নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non-Political Hindu Religious & Social Magazine.

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড।০ আনা।

এই সংখ্যার মূল্য ৷৷০ আনা।

সন ১৩২৫ সাল।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বিদ্যানিধি।
শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত নবকুমার শাস্ত্রী।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।
ডাঃশ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ।
শ্রীযুক্ত নবকুমার শাস্ত্রী।
শ্রী

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে

ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়"

সপ্তম বর্ষ। } ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, আশ্বিন। } প্রথম সংখ্যা।

এস মা!

বরষ পূর্ণ হ'য়েছে জননি! আবার ভারতবর্ষে,
এস মা, তারিণি! মেতেছে তনয় তব দরশন হর্ষে।
সাজায়েছে মা গো! পূজিতে তোমায় পূজা-উপহার ভক্ত,
আগমনপথে নয়নদুয়ার করিয়া দিয়াছে মুক্ত।
হৃদয়-মন্দিরে বিশ্বাস-আসন স্থাপন করিয়া তূর্ণ,
করিয়া রেখেছে ক্ষুদ্র জীবঘট ভকতি-সলিলে পূর্ণ।
সজ্জিত করেছে শরীর-শঙ্খে তব তরে মনো-অর্ঘ্য,
এস মা ত্বরায় ভকত তনয়ে অর্পিতে চরণ-স্বর্গ।
সকলেরি মুখে ফুটিয়াছে হাসি, ভুলিয়াছে সব দুঃখ,
মায়ের চরণ হেরিবে ভাবিয়া আবেগে ফুলিছে বক্ষঃ।
ধনীর প্রাসাদে, দীন-গৃহে তব গমন-উপলক্ষে,
আবালবৃদ্ধবনিতাকুলের আনন্দ ঝরিছে চক্ষে।
তোমারই তনয় পীড়নে কাতর কে রক্ষিবে তোমা ভিন্ন,
সন্তানপালনে জননী কেবল সকলের অগ্রগণ্য;
তাই এস মা গো! কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে,
এস গো জননি! বিপদবারিণী লাঞ্ছিত পীড়িত বঙ্গে।

শ্রীইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়।

মায়ের পূজা।

"সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।"

মহাকালীর ভ্রূকুটীভঙ্গিতে জগতের দিন-দণ্ড-পল যুগমন্বন্তরাদি কাল পরিণাম। এই পরিণামে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় মুহুর্ম্মুহুঃ সংঘটিত হয়। সত্বপ্রধান কাল—সত্য, রজঃপ্রধান কাল—ত্রেতা, রজস্তমঃপ্রধান কাল—দ্বাপর, তমঃপ্রধান কাল—কলিযুগ। সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিজড়িত কালপ্রভাবে মানব সুখী, দুঃখী, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক হইয়া থাকে। আনন্দ, নিরানন্দ এই সুখ দুঃখাদির ভাব বা সত্তা। সাত্বিক, রাজস, তামসভাব ইহাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থিত। আনন্দ ও নিরানন্দে মানুষের চক্ষের জল পড়ে দেখা যায়। বিদেশাগত পুত্রের মুখকমলসন্দর্শনে স্নেহময়ী জননীর নয়নজলধারা, আবার পুত্রবিয়োগ-বিধুরা জননীর নয়নজলধারা পরস্পরে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তাহা যেমন আনন্দ ও নিরানন্দের মধুর ও ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ সাত্বিক ও তামস সুখ দুঃখ আনন্দ ও নিরানন্দের মূর্ত্তি দেখাইয়া, আমাদিগকে কখন সুখের, কখন বা দুঃখের অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করে। জানিনা ইহাতে কি মাধুর্য্য বা কি পারুষ্য বিদ্যমান আছে।

নিরন্তর বিষয়সুখনিরত ভোগী যেমন পরব্রহ্মনিরত বিষয়সুখত্যাগী যোগীর বিমল ব্রহ্মানন্দসুধানুভূতির সত্তা বুঝিতে চাহে না, সেইরূপ পরব্রহ্মনিরত মায়ামুক্ত সাধকও ক্ষণিক মিথ্যা অশুদ্ধ সুখসত্তা অনুভব করিতে অভিলাষ করে না। উভয় প্রকার সুখের তারতম্য বুঝিতে অসমর্থ মায়ামুগ্ধ নশ্বর ঐশ্বর্য্যমদমত্ত মানব ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-সাগরের সুখের তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দ উপভোগে বিমুখ হয়।

প্রাণের আবেগময়ী ভাষায় যাহাকে ডাকিলে পাওয়া যায়, যাহাকে লাভ করিলে জগতে আর কিছু অলভ্য থাকে না, সেই অমৃত, সেই মহত্তত্ত্বরূপা পরমানন্দময়ীর কোলে থাকিয়াও দূরে পড়িয়াছি কেন? ইহা নিজে বুঝিতে পারি না বা অন্যের নিকট তাহা বুঝিতে গেলেও অন্যে বুঝাইয়া দিলে এবং শাস্ত্রে দেখিলেও বুঝি না। শাস্ত্রের বাক্য, গুরুর উপদেশ, সাধুর ক্ষণিক সঙ্গতিতে আমাদের হস্তিস্নানের ন্যায় যে ক্ষণিক চিত্তশুদ্ধি জন্মে, তাহাতে নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি জন্মে না। আমাদের মায়ামলদূষিত চিত্তবৃত্তিতে শাস্ত্রের আদেশ, গুরুর উপদেশবাক্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না। জানি না এই অজ্ঞতার প্রসূতি ঠিক কে? সুখাভিলাষী মানবকুল যাহার আকাঙ্ক্ষায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হয়, জগতে কোথাও সেই নিরতিশয় শান্তিসুধাবিধৌত বিমল সুখ উপভোগ করিতে পারে না, কেবল চকিত উদ্‌ভ্রান্তভাবে আত্মহারা হইয়া নিজের জীবন বা কর্ম্মকে ধিক্কার দেয়; তখন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিমার্গকে পরিত্যাগ করতঃ পাষণ্ডপথ আশ্রয় করে। বল দেখি ভাই! এই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবের প্রসবকারিণী কে?

আবার আর এক দিকে দৃষ্টিপাত কর দেখিবে—ঐ যে মহাশ্মশানে বৃহৎ বটবিটপিতলে ভস্ম-মাখা জটামণ্ডিত মস্তক, কৌপীনধারী নিমীলিতনেত্র মানব, আজ কাহার প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া, কাহার ভাবে বিভোর হইয়া অনিত্য বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কাহার ধ্যানে, কাহার চিন্তায়, কাহার আরাধনায় আত্মহারা হইয়াছে? ইহা কি উহার বিষয়সুখভোগ-পাপের কঠোর নির্জ্জনকারাবাস দণ্ড? অথবা সংসার-বৈরাগ্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মহাপ্রস্থান? যেখানে মানবের উপাধির বিলোপ হয়, যেখানে পাপী ও পুণ্যবান্ অবিচারিত-ভাবে একত্র স্থান পায়, যেখানে সুরম্য হর্ম্ম্যবাসী সম্রাট্ ও পর্ণকুটীরবাসী ভিখারী অভিমান ত্যাগ করিয়া সমভাবে শয়ন করে, যেখানে দেবপ্রকৃতি ও দানবপ্রকৃতি মানবের একত্র সমাবেশ হয়, যেখানে শত্রু মিত্র দ্বেষ্য দ্বেষকতা ভাব ভুলিয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, পণ্ডিতের জ্ঞানগরিমা, মূর্খের মহান্ধতা ঘুচিয়া সমাহিতভাবে এক শয্যায় স্থান পায়, যাহা এই সংসারের নশ্বরতার, অবিশুদ্ধতার ও দুঃখের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মানবকে অবিনশ্বর বিশুদ্ধ নিত্য সুখের দিকে অগ্রসর হইতে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে উপদেশ দেয়, তাহাকে আমাদের শিক্ষার স্থান, দীক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র, জ্ঞানের মহাপীঠ বলিতে সন্দেহ কি? মানবের ঐহিক সুখসৌভাগ্যপরিসেবিত এই দেহের পরিণাম যে ভস্ম, তাহা জানাইবার জন্য মাতৃভক্ত সাধক বিবেকবৈরাগ্যের হাত ধরিয়া এই মহা সমাধি-ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। আর আমাদের ন্যায় আত্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত মোহতমসাচ্ছন্ন ঐহিক বিষয়সুখলুব্ধ মানবকে, "সংসারে যাহা দেখ সমুদয় ভস্ম" এই উপদেশ দিবার জন্য নিজের ভস্মপরিণাম দেহে ভস্ম মাখিয়া নীরবে উপদেশ দেয়।

আমরা ইহা দেখিয়াও কেন বুঝি না, আবার বুঝিয়াই বা কেন ভুলিয়া যাই, ইহা কি ভাবিবার বা বুঝিবার বিষয় নহে? বিবেক, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই তিনটী যাঁহার কৃপায় লাভ করিয়া দেবত্বের উপর আধিপত্য করিতে পারা যায়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাঁহাকেই চিনে না, তাঁহাকেই জানেনা; তাই দুঃখে সুখাভিমানী হইয়া কখন হাসে, কখন কাঁদে।

যাঁহার ইচ্ছায় বা যাঁহার শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সংঘটিত হয়, তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার শক্তিতে তামসপ্রকৃতি মানব যে মুগ্ধ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? দেখ ঐ যে পাখীটি আহার মুখে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে উচ্চ বৃক্ষের অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে, বল দেখি উহার কারণ কি? তুমি বলিবে সুতস্নেহের বশবর্ত্তিনী পক্ষিণী শাবককে আহার প্রদান করিবার জন্য উধাও হইয়া ধাবিত হইতেছে। বল দেখি এইরূপ ভাব তুমি মানবেও দেখিতে পাও কিনা? ক্ষুদ্র পাখীটি হইতে মানব পর্য্যন্ত, অধিক কি আমাদের আরাধ্য দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া নিরন্তর উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করে, তিনি কে? তাঁহাকে কি জানিতে ইচ্ছা হয় না? প্রত্যুপকারলুব্ধ মানব সুতস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মায়ায় আবদ্ধ হয় বলিবে; কিন্তু বল দেখি ঐ ক্ষুদ্র পাখীর সে প্রত্যুপকারের আশা কোথায়? তথাপি কেন সে অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হয়? তোমাকে অবশ্য ইহার উত্তরে বলিতে

হইবে, আমাদের অপ্রত্যক্ষভাবে কোন একটী ঐশীশক্তি বা প্রকৃতি জগতে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদিগকে স্নেহমমতার বন্ধনে বাঁধিয়া সুখের হাসি বা দুঃখের কান্নায় অভিভূত করে, তাহাতেই আমরা এরূপ বিভ্রান্ত হই।

তিনি কে? তিনি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা মহামায়া। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি—এই মহত্তত্ত্ব নিশ্চয়জননে সমর্থ অন্তঃকরণ। এতৎ সমষ্টিকে যিনি আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি বিষ্ণু। মহত্তত্ত্বের কারণ প্রকৃতিদ্বারা বিষ্ণুর যে আংশিক অভিভব, তাহাই যোগনিদ্রা নামে কথিত হয়। অহঙ্কারসমষ্টিকে আত্মা বলিয়া যিনি বিবেচনা করেন, তিনি রুদ্র, মনঃসমষ্টিকে যিনি আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন তিনি ব্রহ্মা। সাংখ্য যাঁহাকে হরিহরব্রহ্মার প্রসূতি বা মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি সেই পরমা প্রকৃতি মহামায়া। এই হরিহরব্রহ্মা আবার সেই পরমাপ্রকৃতি মহামায়ার ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার প্রেরিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্য সমাধা করেন।

বেদান্ত বলেন. চিত্ত নামক অন্তঃকরণসমষ্টি যাঁহার উপাধি, তাদৃশ চৈতন্যই হরি; অহঙ্কার উপাধিতে রুদ্র, বুদ্ধি উপাধিতে ব্রহ্মা। চিত্তের উৎপত্তি মায়া হইতে। মায়ার সংস্কাররূপে চিত্তের স্থিতি হরির যোগনিদ্রা।

জগৎপালনী শক্তিসম্পন্ন জীবই হরি, তিনি সমষ্টিশক্তির তমঃ প্রধান অবস্থায় অভিভূত হইলেই তাঁহার যোগনিদ্রা বলা যায়, ইহা মীমাংসকের মত।

মহামায়ার স্বরূপ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত চৈতন্য ও প্রকৃতি। তাঁহা হইতেই হরিশরীর প্রভৃতি শরীরের উৎপত্তি। সেই শরীরের বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থাই নিদ্রা। সেই অবস্থা প্রকৃতির আংশিক বিকার। এই বিকৃতিভাবাপন্না বা তমঃপরিণামিনী প্রকৃতিই তামসী। মহামায়ার কল্পিতাংশ বলিয়া প্রকৃতিকে মায়া এবং তাঁহারই অবস্থা বিশেষ বলিয়া নিদ্রা বা যোগনিদ্রাকেও মায়া বলা যায়, তিনি চৈতন্যাংশমিলিতা বলিয়া মহামায়া, চৈতন্যাংশ সম্বন্ধ মায়াবস্থা বলিয়াই যোগনিদ্রাকেও মহামায়া বলা যায়। এই মহামায়ার প্রসাদেই জীব ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দধামে আনন্দময়ীর সন্নিকর্ষতা লাভ করিয়া—

"স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি"।

এই মহামায়াই বন্ধনও মোচনের কর্ত্রী, ইনি হরি হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে।"

এই মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা, ইহা আমারই মায়ানির্ম্মিত আদ্যা তনু, ইনি বন্ধন ও মোচনের কর্ত্রী। নারদীয় পুরাণেও বলিয়াছেন,—

"এবং মায়ামহাবিষ্ণোর্ভিন্না সংসারদায়িনী।
অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টা চেৎ সংসারক্ষয়কারিণী॥"

জীব এই বিষ্ণুমায়াকে যখন বিষ্ণু হইতে পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখে তখন সংসারপাশে বদ্ধ হয়। এই ভিন্ন জ্ঞানই সংসারের কারণ, ইহাই অবিদ্যা। আর যখন সাধুসঙ্গে গুরুর উপদেশে পৃথক্ দৃষ্টির বিলোপ হইয়া অভেদ বুদ্ধিতে দেখা যায়, তখন আবার এই বিষ্ণু-মায়াই সংসারক্ষয়কারিণী মুক্তিদায়িনী বিদ্যা। উপযুক্ত অধিকারী হইলে দয়াময়ী মা সন্তানকে আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া অভিলষিত মুক্তি দান করিয়া থাকেন। অনুপযুক্ত পুত্র মাকে চিনে না, তাঁহাকে ডাকিতে জানেনা, তাঁহার নাম স্বপ্নেও স্মরণ করেনা, তাই এই ত্রিতাপপূর্ণ সংসারসাগরের মোহতরঙ্গে পড়িয়া আত্মহারা হয়; কি শুভ, কি বা অশুভ, তাহা ভাবিবার বা জানিবার অবসর না পাইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে, আর কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি, কোথায় আনন্দধাম ইহা বলিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

সম্বৎসর ধরিয়া আমরা সংসারের তাপে দগ্ধদেহ হইয়া বড়ই ক্লিষ্ট হই, তাই দয়াময়ী মা পরমা প্রকৃতি মহামায়া দশভুজারূপে এই শরতে বর্ষে বর্ষে অকৃতি সন্তানদিগের দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচাইতে আসিয়া থাকেন। শারদীয় স্নিগ্ধ শশধরকিরণ মায়ের হাস্যচ্ছটা, বালার্ককিরণ তাঁহার চরণজ্যোতিঃ, ঊষার চারু আলোক তাঁহার দেহকান্তি। এই ঊষার আলোকে ভাবুক ভক্ত মায়ের প্রিয় সন্তানের মনে আজ কত ভাব, কত প্রেম, কত আনন্দ জাগাইয়া দেয়, তাহা ভক্ত বই আর কে বলিতে পারে বা জানিতে পারে? ঐ দেখ দশভুজা মা আমার ভক্ত সন্তানকে সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দশহাতে দশ প্রহরণ লইয়া এই ধরাধামে আসিয়াছেন। মায়ের আগমনে আজ মরজগৎ অমর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যাহার কেশরমূলে ও গ্রীবায় বিষ্ণু, শরীরে সমুদয় জগৎ, মস্তকমধ্যে মহাদেব, ললাটে উমা দেবী, নাসাদণ্ডে সরস্বতী, মণিবন্ধে কার্ত্তিকেয় ও পার্শ্বে নাগগণ, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য, দন্তপংক্তিতে বসুগণ, জিহ্বায় বরুণ, হুঙ্কারে চর্চ্চিকাদেবী, গণ্ডদ্বয়ে যম ও কুবের, ওষ্ঠাধরে সন্ধ্যাদ্বয়, গ্রীবার একদেশে ইন্দ্র, গ্রীবাসন্ধিস্থানে নক্ষত্রবৃন্দ এবং বক্ষঃস্থলে সাধ্যগণ অধিষ্ঠিত, সেই সর্ব্বদেবরূপী কেশরীর পৃষ্ঠে দক্ষিণ চরণ ও মহিষরূপী মহেশের পৃষ্ঠে বাম চরণ স্থাপন করিয়া ত্রিভঙ্গরূপে হাস্যমুখে জগদ্বাসীকে অভয় দিতে বরদারূপে আসিয়াছেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ, দারিদ্র্যহারিণী লক্ষ্মী, মোহনাশিনী বিদ্যা, সর্ব্বশক্তির আশ্রয়-স্বরূপ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভক্তের অভিলষিত বর দান করিবার জন্য ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতিকা মা বরদা আসিয়াছেন। অণিমাদি সিদ্ধির জন্য, ঐশ্বর্য্যের জন্য, বিদ্যার জন্য, শক্তির জন্য, আর কাহারও দুয়ারে যাইতে হইবে না। দয়াময়ী মা আমাদিগকে অসিদ্ধমনোরথ দেখিয়া, দরিদ্র দেখিয়া, বিদ্যাহীন দেখিয়া, শক্তিহীন দেখিয়া, সিদ্ধিদাতা গণেশ, কমলা, সরস্বতী ও কার্ত্তিকেয়কে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। এখন ভক্তিভরে প্রেমানন্দে মায়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, যাহা চাইবে তাহাই পাইবে। তুমি অজ্ঞান সন্তান বলিয়া, সিদ্ধিশ্রীবিদ্যাশক্তি-

প্রসবিনী মা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে লোকলোচনের গোচরীভূতা হইতেছেন। তুমি সমাহিত-ভাবে বাহ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঐ দেবারাধ্যা মাকে তোমার হৃদয়-পদ্মাসনে বসাইয়া মানসনেত্রে দেখিলে দেখিতে পাইবে মায়ের চরণে অনন্ত সিদ্ধি, অনন্ত শ্রী, অনন্ত বিদ্যা, অনন্ত শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। তুমি ইহা বুঝিবে না, তুমি ইহা ভাবিতে পারিবে না বলিয়াই ঐ সকল মূর্ত্তি-বিভূতিকে নিজ হইতে পৃথক্‌রূপে দেখাইতেছেন; ইহা মায়েরই বিভূতি মাত্র। ভক্ত সাধক! আজ তোমার দারিদ্র্যদুঃখহারিণী জননী দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন, ঐ মায়ের চরণতলে লুটাইয়া পড়, আত্মসমর্পণ কর, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বল মা! আমাদের ত্রিতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যাশক্তিহীন চিত্তে শান্তি দাও, সিদ্ধি দাও, ঐশ্বর্য্য দাও, বিদ্যা দাও, শক্তি দাও। মোহান্ধ নেত্রে দিব্যদৃষ্টি লাভের অঞ্জন-শলাকা পরাইয়া দাও, যাহাতে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচিয়া যায়, যাহাতে আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি, প্রকৃত মানুষ হইতে পারি, তাহার শক্তি দাও মা। প্রাণে শান্তি নাই, চিত্তে সুখ নাই, দরিদ্রতার নিপীড়নে চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, দেহে শক্তি নাই। সর্ব্বশক্তিরূপা মা! আমরা তোমার সন্তান হইয়া এত হীন, এত দরিদ্র, এত নির্ব্বোধ কেন হইলাম মা? আমরা বুঝি তোমাকে চিনি না, তোমাকে ডাকিতে জানি না, তাই তুমি আমাদের দুঃখ দারিদ্র্যে সহায় হও না এবং তাহা মোচনেরও চেষ্টা কর না। সত্য, মা আমরা যদি তোমাকে ডাকিতে পারিতাম, তবে তুমিও আসিতে, আমাদেরও দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইত। তোমারই ভক্তসন্তান না একদিন বলিয়াছিল "ডাক দেখি মন ডাকার মতন, মা কেমন তোর থাক্‌তে পারে।" তাই বলি ভাই! তোমরা একবার ডাকার মত ডাক দেখি? তোমার ডাকে মা আসেন কিনা? তোমার দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হয় কিনা? ঐ দেখ অনন্তশক্তিরূপা মা! স্মিতবিশোভিত মুখে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বরাভয় দান করিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। আর দূর কি ভাই? তুমি নয়ন-মন্দাকিনীর প্রেমামৃত ধারায় মায়ের ঐ অমরবাঞ্ছিত পদে পাদ্য দান কর, আর হৃদয়-উদ্যানের ভাবকুসুমে ভক্তিচন্দন মাখাইয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান কর, আর প্রেমগদ্গদকণ্ঠে বল,—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং, ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়ের চরণে পড়িয়া শিশুসন্তানের মত আব্দার করিয়া বল—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

মা! তোমার সন্তান, তোমার ভক্ত, তোমার সাধক, নিজের জন্য নহে, নিজের স্ত্রীপুত্র পরিবার বর্গের জন্য নহে, জগদ্বাসীর জন্য, তোমার সুকৃতি, অকৃতি সন্তানের জন্যই তোমার করুণা প্রার্থনা করে। ভক্তের প্রশস্ত হৃদয়ক্ষেত্রে দ্বেষ, হিংসার বীজ অঙ্কুরিত হয় না,

সে ক্ষেত্র অনুর্ব্বর নহে; তুমি কৃপাকটাক্ষে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া করুণাবারি সেচন করিলে দেখিতে পাইবে—সে ক্ষেত্রে কি অমৃতফলপ্রসবিনী কল্পলতিকার উৎপত্তি হয়। জগতের জন্য তোমার ভক্ত ভিন্ন, তোমার সাধক ভিন্ন, তোমার সন্তান ভিন্ন, আর কাহার প্রাণ কান্দে, আর কে বা পরার্থে স্বার্থ বলিদান করিতে সমর্থ হয়? তাই বলি মা আজ তোমার জগৎবাসী সন্তানগণ ভক্তিভাবে, গলদশ্রুনেত্রে তোমাকে ডাকিতেছে,—

আগচ্ছ বরদে দেবি বিন্ধ্যাদ্রেহিমপর্ব্বতাৎ।
আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিং॥

এস মা সর্ব্বমঙ্গলে! এস, তোমার অকৃতি অধম সন্তানগণের পূজা গ্রহণ কর, আর তাহাদের যাহাতে দুঃখ দূর হয়, তাহারা যাহাতে তোমার প্রকৃত সন্তান হইতে পারে, তাহার বিধান কর মা।

আর যদি মা তোমার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিতে বাসনা হয়, তবে বলিব শ্মশানবাসিনি মা! তুমি তোমার সেই ভীমা চণ্ডমুণ্ডনাশিনী চামুণ্ডামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তোমারই গড়া সোণার সংসারকে সংহার কর; তোমার সংসার শ্মশানে পরিণত হউক, আর তাণ্ডবিনী তুমি তাহাতে উদ্ভট নৃত্যের অভিনয় কর, আমাদের তাপদগ্ধ ভস্মোপম দেহ তোমার চরণ-তাড়নায় বিচূর্ণিত হইয়া অনন্তে মিশিয়া যাউক, তোমার শ্মশানে তাণ্ডবনৃত্যের অভিনয় শেষ হউক।

শ্রীবিপিনচন্দ্র বিদ্যানিধি।

দুর্গোৎসব।

হেমাভরণসম্পন্না সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের সহিত নিত্যযুক্তা, বহুবিধশোভাসম্পন্না হৈমবতী দুর্গামূর্ত্তিতেই ব্রহ্মশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই পরব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি দুর্গা নামে বর্ণিতা এবং জগদম্বারূপে সর্ব্বদেবগণের, ঋষি যোগী ও গৃহিগণের নিকট অর্চ্চিতা।

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং
হৈমবতীম্, তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি॥"

কেনোপনিষৎ।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী সর্ব্বমঙ্গলময়ী পরমশরণ্যা, সর্ব্বজীবে যিনি বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও অপবর্গের প্রধানকর্ত্রী, সেই সনাতনী দুর্গাদেবীই দেবগণকে ব্রহ্মতত্ত্ব "আপনার

তত্ত্ব আপনিই প্রকাশ করেন"। দুজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব দেবগণ ভগবতী দুর্গাদেবীর নিকট অবগত হন, মহামায়া দুর্গাপূজায় দিব্যজ্ঞানের পরম জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত হয়, যে ভক্তের হৃদয়ে তিনি যে রূপে প্রকাশিত হয়েন, সেই ভক্ত তাঁহাকে সেই রূপেই পূজা করিয়া থাকেন। দুর্গাপূজায় সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশন গণেশের পূজা, ধর্ম্মাস্ত্রধারী সর্ব্বশক্তিধর কার্ত্তিকেয় মহাসেনার পূজা, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী জ্ঞানময়ী সরস্বতী ও ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা, ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতি দ্বারা সিংহবৎ প্রবল বীরত্ব অবলম্বনে পাপবিনাশক সিংহরূপী পরমভক্ত সাধকের পূজা, নিষ্পাপ ভক্ত উপাসকের বাসনাত্যাগের এবং শিবময় ভূমায় মিলিত হইবার একমাত্র হেতু সেই মহাযোগী মহাদেব শিবের পূজা, আর সেই মোক্ষদায়িনী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী মহামায়া দুর্গার পূজা। এই মহাপূজায় শিবময় তুরীয়ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া আত্মার মুক্তিপদ প্রাপ্তি ঘটে। দুর্গোৎসব সাধনার সার, কর্ম্মের কর্ম্ম, প্রেমের ও আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ।

অতি কঠোর তপস্যায়, অতি কঠোর আত্মত্যাগে যাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বরের পরমারাধ্যা, অবাঙ্মনসোগোচরা তুরীয়ব্রহ্মরূপিণী চিন্ময়ী দুর্গা আমাদের পরমারাধ্যা। কোটি কোটি কল্প কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত হইলে যাঁহার করুণাকটাক্ষে জীব জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী, সর্ব্ব জীবের মুক্তিপ্রদায়িনী জগন্মাতা দুর্গা। মানব দুঃখে দুর্গতির দুঃসহ নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাঁহার করুণাকটাক্ষে নিষ্কৃতি লাভ করে, তিনিই সেই ব্রহ্মময়ী সনাতনী দুর্গা। মা আমার দুর্গারূপে শুদ্ধসত্ত্ব-গুণময়ী ব্রহ্মরূপিণী, দশদিকে দশ হস্ত ধারণ করিয়া পূর্ণশক্তিশালিনী। ভাবরাজ্যে পবিত্র অধ্যাত্মভাব হৃদ্বোধ করিতে পারিলে, ভাবময়ী মায়ের ভাবতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। মায়ের দুর্গারূপের এক ধারে সিংহরূপী রজোগুণ মহিষাসুর তমোগুণকে পরাস্ত করিতেছে। এক ধারে বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা গণপতি, এক ধারে ধনৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী, অপর ধারে বল বিক্রমের অধিষ্ঠাতা কার্ত্তিকেয় ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌বাদিনী সরস্বতী দেবী। দুর্গাপূজায় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গলাভ ঘটে। ইহাই বিজ্ঞাপনার্থ ঐ মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের একত্রসমাবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অজ্ঞান অন্ধকার নাশ হইলে, জ্ঞান দৃষ্টি উন্মীলিত হইলে ভাবময়ী মায়ের ভাবতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান।

মায়ের অনুকম্পা ব্যতীত কখন কোন কালে কেহ কোন দুরূহ কার্য্য সংসাধন, কি দুরূহ বিপদ হইতে পরিত্রাণ বা মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। মায়ের এই পূজাই মাকে পরিতুষ্ট করিবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রেষ্ঠ পথ। সেইজন্যই মায়ের তুষ্ট্যর্থে ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্র আশ্বিন মাসে বোধন করিয়া দুর্গারূপের পূজা করেন। আর সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একযোগে একত্র সম্মিলনে মায়ের ভগবতী মহাশক্তি দুর্গামূর্ত্তির পূজা করিয়া ধন্য হন। মহেশ্বর মহাশক্তির পূজক, লোকনাথ বিষ্ণু তন্ত্রধারক, আর সৃষ্টিকর্ত্তা

ব্রহ্মা মায়ের পূজায় নিজের মুণ্ড বলিদান করিয়া চতুর্মুখ হইয়াছেন, তাই চতুর্বেদ মা তোমারই মহিমাপূর্ণ বেদগান করেন। প্রজাপতি দক্ষ সেই বেদগান শ্রবণ করিয়াই সৃষ্টির আদিতে মহাদক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, আর সেই পুণ্যপ্রভাবেই তিনি মহাশক্তি যোগমায়াকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহাশক্তি মহামায়া সাকারা ও নিরাকারা। মাগো, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আমার জীবিতকালে যখন যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা যেন তোমার পূজা, উপাসনা, সেবা, অর্চনা-স্বরূপ হয়। আমি যখন যাহা উচ্চারণ করি, কথোপকথন করি, তাহা যেন তোমার জপস্বরূপ হয়। আমি যখন যেভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করি, তাহা যেন তোমার পূজা উপাসনার মুদ্রারূপে পরিণত হয়। আমার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ যেন তোমার চিন্ময়ী মূর্ত্তির প্রদক্ষিণ-স্বরূপে পরিণত হয়। আমি যখন যাহা পান ভোজন করি, উহা যেন তোমার আহুতিস্বরূপে প্রদত্ত হয়। নিদ্রার জন্য শয়ন যেন তোমার সাষ্টাঙ্গ প্রণতিস্বরূপ হয়। আমার সর্ব্ববাসনা যেন তোমাতেই লয় হয়। আমার নিখিল শক্তিসংযোগ জন্য সুখ যেন আত্মসমর্পণস্বরূপ হয়। তোমার প্রতি অনন্তভক্তিসহকারে তোমার সংসারে তোমার কার্য্য মনে প্রাণে সাধন করিয়া তোমার ঐ দেবদুর্লভ অভয়পদে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রতি মতি রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, ইহা ব্যতীত জীবনে আর কোন কামনা নাই।

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগমনী।

গিয়াছে বরষা, ধরণী-সরসা
প্রকৃতি শ্যামলা রূপসী।
শতদলরাজি উঠিয়াছে ফুটি
উজ্জ্বল করি সরসী।

শরতের নব শিশিরসম্পাতে
ফুটেছে শেফালিরাশি,
জলে ধোয়া চাঁদ, আকাশের গায়
ধরায় ধরেনা হাসি।

বিছায়ে দিয়াছে প্রকৃতি আপন
শ্যামল অঞ্চলখানি,
আসিবে বলিয়া বঙ্গভবনে
তুমি মা মহেশ-রাণি!

কাননকুঞ্জে, গাহে আগমনী
হর্ষে পাপিয়া পিক্,
বঙ্গভবনে আসিছে জননী
জানাইছে চারি দিক্!

এস মা কমলে! নয়নের জলে
জানাই প্রাণের ব্যথা,
কোন্ অপরাধে সঁহি এত দুখ
সুধাই জগন্মাতা!

(আজি) অর্দ্ধ বঙ্গ, বন্যা-পীড়িত
ঘরে ঘরে হাহাকার!
ক্ষুধায় অন্ন— অঙ্গে বসন
জুটান হয়েছে ভার!

বিশ্ব ব্যাপিয়া,   জ্বলিতেছে ধূ ধূ
   প্রচণ্ড সমরানল।
তরঙ্গ তুলিয়া,   শোণিতের নদী
   ছুটিতেছে কল কল!

গগনে পবনে,   ভূতলে সলিলে
   নিয়ত সংহারলীলা!
গভীরাতঙ্কে,   উঠিছে শিহরি
   ধরণী ধৈর্য্যশীলা!

প্রকৃতিরঞ্জক,   খ্যাত সদাশয়
   নরপতি চির দিন,
অসুরের সনে,   প্রবল আহবে
   বিপদ-সাগরে লীন।

এস দশভুজে—   দশ প্রহরণে
   বিনাশ অসুরদলে,
যুগে যুগে যথা,   করেছ দলন—
   অসুর চরণতলে।

অন্ন-ভাণ্ডার   দিয়ে যাও ভরি
   অন্নপূর্ণারূপিণি!
অর্দ্ধনগ্ন,   জননী ভগিনী
   রাখ মা লজ্জাবারিণি!

বিতর শান্তি   নিখিল ভুবনে
   শান্তিরূপিণী কমলা,
দুঃখ দৈন্য,   ভুলুক বঙ্গ
   হউক শস্যশ্যামলা।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দুর্গাদাসের দুর্গোৎসব।

কালচক্রের আবর্ত্তনে দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস আবর্ত্তিত হইয়া সম্বৎসরের পরে শরৎঋতু ভূমণ্ডলে সমাগত। আকাশ প্রাবৃটের মলিন কাদম্বিনীবসন পরিত্যাগপূর্ব্বক নক্ষত্রমালাখচিত নির্ম্মল নীল বসন এবং গঙ্গাগামী উড্ডীন রাজহংসকুলরূপ শ্বেত শতদলের মালা পরিয়া মনোহর সাজে সজ্জিত। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির শ্যামল শস্যক্ষেত্র কমলার আসনরূপে শরতের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। শেফালিকাগন্ধামোদিত চন্দ্রমার বিমল জ্যোৎস্না বিগতকলুষা জাহ্নবীর তরঙ্গমালার স্তরে স্তরে সাঁতার দিতেছে। ছোট বড় সকল সরোবর কুমুদ, কহ্লার ও কমলকুসুমের অঞ্জলি লইয়া মা জগদম্বার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বঙ্গে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে। মা আনন্দময়ী আসিতেছেন। রোগী রোগ-যন্ত্রণা, শোকার্ত্ত শোকগাথা ভুলিয়া আনন্দময়ীর দর্শন কামনায় উদ্‌গ্রীব। যে সকল ভাগ্যবান্ গত বিজয়ায় "সংবৎসরব্যতীতে তু" (ইত্যাদি) বলিয়া বৎসরান্তে আসিবার জন্য মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। মহাসমর-নিবন্ধন পৃথিবীময় সার্ব্বজনীন অভাব, তিন বৎসর বঙ্গে অজন্মা, তাহার উপর এইবার মহাবন্যায় বঙ্গপ্লাবিত। বহুস্থানে ধানগাছের পাতা পর্য্যন্ত নাই। সর্ব্বাভাবে মহাভীতি, মহাচিন্তা। হঠাৎ শারদীয় সুষমার সঙ্গে বঙ্গে নিরাশার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার আলোক বিকাশ পাইয়াছে, জগজ্জননী আসিতেছেন। অবতার-তত্ত্বের পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য এবং ভয়ে ভীত, চিন্তায় ক্লিষ্ট, আধিব্যাধিগ্রস্ত সন্তানগণের আনন্দ বিধানহেতু মা আনন্দময়ী আসিতেছেন। সর্ব্বত্র আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলই নিজ নিজ ভাব নিয়া আনন্দিত।

বঙ্গের প্রান্তদেশে কোন গণ্ডগ্রামে দুর্গাদাসের বাস। দুর্গাদাস ধনী ও কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান। বংশপরম্পরা ইঁহারা দুর্গাভক্ত। দুর্গাদাস পণ্ডিত ও সাধক। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, যথারীতি রক্ষার অভাবে বহু সম্পত্তি শৈশবেই নষ্ট হইয়া যায়।

দুর্গাদাসের পিতা সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। তিনি দুর্গাভক্ত থাকায় শৈশব হইতেই দুর্গাদাসের চিত্তে দুর্গাভক্তি ফুটিয়া উঠে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে দুর্গাদাসের পিতার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার ছিলেন, তাঁহার নাম তারকনাথ। দুর্গাদাসের পিতার জীবিতাবস্থায় এই জমিদার কিছুই করিতে পারেন নাই, কিন্তু মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝিয়া নানা ছল চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া দুর্গাদাসের বহু সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। এই সকল বিবাদবিসম্বাদ দুর্গাদাস ঘৃণা করিতেন। তিনি এই সকল হইতে দূরে থাকিবার জন্য অবশিষ্ট সম্পত্তি রক্ষার ভার একজন আত্মীয় কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করিয়া ৺কাশীধামে বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল হন। যথাসময়ে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত

হইয়া বাড়ী আসিবার অল্পদিন পরেই সেই কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়। উক্ত কর্ম্মচারীর বিচক্ষণতায় কতক সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছিল। দুর্গাদাস বহু ছাত্রের অন্ন ও বিদ্যাদাতৃরূপে শাস্ত্রালোচনায় ও সাধনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রভূত ব্যয়, অথচ বিষয়রক্ষায় মনোযোগ নাই। সুযোগ বুঝিয়া জমিদার তারকনাথ নানা উপায়ে সমুদয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রজারা দুর্গাদাসকেই ভূস্বামী বলিয়া ভক্তি ও তাঁহার সাহায্য করিত। সকলেই জানিত অন্যায় করিয়া তারকনাথ দুর্গাদাসের সকল সম্পত্তি গ্রাস করিয়াছেন। এইহেতু প্রজারা তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত। ইহাতে তারকনাথ অতি ক্রোধ ও ঈর্ষাবশ হইয়া প্রজাদিগকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল বিপরীত হইল; প্রজারা তারকনাথকে অধিক ঘৃণা ও দুর্গাদাসকে দেববৎ ভক্তি করিতে লাগিল, এবং যথাসাধ্য সকলেই তাঁহার আনুগত্য করিত। এই সকল দেখিয়া তারকনাথের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। দুর্গাদাসকে জব্দ করাই শান্তির কারণ বিবেচনায় তাহার বিপক্ষে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। দুর্গাদাসের সেই দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, দুর্গাভক্ত দুর্গাদাস জগদম্বার অভয়পদে মতি স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা ও সাধনভজনে দিনাতিপাত করিতেন। বহু ব্যয়, কিন্তু তদনুরূপ আয় নাই। বর্ণাশ্রম-সমাজে নানা অনাচার প্রবেশ করায় শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ব্বাচনের সুযোগ না দেখিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ। অব্যবস্থা কুব্যবস্থা দিয়া অর্থ গ্রহণ করাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সুতরাং তাঁহার আয়ের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। ক্রমে দুর্গাদাসের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। অনাহারে অর্দ্ধাহারে পরিজনের দিনাতিপাত হইতে লাগিল। শৈশবে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও আজ দীনহীন। দুর্গাদাসের পত্নী নারায়ণী, স্বামীর উপযুক্তা সহধর্ম্মিনী,—স্বামীর নিকট সকল শাস্ত্রের উপদেশ পাইয়াছেন। গৃহকর্ম্ম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দেবদ্বিজসেবা প্রভৃতিতে তিনি আদর্শ আর্য্য-রমণী। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র, নাম সুব্রহ্মণ্য। পুত্রকে যথাকালে উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়মানুসারে বেদাদি শাস্ত্র, আচার নিয়ম ও সংযম শিক্ষা দিয়া গত বৈশাখমাসে তাহার সমাবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। দুর্গাদাস অধিক সময়েও পূজা, জপ ও যোগে নিবিষ্টচিত্ত। পত্নীও স্বামীর অনুকারিণী। অবস্থার সঙ্গে সকল দাস দাসী চলিয়া গিয়াছে। একটী পুরাতন ভৃত্য যায় নাই, তাহার নাম রামলাল। এই ভৃত্যই সংসারের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সে এই পুরাতন প্রভুপরিবারের সেবা করিয়াই সন্তুষ্ট, বেতনাদির কোন প্রত্যাশা তাহার নাই।

(২)

দুর্গাদাসের বাড়ীতে মহাড়ম্বরে দুর্গোৎসব হইত, এখন অবস্থাহীনতায় ব্যয়াধিক্য না হইলেও যথাসম্ভব ব্যয়ে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। সে পূজার পরিপাটী, ভাব, ভক্তি অতুলনীয়, যে তাহা দেখে সেই ভক্তিভাবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে না।

এইবার মায়ের নবমীর বোধন হইয়া গিয়াছে। দুর্গাদাস যথাকালে ঘটস্থাপন করিয়া মায়ের বোধন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগরের কারুকর প্রতি বৎসরের নিয়মানুসারে মায়ের প্রতিমা গড়িয়াছে, এখনও রং হয় নাই। রামলালই সব করিতেছে, প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা নাই। দুর্গাদাস বাহিরের কোন বিষয়ের তত্ত্ব রাখেন না, জানেন সাধ্বী পত্নী ও ভক্ত ভৃত্য আছে। তাঁহারাও প্রভুর চিত্ত বিক্ষেপকর বিষয়কথায় ধর্ম্মকার্য্যের বাধা না দিবার প্রয়াসী। কিন্তু এইবার আর চলিতেছেনা। সমুদয় সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেলেও রামলাল খাজানা স্বীকারে ক্রেতার নিকট হইতে কতক ধানের জমি নিজ অধীন রাখিয়া বার্ষিক অন্নসংস্থান করিয়াছিল। অজন্মাহেতু এই বৎসর তাহাও নাই। বস্ত্রাদি সকল দ্রব্যের মূল্যই অত্যধিক। পরিবারে অন্নবস্ত্রের অভাব। সকলের পরিধানেই ছিন্ন বস্ত্র, অনাহারে অর্দ্ধাহারে সকলের শরীর জীর্ণ শীর্ণ। রামলাল শারীরিক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত, কিন্তু অনাহার অর্দ্ধাহারনিবন্ধন শরীর ক্ষীণ হওয়ায় তেমন পরিশ্রম করিতে পারেনা, সুতরাং সেই আয়ও হ্রাস হইয়া আসিল, দুর্গাদাসের পরিজনের অনাহার কষ্ট বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে অবস্থা বর্ণনাতীত হইয়া পড়িল।

পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। দুর্গাদাসের গৃহে পূজার কোন আয়োজন নাই। গৃহে একটী পয়সা বা একটী তণ্ডুলকণাও নাই, অনন্যোপায় হইয়া রামলাল অপরাহ্নে অবসর মত দুর্গাদাসকে বলিল—ঠাকুর! এবার মায়ের পূজার উপায় কি হইবে? দেশে মহাদুর্ভিক্ষ, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, যে দিন কিছুই সংগ্রহ হয় না, সেই দিনের তো কথাই নাই, যে দিন সকলের পরিমিত সংগ্রহ না হয়, সে দিন মাঠাকুরাণী তাহা দেবতার ভোগ হইলে সকলকে বিভাগ করিয়া দেন, নিজে কিছুই খাননা। এইরূপে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তিনি আর দাঁড়াইতে পারেননা। কল্যও তিনি কিছুই খান নাই, অদ্যও উপবাসী আছেন। এই কথা শুনিয়া দুর্গাদাস একবার করুণ দৃষ্টে গৃহিণীর দিকে তাকাইলেন। নারায়ণী নতমুখে ভূমিপানে চাহিয়া রহিলেন। ভৃত্য রামলাল আবার বলিতে লাগিল, ঠাকুর! মাঠাকুরাণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনি এত দিন সংসার চালাইয়াছেন। এক এক করিয়া সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়া এত দিন দুর্গোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাঁহার গহনা তো কম ছিলনা? কিন্তু আর কত দিন চলিবে? এখন আর গহনা এক খানিও নাই, এই বার মায়ের পূজার ও পরিজনবর্গের জীবন যাত্রার উপায় দেখিতেছিনা। মাঠাকুরাণীর যে দশা হইয়াছে, আর শরীর রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হয় না, আমি মাঠাকুরাণীর এই শোচনীয় দশা আর সহ্য করিতে পারিনা। এই বলিয়া রামলাল অজস্রধারে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নারায়ণী বলিলেন,—ওকি বাছা রামলাল! ওরূপ করিতে আছে কি? আমার কি সব দুঃখ বাছা? তোমরা খাইলেই, আমার খাওয়া হইল, আজ দুই দিন তুমি কিছু খাও নাই, ইহাই আমার দুঃখ। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি সু-ব্রহ্মণ্যতুল্য প্রিয়! তোমার গুণের পুরস্কার এ জগতে নাই, মা জগদম্বা তোমার মঙ্গল করিবেন।

আমার জন্য দুঃখ কি বাছা? তোমাকে ও পুত্রকন্যাকে মা অভয়ার চরণ-ছায়ায় রাখিয়া আমি মুখে দুর্গা দুর্গা বলিয়া যদি তাঁহার চরণে মস্তক রাখিতে পারি, তবে আমার ভাগ্যের সীমা কি বাছা? নারীজীবনে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি হইতে পারে রামলাল?

নারায়ণী তাহার পর স্বামীকে বলিলেন, এই রামলাল যাহা করিতেছে, তাহার তুলনা নাই। রামলাল রেলওয়ে ষ্টেসনে লোকের গাঁঠরি বহিয়া এতদিন সংসার চালাইয়াছে। বাছা আমার অনাহারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে, তাহার দিকে আর তাকান যায় না, কন্যা অতি কষ্টে সামান্য কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল। দেবতার প্রসাদ সামান্য কিছু তাহার জন্য রাখিয়াছিলাম, কিন্তু বাছা তাহা গ্রহণ করে নাই। দুর্গাদাস বুঝিলেন গৃহিণীর খাওয়া হয় নাই বলিয়া ভক্ত রামলাল কিছুই খায় নাই। তখন তিনি তাহাদের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি করিয়া মৃদুভাবে বলিলেন—বৎস রামলাল! তোমরা যাহা বলিলে তাহা শুনিলাম, তোমরা যাহা করিয়াছ ও করিতেছ, তাহা প্রশংসার্হ, কিন্তু বাছা! তুমি নিজে কর্ত্তা সাজিয়া কষ্ট পাও কেন? তুমি অথবা গিন্নী কেহই সংসার চালাইবার কর্ত্তা নও। সকলের উপরে একজন কর্ত্তা আছেন, তাহা ভুল কেন? মায়ের কৃপায় তোমরা সকলেই জানিতে পারিয়াছ মা জগদম্বাই জগৎ সৃষ্টি, পরিপালন ও সংহার করেন, মা'ই লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বদাত্রী, সেই মায়ের উপর নির্ভর কর। নিজকর্ত্তৃত্ব পুরুষকার ভুলিয়া যাও, প্রভাস-যুদ্ধের শেষ চিত্রে দৃষ্টিপাত কর। কেন অর্জ্জুন গাণ্ডীব উত্তোলনেও অসমর্থ তাহা বোঝ। ত্রিলোকবিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ ও অমরসন্ত্রাস মহিষাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের জয়-পরাজয়ের কারণানুসন্ধান কর। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে সেই জয়-পরাজয়ের উপরে কাহার কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষিত, রামচন্দ্র নিজ-কর্ত্তৃত্ব কাহার চরণে অর্পণ করিয়া রাবণবধে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন? বুঝিলে ত বাছা? মা'ই সব করেন ও করান। সর্ব্বার্ত্তিনাশিনী ভগবতী দুর্গা একবার ভাগ্যবশতঃ প্রসন্না হইলে শরণাগত ভক্তের সমস্ত শোকদুঃখাদির বিনাশ হয়। ধর্ম্ম চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি। এই করুণাময়ী শরণাগত দীন ভক্তজনের পরম আশ্রয়-স্বরূপা হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত বিপদজাল হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। তোমরা মায়ের অপরিমেয় শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একমাত্র সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও। সকলে মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ কর। নিজ কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া যাও, দেখিবে কোন অভাব, কোন দুঃখ থাকিবে না। মায়ের পূজার জন্য ভাবনা কি? অর্থের জন্য মায়ের পূজা আটকাইবে না। বাগানে পুষ্প বিল্বপত্রাদি আছে, গঙ্গাজল আছে, হৃদয়ভরা ভক্তি আনিতে চেষ্টা কর। যিনি জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বদাত্রী তাঁহাকে আবার তুমি কি দিবে বাছা? গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলে ফল হয় কেন জান? পূজার জলে ভক্তি মাখাইতে পারিলেই ফল হয়, নতুবা নয়। সেইরূপ জগজ্জননীর পূজার দ্রব্যে ভক্তি মাখাইতে পারিলেই ফল পাওয়া যায়। কোন চিন্তা নাই, সকলে মাকে ডাক, ডাকার মত ডাকিতে পারিলে সর্ব্বার্থই লাভ হইবে।

[illegible] জীবন ? [illegible] শুনিতেছেন, [illegible] দর্শনিক তর্কের সমাধানকৃত [illegible] বেদান্ত পড়িতেছিলেন। [illegible] পর তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া পিতামাতা ও রামলালের ভরণপোষণে মনোযোগী।

(৩)

সন্ধ্যা সমাগতা। আজ কাহারও আহার হয় নাই। নারায়ণী ও রামলালের কথা বলিবার শক্তি নাই, শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, উভয়েই ভূমিতে শুইয়া পড়িলেন। সুব্রহ্মণ্যের মুখ বিশুষ্ক, সুব্রহ্মণ্য সজলনয়নে পিতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন বাবা! উপায় কি হইবে? মা এবং রামলালদাদার অবস্থা দেখিতেছেন ত? তাঁহাদের জন্য আমার ভয় ও দুঃখ হইতেছে। দুর্গাদাস অবিচলিতভাবে বলিলেন, ভয় কি বৎস! মা অন্নদা অভয়া থাকিতে কিসের অভাব, কিসের ভয়? বিচলিত হইওনা, মাকে স্মরণ কর, ত্রাহি দুর্গে বল, তিনি সব রক্ষা করিবেন। নারায়ণী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—বাবা সুব্রহ্মণ্য! বড় পিপাসা, একটু জল দাও। সুব্রহ্মণ্য তাড়াতাড়ি জল নিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের শুষ্ক মুখে দুর্গা দুর্গা বলিয়া প্রদান করিলেন। রামলাল ও ইঙ্গিতে জল দিবার কথা সুব্রহ্মণ্যকে বলিল। দুর্গানামে অভিমন্ত্রিত জল সুব্রহ্মণ্য রামলালের মুখে প্রদান করিলেন। উভয়েই একটু সুস্থ হইলেন। সুব্রহ্মণ্য মায়ের কাছে বসিয়া নয়নজলে ভাসিতেছেন এবং বাতাস করিতেছেন, ক্ষণকাল পরে নারায়ণী বসিয়া সুব্রহ্মণ্যের চক্ষু মুছিয়া দিলেন। রামলালও উঠিয়া বসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক আসিয়া গোপনে নারায়ণীকে বলিল, ঠাকুরুণ! জমিদার তারকনাথ বাবু আপনাদের বাড়ী আসিতে গ্রামের সকল লোককে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, যে আসিবে তাহার শাস্তি হইবে, ও পাড়ার আপনাদের প্রজা হরিচক্রবর্ত্তী আপনাদের অবস্থা জানিয়া আমাদ্বারা পাঁচ সের চাউল পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি দিনের বেলায় আসিতে সাহস করি নাই, যদি কেহ ঐ পোড়ারমুখ জমিদারের নিকট বলিয়া দেয়, তবে আমার জরিমানা করিবে, সেই জন্য আমি রাত্রিতে আসিয়াছি। মা! আপনাদের জন্য সকলেই দুঃখ করে, কিন্তু ঐ তারকবাবুর ভয়ে কেহ আপনাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। ঐ পাষণ্ডই আপনাদের সকল দুঃখের কারণ। দেখিবেন মা! ওর সর্বনাশ হইবে। নারায়ণী বলিলেন—না বাছা, অমন কথা মুখে আনিও না, কাহাকেও অভিশাপ করিতে নাই। তারক বাবুর কি দোষ? আমাদের কর্মফলেই আমরা কষ্ট পাইতেছি। বাছা! মা দুর্গা তোমারও হরি চক্রবর্ত্তীর মঙ্গল করিবেন। তোমাদের উপকার আমরা ভুলিব না।

স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেল, মায়ের কৃপা মনে করিয়া নারায়ণী সকলের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও আপনি [illegible] গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার পর ২ দিন কাটিয়াছে, দুর্গাদাসের [illegible] [illegible] । [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোকেই [illegible]

ব্যস্ত, কে কাহাকে দেখিবে? বহু সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। দুর্গাদাসের পরিজন অনশনক্লিষ্ট, তাহার উপর বিগত রজনীতে সুব্রহ্মণ্যের কলেরা হইয়াছে, অদ্য বেলা ১০টা হইতে না হইতেই রোগ ভীষণ ভাব ধারণ করিল। অনবরত দাস্ত বমি হইতেছে, হাতে পায়ে খিল ধরিয়াছে, রামলাল ও নারায়ণী শুশ্রূষা করিতেছেন। গৃহে একটী পয়সাও নাই, কি দিয়া চিকিৎসক ডাকিবেন। তারকনাথের ভয়ে গ্রামের কেহ দুর্গাদাসের বাড়ী আসেনা, কাজেই এই বিপদে অন্যের সাহায্য পাইবার উপায় নাই, কেহ এই বিপদ জানিতেও পারিলনা। নারায়ণী কেবল ভগবতীর চরণে মাথা খুঁড়িয়া সুব্রহ্মণ্যের জীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন, কেবল বলিতেছেন—মা! রক্ষা কর, এ সংসার তোমার কৃপায়ই আছে, আমরা একমাত্র তোমারই চরণাশ্রিত, আর ত আমাদের কোনও সম্বল নাই মা? তোমার কৃপায়ই আমরা সুব্রহ্মণ্যকে পাইয়াছি, তোমার প্রদত্ত ধন আজ তোমার চরণেই অর্পণ করিলাম, তুমি রক্ষা কর; মা দুর্গতিহারিণি! তোমার আশ্রিত সেবককে রক্ষা কর। দুর্গাদাস পূজা ও চণ্ডীপাঠ করিয়া মায়ের চরণামৃত সুব্রহ্মণ্যের মুখে প্রদান করিলেন, মস্তকে অভয়ার নির্ম্মাল্য দিয়া বলিলেন—বাবা সুব্রহ্মণ্য, ভীত হইওনা, মা অভয়াকে ডাক, মায়ের চণ্ডীমাহাত্ম্য স্মরণ কর, দেবীর সেই অভয়বাণী মনে আছে ত? মা বলিয়াছেন তাঁহার মাহাত্ম্যপাঠ করিলে মহামারীজনিত সকল উপসর্গ নষ্ট হয়, তুমি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে মায়ের সেই অমোঘ মহৌষধস্বরূপ মাহাত্ম্য স্মরণ কর, কোন ভয় নাই। তাঁহার কৃপায় সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর হইবে, মা তোমাকে রক্ষা করিবেন। সুব্রহ্মণ্য পিতার আদেশমত ক্ষীণ কণ্ঠে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা ১২টা হইতে না হইতেই রামলালের দাস্ত বমি আরম্ভ হইল। নারায়ণী উভয়ের শুশ্রূষা করিতেছেন, অনাহারে ভয়ে চিন্তায় শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিতেছেন না। রামলাল পীড়িত হওয়ায় অধিক প্রমাদ গণিলেন। ক্রমেই রামলাল ও সুব্রহ্মণ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিল, রামলাল অল্প সময় মধ্যেই অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। ভীষণ কলেরা, উভয়ের মুখেই যেন মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছে, বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। নারায়ণী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মধ্যে মধ্যে উভয়ের মুখে মায়ের চরণামৃত দিতেছেন, এবং নয়নজলে ভাসিয়া ভবানীর চরণে উভয়ের জীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন। দুর্গাদাস দেবীঘটের সাক্ষাতে নিমীলিত নেত্রে বলিতেছেন—

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা, রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি॥

বহু স্তব পাঠ করিয়া দুর্গাদাস ভগবতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। দেবগৃহ হইতে রোগীদের গৃহে যাইতেছেন, এমন সময় একজন আদালতের পিয়ন একখানা পরোয়ানা

দুর্গাদাসের হাতে দিল, দুর্গাদাস তাহা পাঠ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি? পিয়ন বলিল—ইহা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, জমিদার তারকবাবু হইতে আপনি যে টাকা ধার করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করেন নাই, পনেরশত টাকার ডিক্রীজারীতে এই গ্রেপ্তারী হয়। টাকা দেন, নতুবা আমাদের সঙ্গে আদালতে চলুন। দুর্গাদাস দেখিলেন পিয়নের সঙ্গে তারকনাথবাবুর একজন কর্ম্মচারী ও অপর ৫।৬ জন লোক। দুর্গাদাস সব অবস্থা বুঝিলেন। তিনি পিয়নকে বলিলেন—আমি ত কখনও তারকবাবু হইতে কোন টাকা ধার করি নাই; যাহা হউক আমি টাকা কোথা হইতে দিব? আজ তিন দিন মধ্যে আমাদের কাহারও আহার যোটে নাই, রামলাল ও সুব্রহ্মণ্য কলেরায় অত্যন্ত কাতর, তাহাদের ঔষধ ও পথ্যাই দিতে পারা যায় নাই। আচ্ছা তা হোক, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি রামলাল ও সুব্রহ্মণ্যকে শেষ দেখা দেখিয়া এবং পত্নীকে এই সংবাদ জানাইয়া আসি। তারকবাবুর কর্ম্মচারী কর্কশ স্বরে তাহাতে প্রতিবাদ করিল। দুর্গাদাস বলিলেন,—ভয় নাই, আমি পলাইব না, আমার অবস্থা চিন্তা কর, একটু সময় আমাকে দাও, আমি তোমাদের কার্য্যে বাধা দিব না। পিয়নের মন আর্দ্র হইল, সে বলিল আপনার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়, কিন্তু আমার কোন অধিকার নাই, যান, আপনি আপনার পীড়িত পুত্রাদিকে দেখিয়া এবং আহার করিয়া আসুন। যদি গৃহে কিছু না থাকে, তবে আমি আপনাকে একটী টাকা দিতেছি, ইহাদ্বারা আহারের ব্যবস্থা করুন। দুর্গাদাস বলিলেন—তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলাম, তোমায় টাকা দিতে হইবে না, আমার আহারের প্রয়োজন নাই, আমি এখনই আসিতেছি। এই বলিয়া গৃহে গিয়া দেখিলেন,—রামলাল ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, সুব্রহ্মণ্য সংজ্ঞাহীন। অবস্থা দেখিয়া আর ভরসা করিতে পারিলেন না। নারায়ণী অনাহার, চিন্তা, ও পরিশ্রমে ভূশায়িতা, বসিতে পারিতেছেন না, অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, মুখে অস্ফুটস্বরে "দুর্গা দুর্গা, ত্রাহি দুর্গে" বলিতেছেন।

দুর্গাদাস বলিলেন, গিন্নি! লীলাময়ী মা'র লীলা বুঝা ভার, এ অধম সন্তানকে নিয়া মা কি লীলা করিতেছেন তিনিই জানেন। মা'র ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তুমি সাবধানে শুন, ভীত হইও না, উতলা হইও না, ইহা আকুল হইবার সময় নয়, ইহা ধৈর্য্যের সময়, সাধনার সময়, মনুষ্য-জীবন কর্ম্মভোগের জন্য, পরীক্ষার জন্য। দ্বারে তারকনাথের লোক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়া উপস্থিত, আমি কখনও তাহার নিকট হইতে কোন টাকা ধার করি নাই। তথাপি পনরশত টাকার দায়ী, সেইজন্য আমাকে জেলে যাইতে হইবে, আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। এই কথা শুনিবামাত্র দুঃখজর্জ্জরিতা নারায়ণী মূর্চ্ছিতা হইলেন। সেই সময় সেই গৃহের দৃশ্য দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। দুর্গাদাস আত্মসম্বরণ করিয়া নারায়ণীর মুখে ও চক্ষুতে জল দিয়া কোনরূপে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন বাহির হইতে তারকনাথবাবুর লোকগুলি দুর্গাদাসকে ডাকিতে লাগিল। তিনি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নারায়ণীকে বলিলেন—গিন্নি! আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না।

আমি থাকিয়াইবা কি করিতে পারি ? আমি বহুপূর্ব্বে তোমাদিগকে মা অভয়ার অভয়পদে অর্পণ করিয়াছি, তিনিই তোমাদের রক্ষা ও পালনকর্ত্রী, মায়ের মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে, আমি মা'র লীলানাটকের দর্শক হইয়া কি করিব ? মা'র শরণাপন্ন হও। এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দুর্গাদাস "শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং, মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং। নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ।" বলিয়া যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনবকুমার শাস্ত্রী।

চার্ব্বাক দর্শনে ধর্ম্মোপদেশ।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, একমাত্র চার্ব্বাক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরাজ্যের সুদৃঢ় দুর্গে যেরূপ বিষম আঘাত করিয়াছিলেন, এইরূপ আর কেহই করিতে পারেন নাই। চার্ব্বাকের অপর নাম লোকায়ত। লোকদৃষ্ট যুক্তি তর্ক দ্বারা তাঁহার মতের অভ্যুত্থান, তজ্জন্যই চার্ব্বাক লোকায়ত-সংজ্ঞা পাইয়াছেন। লৌকিকী যুক্তি সহসা সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই অনিষ্টের আশঙ্কা চার্ব্বাক হইতেই অধিক।

বৃহস্পতি চার্ব্বাকদর্শনের রচয়িতা। বৃহস্পতি স্বয়ং দেবাচার্য্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা হইয়া এইরূপ ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? ধর্ম্মবিঘাতকর কুতর্কজাল প্রবর্ত্তিত করিয়া মানবকে অবিশ্বাসী ও ধর্ম্মচ্যুত করিতে আগ্রহবান্ কেন ? এইরূপ প্রশ্ন অনেকের হৃদয়ে জাগিতে পারে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা যাইবে না। তিনি দেশ, কাল, প্রয়োজন ও অধিকারিতার বিবেচনায় যে উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশসমূহের সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বৃহস্পতি অভিযুক্ত হইবেন না।

যখন দেবাসুর-সংগ্রামে অমরবৃন্দ পরাস্ত হইলেন, বিশ্বজিৎ প্রভৃতি ত্রৈলোক্যবশঙ্কর মহাভিষেক যজ্ঞসমূহের ফলে অসুরগণ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইল, বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানে তখনও তাহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রবল অনুরাগ। এই অবস্থায় তাহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া দেবমণ্ডলীর সাধ্যায়ত্ত ছিল না, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর্ম্মী অসুরেন্দ্রগণ তখন জগতে অজেয়।

দেবগণ মন্ত্রণা করিলেন, শত্রুসমাজকে কর্ম্মমার্গ হইতে বিচ্যুত করিবার উপায় দেখিলেন; তখনই নারায়ণের উপদেশে বৃহস্পতি গ্রন্থরচনা করিতে লাগিলেন। মায়ামোহ নামক এক প্রচারক বৃহস্পতির শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অসুর-সমাজে বক্তৃতা করিতে বাহির হইলেন। অসুরগণ সেই উপদেশ শুনিয়া ধর্ম্মমার্গে ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিক হইয়া উঠিল। দেবতাদের কার্য্য সিদ্ধি হইল, কর্ম্মচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে অসুরদের তেজোবীর্য্য অন্তর্হিত হইয়া গেল; সংগ্রামে তাহারা পরাস্ত হইল, দেবগণ স্বর্গ পাইলেন।

কিন্তু মায়ামোহের সেই ভয়ঙ্কর উপদেশ লোকপরম্পরায় পৃথিবীমণ্ডলে বিস্তৃত হইতে লাগিল,—অসুরমোহনের পর আর বিলুপ্ত হইল না।

গ্রন্থরচনাকালেই বৃহস্পতি ভাবিয়াছিলেন, হয় ত এই উপদেশ হইতে ভবিষ্যতে একটা অনিষ্ট হইতে পারে, এবং তজ্জন্যই তাহার সূত্রগুলিতে এমনি সঙ্কেতে পদযোজনা করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশে সাত্ত্বিকভাবে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিলে আর অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।

কিন্তু আমরা যাহাকে অনাত্মীয় ভাবি, তাহার উক্তিগুলি সুভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের পরম আরাধ্য দেবাচার্য্য যে ইহার রচয়িতা, তিনি অসুর-সমাজকে বিমার্গগামী করিলেও, আমাদিগকে কুপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্র লিখেন নাই, একথা আমরা ভাবি কৈ ?

যেমন এক ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত উপদেশশ্রবণে ইন্দ্র ও বিরোচনের চিত্তে বিভিন্ন জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তেমনি বৃহস্পতির এই উপদেশ হইতে দৈবী ও আসুর সম্পৎশালিগণের যে বিভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। চার্ব্বাকের সূত্রগুলি সাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে কোনও ধর্ম্মোপদেশ পাওয়া যায় কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে।

চার্ব্বাকের একটী সূত্র এই—

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদা স্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্ম্মিতা॥

অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড (যজ্ঞোপবীত) ভস্মলেপন, বুদ্ধি ও পুরুষকারবিহীনগণের বিধাতৃনির্ম্মিত জীবিকা। নাস্তিকেরা ইহার ব্যাখ্যা করিলেন,—এই যে যজ্ঞোপবীত ধারণ, অগ্নিহোত্র, যাগ ও বেদোক্ত কর্ম্মকলাপ, তাহার কোনও ফল নাই, বুদ্ধিপৌরুষহীন নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণগণকে জীবিত রাখিবার জন্য বিধাতা একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ইহারা বেদের দোহাই দিয়া সমাজকে বঞ্চনা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে।

কিন্তু আমরা সুভাবে ইহাকে গ্রহণ করিলে এইরূপ বুঝিব—এই যে যজ্ঞোপবীত ধারণ, ভস্মলেপন ও বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, ইহা কেবল জীবিকার জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে। বুদ্ধিমান্ ও ক্রিয়ানিপুণ ব্যক্তিগণ চতুর্ব্বর্গ ফললাভের নিমিত্ত এই সমুদয়ের অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাবতীয় পুরুষার্থই সাধিত হইবে। যাঁহারা এই পবিত্র

ব্রহ্মসূত্রাদি ধারণ করিয়া, আলস্য ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত, তাহার যথাবিহিত অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহাদের পক্ষে অর্থাৎ সেই নির্ব্বুদ্ধি ও পুরুষকারবিহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা কেবল জীবিকা মাত্রই হইবে; যজ্ঞসূত্রের জোরে ভিক্ষামাত্র লাভই সার হইবে, আর কোনও উচ্চতর ফল হইবে না। চার্ব্বাক-দর্শনের এই সূত্রদ্বারা অনুষ্ঠানবিহীন মূঢ়বুদ্ধিগণকে নিন্দা করিয়া বুদ্ধিমান ও পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

আর একটী সূত্র এই—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?

অর্থ—যতদিন বাঁচিবে সুখেই বাঁচিবে, ঋণ ক'রে "ঘি খাও", দেহ ভস্মীভূত হইলে আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা কোথায়? নাস্তিকগণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহলোক ভিন্ন পরলোক নাই, ঋণ করিয়া ঋণ পরিশোধ না করিলেও কোনও অনিষ্ট হইবে না; কেননা জন্মান্তর ত স্বীকৃত নহে, যতদিন বাঁচিবে সুখে বাঁচিবে,—ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত ক্লেশ পাইবে না, বিধিনিষেধের অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারবিহারে ব্যাঘাত ঘটাইবে না, দেহ ভস্মীভূত হইলে আর আসিতে হইবে না, আর পাপভোগ ভুগিতে হইবে না, ঋণ আদায়ের জন্য ক্লেশিতও হইবে না।

কিন্তু আমরা এই সূত্রটী সাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করিলে বুঝিব যে—যতদিন বেঁচে থাক, সুখেই থাক, অর্থাৎ সারাজীবন কেবল সুখেরই অনুসন্ধান কর; ব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে সুখ পদার্থ, সুখে থাকিতে হইলেই ব্রহ্মভাবে বা গুণাতীতভাবে থাকিতে হয়, জগতের সহিত নিজের আমিত্বের মিশামিশি না করাই গুণাতীত ভাব। সেই ভাবেই প্রকৃত সুখানুভূতি হয়। সংসার দুঃখময়, অনাসক্তভাবে সংসার হইতে দূরে থাকাই সুখে থাকা, চার্ব্বাক-সূত্রে সেইরূপ সুখে থাকারই উপদেশ পাইতেছি।

সেই সুখে থাকার হেতু বলা হইতেছে;—"ঘি খাও" নিজ হইতে না পার, "ঋণ করে ঘি খাও"। ব্রহ্মভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে জ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে, এই ঘি খাওয়াই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানালোচনার উপদেশ।

শ্রুতি বলেন,—

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন॥

মণ্ডূক উপনিষৎ।

দুগ্ধে যেমন ঘৃত অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, তেমনি প্রতিভূতেই গুপ্তভাবে "জ্ঞান" অবস্থিত আছে, মনোরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা সর্ব্বদা তাহাকে মন্থন করিবে।

চার্ব্বাকসূত্রে বলিতেছেন—যদি তুমি নিজে সেই ঘৃত (জ্ঞান) মন্থনপূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে না পার (পারিবেই না) তবে ঋণ কর। যিনি মন্থনপটু, কৌশলী সঞ্চয়শীল মহাজন, তিনি মন্থনপূর্ব্বক প্রচুর ঘৃত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। যাও, তাঁহার পায়ে ঋণখত লিখিয়া দাও, অধমর্ণ সাজিয়া কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পায়ে পড়। তিনি দয়া করিয়া তোমার আবশ্যক ঘৃত ঋণ দিবেন, তুমি তাহা পান করিয়া সুখী হইবে। তাঁহার সেবাশুশ্রূষা দ্বারা সেই ঋণশোধ হইবে, নগদ দিতে হইবে না।

শ্রুতি বলেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘৃত (জ্ঞান) লাভ কর। চার্ব্বাক-সূত্রে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে;—দেহ ভস্মসাৎ হইলে আর পুনরাগমন কোথায়? অর্থাৎ তুমি বহুজন্ম অতিক্রম করিয়া এই সাধনপটু পবিত্র মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছ, এই জন্মেও যদি গুরুশুশ্রূষার ফলে জ্ঞানরত্নের অধিকারী না হইতে পার, তবে তোমার জীবন বিফল হইবে। আর যে মনুষ্যদেহ পাইবে, তাহার সম্ভাবনা কি?

শাস্ত্র বলেন;—

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্ত স্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ॥ ভাগবত॥

মনুষ্য-জীবনে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়; যিনি তাদৃশ মনুষ্যদেহ পাইয়াও পক্ষীর ন্যায় গৃহপিঞ্জরে আসক্ত থাকেন, গুরুশুশ্রূষা, উপাসনা ও জ্ঞানালোচনাদি কর্ম্মে বিমুখ হন, তাঁহাকে আরূঢ়চ্যুত (উত্থিত হইয়া পতিত) বলা যায়। গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্মে অবহেলনপূর্ব্বক আরূঢ়চ্যুত না হইবার জন্য চার্ব্বাক বলিতেছেন,—

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

খড়্গপতন।

শিবনারায়ণ মিছির সরযূপারী ব্রাহ্মণ। আর্য্যজাতির উপনিবেশভূমি সেই রামের অযোধ্যায়, বৈবস্বত মনু যাহার প্রতিষ্ঠাতা, মান্ধাতা হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশের শোণিত যে স্থানে পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে, সেই অযোধ্যার ঠিক অপর পারে প্রসন্ন-সলিলা সরযূতীরে "খড়্গাগীরা" গ্রামে বেদপারগ ব্রাহ্মণবংশে দরিদ্র শিবনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিশোরজীবনে পল্লীসুলভ হিন্দি, আর সামান্য রকমের কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সুখে দুঃখে দিন অতীত করিত।

"পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজন" জন্য একটী সুলক্ষণা নারীর পাণিপীড়ন করিয়া গৃহস্থালী করিতে-ছিল। কিন্তু সাগরদুহিতার অকৃপায় তাহার গ্রাসাচ্ছাদন চলিলনা। তখন একদিন সাধারণ হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও রজপুতের ন্যায় বাঙ্গালীর দ্বারওয়ানী বা জমিদারের বরকোন্দাজী করিতে সঙ্কল্প করিয়া আউধপ্রদেশের তালুকদারশ্রেষ্ঠ বলরামপুরের রাজা দুগণসিংহের দেওয়ান শ্রীমান্ দেবীদাস রায় চৌধুরীর গৃহে দেউড়ির জমাদারী কার্য্য গ্রহণ করিল। এই স্থানে শিবনারায়ণ মিছির শিবঠাকুর নামে পরিচিত। বঙ্গের বিখ্যাতপল্লী হিরণ্যপুরের জমিদার ঐ দেবীদাস রায়চৌধুরী মহাশয় অধিকাংশ সময় সহরে বাস করিতেন। শিবনারায়ণই তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তা। দীর্ঘকাল বাঙ্গলায় থাকিয়া বাঙ্গালী জাতির পূজাপদ্ধতি আর ব্যবহার দেখিতে দেখিতে শিবনারায়ণ প্রায় অর্দ্ধবাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছে। একবার আশ্বিন মাসে তাহার ব্রাহ্মণহৃদয় মা জগদম্বিকার আরাধনা করিবার জন্য নাচিয়া উঠিল।

সেই বার কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই দুর্গোৎসব। তাই শিবনারায়ণ দেবীদাস বাবুর নিকট দুইমাসের ছুটি লইয়া জন্মভূমি খড়্গাগীরা গ্রামে উপস্থিত হইল। তখন তাহার জ্ঞাতিগণ তাহাকে বাহ্য দৃশ্যে আর ব্যবহারে বাঙ্গালীভাবাপন্ন জানিয়া, মাছ মাংস খোর ভাবিয়া একরূপ পরিত্যাগ করিল। যখন পূর্ব্বপরিচিত ছাতুখোর জ্ঞাতিগণ তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিল, তখন শিবনারায়ণ মাত্র স্ত্রী আর দশম বর্ষীয়া কন্যা লইয়া দুর্গোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিল।

আশ্বিন মাসের প্রভাতে শেফালিকা ফুলের গন্ধে আর অজস্র পতনে তাহার ক্ষুদ্র আঙ্গিনাটীকে যেন একটী শুভ্র কুসুমক্ষেত্র তুল্য বোধ হইতে লাগিল। বালিকা ভগবতী ক্ষুদ্র চুপড়িতে ফুল কুড়াইয়া, চন্দন ঘষিয়া, একটা তাম্রের কমণ্ডলুতে সরযূর জল ভরিয়া পিতার আহ্নিকের আয়োজন করিয়া দিত। গৃহিণী রামপিয়ারী আসিয়া নোটওয়া পরিস্কার করিয়া ঘাঘরাসহ সরযূতে স্নান করিয়া জোকারুটি আর অরহরকি ডাউল পাকাইয়া স্বামীর প্রাত্যহিক পূজার জন্য অপেক্ষা করিত।

একদিন অতি প্রভাতে শিশিরসিক্ত মুক্তাফলের ন্যায় অসংখ্য হরশৃঙ্গার ফুলে সাজি ভরিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া ভগবতী তাহার মাকে কহিল মায়ি! বাঙ্গলায় দুর্গা পূজা আজকাল আরম্ভ হইয়াছে। আমি বাবুজীর গৃহে প্রতিবর্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। মা আমরা কেন পূজা করিনা? ভগবতীর প্রসূতি হাসিয়া কহিল—বেটিয়া তুহার বাপজান্‌কে একথা বল। মাতাপুত্রীর এই আলাপ শিবনারায়ণেরও কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন সে রামাষ্টক পড়িতে পড়িতে ইহা শুনিয়া বড় তৃপ্ত বোধ করিয়া বলিল, বেটি আমি মায়ের পূজা করিতেই এবার দেশে আসিয়াছি, তোমরা বাবুর বাড়ীতে দুর্গোৎসবের যে সকল আয়োজন দেখিয়াছ শিখিয়াছ, তাহার জোগাড় কর। আমি অযোধ্যার রায়গঞ্জে চলিলাম। তথায় এক কুহার (কুম্ভকার) আছে, তাহা দ্বারা দশভুজা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শিখাইয়া প্রতিমা গড়াইয়া লইয়া আসি।

শিবনারায়ণ নদী পার হইল। বালিকা ভগবতী একটী বিল্ববৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া পিতার প্রতি চাহিতে চাহিতে "জয় মা ভগবতি! তুহার আজ হামি বোধন করিব।" তখন বালিকা বিল্বপত্রদ্বারা কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া সরযূজলে স্থানটিকে সিক্ত করিল। শেষে যুক্ত করে গাহিল -

আও ঘট্‌মে জগৎ জননি!
হাঁম অহি ডালি দিউঙ্গে মেরি বদনখানি
বলি উপহার মাহিমা বিথার
তবহুঁ তব চরণ পূজুঙ্গে
আও মা ভবওয়ানি সত্য সনাতনি!
দাসী কৃপা মাঙ্গত তহার॥

বাঙ্গলায় থাকিতে শিউনারায়ণ মাতৃপূজার তরে উচ্ছসিত হৃদয়ে এই গানটী রচনা করিয়া কন্যাকে দিয়া এই আহ্বান গীতি করাইয়াছিল। আজ ভগবতী নিজের বাটীতে পূজাসঙ্গে গীত পুনরায় গাহিল, পরে পিতার আদেশ আর পূর্ব্বশিক্ষানুযায়ী পূজার উপকরণ-সংগ্রহে মনোযোগ করিল। রামপিয়ারী তাহার চাচতো ভাই রামখেলওয়ান চৌবের দ্বারা দ্রব্যসম্ভার ভারে ভারে আনাইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের আবশ্যক দ্রব্যাদি যাহা লাগে, তাহা প্রায় রামপিয়ারী জানিত, কিন্তু বিশেষ সূক্ষ্মভাবে কিছু জানিত না। মোটের উপর দুর্গাপূজার সাধারণ সমস্ত দ্রব্যই সংগৃহীত হইল। ভগবতী যখন প্রথম আহ্বান গীতি করে, ঘটনাক্রমে সেই দিন প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। সেই প্রতিপদ হইতে প্রত্যহ প্রাতে সেই বিল্বতরুমূলে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে মাতৃমঙ্গল গান করিয়া প্রতিপদাদি-কল্পের কার্য্য করিতে লাগিল। এই সময় হইতে তাহার দেহসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেমন একরূপ অনৈসর্গিক মাধুর্য্য দ্বারা তাহার কিশোরকান্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রামপিয়ারী তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। এই ভাবে প্রায় সাত আট দিন অতীত হইল।

শিউনারায়ণ রায়গঞ্জে থাকিয়া অনভ্যস্ত হিন্দুস্থানী কুম্ভকারদ্বারা অতি সুন্দরভাবে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া গৃহে আনিল। অনবধানতাবশতঃ বা অল্প সময়নিবন্ধন চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত হয় নাই। রামপিয়ারী বলিল - দেখ, এখন আর সময় নাই, এই গৃহেই পূজা হউক। আমরা এই কদিন গোশালায় অবস্থান করি, গাভীগুলিকে মুজের গৃহে রক্ষা করা হউক। শিউনারায়ণ অগত্যা তাহাই করিল। রামখেলওয়ানকে লইয়া মাতৃমণ্ডপ সাজাইতে লাগিল, প্রতিমা খাটের উপর উঠাইল। মাটির গহনাতে প্রতিমাখানি সেই গবাক্ষহীন আঁধার গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। শিউনারায়ণ নিজে নারিকেলহীন একটী ঘট মাত্র আম্রপল্লবে সজ্জিত করিয়া সিন্দূর রঞ্জিত করতঃ কাঁচা মৃত্তিকার উপর সংস্থাপন করিল। নবপত্রিকার ভার স্বয়ং ভগবতী গ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও মাধুর্য্যে গৃহ পূর্ণ করিয়া তুলিল।

পূজার উপকরণ সংগ্রহ হইলে শিউনারায়ণ বোধন করিবার জন্য যখন বিল্বতরু অনুসন্ধান করিতে বাহিরে যায়, তখন তাহার পত্নী ভগবতীকে কহিল "বেটিয়া তোর সেই শ্রীফলপেড় (বৃক্ষ) কি হইল?" ভগবতী তখন শিউনারায়ণকে লইয়া তাহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বেলতলায় উপস্থিত করিল। অনুষ্ঠানপ্রিয় অল্পবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহানন্দে তথায় দেবীর বোধন করিতে শক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ জন্য উপবেশন করিল। বলা বাহুল্য শিউনারায়ণ বোধনপদ্ধতি পূর্ণরূপ জানিত না, মাত্র দেবীর সেই "অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং" ধ্যান, আর অল্পমাত্র চণ্ডীপাঠ এবং সাধারণ পূজাবিধি মাত্র শিখিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রগাঢ় ভক্তি আর অকৈতব দৃঢ় বিশ্বাসে দেবীর বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দেবীপূজার পদ্ধতি যে কয়খানি পুরাণ-অনুযায়ী বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কোন ক্রিয়াই আচরিত হইল না। ভক্ত সাধক হৃদয়ের বিশ্বাস আর ভক্তিবলে শিক্ষামত বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। ভগবতী পিতার সহিত বিল্বমূলে থাকিয়া বরণডালাকক্ষে যখন মণ্ডপে উপস্থিত হইল, তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সেই সর্ব্বরূপ মঙ্গলকার্য্যের ঢ্যাপঢেপে বাদ্য, আর সুমধুর বংশীধ্বনি (?) একত্র মিশিয়া বালিকার পিককণ্ঠনিন্দিত "ঘটমে' বৈঠ মা সনাতনী" গীতঝঙ্কারসহ এক অতি অপূর্ব্ব স্বরলহরী উঠিয়া খড়গাছা পল্লীর তেঁতুল, নিম, আম, জাম, বাবলা, তাল তরুর শীতল ছায়াশ্রয়ী বিহগকাকলীসহ শূন্যে উঠিয়া গেল। শরতের নির্ম্মল আকাশে আধ শশধরের রজতকৌমুদী সরযূজলে তরঙ্গ খেলিয়া গেল। এই সময় রামপিয়ারী আর গৃহস্বামী দুইজনে ঘটের সম্মুখে প্রণত হইল। তাহার পর কন্যাকে লইয়া একখানা দড়ির খাটিয়ার উপরে উপবেশন করিল। রামখেলওয়ান চৌবে বাদ্যকারগণসহ "বড়তামাক" খাইতে বসিল। রাত্রির প্রথম যাম অতীত হইতে হইতে নূতন পূজক শিউনারায়ণের মাতৃ-অর্চনার বোধনক্রিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল।

আজ সপ্তমী [illegible] বাঙ্গলার গৃহে গৃহে [illegible] বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। এই হিন্দুস্থানীপল্লীতে [illegible] বাজিতেছে না, তথাপি প্রভাতী বাজনার ত্রুটি

ছিল না; [illegible] ভগবতী ফুলের ডালা ভরিয়া কুলগাছ, অতসী, অপরাজিতা, শেফালিকা, রক্তজবা তুলিয়া আহ্লাদে গুন্‌গুন্ করিতে করিতে সেই "ঝটসে আও ভবানী" গীত গাইতে গাইতে গৃহে আসিল। শিউনারায়ণ প্রভাতেই সরযূ হইতে অবগাহন করিয়া বেলা ৮ দণ্ডের মধ্যে দেবীর পূজা শেষ করিল। তাহার পর ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেবনাগর-অক্ষরে লেখা একমাহাত্ম্য চণ্ডী, আর হিন্দুস্থানের হিন্দুগৃহীর সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব সময়ের পাঠ্য তুলসীদাসি রামায়ণ লইয়া দেবীর সম্মুখে ভক্তিগদগদচিত্তে উপবেশন করিল। প্রথমে অতি উচ্চ স্বরে সেই অভ্যস্ত এক অধ্যায় চণ্ডী পাঠ করিল। তাহার পর রামায়ণের রাবণবধ-কালীন শ্রীরামের অকালবোধন আখ্যায়িকা, আর তাঁহার নীলপদ্মের পরিবর্ত্তে নীল আঁখি উৎপাটনাংশ লইয়া দেবীমাহাত্ম্য তিন চারিবার পাঠ করিল।

রামপিয়ারী মায়ের ভোগের জন্য লাড্ডু, পেঁড়া, বালুশাহি, বরফি, পুরী, রুটী, মালপো, কৌচড়ি, খেচড়ি, অরহরকি ডাউল এবং চানাকি ছাতুয়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং পেয়ারা, নেশপাতি, আপেল, আখের টুকরা, বাদাম, কিস্‌মিস্, মনেক্কা, চিনের বাদাম, বেদানা, আতা, পাকা কাঁচকলা আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকা ভগবতী কোমরে আঁচল জড়াইয়া পায়ে হরিদ্রা মাখিয়া মেদিরঞ্জিত পদে পাড়ায় সমবয়স্কা বালিকাগণকে ডাকিতে গেল। অযোধ্যাপ্রদেশের অশিক্ষিত অপরিষ্কৃত পল্লীবালিকাগণ ঘাঘরি ঝুলাইয়া কোর্ত্তা গায়ে দিয়া ভগবতীর রূপ দেখিয়া তাহাকে তাহার পিতা পূজা করিতেছেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বহিনি, তুহাব পিতা কি তোর পায়ে ফুল জল দিয়া তোর পূজা করিতেছে? ভগবতী একটুকু বিরক্তির সহিত বলিল—চুপ্, এমন দোষের কথা বলিতে নাই। তিনি পিতা, তিনি কি কন্যার পায়ে ফুলজল দিতে পারেন? আমাদের ঘরে মা ভগবতী এসেছেন। এসো, আমার সঙ্গে এসো, দেখ এসে এমন চমৎকার দেবতা তোমরা কখনো দেখ নাই। এসে দেখ।

বালিকাগণ সকলেই আসিতে ইচ্ছুক হইল; কিন্তু তাহাদের মূর্খ পিতামাতা তাহাতে বাধা দিল। বলিল "যেও না। ভগবতিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে। মাছ খায়, গাউন পরে, জোতা পায় দেয়। ক্রিস্তান হইয়া গিয়াছে। উহার সঙ্গে মিশিলে হনুমানজীকা সেব করিতে পারিবে না। অযোধ্যায় ব্রাহ্মলোক হনুমানজির বাড়িতে যাইতে দিবে না।" ভগবতী ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া কহিল—এরূপ কথা বলিও না—আমি ব্রাহ্মণকন্যা, মহাকালী পাঠশালায় দেবদেবীর স্তবকবচ শিখিয়াছি। যদিও বাঙ্গলায় থাকি, তবু কিন্তু মাছ মাংস খাই নাই। আর শুনিয়াছি—বাঙ্গালি মাছ খাইলেও তাহাতে দোষ হয় না। দুর্গাপূজায় বড়লোক ছাগবলি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে ভগিনীগণ, তোমরা যাবে না? বেশ, আবশ্যক নাই। আমি বাঙ্গালীর ঘরে যাই, [illegible] তাহার [illegible]। বাবা [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

বলিয়া ভগবতী দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। বড় দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া একমাস পরে দেবীদাসবাবুর দৌহিত্রী অনিলবালাকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ভাবিল বিগত বর্ষে সপ্তমীপূজার দিন আমি আর অনিলা দরদালানে দাঁড়াইয়া বলি দেখিয়াছি, আরতি দেখিয়াছি, তখন কত আহ্লাদে, কত সুখে ছিলাম। এবার এই ছাতুর দেশে আসিয়া দুর্গোৎসবের সেই প্রাণভরা আমোদটুকু পাইলাম না। বাবা যদিও পূজা করিলেন, তাহা কেহ দেখিতেও আসিলনা। আর বাবুর বাড়ী কত ব্রাহ্মণে খায়, কত কাঙ্গালীতে প্রতিমা দেখিতে আসিয়া নারিকেল নাড়ু, আর চিড়া খই লইয়া যায়। রাত্রে ঝাড়লণ্ঠনের আলোর মধ্যে যাত্রা হয়, কত লোকে শুনে। আবার বলির সময়ের সেই মহা ধূমধামের আড়ম্বর, নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড, ধূপধুনার গন্ধ, আর প্রাণস্পর্শী মা—মা—মা ধ্বনি শুনিতে দেখিতে পাইলাম না। একি হ'ল, বাবা একি ক'রলেন? বাবুর বাড়ী যেরূপভাবে পুরুত-ঠাকুর হাড়িকাটের নিকট দাঁড়াইয়া কোশা হাতে করে মা মা করিতে থাকেন, ঢাকীরা বলির বাজনা বাজাইয়া বাড়ী শুদ্ধ তোলপাড় করে, ছাগশিশু যেরূপ ডাকিতে থাকে, তা কই? এতো ঠিক পূজা হলো না, বাবার ভুল হইয়াছে, বলি চাই। বাড়ী গিয়া পিতাকে জানাই। আগামী কল্য মহাষ্টমীতে অন্ততঃ সন্ধিপূজার বলি চাই। দেবীর সম্মুখে রুধিরধারার উৎসর্গ চাই।

ভগবতী সঙ্গিনী না পাইয়া দুঃখিত চিত্তে এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিল। মাকে কহিল—মাই, বাবার ভুল হইয়াছে, পূজায় বলি কেন দেওয়া হইল না? রামপিয়ারী কহিল—না, ভুল হয় নি মা! উনি বলিয়াছেন দেবীর পূজা দুই রূপ। এক তামসিক মিশ্রিত রাজসিকী, অপর পূর্ণ সাত্ত্বিকী। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাই করে। ইহাতে কাহারো প্রত্যবায় নাই। অধিকারিভেদে ঋষিগণের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। তবে কথাটি এই যে, এই শারদীয়া উৎসব পূর্ণ রাজসিক প্রকৃতির অর্চ্চনা। রামচন্দ্র রাবণবধে অকৃতকার্য্য হইয়া পূর্ণ রাজসিকভাবে সমুদ্রতীরে এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুরথের দেবীপূজাও তাই। আমাদের দুর্গোৎসব সাত্ত্বিক পূজা, ইহাতে বলির প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ আমরা হিন্দুস্থানী-প্রথায় বৈষ্ণবভাবে এই পূজা করিতেছি। ভগবতী বলিল—মা, তোমার ভুল তো হয় নাই? মহাকালী পাঠশালায় শিবপূজায় উপদেশপ্রদানের কালে আমাদের পণ্ডিত-মহাশয় বলিয়াছিলেন—বলি পূজার অঙ্গ, বলি ব্যতীত পূজা পূর্ণই হয় না, সাত্ত্বিক পূজায়ও বলি দিতে হয়। তবে সে বলি এরূপ নয়—কর্ত্তার হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিই সাত্ত্বিক পূজার বলি। কিন্তু সাত্ত্বিক পূজার অধিকারীর কথা তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয়, আমরা সাত্ত্বিক পূজার অধিকারী নই। আরও তিনি বলিয়াছেন, দুর্গোৎসবে রুধির চাই-ই, চণ্ডীতে মা কি লেখা আছে—[illegible] ও বৈশ্য [illegible] মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া [illegible] দুর্গোৎসব [illegible] [illegible] [illegible]
ব্যবহার [illegible] [illegible] [illegible]

ছিল না; তাই নিজ শরীরের রক্ত দিয়া মায়ের পূজায় অঙ্গ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের কথায় আমরা সকলে ইহাই বুঝিয়াছি। তাই বলি মা! তোমাদের এটা বোধ হয় ভুলই হইয়াছে, মাতৃপূজায় রুধির চাইই।

ভগবতীর এই কথায় তাহার মাতা বিস্মিত হইল। কন্তা যেন খাঁটি বাঙ্গালিনী হইয়াছে, আর তাহার কিশোর হৃদয় দেবীপূজাতত্ত্বে ডুবিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ দুর্গোৎসব সম্বন্ধে একটা সংস্কারও মহাকালীপাঠশালার উপদেশে ভগবতীর এইরূপ দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। শিউনারায়ণের বলিহীন পূজা কন্তা ভগবতীর পছন্দই হইতেছে না। মনে মনে বলির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল। তাহার পরদিন অষ্টমীপূজার ফুল তুলিতে গিয়া পূর্ব্বের সেই বিল্বতরুতলায় এক বিচিত্রকান্তি ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া আসিল! গৌরকান্তি জটাজুটশীর্ষ ব্রহ্মচারী তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—"কন্যা, তোর বাক্ অষ্টমীর বলিক্রিয়া পূর্ণ হইবে"। এই গভীর ভাবযুক্ত বাক্য শুনিয়া বালিকা ভগবতী চিন্তা করিতে ২ পিতার অষ্টমীর কৃত্যের আয়োজন করিয়া দিল। আজ শান্তপ্রকৃতি শিউনারায়ণ যেন কিছু উগ্রভাবাপন্ন। তাহার পূর্ব্ব লাবণ্য, আর সাত্ত্বিক ভাব যেন কিছু আচ্ছন্ন। কেবলমাত্র কন্তার সাজ শয্যা, আর আহারের প্রতি তাহার প্রবৃত্তি অধিকতর বাহ্যমুখিনী। স্নাত দেহে দেবীর সম্মুখে বসিয়া অভ্যাসসিদ্ধ পূজাপদ্ধতির আচরণ করিতে লাগিল, মুহুর্মুহুঃ ভগবতী কি খাইল, কি পরিল, কোন্ বস্তুর প্রতি তাহার স্পৃহা অধিক, তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত দুর্গোৎসবের কার্য্য করিয়া যখন শিবনারায়ণ একটুকু অবসর পাইল, তখন কন্তাকে ডাকিয়া বলিল—মা! তোমাকে বিগতবর্ষে বাবুজী একখানা রাঙ্গা চেলির কাপড় দিয়াছিলেন আজ তাই পরিধান কর। গহনাদি যাহা তোমার আছে, তাহা পরিয়া মণ্ডপে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মাসনখানির উপর উপবেশন কর। আমি আজ এই মহাষ্টমী তিথিতে তোমাকেই কুমারী পূজা করিব। এই গ্রামের মূর্খগুলা দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য বুঝিল না, বাঙ্গলাদেশে যে মা আনন্দময়ীর আগমনে কি অপূর্ব্ব পবিত্র আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, আর বাঙ্গালী জাতি যে মায়ের কি একনিষ্ঠ ভক্ত, তাহাতো এই ছাতুওয়ালা বুঝিল না। বাঙ্গালী মাছ খায়, ইহাই যদি দোষের হইয়া থাকে, তবে মূর্খগুলা শাস্ত্র খুঁজিয়া দেখুক। উহাতে হিন্দুত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব বিন্দুমাত্র যায় না। বরং দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, মস্তিষ্কের কোমলাংশের ধারণাগুণ অধিক জন্মে। মৎস্যভোজী বাঙ্গালীই আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি। ইহাদেরি রক্তে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধক ধর্ম্মবীরগণ বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্মের ভাব শিখাইয়া দিয়াছেন। শক্তিমাহাত্ম্যপূর্ণ চণ্ডী বলিতেছেন—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী

[illegible]

দেবীপূজায় বলির প্রচলন [illegible]

দেবীপ্রতিমার শিবমূর্ত্তি ভগবতী যেন পরিচালিত যন্ত্রের ন্যায় মহাবিরক্তিভাবে দৈবশক্তি-প্রণোদিত হইয়া বলিয়া উঠিল—খাবো খাবো, পাঁঠা খাবো।

কন্যার এই ভীষণ বিকৃত বাক্য শুনিয়া আর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া উগ্রমূর্ত্তি শিউনারায়ণ কি জানি কি মোহে ভগবতীর নাকে মুখে ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করিল। অঘটনঘটনপটিয়সীর ইচ্ছায় বালিকা রক্তবমন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রামপিয়ারী আর চৌবেজী ছুটিয়া আসিয়া হাহাকার করিতে করিতে শবদেহ ধারণ করিল। রক্তবেগ তখনো বালিকার মুখ দিয়া পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গাপূজার প্রধান ক্রিয়া রুধিরোৎসব এইভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। বালিকার প্রাণবায়ু স্তম্ভিত হইয়া রহিল। শিবনারায়ণ স্তম্ভিত, অবশ হৃদয়ে শ্বাসহীন অবস্থায় থাকিয়া পরে "মা গো" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এদিকে আবার আর এক নূতন ক্রিয়া সংঘটিত হইল।

বালিকার শোণিতস্রাবসময়ে স্থাপিত ঘট ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। দেবীর দক্ষিণ হস্তের মৃত্তিকানির্ম্মিত খড়্গ পড়িয়া গেল। দর্শকত্রয় শোকে আর বিস্ময়ে অভিভূত। এই ক্রিয়া কেহ লক্ষ্য করিল না। বহু শুশ্রূষায় বালিকার চৈতন্য হইল না দেখিয়া তিনটি দর্শক গৃহখানিকে একটি শোকের আলয় করিয়া তুলিল। রামপিয়ারী স্বভাবতঃ কিছু নির্ম্মম প্রকৃতির মহিলা। তাহার মাতৃপ্রাণ যতটা অধীর হইবার—তাহা হইল না, মাত্র কন্যার মৃতদেহ বক্ষে লইয়া নীরব ক্রন্দনে বসিয়া রহিল।

এইভাবে প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। গোধূলির রাঙ্গা রাঙ্গা মেঘগুলা উড়িয়া ভাসিয়া শূন্যে মিলিয়া যাইতে লাগিল। শিউনারায়ণের পিতৃহৃদয় শোকে অভিভূত না হইয়া কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইল। মনে মনে ভাবিল বস্—আমার বলিহীন পূজা আজ মা দুর্গা আমারি কন্যাকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। আমি পূজক, আমিই ঘাতক। ইহা মায়ের ইচ্ছা; আমার দ্বারা তাহা পূর্ণ হইল। আর নবমীপূজা এই পর্য্যন্ত। কন্যার দেহ অগ্রে সরযূতে ভাসাইয়া আসি। তাহার পর প্রতিমা বিসর্জ্জন দিব। বলিয়াই শিউনারায়ণ কন্যার স্তম্ভিত দেহ স্কন্ধে উঠাইল। রামখেলওয়ানকে আগুন লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিয়া বাটির বাহির হইল। মুখে দুর্গানাম, বক্ষে কন্যা ভগবতীর রঞ্জিত দোদুল্যমান দুই পদ। গতি দ্রুত, অথচ শ্লথ। সরযূতীরে রুধির উপস্থিত হইবার ক্ষণমুহূর্ত্তে দূর হইতে একটী গভীর শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। "ঠার যাও ভেইয়া, ফেঁক মৎ।" শিবনারায়ণ শিহরিয়া পশ্চাতে চাহিল। দেখিল দূরে অল্প দূরে একজন লম্বিতজটাজাল-ভূষিত, রুদ্রাক্ষমালী, সিন্দূরশোভিতভাল ত্রিশূলধারী, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, দ্রুতপদে তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। শিবনারায়ণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এই সময় চৌবেজী আগুন হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবনারায়ণ তাহাকে দেখিয়া কহিল—ভেইয়া, আমি আর মানুষ নহি। চিত্রপুত্তলিকাবিশেষ। ঐ দেখ সাধু—আসিতেছেন। আমাকে থামিতে বলিতেছেন। একি ব্যাপার? ব্রহ্মচারী আসিয়া কহিল—মিছিরজী কন্যার দেহ জলে

ভাসাইওনা, গৃহে ফিরাইয়া লও। তোমার কন্যার প্রকৃত মৃত্যু হয় নাই। তোমার গৃহে যে স্নেহময়ী জননী পূজিতা হইতেছেন, তাঁহারি প্রসাদে তোমার কন্যা পুনর্জীবন পাইবে, তোমার দুর্গোৎসব পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া ব্রহ্মচারী তাহাকে টানিয়া লইয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। তাহার পর একতাল কাঁচা মাটি দিয়া বিদীর্ণ ঘট সংস্কার করিয়া দেবীর পতিত খড়্গ যথাস্থানে সংস্থাপন করতঃ পূজায় বসিল। বালিকার মৃতদেহ এক খানি কুশাসনে রাখিয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে রহিল। রামপিয়ারী মধ্যে মধ্যে কান্দিয়া সন্ন্যাসীর মায়ামোহশূন্য মনঃক বিচলিত করিতে লাগিল। শিবনারায়ণ মাঝে মাঝে—মা দুর্গতিহারিণী দুর্গা বলিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। চোবেজী নীরব নিথরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মচারী পূর্ব্বেই বিল্বতরু হইতে পত্র আনিতে, আর একটী অপরাজিতা ফুল আনিতে তাহাকে আদেশ দিয়া ধ্যানে বসিলেন। পরমুহূর্ত্তে নিজের ঝুলি হইতে একখানি তাল পত্রের জীর্ণ পুস্তক বাহির করিয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন শিবনারায়ণ কান্দিয়া বলিল—ওগো তারা জিনয়নি—দুঃখ দেখিতে পাওনা কি ? আমি যে অতি দুঃখী, তোমার মায়া কি করে বুঝিব ? আমি জানি এই ভগবতী আমার কন্যা, কিন্তু শিবে ! এখন বুঝিলাম দেখিলাম কিছুই নহে। নবীন দেবীভক্ত আর বলিতে পারিল না, তাহার জিহ্বা অবশ হইয়া আসিল। ব্রহ্মচারী এই সময় দেবীপুরাণ লইয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অষ্টমীকৃত্য হইয়াছে, এখন সন্ধিপূজার সময় উপস্থিত। ব্রহ্মচারী দেবীপুরাণের যথাবিধি ক্রমানুযায়ী পূজা করিতে লাগিলেন। দর্শকত্রয় নীরব রহিল। বাজাদারদল ভগবতীর প্রাণ বাহির সময়ই পলায়ন করিয়াছে, সুতরাং কোন বাদ্যভাণ্ড নাই, মাত্র সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা, আর শাঁখ বাজাইয়া সন্ন্যাসী সন্ধিপূজা শেষ করিলেন। তাহার পর ঘটের জল লইয়া বালিকার শবদেহে ছিটাইয়া দিলেন। ভগবতী ভগবতীর কৃপায় তখন উঠিয়া বসিল। শিবনারায়ণ রামখেলওয়ান আর রামপিয়ারী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মা—মা—বলিতে বলিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আনন্দময়ী মৃন্ময়ী প্রতিমাও যেন হাসিয়া কহিলেন—"এই ত পূজা, একেই বলে দুর্গোৎসব।"

ব্রাহ্মচারী কহিলেন—ভক্ত শিবনারায়ণ, তুমিই প্রকৃত মাতৃসেবক এবং পূজার অধিকারী। কিন্তু দুর্গাপূজার পূর্ণ পদ্ধতি জাননা, অসম্পূর্ণ পূজা আর অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ করিয়া দেবীর আরাধনা করিতেছিলে, তাই তোমার এই বিঘ্ন ; তোমার একনিষ্ঠ ভাবই বিঘ্নকেও পরাজিত করিয়াছে। তাই মা সর্ব্বমঙ্গলা কাত্যায়নী প্রফুল্ল হইয়া আজ তোমার কৃতকার্য্যের সুফল প্রদান করিলেন।

মানুষ মরিয়া পুনর্ব্বার জীবন পাওয়া পুরাণের সত্যবান্ ভিন্ন দ্বিতীয় উদাহরণ নাই। তোমার কন্যা এই অপৌরাণিক যুগেও মরিয়া পুনরপি জীবন পাইল। ইহা এক অদ্ভুত কাহিনী। তুমি স্বর্গফল ভোগের জন্যে এই মেয়ের অবদানেই দেবীর বিরাট দেহে আবার

পাইবে। দেখ, আমি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী, পর্য্যটন আমার কার্য্য। যখন জানিলাম তুমি দুর্গোৎসব করিবে, তখনই বুঝিয়াছিলাম এই পূজায় এক বিরাট অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তাই মাতৃইচ্ছায় তোমার কন্যার প্রতিষ্ঠিত বোধনতলায় আশ্রয় লইয়া তোমার খামখেয়ালী পূজা দেখিতেছিলাম।

তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাতো প্রত্যক্ষ দেখিলে। এখন শোন—আগামী কল্য নবমী-পূজার দিন একটি কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ছাগ সংগ্রহ কর, আমি পূজা করিব, আমিই বলি দিব। তাহার পর যজ্ঞশেষে প্রতিমা বিসর্জ্জন না দিয়া এইস্থানে রক্ষা করিবে, ইচ্ছা হয় চিরদিন দেবীপূজা কর, না হয় আমার উপর ভার দিয়া স্থানান্তরে যাও। আর একটি কথা দিছির—এই বালিকাকে একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, খাঁটি আস্তিক ভক্ত দেখিয়া বিবাহ দিও। ইহার জীবনচক্র অনন্ত কর্ম্মময়।

শিবনারায়ণ সম্মত হইল। এই সময় আকাশে রূঢ়কণ্ঠে পেচক ডাকিল—রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। সন্ন্যাসীর আদেশে সকলি তখন স্থানান্তরে গেল। ব্রহ্মচারী যোগক্রিয়ার প্রাণায়াম কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এইভাবে কার্য্য চলিয়া যখন সন্ন্যাসীর কণ্ঠ হইতে "মা মা দুর্গা দুর্গা" ধ্বনি বাহির হইল, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। ঝির্‌ঝিরে বাতাস বহিতেছে।

আজ নবমীপূজার দিন। ভগবতী প্রভাতে ফুল তুলিতে তুলিতে বোধনতলায় আসিয়া দেখিল—একটী নবীন ছাগ পতিত বিল্বপত্র আহার করিতেছে। বালিকা ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে এই সংবাদ দিল, সন্ন্যাসী সেই ছাগকে আনিতে ভগবতীর মাতুল চৌবেজীকে আদেশ দিল। তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—ইচ্ছাময়ী তোমার ইচ্ছা তুমি জান। আমরা ভ্রান্ত জীব তাহার কি বুঝিব।

আজ প্রভাতে প্রভাতী বাদ্য বাজে নাই। শাঁখ বাজাইয়া ভগবতী তাহা নির্ব্বাহ করিয়াছে। বেলা বাড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন। শিউনারায়ণ আজ যুক্তকরে মায়ের প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। পূজা করিতে করিতে সন্ন্যাসী রামখেলওয়ানকে পাঁঠা আনিতে আদেশ করিলেন। স্নাত ছাগ উপস্থিত হইল, উৎসর্গ শেষ হইলে বলির উপাদানাভাব উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী একটি কদলীবৃক্ষ কাটিয়া দেবীর সম্মুখে দূরে রক্ষা করিলেন। তাহার পর চৌবেজী ব্রহ্মচারীর শিক্ষানুযায়ী পাঁঠা ধরিল। সন্ন্যাসী প্রতিমার মাটির খড়্গে নিজের একখানি ক্ষুদ্র ছুরি সংলগ্ন করিয়া পশুর গ্রীবায় আঘাত করিলেন। মুণ্ড বিখণ্ডিত হইলে ভগবতী আহ্লাদে রক্তাপ্লুত ছিন্নমুণ্ড মস্তকে লইয়া গেল। তাহার পর সন্ন্যাসী কৃতকর্ম্ম করিয়া হোম করিতে বসিলেন। অগ্নিতে পশুমাংস আহুতি দেওয়া হইল। দক্ষিণান্ত সময় শিউনারায়ণ আহার পৈতৃক সম্পত্তি সন্ন্যাসীকে দান করিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকন্যাসহ, সেই চিরদিনের প্রিয় জন্মভূমি, ভূতলের অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় যাইবার জন্য নৌকায় উঠিল।

কমলাকান্ত শিবনারায়ণকে ব্রহ্মচারী করিলেন—বলিলেন, অতঃপর তোমার এই জন্মভূমির নাম "খড়গাগীরা (খড়্গগড়) হইল, এই দেবীর নাম "শোণিতমুখী নারায়ণী" রহিল, আমিই ইহার অর্চনা করিব। সেবৈত্রী বলিল—গুরুবাবা, আমি আর গৃহে যাইব না। আপনার সহিত এই শোণিতমুখীর সেবা করিব। কিন্তু একটা কথা—বলি-ভিন্ন কি দেবী-পূজা সিদ্ধ হয় না? সন্ন্যাসী কহিলেন কেন হইবে না। শাস্ত্রে পূজা মাত্রেই তিনভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু সাত্ত্বিকী পূজা বড় কঠিন। তাহাতে সাধক কাম-প্রবৃত্তিকে বলিরূপে দান করেন। আর রাজসিক পূজায় পশু বলি দিয়া পশুজীবনের মুক্তি দান করা হয়। তামসিকী পূজাও আছে। বর্ত্তমানে মনোবৃত্তিকে বলি দিয়া পূজা করার সাধক অতি অল্প আছেন, এই জন্য ঋষিগণ ত্রিকাল দর্শন করিয়া বলি দিয়া পূজাপ্রথা প্রচলন করিয়াছেন। যাক, এখন দশমীর পূজা শেষ করা যাক, মায়ের বিসর্জ্জন কার্য্যটি এই প্রতিমায় হইবে না। সন্ন্যাসী পূজা শেষ করিয়া প্রণত হইলেন।

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥

লেখক অতি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছেন যে এই খড়্গাগীরা গ্রামের শোণিতমুখী নারায়ণীকে এই অঞ্চলের লোকে "দেওকালী" বলিয়া অভিহিত করে। কেননা এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের ধারণা যে, বলিগ্রহণ কালিকা ভিন্ন অন্য দেবতায় করেন না, তাই ইহার নাম "দেওকালী"। এই স্থানে প্রতি শনিবার অমাবস্যায় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। একবারের দেওকালীর মেলা লেখক দেখিয়াছেন।

স্বাঃ শ্রীযোগদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

আগমনী।

(প্রার্থনা)

(১)

ধীরে ধীরে অপসারি গোধূলিতিমির,
শরতের নৈশাকাশে সুচারু চন্দ্রিকাহাসে
মাখিয়া জোছনারাশি শীতল সমীর।
বিলাইছে সুখস্পর্শ আনন্দ গভীর॥

(২)

বরষা বিগমে আজ বিমলা ধরণী।
নেহারি সাগর মাঝে নিজ প্রতিবিম্ব রাজে
গণিছে আপনা ধন্য হাসি গরবিণী।
দর্পণ সম্মুখে যথা সদ্যঃস্নাতা ধনী॥

(৩)

শীতল শিশির সিক্ত ফুল্ল উপবনে
শাখিশাখে বসি পাখী ডাকিতেছে থাকি থাকি
ঢালিয়া পিযূষধারা ধরার শ্রবণে।
ফুটিছে অমর হাসি মরত—ভবনে॥

(৪)

হাসে শশিসোহাগিনী স্বচ্ছ সরোবরে।
মানবের মনোলোভী শরতের শত শোভা
ধরিছে প্রকৃতি রাণী প্রফুল্ল অন্তরে।
[illegible]॥

(৫)

[illegible]
[illegible]

(৬)

তিনটী দিবস তরে এসগো জননি!

চির-দাস-হীন-বঙ্গে [illegible] দাঁড়ে নবে

ষড়ানন গণপতি নিয়ে বামে বাণী।

ভকত পূজিবে পদ [illegible]

(৭)

জানি গো জননি! তুমি রাজরাজেশ্বরী।

জানি এই পাদপদ্ম   সতত দেবতারাধ্য

তবু রাখিয়াছি পাত্র দু-নয়ন ভরি।

ভকতিকুসুম-অর্ঘ্য যোড় করে করি।

(৮)

চিরারাধ্যা পরাৎপরা বিশ্বপ্রসবিনী।

দরিদ্র কি পাবে আর   উপচার অর্চনার

সঞ্চিত বাসনা বলি লওগো ভবানি,

দীন তনয়ের পূজা তাও মা জননি।

(৯)

চিরশান্তি বিরাজিত মা! তব চরণে।

হবে লুপ্ত হিংসা দ্বেষ   আনন্দে ভরিবে দেশ

নিত্যানন্দময়ী শিবে তব আগমনে।

চির দুঃখী বঙ্গবাসী শান্তি পাবে প্রাণে।

(১০)

চাহিনা; অপর কিছু জগজ্জননি!-

শিখেছে তনয় তব   সহিবারে দুঃখ সব

ধৈর্যের জননী তুমি শৈলজা শর্বাণি!

দাও শুধু সহিষ্ণুতা শক্তিস্বরূপিণি!"

শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য

সংবাদ।

আমরা জাতি বা বর্ণ নামক প্রবন্ধে মোক্ষমূলার সাহেবের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি যে, বৈদিক মন্ত্রাদি কেবল রচনা চাতুর্য্য ইতিহাস মাত্র নহে; উহা স্বপ্রকাশ মন্ত্র, অর্থের সহিত সম্বন্ধ ছাড়া আর একটা শক্তি উহার আছে, যাহা দ্বারা সূক্ষ্ম জগতের এবং স্থূল জগতের বিপর্য্যয় সাধন করা যায়. পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহোদয়গণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত ক্রিয়া সর্ব্বত্র সকল সময় দেখাইবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে আমাদের নাই সত্য, কিন্তু এখনও সময় বিশেষে কোন কোন স্থানে সে ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, মনস্বী স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় মন্ত্রশক্তির সেই মহৎ ফল প্রত্যক্ষ করিয়া বঙ্গবাসী কাগজে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সেইটী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, আশা করি পাশ্চাত্য শিক্ষিত পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন যে, এখনও মন্ত্রশক্তির তিরোধান হয় নাই।

সম্প্রতি স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন জন্য আমি মাসাবধি কাল ৺পুরীধামে গিয়াছিলাম। এবার সেথায় বহুদিন যাবৎ অনাবৃষ্টি হও।। ধান্যাদি শস্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, ধানের গাছগুলি মৃত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। বৃষ্টি না হইলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইবে, এই আশঙ্কা সকলেই করিতে লাগিল। এদিকে ৺পুরীর বাজারে চাউল মহার্ঘ হইয়া লুঠপাট আরম্ভ হইল। কিন্তু তথাকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়দিগের যত্নে লুঠপাট থামিয়া গেল। শুনিয়া সুখী হইবেন, মাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালী এবং পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিহারবাসী। উভয়েই বিশেষ ভদ্র স্বভাবের এবং প্রজার উপকারার্থ যত্নবান্। পুরীর রাজা বৃষ্টির জন্য যজ্ঞারম্ভ করিলেন। শ্রীমন্দিরের সিংহদরজার সম্মুখস্থ গরুড়স্তম্ভের উত্তর পার্শ্বে যজ্ঞ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। বহু কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। যজ্ঞমণ্ডপের চারি দ্বারে চারি বেদের পূজা ও তাহাদের পার্শ্বে. চারি জাতীয় মেঘের পূজা যজ্ঞ জন্য নিরূপিত হইল। মধ্যে ইন্দ্র ও বরুণের জন্য বৃহৎ যজ্ঞ কুণ্ড নির্ম্মিত হইল। ভারে ভারে বিশুদ্ধ ঘৃতাদি ও যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ আসিতে লাগিল। লক্ষ্মী পূর্ণিমা হইতে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। কার্ত্তিক ১২ তারিখ ঘোর ঘনঘটা হইয়া মূষল ধারে বৃষ্টি হইতে থাকে। চারি পাঁচ দিন-বৃষ্টি অনবরত হইয়া গেল। শুষ্কা পৃথিবী সজলা হইল। গত শুক্রবার আসিবার সময় দেখিলাম, মাঠে শস্যের অবস্থা অনেকটা ভাল। পুরীর এই যজ্ঞের ফল দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। এখনও যে হিন্দুধর্ম্মের রীতিমত কার্য্য হইলে প্রত্যক্ষ ফল ফলে, তাহা হাতে হাতে দেখা গেল। এই হোমে বহু কষ্টে ও যত্নে বিশুদ্ধ ঘৃত যোগাড় করা হইয়াছিল। যে সময় পড়িয়াছে, বিশুদ্ধ ঘৃত অভাবে যজ্ঞ ও হোমাদি দেবার্চ্চনা নিষ্ফল হইয়া যায়। নানাবিধ ব্যাধি ও সংকট হইতে উদ্ধার জন্য দেবার্চ্চনা ও হোমাদি যে কি আশ্চর্য্য ফলদায়ক, তাহা ভবিষ্যতে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

"নমো ব্রহ্মণা দেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, কার্ত্তিক। } দ্বিতীয় সংখ্যা।

বিজয়া।

শুধু— দু'দিনের তরে এ'লে গো জননী
চলিলে দু'দিন পরে,
আলোকে পূরিত এ বিশ্ব ভবন—
ফেলিয়ে আঁধার ঘোরে।

আজ— নীরব নিথর 'মণ্ডপ' ভবন,
নাইসে আলোক ভাতি;
সিংহাসনোপরে দেখিনেতো আজ
তোমার পুণ্য মূরতি।

যেই— কনক কিরীট, সুবর্ণ বলয়—
শোভিত সৌম্য হাসিনী,
দলিত অসুর তীক্ষ ত্রিশূলে
ভীষণ-সিংহ-বাহিনী।
দশভুজে যুত দশ প্রহরণ—
দুষ্ট দমন-কারিণী;
অভয়-প্রদানে পালিছে তনয়
বিপদ ভয় বারিণী।

বিজ্ঞান দায়িনী বীণাপাণি সনে,
সজেতে লইয়ে রমা,
কার্ত্তিক গণেশ লইয়ে সহিতে
আসিলে যেরূপে উমা !

এবে— কোথা গো জননি ! যে মূর্ত্তি তোমার
সকল দুঃখ নাশিনী,
যাহার দর্শনে বিমুক্ত তনয়,
পবিত্র সর্ব্ব অবনী।

মা গো ! দরশন আশা পাইতে বারণ
চরণ লোকালে কোথা ?
সন্তানের প্রতি কেন চিরদিন,—
নিদয়া র'লে গো মাতা ?

যদি— ব্যথা দিয়ে চিতে চকিতে পালাও
চঞ্চলা চপলা যথা,
মাতৃ.স্নেহ হীন মোদের জনম—
দিয়েছ কেন গো বৃথা ?

দয়াময়ী মা গো ! দয়া পরকাশে—
দেখ গো বারেক চেয়ে.
মাতার মূরতি না দে'খে সন্তান
(ঐ) কাঁদিছে ব্যাকুল হোয়ে !

শ্মশান-সমান সংসারের দশা ;
সকলি সজল নেত্রে,—
কাঁদে মা মা বলি দিবস-যামিনী
কাতরে নগেন্দ্র গোত্রে !

মা গো ! অজ্ঞান-জড়িত সন্তানে তোমার
দেখিও স্নেহের চক্ষে,
সুপুত্র কুপুত্র জানিত' যতনে
জননী করে গো, রক্ষে ॥

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ।

দুর্গাদাসের দুর্গোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারকনাথবাবুর লোক ভক্ত দুর্গাদাসকে নিয়া সেই ভীষণ মধ্যাহ্নকালের উত্তপ্ত পথে মনের আনন্দে আদালতাভিমুখে ছুটিতেছে, প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় এক সাহেব, একজন বাবু ও কতকগুলি চাবাগানের কুলির সহিত দেখা হইল; ঐ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন দুর্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী কোন্ দিকে? দুর্গাদাস মনে মনে ভাবিলেন—আরও নূতন কোন বিপদ হইবে, প্রকাশ্যে বলিলেন কেন মহাশয়? বাবু বলিলেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য সাহেব ও আমরা যাইতেছি। তখন দুর্গাদাস বলিলেন—আমিই দুর্গাদাস, কি প্রয়োজন বলুন, আমি দেন ডিক্রীতে গ্রেপ্তার হইয়াছি, আমার বাড়ী যাইবার উপায় নাই। বাবু সব অবস্থা জানিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন; সাহেব বলিলেন—কোন চিন্তা নাই আমি সব টাকা দিব, এই ব্যক্তি যে দুর্গাদাস তাহার বিশেষ প্রমাণ চাই, এবং বাগানের দলিল দেখিব, চল দুর্গাদাসের বাড়ী যাই, সাহেবের কথায় কেহ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। তারকনাথের লোকগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহেবের সঙ্গে দুর্গাদাসের বাড়ী আসিল। কেন সাহেব আসিলেন, কেন তিনি টাকা দিতে চান, তাহা দুর্গাদাস বা তারকনাথের লোক কিছুই বুঝিতে পারিল না। সাহেব এবং কতকগুলি লোক দেখিয়া গ্রামের লোক আসিয়া দলে যোগ দিল, এইরূপে এক জনসঙ্ঘ দুর্গাদাসের বাড়ী প্রবেশ করিল, দুর্গাদাস পারিবারিক অবস্থা সাহেব ও বাবুকে বলিলেন, ইহা শুনিয়া সমবেত সকলই দুঃখ প্রকাশ করিল। দুর্গাদাস গৃহে গিয়া দেখেন নারায়ণী অচৈতন্যাবস্থায় ভূলুন্ঠিতা, রামলাল ও সুব্রহ্মণ্যের শরীর নিস্পন্দ, এখনও শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট আছে, তিনি সকলের মুখে ও চক্ষুতে দুর্গা দুর্গা বলিয়া ভগবতীর চরণামৃত দিলেন, এই অবস্থা ক্রমে সমস্ত লোক জানিতে পারিয়া অশ্রু বর্ষণ করিল, সাহেবও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ পরে সুব্রহ্মণ্য চক্ষু উন্মীলিত এবং মুখব্যাদন করিল, দুর্গাদাস মায়ের চরণামৃত মুখে দিলেন, বহুক্ষণ যত্নের পর সকলের চৈতন্যোদয় হইল, নারায়ণী উঠিয়া বসিলেন, একটু আশ্বস্তা হইলেন।

দুর্গাদাস বাহিরে সাহেবের নিকট গেলেন, তখন সাহেবের অনুমতি অনুসারে তাহার বাবু দুর্গাদাসকে সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন, আপনার অবস্থা দেখিয়া সাহেব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। যাহা হউক তিনি যে কার্য্যে অদ্য আপনার নিকট আসিয়াছেন শ্রবণ করুন। সোণাগড় চাবাগানে আপনার যে অংশ আছে, তাহার গত কালের লভ্যাংশ জমা রহিয়াছে। বাগান খোলার তিন বৎসর পরই ইহারে অংশ নিয়া সর্ব্বদা উপস্থিত

হয়, বিলাত আপিলে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বাগানের লভ্যাংশ কাহাকেও দেওয়া হইবে না ইহাই হাইকোর্ট অবধারণ করিয়া দেন, দশ বৎসর মকর্দমার পর গত যে মাসে আপনার স্বপক্ষে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে মকর্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। কোম্পানি এখন সকল অংশীকে লভ্যাংশ বিভাগ করিয়া দিতেছেন। বাগানের অর্দ্ধাংশ আপনার, এখন প্রতি বৎসর এই বাগানে লক্ষ টাকার উপর লাভ হইতেছে। বাগানের প্রথমাবস্থায় লাভ কম হইয়াছিল, মকর্দমায়ও বহু টাকা ব্যয় হইয়াছে, অথচ আপনার ভূমিতেই কোম্পানি আরও নূতন তিনটা বাগান খুলিয়াছেন। গত কালের হিসাবে আপনার নামে দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা জমা আছে, ইনি বাগানের ম্যানেজার সাহেব, দুই লক্ষ টাকার চেক্ ও পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার নোট নিয়া আসিয়াছেন, আপনি রসিদ দিয়া তাহা গ্রহণ করুন। দুর্গাদাস তথাপি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কি বাগান কি অংশ তাহা তিনি জানেন না। দুর্গাদাস বলিলেন—একটা পর্ব্বতে আমার পিতার অনেক ভূমি ছিল জানিতাম বটে, কিন্তু আমি ত তাহার রাজস্বাদি দাখিল করি নাই, ইহা কিরূপে রক্ষা পাইল, এবং সাহেব কোম্পানিকেইবা কে দিল? তখন ঐ বাবু একখান দলিল বাহির করিয়া দেখাইলেন, এবং বলিলেন, আপনি যখন কাশীধামে অধ্যয়নে ছিলেন, তখন আপনার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পর্ব্বতের সকল ভূমি চা-বাগানের জন্য "পি, বার্ড টি কোম্পানি"র নিকট বন্দবস্ত দিয়াছেন; তিনি ঐ ভূমির মূল্য বা নজরাণা গ্রহণ করেন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন পুরাতন সকল বাগানে আপনার অর্দ্ধেক অংশ থাকিবে। মহাশয়! এখন এই চারিটী বাগানে প্রতি বৎসর আপনার অংশে দুই লক্ষ টাকার উপর আয় হইবে। দুর্গাদাস অন্যমনস্ক হইলেন, সজল নয়নে বলিলেন, সমস্তই মা'র লীলা।

দুর্গাদাস রসিদ দিয়া নোট ও চেক গ্রহণ করিলেন, এবং ডিক্রীর টাকা প্রদান করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই গ্রামের সকলে দুর্গাদাসের অভ্যুদয় সংবাদ জানিতে পারিল, সকলেই আনন্দিত, সকলেই দুর্গাদাসের বাড়ী আসিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিল। মায়ের চরণামৃত পানেই সুব্রহ্মণ্য ও রামলাল আরোগ্য লাভ করিয়া অন্ন পথ্য পাইয়াছে।

দুর্গাদাস সর্ব্বপ্রথমই গ্রামের আর্ত্তত্রাণের ব্যবস্থা করিলেন, অর্থ ও চাউল দ্বারা বিপন্নদিগের সাহায্য করিলেন, নিজে সমস্ত ব্যয় দিয়া সহর হইতে দুইজন ভাল চিকিৎসক আনাইয়া নিকটবর্ত্তী সকল লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে গ্রামবাসীর দুঃখ অনেকটা হ্রাস পাইল। সকলেই দুর্গাদাসকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

সুব্রহ্মণ্য ও রামলাল আরোগ্য লাভ করিয়াছে, প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি হইয়াছে দেখিয়া, নারায়ণী গলে অঞ্চল দিয়া—চণ্ডীর ঘটের সাক্ষাতে জোড় হাতে নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন, মা দয়াময়ি! তোমার দয়ার সীমা নাই, তুমি দয়া করিলে কি না হইতে পারে? আমার রামলাল ও সুব্রহ্মণ্য একমাত্র তোমার কৃপায়ই প্রাণ পাইয়াছে। এত ঐশ্বর্য্য কেন দিলে মা? আমরা ত তোমার চরণে পার্থিব ধন পার্থিব সুখ চাই নাই, মনোমত

তোমার পূজা করিতে পারি, কোনরূপ সংসার চলে, এরূপ ধন হইলেই ত চলিবে মা! করুণাময়ি! জানি তোমার কৃপাকটাক্ষে শত সাম্রাজ্য লাভ হয়, ত্রিজগতের অধীশ্বর হওয়া যায়,—ইচ্ছাময়ি! তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ কর, কিন্তু মা! কাঁচ দিয়া আমাদিগকে কাঞ্চনে বঞ্চিত করিও না, ঐশ্বর্য্য লাভে তোমার চরণ চিন্তা যেন আমরা ভুলি না। এ সংসার মা, তোমার কৃপায়ই আছে, মা! আমার রামলাল ও সুব্রহ্মণ্যকে তোমার অভয় পদে সমর্পণ করিয়াছি, তাহাদিগকে রক্ষা করিও, তোমার পদে তাহাদের মতি রাখিও। আমাদের সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের আর অপ্রাপ্য কিছুই নাই। মা! যে জন তোমার চরণ-কৃপা লাভ করে, তাহার কি আর কিছু অপূর্ণ থাকে? মা! আর সুখ দুঃখময় সংসারে ডুবাইয়া রাখিও না, সতি! দাক্ষায়ণি! তুমিই মা, আমার একমাত্র গতি, তোমার চরণে স্থান দিও মা, তোমার চরণে সব অর্পণ করিয়া আমি তোমারই চরণে মিশিতে চাই মা! এই বলিয়া নারায়ণী ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহে গেলেন।

(৫)

আজ ভক্ত দুর্গাদাসের সৌভাগ্য দর্শনে দুর্গাদাসের গ্রামের চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ সকলে যেন আনন্দে উৎফুল্ল।

বোধন ঘটে দেবীর আরতি ও বৈকালী শেষ হইলে, উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রায় সকলই দুর্গাদাসের গুণগান করিতে করিতে বাটী গমন করিল। দুর্গাদাস নিশ্চিন্ত মনে নিরাময় পুত্র ও ভৃত্যসহ স্বজনগণ লইয়া সন্ধ্যার পর একত্রে বসিয়াছেন। দুর্গাদাস সুব্রহ্মণ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! মায়ের কৃপায় তুমি বেদাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছ, তাঁহারই কৃপায় বহু ধনের অধিপতিও হইয়াছ, রামলাল তোমার অগ্রজ স্থানীয়, তাহাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া মনে করিও, সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিও। সে যে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে চায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিও। তাহাকে ত্যাগ করিও না, তাহার কথামত চলিও। রামলালের তত্ত্ব গোপন রাখাই তাহার ইচ্ছা, আমি তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান এখন ব্যক্ত না করিয়া ২।১টী কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি, ইহা অন্যকে জানিতে দিও না। রামলাল ভৃত্যযোগ্য লোক নহে, গৌরবান্বিত ক্ষত্রিয় বংশে বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী গৃহে তাহার জন্ম, বিষয় লিপ্সা ভ্রাতৃবিরোধ সম্ভবপর দেখিয়া এবং তাহার প্রাণ-সংশয় বুঝিয়া সে কাশীধামে যায়, তথায় আমার সহিত দেখা হয় এবং এখানে চলিয়া আসে, আমাদের অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু লোককে তাহা জানিতে দেয় নাই। তাহার সংসারের প্রতি অনাস্থা দেখিয়া তাহার বিবাহাদি বিষয় আর কিছু করি নাই, তাহার অভিপ্রায় হইলে তুমি সেই বিষয় যত্ন করিও।

[illegible] অর্থ না হইলে সংসার চলে না সত্য, কিন্তু অর্থই সকল অনর্থের মূল। এই বিষয় বিশেষ [illegible] থাকিতে হইবে। বিষয়দোষদর্শনরূপ অঙ্কুশ দ্বারা মনোমাতঙ্গকে দমিত [illegible]। রূপ রসাদি বিষয়ের অধীন না হইয়া বিষয়কে অধীন করিয়া রাখাই [illegible]। এই সাধনায় চ্যুত লোক নিম্ন হইতে নিম্নস্তরে গমন করে, এবং এই সাধনায় [illegible] লোক ক্রমে মোক্ষেরও অধিকারী হয়। ভগবানের চরণে সর্ব্বকর্ম্মের ফলার্পণ করিয়া [illegible]ভাবে লৌকিক ও বৈদিক কার্য্য করাই পরম শান্তির কারণ! তোমায় অধিক [illegible] কি বলিব মায়ের প্রসাদ ভুলিও না।

এই কয় বৎসর মায়ের পূজায় মনোমত ব্যয় করিতে পারে নাই বলিয়া আমার রামলাল [illegible] প্রকাশ করিয়াছে, এই বার তাহার দুঃখ থাকিতে দিও না, তাহার মনোমত অর্থ ব্যয়ে সকল কাজ করিতে দিও। যাও বাছা রামলাল! তোমার আকাঙ্ক্ষা মা পূর্ণ করিয়াছেন, তুমি এইবার মনের সাধ মিটাইয়া সর্ব্বমঙ্গলার পূজা কর। রামলালের আনন্দ ধরে না, মহানন্দে বলিল, লক্ষের উপর যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা মায়ের পূজা করিব, এই বার আমার মনের সাধ মিটাইয়া নিব।

দুর্গাদাস প্রীতি ভরে বলিলেন আচ্ছা বাছা! তাহাই হইবে, তোমার ইচ্ছা মতই সব কর।

তাহার পর দুর্গাদাস সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে শুন,—আমার বয়স হইয়াছে, এ দেহে আর দুর্গোৎসব করিতে পারিব কি না তাহার স্থিরতা নাই, এইবার তোমরা নিজ ইচ্ছায় সকল কাজ কর, আমাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অন্য মনস্ক করিও না, একমনে আমাকে মায়ের চরণ চিন্তা করিতে দিও। আমি এইবার মাতৃ ধ্যানে মহানন্দে দুর্গোৎসব করিয়া জীবন সার্থক করিব।

দেশের লোক আধি ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, ইহার উপর মহালয়ার সন্ধ্যায় বঙ্গে মহা ভূমিকম্প, মেদিনী থরথরি কাঁপিয়া উঠিল, প্রায় সকল প্রাসাদ, দালান মঠ ভূমিসাৎ হইল, বহু লোক ইষ্টক চাপায় প্রাণ হারাইল। জমিদার তারকনাথের সমস্ত গৃহাদি ভূ পতিত, সমুদয় দ্রব্যজাত চূর্ণবিচূর্ণ, তাহার দুইটী পুত্র ইষ্টক চাপায় মরিয়াছে, তারকনাথের পত্নী ও একটী শিশুপুত্র [illegible] আঘাত পাইয়া জীবিত আছে। তারকনাথের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, হস্ত [illegible], প্রাণমাত্র অবশিষ্ট, এই তিনজন ভিন্ন তারকনাথের নিজের লোক আর কেহ জীবিত নাই, তারকনাথের থাকিবার স্থান নাই, ছোট একখানা খড়ের গোগৃহে অবস্থান করিতেছেন, এই বিপদের উপর দ্বিতীয় সন্ধ্যায় ঐ পুত্রটীর কলেরা উপস্থিত। তারক-নাথ [illegible] অন্ধকার দেখিলেন, তাহার কেহ নাই, কোনরূপেই পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, পুত্রের পীড়া বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া তারকনাথের স্ত্রী তারকনাথকে বলিলেন, [illegible]। তুমি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, দুর্গাভক্ত সাধক [illegible] পরিবারকে [illegible] দেওয়াই আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তিনি মহাসাধু [illegible]

ব্রাহ্মণ, তাঁহার শাপে ও মা চণ্ডীর কোপে আমার এই দশা হইয়াছে, তুমি এখনই তাঁহার নিকট লোক পাঠাও তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, তাঁহার হিংসা দ্বেষ নাই, তিনি আসিলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র বাঁচিবে, তুমি তাঁহার পদে পতিত হইয়া ক্ষমা চাহিও, মা জগদম্বার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতদিন পরে তারকনাথ সংসার শূন্য দেখিলেন, বুঝিলেন এমন এক সময় আসে যে সময় মানুষের শাস্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোন কাজে লাগে না, আজ তাহার সহচরগণ বা ছল চাতুরী বুদ্ধিমত্তা কোন কাজে লাগিতেছে না, তখন তিনি অনন্যোপায়, সুতরাং কৃতকর্ম্মের জন্য তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইল। চক্ষে জল আসিল, বহুদিন পরে তাঁহার মুখে দুর্গানাম উচ্চারিত হইল, তিনি কাতরে বলিলেন, মা দুর্গা! আমার ন্যায় মহাপাপীকে তুমি ক্ষমা না করিলে আর কে করিবে, তুমি যে অধমতারিণী, মহাপাপবিনাশিনী, একথা তো সকল শাস্ত্রে আছে শুনিতে পাই, তাই ক্ষমা চাহিতে সাহসী হইয়াছি, রক্ষা কর, আমাকে ক্ষমা কর। তারকনাথের দুর্দ্দশায় কেহ দুঃখিত নয়, কেহ তাহার নিকটে আসে না, বহুকষ্টে তারকনাথের পত্নী একটী লোক পাঠাইয়া দুর্গাদাসকে সকল অবস্থা জানাইলেন, দুর্গাদাস তাহা শুনিবা মাত্র ঐ রাত্রিতেই সুব্রহ্মণ্য ও রামলাল সহ একজন ডাক্তারকে নিয়া তারকনাথের বাড়ী গেলেন, তারকনাথের অবস্থা দেখিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তারকনাথ লজ্জায় অনুতাপে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, কি বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কেবল দরদরিত ধারে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, দুর্গদাস অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, আপনি কিছু মনে করিবেন না, কিছু বলিবারও প্রয়োজন নাই। তিনি ভগবতীর চরণামৃত নির্ম্মাল্য লইয়া গিয়াছিলেন, প্রথমেই শিশুর মুখে মায়ের চরণামৃত দিলেন, মাথায় নির্ম্মাল্য দিয়া কাতরভাবে মায়ের চরণে শিশুর আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। ডাক্তারও শিশুকে দেখিয়া বলিলেন, এখন আর মোটেই আশা নাই, এ অবস্থায় ঔষধও চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই, রোগীর নাভিশ্বাস প্রায়, আর বিলম্ব নাই, বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তারকনাথের স্ত্রী দুর্গাদাসের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আপনি আমার পুত্রের জীবন ভিক্ষা দেন, ভগবতীর কোপে এবং আপনার মনস্তাপে আমার এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আপনি প্রসন্ন হইলে মা জগদম্বাও প্রসন্না হইবেন। নিজের ঘোর বিপদে অটল থাকিলেও আজ দুর্গাদাস চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি তারকনাথের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া কাতরে ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সুব্রহ্মণ্য ও রামলাল সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বালকের শুশ্রূষা করিতে লাগিল, আর আনীত চণ্ডীচরণামৃতরূপ ঔষধ পুনঃ পুনঃ মুখে দিতে লাগিল; প্রাতঃকালেই রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ হইল, দুর্গাদাস গৃহে গিয়া নিত্যকর্ম্ম পূজা ও চণ্ডীপাঠ শেষ করিয়া আসিয়া তারকনাথকে বলিলেন, মা চণ্ডীর কৃপায় আপনার পুত্রের আর কোন আশঙ্কা নাই, তবুও আমি একটী প্রস্তাব করিতেছি, আশা করি আপনারা অন্যথা মনে করিবেন না, আপনার শারীরিক যে অবস্থা,

এখন বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার প্রয়োজন, মায়ের পূজা নিকটবর্ত্তী, সুব্রহ্মণ্য ও রামলাল সর্ব্বদা এখানে থাকিলে পূজার আয়োজন হইবে না, এখানে গৃহাদি নাই, পূজার পূর্ব্বে গৃহাদি প্রস্তুত করাও সম্ভবপর নয়, পূজার পর আমি সব ব্যবস্থা করিয়া দিব, এই কয়দিন যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে আসেন, তবে সকল বিষয় সুব্যবস্থা হইতে পারিবে। তারকনাথ হাত জোড় করিয়া কি বলিতেছিলেন, বাক্য রোধ হইল, কিছু বলিতে পারিলেন না, বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে দুর্গাদাসের পদতলে পতিত হইলেন, দুর্গাদাস তারকনাথের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, আপনি কিছু মনে করিবেন না, সমস্তই মনের বিষয়, মনের মাটী ধুইয়া ফেলিলেই হইল। দুর্গাদাসের কথায় কেহ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না, সকলকে নিয়া দুর্গাদাস নিজ বাড়ীতে গিয়া উপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, নারায়ণী তাহাদের বিশেষ যত্ন ও সমাদর করিতে লাগিলেন, তারকনাথ ও তাহার পত্নী তাহাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন, মানুষ এইরূপ করিতে পারে তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারিলেন না।

ক্রমে পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, গ্রামময় হুলুস্থুল। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলই দুর্গাদাসের বাড়ী আসিয়া অধিকারীভেদে এক একটা কাজের ভার গ্রহণ করিল। দেশে মহা দুর্ভিক্ষ, সকলই অভাবগ্রস্ত, যাহারা দুর্গাদাসের মহালগুলি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, তাহারা মূল্য গ্রহণে সেই সমুদয় প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিলে; রামলাল সকলকেই কতক কতক টাকা দিয়া প্রতি বৎসর অবশিষ্ট টাকা দিবার কিস্তি করিল। অন্যায় পূর্ব্বক যে সকল ভূমি তারকনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করিলেন। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোক গৃহ, প্রাঙ্গণ, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি সংস্কার করিতে লাগিল। দুর্গাদাসের উন্নতিতে গ্রামস্থ সকলেই আনন্দিত। পূজার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সকল আত্মীয় কুটুম্ব যথাসময়ে আসিয়াছেন, এইরূপে দুর্গাদাসের নষ্ট শ্রী পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিল।

নারায়ণী রামলালকে বলিলেন বৎস রামলাল! এইবার কাপড়ের মূল্য বড় বেশী, গরীবেরা এইবার পূজার সময় কাপড় খরিদ করিতে পারিবে না। আমার বড় সাধ যে এইবার গ্রামের বালিকা, সধবা ও বিধবা সকলকে এক একখানা ভাল কাপড় দিব, এবং পূজার তিন দিন সকলেই এখানে খাইবে, আমার এই বাসনাটী তুমি পূর্ণ করিলে বড় আনন্দিত হইব। রামলাল আনন্দের সহিত বলিল,—মা! আমারও সেই ইচ্ছা, আপনি গ্রামের ছোট বড় সকল মেয়েলোককে এক একখানা ভাল কাপড় দিবেন, আর আমি সকল পুরুষকে এক এক জোড়া কাপড় দিব, পূজার সময় কাহাকেও ছিন্ন বস্ত্র পরিতে হইবে না, পূজার তিন দিন কাহারও বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িতে দিব না।

(৬)

মহা ধূমধামের সহিত দুর্গাদাসের দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল। গ্রামবাসী সকল যেন আজ এক পরিবারভুক্ত। নিজ বাড়ীর কার্য্যের ন্যায় সকলেই মহানন্দে পূজার কার্য্য করিতেছে।

রামলালের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। সকল বিষয়েই যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল, দুর্গাদাস ভক্তিভরে বিল্ববৃক্ষে মায়ের আমন্ত্রণ অধিবাস করিলেন। ষষ্ঠীর ত্রিযামা বিগতা। ভুবনস্থিতা ভুবনমোহিনী জগদম্বাকে দর্শনহেতু লোহিত বসনে সজ্জিত সহস্রাংশু উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বাশার তোরণ উদ্ঘাটন করিয়া সমুদিত। পূজার বাড়ীতে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর, তুরী, ভেরী, ঢাক, ঢোল বাজিয়া উঠিল। আনন্দ কোলাহলে আকাশ মুখরিত। দুর্গাদাস পূর্ব্বাহ্নে মূলা নক্ষত্রযুক্তা সপ্তমীতে শুভকরী নবপত্রিকা প্রবেশ এবং প্রতিমায় দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণগণ শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ, লক্ষাহুতি ও লক্ষ জপের সংকল্প করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। সুব্রহ্মণ্য হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত ও কণ্ঠ তাল্বাদি স্থানভেদে বর্ণোচ্চারণ করিয়া চণ্ডীপাঠ, এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, স্বরভেদে দেবীসূক্ত পাঠ করিতেছেন। সে ভাবরসময় চণ্ডীপাঠ শুনিলে অতি পাষণ্ডের মনেও ভক্তির সঞ্চার হয়। রামলাল পদ্ম, করবী, চাঁপা, অপরাজিতা, শেফালিকা প্রভৃতি ভার ভার পুষ্প সংগ্রহ করিয়াছে। ধূপ গুগ্‌গুল, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন, অগুরু ও পুষ্পগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত। দুর্গাদাস ভাবে ডুবিয়া তন্ময়চিত্তে ষোড়শোপচারে সকল দেবদেবীর পূজা করিতেছেন। বিক্ষেপ নাই, চাঞ্চল্য নাই।

নারায়ণী নানাবিধ পিষ্টক পায়স অন্ন ব্যঞ্জনে মায়ের ভোগ প্রস্তুত করিয়াছেন। নারায়ণী ও রামলালের প্রদত্ত সুন্দর সুন্দর বস্ত্র পরিয়া গ্রামের বালক বালিকা, যুবা যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, দলে দলে পূজাবাড়ীতে আসিতেছে, আনন্দের সীমা নাই। সকলেই আনন্দিত। গ্রাম যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে,—প্রতিমার সাজ সৌন্দর্য্য, পূজা পাঠ, ভাব ভক্তি আয়োজন ও আগন্তুকের আদর সম্ভাষণ দেখিয়া সকলই পরমানন্দিত, অতি প্রীত। রামলালের ব্যবস্থা গুণে নানাবিধ খাদ্যে শত শত লোক পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন করিতেছে। কোন বিশৃঙ্খলা নাই। নারায়ণী মেয়েলোকদিগকে প্রচুর ভোজন করাইয়া মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত এবং বালকবালিকাদিগকে অঞ্জলি পূরিয়া সন্দেশ দান করিতেছেন, উচ্চ নীচ কেহই বাদ রহিল না। নিম্নশ্রেণীর লোকগুলিকে নারায়ণী অধিক মিষ্টান্নাদি দিয়া বিশেষ যত্নে ভোজন করাইলেন। এইরূপে সপ্তমীর দিবা অবসান হইলে, সন্ধ্যায় দুর্গাদাস ধূপ দীপাদি দ্বারা আরত্রিক করিয়া, ভক্তি গদ্গদভাবে নয়নজলে ভাসিয়া "নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে। নমস্তে জগদবন্দ্যপাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করিলেন। সুব্রহ্মণ্য আনন্দলহরী ও নারায়ণী—

ভবাব্ধাবপারে মহা দুঃখ ভীরুঃ
প্রপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গী কুবুদ্ধ-প্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

ইত্যাদি এবং রামলাল নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী ইত্যাদি স্তব পাঠ করিলেন। মায়ের জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া মনে হইতেছে। রূপের ছটায় দর্শক বর্গের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, মায়ের আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া, সকলে নিজ নিজ অভীষ্ট কামনা করিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সকলের প্রাণ ভক্তি শ্রদ্ধা ও শান্তিময় হইল। দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব বুঝিয়া সকলেই মুগ্ধ। গ্রামের লোক নিজ নিজ বাড়ী গিয়া পরস্পর কেবল দুর্গাদাসের বাড়ীর পূজার এবং দুর্গাদাস, নারায়ণী, সুব্রহ্মণ্য ও রামলালের চরিত্র বিষয় আলোচনা ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এইরূপে দুর্গাদাসের বাড়ীতে ভগবতীর সপ্তমী পূজা সমাপন হইল।

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র যুক্ত মহাষ্টমীতে, দুর্গাদাস পূর্ব্বাহ্নে যথাবিহিত দ্রব্যে জগদম্বার মহাস্নান ও পূজা সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যায় আরত্রিক ও স্তব পাঠ করিয়াছেন, এমন সময় সুব্রহ্মণ্য পিতাকে দুর্গাতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্গাদাস বলিতে আরম্ভ করিলেন—বৎস! পরা প্রকৃতি ব্রহ্ম। যিনি শাস্ত্রে ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা, তিনি প্রকৃতি নামে বিখ্যাতা। তিনি ব্রহ্মশক্তি, এই পরাপ্রকৃতি ও প্রকৃতিকে, ব্রহ্ম ও শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নরূপে অবধারণ করা যায় না। শক্তি ও শক্তিমৎ পদার্থের পৃথক্‌রূপে গ্রহণ অসম্ভব, অগ্নি আর তাহার দাহিকাশক্তি, চন্দ্র ও রমণীয়তা, পদ্ম ও শোভা এবং রবি ও প্রভা যেমন নিয়ত পরস্পর পরস্পরে সংসক্ত রহিয়াছে, সেইরূপ পরমাত্মা ও প্রকৃতি পরস্পর মিলিত রহিয়াছেন, সাধারণভাবে এই উভয়ের ভেদ ও অভেদ বুঝাইবার জন্য শক্তিমান্ ব্রহ্মের প্রকৃতি পুরুষলীলা অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির প্রকাশ। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে কেবল প্রকৃতিকেই জড়া বলিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মশক্তিরূপিণী সেই প্রকৃতি জড়া নহেন, তিনি চিন্ময়ী, এইজন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়া বারবার উল্লেখ করিয়াছেন।*

(১) "প্রকৃতিশ্চ" এই বেদান্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥
গুণে সত্ত্বে প্রকৃষ্টে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতঃ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তি শব্দ স্তমসি স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্ম স্বরূপা যা সা চ শক্তি সমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টি করণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টে রাদৌ চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥

এখন সংক্ষেপে প্রকৃতি লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। "প্র" এই উপসর্গটী প্রকৃষ্ট বাচক, আর "কৃতি" এই পদটী সৃষ্টিবাচক, যিনি সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃষ্ট রূপা সেই মহাদেবীই প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধা। এই যে প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহা তটস্থ লক্ষণ। এখন ইঁহার স্বরূপ লক্ষণ বলিতেছি শুন,—ত্রিগুণ মধ্যে সত্বগুণটী বিমলত্ব এবং জ্ঞান প্রকাশতা প্রযুক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং প্র শব্দটী প্রকৃষ্টার্থ বোধক সত্বগুণে প্রবর্ত্তিত, বিক্ষেপতা দোষ প্রযুক্ত রজোগুণ মধ্যম, অতএব কৃ শব্দ রজোগুণে প্রবর্ত্তিত বলিয়া মধ্যম, এবং তমোগুণ জ্ঞানের আবরক বলিয়া অধম, তি শব্দটী তমোগুণ বোধক। নিরতিশয় রূপে আবরণ বিক্ষেপাদি দোষরহিতা গুণাতীতা সেই চিন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী যখন গুণত্রয়ে সংমিলিত হইয়া সর্ব্বশক্তি সমন্বিত হন, তখনই সৃষ্টি কার্য্যে প্রধানা, সেই জন্যই তাহাকে প্রকৃতি বলা যায়। নিত্য নিরঞ্জন পরমাত্মা সৃষ্টি কার্য্যের জন্য যোগমায়া-প্রভাবে দুই প্রকারে আবির্ভূত হন। তাহার দক্ষিণার্দ্ধ ভাগের নাম পুরুষ, আর বামার্দ্ধ ভাগের নাম প্রকৃতি।

"শ" ঐশ্বর্য্য বাচক, এবং ক্তি পরাক্রম বাচক, সুতরাং ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম স্বরূপা এবং ঐ উভয়ের দাত্রী বলিয়া মূল প্রকৃতি শক্তি নামে অভিহিতা। বেদে প্রণব এবং মায়াবীজ দ্বারা ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে উল্লেখ করিয়াছেন, প্রণব ব্রহ্মের বাচক, এবং মায়াবীজ প্রকৃতির বাচক। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার সৃষ্টির আদিতে জীবগণের কর্ম্ম ফলের পরিপাক বশতঃ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়।

ব্রহ্মাধিষ্ঠিত ব্রহ্মশক্তি বা ত্রিগুণা প্রকৃতি সৃষ্টি সময়ে ভগবতী দুর্গারূপে প্রাদুর্ভূতা হন। ভগ শব্দ জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, যশঃ ও বল বাচক। সুতরাং ঐ সকল জ্ঞানাদি শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া ইহাঁকে ভগবতী বলা হয়।

এই সর্ব্বমঙ্গলময়ী দুর্গা দেবীই জগতীস্থ জীব নিবহের চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা ছায়া, তন্দ্রী, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, ভ্রান্তি, শান্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী ও ধৃতিরূপা। এই সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপা, সনাতনী ভগবতী দুর্গাদেবীই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই লীলাময়ীর মহিষাসুর বধের সময় আবির্ভাব, এবং শুম্ভ নিশুম্ভ বধের সময় বিভিন্ন শক্তি রূপে প্রাদুর্ভাবও একত্র তিরোভাব তত্ত্ব স্মরণ কর; দেখিতে পাইবে এই আদ্যা শক্তিই সকল দেব দেবীর কারণ স্বরূপা। এইজন্যই ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ, ও মনুগণ সকলেই পরমারাধ্যা ভগবতী দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা ও স্তবাদি করিয়া থাকেন। ইনি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্না হইয়া অধিকারি-ভেদে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ দান করিয়া থাকেন।

যোগেনাত্মা সৃষ্টি-বিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
সাচ ব্রহ্ম স্বরূপাচ নিত্যা সাচ সনাতনী।
যথাত্মা চ তথা শক্তি র্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা।
অতএব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রী পুং ভেদো ন মন্যতে॥

দুর্গাদাসের কথিত দুর্গাতত্ব সুব্রহ্মণ্য নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে ছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি পিতাকে বলিলেন—একটী তত্ব বুঝিবার জন্য আমার বড় অভিলাষ হইতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে বলুন, আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী পূর্ণিমায় লক্ষ্মী পূজা, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা, কার্ত্তিকী সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজা ও গণেশ চতুর্থীতে গণেশ পূজা হইয়া থাকে, তথাপি আবার দুর্গোৎসবে এক কাঠামে সকলের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করা হয় কেন? লক্ষ্মী সরস্বতী কি পৃথক শক্তি? সিংহ, অসুর মহিষ দেওয়া হয় কেন? ইত্যাদি বিষয় আধ্যাত্মিক তত্ব কিছু থাকিলে আমাকে উপদেশ করুন। দুর্গাদাস বলিলেন বৎস! এজগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ভগবতীর অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়ার প্রভাবে নানারূপে প্রতিভাত হয়, সকলের মূলে এক সত্য তত্ব নিহিত আছে। স্থূলকে সূক্ষ্মে পরিণত করাই সাধনা। এই দুর্গোৎসবে সৃষ্টি তত্ব অভিব্যক্ত। মহিষরূপ আবরক তমোগুণ ছিন্ন, প্রবৃত্তি ধর্ম্ম রজো রূপ অসুর বহির্ভূত হইয়া সত্ব রূপ সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত পরস্পরাভিভবে যত্নশীল। ইহা সৃষ্টির স্থূলাবস্থা। যে স্থলে রজঃ তমোভিভূত, শুদ্ধ সত্ব মাত্র প্রকটীভূত, সেই বিশুদ্ধ সত্ব স্বরূপ সূক্ষ্মাবস্থায় ভক্তাভীষ্ট প্রদান হেতু জগদম্বা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাত্তিক ও গণেশ রূপে মূর্ত্তিমতী দেবতা। বৎস! ভগবতীর অংশ বিশুদ্ধ সত্ব স্বরূপা শক্তি লক্ষ্মী, ইনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবী, এই মহাশক্তিই জীব নিবহের জীবন ধারণার্থ একাংশে শস্যরূপিণী, এই মহাশক্তি রূপিণীই স্বর্গ ধামের স্বর্গলক্ষ্মী, রাজাদিগের রাজলক্ষ্মী, আবার সুকৃতিমান্ মানবগণের গৃহলক্ষ্মী। বৎস! সমস্ত প্রাণিবর্গে বা যাবতীয় দ্রব্য সমূহে যে মনোরম শোভা দৃষ্ট হয়, সে সমস্তই ইনি। ইনিই পুণ্যাত্মাদিগের কীর্ত্তিরূপা।

বৎস! যিনি অনন্ত বিশ্বের সমস্ত বিদ্যারূপা, যে মহাশক্তি পবিত্রাত্মা মানবগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা হইয়া—মেধা, কবিতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভাশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহার নাম সরস্বতী। সুধীবর্গের কোন বিষয় সন্দেহ হইলে ইনিই তাহাদিগের সেই দুর্ব্বোধ বাক্যার্থ বোধগম্য করাইয়া সমস্ত সংশয় ছেদন এবং নানা বিষয়ক সিদ্ধান্ত সকলের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সংকলন করিয়া দেন। পণ্ডিতদিগের গ্রন্থকরণ শক্তি, বিচার শক্তি, সঙ্গীত ব্যবসায়ীর সন্ধান তাল লয়াদির কারণ এই মহাশক্তি। এই মহাদেবীই সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বাদ অর্থাৎ বিতর্ক রূপা, ইঁহাকেই ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীববৃন্দের স্ব স্ব বিষয় জ্ঞানরূপা ও বাক্যরূপা জানিবে। "আমিই সমস্ত বিদ্যার আধারভূমি" এই তত্বটি যাবতীয় জীবকে জানাইবার জন্যই এই মহাদেবী সরস্বতী এক হস্তে বীণা অপর হস্তে পুস্তক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইনি শুদ্ধ সত্বস্বরূপা, শ্বেত সরোজোপবিষ্টা, কুন্দেন্দু-তুষার হার ধবলা, এই সরস্বতীদেবীই সকলের বিদ্যা স্বরূপা।

কার্ত্তিক সর্ব্বশক্তিধর; (কেন্দ্রীভূত শক্তি) গণেশ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, ভক্তকে শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্, শক্তিধর ও সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন করিবার জন্য কারণরূপা মূলপ্রকৃতি ভগবতীর এই রূপময়ী বিভূতি চতুষ্টয়। বৎস! তুমি সাক্ষাতে জগদম্বার যে স্থূললীলা প্রত্যক্ষ করিতেছ, তাহা

সত্য ঘটনা, এবং লীলাময়ীর এই লীলা সূক্ষ্মভাবে (উল্লিখিত বর্ণনা স্বরূপ) জগতের কোন না কোন স্থানে নিত্যই সংঘটিত হইতেছে।

মায়ের এই সত্য স্থূললীলা হইতে সাধক ভক্ত সাধন-তত্ত্বের এই ইঙ্গিত পাইতেছেন— সিদ্ধি (গণেশ) শক্তি (কার্ত্তিক), ঐশ্বর্য্য (লক্ষ্মী) ও জ্ঞান (সরস্বতী) সম্পন্ন হইয়া সাধন-সমরে প্রবৃত্ত সাধক জ্ঞান-অসিদ্বারা মোহ (মহিষ) কে ছিন্ন এবং প্রবৃত্তি (অসুর) কে অভ্যাস রূপ পাশে আবদ্ধ ও বৈরাগ্য ত্রিশূলে অবসন্ন করিয়া সত্ত্ব (সিংহ) কে অবলম্বনপূর্ব্বক মোক্ষের (আনন্দময়ীর) নিকট পৌঁছিতে হয়।

(৮)

মহানন্দে দুর্গাদাসের নবমীপূজা সম্পাদন হইল, নিয়মিত আরত্রিক ও স্তোত্র পাঠাদি করিয়া দুর্গাদাস পত্নীকে বলিলেন, নারায়ণি! আমরা আজ মার প্রসাদে পূর্ণ মনোরথ, আর কেন ব্যুত্থান অবস্থায় সংসার-সমুদ্রের সুখ দুঃখরূপ তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিব? ক্ষণভঙ্গুর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শাদির ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া অতৃপ্তির তাড়নায় 'হা হুতাশ' করিব? সকল সুখ, সকল শান্তি ও সকল আনন্দের মূলীভূত কারণ আনন্দময়ী মা আমাদের সাক্ষাতে শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজমানা, এস মার পাদপদ্মে বুদ্ধি অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব লয় করিয়া ক্ষুদ্রত্ব মহত্ত্বে মিশাইয়া মহতে পরিণত হই। আর পাহারা দিতে পারি না, যাহার জিনিষ তাহাকে দিয়া আমরা দায়িত্ব হইতে মুক্ত হই। মার জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমাতে চক্ষু স্থির কর, ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ঐ চিন্ময়ীকে ধারণা কর, পার্থিব সব ভুলিয়া যাও, নিজকে বিস্মৃত হও, ক্রমে স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম বিষয় ভাবনা কর, স্বীয় পৃথক্ সত্ত্বা মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া সোঽহংরূপে সদানন্দময় মহার্ণবে ভাসমান হও। এই বলিয়া দুর্গাদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যানাদিক্রমে মহাযোগে সমাসীন হইলেন। নারায়ণীও পতির উপদেশানুসারে মায়ের চরণে সব অর্পণ করিয়া তন্ময় হইলেন। উভয়ে ধ্যান মগ্ন। মহানিশায় জগৎ প্রকৃতির ক্রোড়ে সুষুপ্ত, বহুক্ষণ অতীত, দুর্গাদাস ও নারায়ণী নিশ্চল নিঃস্পন্দ্। তাহাদের শরীর হইতে যেন অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রভা বিনির্গত হইতেছে। নিকটে সুব্রহ্মণ্যও যোগস্থ, দ্বারে বসিয়া রামলাল দুর্গানাম জপ করিতেছে এবং ভগবতীর অলৌকিক রূপ দর্শন করিতেছে। আজ যেন ভগবতীর রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, অন্য দিনের ভাব নাই, আজ অপার্থিব শোভা অদৃষ্ট পূর্ব্ব রমণীয়তা। রামলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—নিশ্চয়ই মা হৈমবতীর আবির্ভাব হইয়াছে, প্রত্যহই ত মায়ের প্রতিমা দর্শন করি, কৈ? এমন ত একদিনও দেখি না, মৃন্ময়ী মূর্ত্তির কি এমন রূপ হইতে পারে। নিশ্চয়ই কর্ত্তার প্রতি প্রসন্না হইয়া মা চিন্ময়ী আবির্ভূতা হইয়াছেন। মহতের সেবায় আমার অধম জীবনও ধন্য হইল। ধন্য মা করুণাময়ি! ধন্য তোমার কৃপা। তুমি সর্ষপকে সুমেরু, কীটকে দেবেন্দ্র ও খদ্যোতকে চন্দ্র সূর্য্যে পরিণত করিতে পার,

তুমি রত্নাকরকে বাল্মীকি করিয়াছ, তুমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মহাপাপী অসুরগণকে মুক্তিদান করিয়াছ। মা এ মহাপাপী অধমের কি গতি হইবে? আমি সাধন ভজনহীন, করুণাময়ি! এ দাসের প্রতি প্রসন্না হও। তোমার পদে আমার মতি রাখিও মা! আর পাপে ডুবাইয়া রাখিও না, মা! তুমি অগতির গতি, মা অভয়া! তোমার অভয় পদে স্থান দিও মা! এই বলিয়া রামলাল ভক্তি গদগদ ভাবে নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল। সুব্রহ্মণ্যের ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে, তিনি—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

বলিয়া প্রণাম করিলেন।

হঠাৎ সেই গৃহে এক অমর্ত্ত্য জ্যোতিঃ প্রকাশে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিল। ইহা কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশশালী, অথচ কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, কোটি বিদ্যুতের ন্যায় আভা বিশিষ্ট। অদৃষ্ট পূর্ব্ব সেই তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া সুব্রহ্মণ্য এবং রামলাল ভীত, বিস্মিত ও কম্পিত হইলেন। ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহাদের স্বেদোদ্গম ও পুনঃ পুনঃ লোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ যেন কাহার আহ্বানে দুর্গাদাস ও নারায়ণীর ধ্যান ভঙ্গ হইল, তাহারা চকিতে দেখিলেন সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে তাহাদের চিরাভীষ্ট সাধনার ধন,—কোটিচন্দ্রপ্রভাময়ী চারুচন্দ্রার্দ্ধশেখরা ত্রিনয়না বরাভয় করা সিংহবাহিনী গণেশ জননী দুর্গা মূর্ত্তি বিরাজমানা। দুর্গাদাস ও দাক্ষায়ণী ভাবাতীত, কিছু বলিতে পারিলেন না, ভক্তিভরে মস্তক ভূলুণ্ঠিত হইল, ক্রমে সেই আলৌকিক তেজোমণ্ডল শমিত হইয়া আসিল, জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইলেন। স্বর্গীয় দুন্দুভি নাদে ভক্তের জয় বিঘোষিত হইল।

শ্রীনবকুমার শাস্ত্রী।

ব্যাধি-রহস্য।

মনুষ্যের ব্যাধি।

ব্যাধি দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বলিয়া শরীরের একটী নাম ব্যাধি-মন্দির। কিন্তু তাই বলিয়া শরীর থাকিলেই যে তাহাতে ব্যাধি থাকিবেই এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ বহু সাধুপুরুষের পবিত্র দেহে ব্যাধির নাম গন্ধ পর্য্যন্ত থাকে না। অন্য পক্ষে অসাধুর দেহ মাত্রই ব্যাধিগ্রস্ত। বোধ হয় এইরূপ অসাধুর দেহকে লক্ষ্য করিয়াই এদেশের শাস্ত্রে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" বাক্যটীর অবতারণা করা হইয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দেহের সহিত আমাদের দেহের তুলনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের অপেক্ষা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অধিকতর নীরোগ ছিলেন, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ অপেক্ষা যে পরবর্ত্তী পুরুষ ক্রমেই রুগ্নতর হইতেছেন, এখনও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই দেখা যায় যে, সন্তানের পিতা তাহার পিতামহ অপেক্ষা অধিকতর রুগ্ন ও দুর্ব্বল, অথচ সেই পিতা নিজ সন্তান অপেক্ষা অধিকতর নীরোগ ও সবল। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, এদেশে এমন কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে, যাহার ফলে প্রত্যেক বংশের উল্লিখিতরূপ ক্ষয়কারী ব্যাধি উপস্থিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এহেন ব্যাধির মূল কারণ নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। জানিনা জগদম্বা আমাদিগকে তাদৃশী শক্তি প্রদান করিবেন কি না।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, এই সৃষ্টির মূলে এমন একজন কেহ বিরাজমান, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিচালনা করিতেছেন, এবং তাহার ফলে এই প্রাকৃতিক রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। যে অনাদি ও বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিরাজ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহ সৃষ্ট হইতেছে, সেই কর্ম্মের ফলভোক্তা পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা সেই সকল দেহকে আশ্রয় করিয়া আছেন। যতদিন না কর্ম্মক্ষয় হয়, ততদিনই জীবাত্মাগুলি সেই সকল দেহের দেহী হইয়া দেহযন্ত্রের সহায়তায় রূপরসাদি বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতেছেন এবং একমাত্র তত্বজ্ঞান লাভের ফলে কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাহাদের মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কর্ম্মত্যাগ করিতে পারা যায় না।

মোটের উপর দেখা যায় প্রকৃতি যেন এক মহাযন্ত্র এবং তাহার অন্তর্গত দেহগুলি হইতেছে ক্ষুদ্র যন্ত্র। প্রকৃতির ক্রিয়ায় কোন গোলযোগ অর্থাৎ ব্যাধি উপস্থিত হইলে, একমাত্র তাহার পরিচালক অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরই তন্নিবারণে সমর্থ হন। কিন্তু ক্ষুদ্র দেহ-যন্ত্রের ব্যাধি জীবের বা জীবাত্মার প্রযত্নের দ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি-যন্ত্রের অন্তর্গত যে বিশেষ দেহ দ্বিপদ ও দ্বিহস্তবিশিষ্ট, তাহাই মনুষ্যদেহমধ্যে পরিগণিত। জীবাত্মা এইরূপ দেহের সহায়তায় রূপরসাদি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করিতে গিয়া যেরূপে বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত হন, আমরা ক্রমেই তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

তবে এই প্রসঙ্গে আর একটী কথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক। কথা এই যে, দেহ ও দেহী যে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। অগ্নিদগ্ধ রক্তবর্ণ লৌহপিণ্ডের মধ্যে যেমন তাপ ও লৌহপিণ্ড উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, অথচ তাহারা এক পদার্থ বলিয়া প্রথমতঃ একটা ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়, তেমনি দেহী ও দেহের একত্র অবস্থানকালে একটা ভ্রম জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ভ্রান্তির কোন কারণ দেখা যায় না। দেহ ও দেহী যে পৃথক্ পদার্থ তাহা স্থূল চিন্তায় লোকের ধারণায় না আসিতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু অভিনিবেশ করিলেই বুঝা যায় যে, স্বয়ং দেহই যদি ভোক্তা হইত, তাহা হইলে দেহী তাহাকে ত্যাগ করিলেও তাহার ভোগশক্তি বিলুপ্ত হইত না; কারণ যাহা যাহার নিজস্ব, তাহা যতদিন তাহার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান্ থাকিয়া যাইবে। কিন্তু যাহা পরস্ব হইয়াও নিজস্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা তাহার নিজের অস্তিত্ব থাকিতে থাকিতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাই আমরা দেখি, যেই দেহী দেহ ত্যাগ করে, অমনি তাহার সেই পরিত্যক্ত শবদেহ তৎসহ সর্ব্বশক্তিবর্জ্জিত হয়, এবং তখন তাহা খণ্ডীকৃত কি ভস্মীভূত হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় কোনরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে না। তবেই দেখা যায়, যতদিন দেহী থাকে, ততদিনই দেহের মধ্যে ভোগের ক্রিয়া বিদ্যমান্ থাকে, আর দেহী চলিয়া গেলেই তাহা বিলুপ্ত হয়। অগ্নিদগ্ধ লৌহপিণ্ড তাপের প্রভাবে রক্তবর্ণ ধারণ করিলে তাহা ঐ পিণ্ডের ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া প্রথমতঃ মনে একটা ভ্রম জন্মে বটে, কিন্তু পিণ্ডের তাপ ক্রমশঃ কমিয়া উহার রক্তবর্ণ ঘুচিয়া গেলে, তাদৃশ ভ্রমের আর কোন অবকাশ থাকে না। তখন লৌহপিণ্ড ও তাপ যে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ দেহ ও দেহীকে একভাবে যথাক্রমে লৌহপিণ্ড ও তাপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কারণ দেহী যতক্ষণ দেহের সঙ্গলাভ করিয়া থাকে, ততক্ষণই তাহাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য হয় বটে, কিন্তু তাহা দেহী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দেহী ও দেহ যে পৃথক পদার্থ, তাহা প্রমাণ হইয়া থাকে। দেহীর সংযোগে দেহের যে অবস্থা থাকে, তাহার বিয়োগে তাহার সে অবস্থা দৃষ্ট হয় না। মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যুর পর সকলেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আবার সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছার সময় যখন দেহী আত্মশক্তি গুটাইয়া মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় বিরাজ করেন, তখনও দেহের দর্শন, স্পর্শন, গমন, পরিচালনাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব এক্ষণে ইহা বুঝা গেল যে, দেহ ও দেহী এই দুইই স্বতন্ত্র পদার্থ। সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝিবার বিষয়।

এইবার আমরা মূলবিষয় ব্যাধি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। ব্যাধি বলিলে সাধারণতঃ জ্বর, আমাশয়, শিরঃপীড়া, উদরাময় প্রভৃতি রোগ লক্ষণকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সকল লক্ষণ স্বয়ংই কোন ব্যাধি নহে, পরন্তু তাহারা ব্যাধির জ্ঞাপক মাত্র। এই জন্যই কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলিয়াছেন,—

Every disease manifests itself by symptoms more or less numerous. These symptoms are not the disease itself. They are danger signals, the red flag wafted in the medical breeze which shows the observer that some thing is wrong; that there is danger somewhere.

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যাধিই অল্পাধিক লক্ষণ দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। এই সকল লক্ষণ কথনও স্বয়ংই কোন ব্যাধি নহে, তাহার, বিপদ জ্ঞাপক নিদর্শন মাত্র; ঠিক যেন রক্তবর্ণ পতাকা উড্ডীন হইয়া চিকিৎসকের নিকট কোন অশুভ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে, যেন কোথাও কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, এই সকল লক্ষণদ্বারা ব্যাধির কোন স্বরূপই নির্ণীত হয় না। ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহার ধাত্বর্থ বুঝিতে হইবে, এবং পরে তাহার উপস্থিতির সময় দেহাভ্যন্তরে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার যথাযথ চিত্র অঙ্কন করা আবশ্যক। পীড়নার্থক ব্যধ্ ধাতু হইতে ব্যাধি পদটী নিষ্পন্ন। অতএব যাহা পীড়ন করে তাহারই নাম ব্যাধি। সুতরাং দেহী বা মনুষ্যের ব্যাধি বলিলে যাহা তাঁহাকে পীড়ন করে তাহাই বুঝাইয়া থাকে।

এই বার আমরা একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাধির ক্রিয়ার স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মনে করুন কলিদাস নামক একজন মনুষ্যের চক্ষুর ব্যাধি হইয়াছে। এক্ষণে ভিতরে কি ঘটনা ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে হইলে এই চক্ষুরিন্দ্রিয় পদটীর অর্থ বুঝিতে হইবে। চৈতন্য-বিশিষ্ট যে অসংখ্য সংস্কার বা শক্তি সমষ্টি কালিদাসের দেহযন্ত্রের যন্ত্রী, চক্ষুরিন্দ্রিয় বা দর্শন-শক্তি তাহারই অন্যতম। অক্ষিগোলক হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্নায়ু মস্তিষ্কের অন্তর্গত দর্শনশক্তির কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, চক্ষুরিন্দ্রিয় সেই স্নায়ু পথে যখন অবাধে যাতায়াত করিতে পারে, এবং তাহার ফলে দর্শনকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তখনই বলা হয় চক্ষুর কোন ব্যাধি বা পীড়া নাই। কিন্তু যেমন সেই দর্শনশক্তি স্নায়ুপথে কোন গোলযোগ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ তাহার স্বচ্ছন্দ গমনে বাধা প্রাপ্ত হয়, অমনই চক্ষুর ব্যাধি হইয়াছে এইরূপ বলা হয়। এইরূপ শুধু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কেন, মনুষ্যের আরও যে শক্তি বা সংস্কার আছে, তৎসমুদয়ের অবরোধকও বিভিন্ন ব্যাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত সংস্কার বা শক্তি প্রধানতঃ তিন জাতীয়। একজাতীয় শক্তি দেহের নির্ম্মাণ, পোষণ ও রক্ষণ ক্রিয়া সাধন করে। এই শক্তি প্রাণশক্তি বলিয়াই পরিচিত। ইহার ক্রিয়া সমগ্র দেহরাজ্যের উপর বিস্তৃত। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রাণশক্তির অধিকৃত দেহ রাজ্যকে Vegetative system বলিয়া থাকে। এই System বা শরীর বিধান পদ-নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রাণশক্তি এই বিধানের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহার পোষণ ও রক্ষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই শক্তির ক্রিয়ার বাধা উপস্থিত হইলে তাহার ব্যাধি হইয়াছে, এইরূপ উক্তির অবতারণা করা হয়।

দ্বিতীয় জাতীয় শক্তির নাম পরিচালন শক্তি। এই শক্তির ক্রিয়া সাধন জন্য দেহ মধ্যে অসংখ্য স্নায়ু গঠিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানশাস্ত্রমতে ঐ স্নায়ুবিধানের

নাম Motor nervons system পরিচালন শক্তি প্রাণশক্তির প্রদত্ত উপাদান দ্বারা এই স্নায়ুবিধান নির্ম্মাণপূর্ব্বক যতদিন তাহার নিজক্রিয়া সাধন করিতে পারে, ততদিন তাহা ব্যাধিশূন্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। কিন্তু যেমন স্নায়ুবিধানের কোনরূপ বিকৃতিনিবন্ধন তাহার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, অমনি তাহা ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত হয়।

তৃতীয় জাতীয় শক্তির নাম জ্ঞানশক্তি। যে সকল স্নায়ুর উপর দিয়া এই শক্তি চলাচল করে, তাহাদের সমষ্টির নাম জ্ঞানশক্তিবাহী স্নায়ুবিধান বা Sensory Nervous system। এই বিধান জ্ঞানশক্তির দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং প্রাণশক্তি পূর্ব্ববৎ তাহার নির্ম্মাণোপযোগী উপাদান প্রদান করে। পরে জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তির সহায়তায় এই নির্ম্মিত বিধানের রক্ষণ ও পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তদুপরি গতায়াতপূর্ব্বক নিজক্রিয়া সাধন করে, এবং তাহার ফলে বিবিধ জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, জ্ঞানশক্তি এই বিধানের উপর দিয়া চলাচল করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই তাহা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হয়।

আমরা যথাস্থানে উল্লিখিত ত্রিবিধ শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা করিব। এক্ষণে উপরে যাহা বলা হইল; তাহাতে পাঠক সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন যে, জীবের শক্তিরাশি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং এই তিন শ্রেণীর প্রত্যেক শক্তিই শরীর বিধানের (Physical system) উপর দিয়া চলাচল করিয়া থাকে। যতদিন এই শক্তি অবাধে শরীর বিধানের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, ততদিন তাহা ব্যাধিশূন্য, কিন্তু যেই শরীর-বিধান বিকারগ্রস্ত হইয়া তাহার স্বাধীন গমনাগমনে বাধা দিতে থাকে, অমনই জীব ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন এইরূপ বলা হয়।

এস্থলে আরও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জীবের শক্তিসমষ্টি তিন জাতীয় হইলেও তাহারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তাই দেখা যায়, একের কোনরূপ বিকারে, অপর শক্তির বিকার স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দেখিয়াছেন যে, জ্ঞানের বিকারে পরিচালনের, পরিচালনের বিকারে পোষণের, এবং পোষণের বিকারে জ্ঞানের বিকার অবশ্যম্ভাবী। এই ত্রিশক্তির আর একটী স্বাভাবিক গুণ এই যে, তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই কখন জ্ঞান, কখন পোষণ এবং কখনও বা পরিচালনশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং একের প্রাধান্যের সহিত অপর শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়ে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে কেবল দেহের যন্ত্রী বা জীব সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইল; কিন্তু যে দেহযন্ত্র বিকারগ্রস্ত হইয়া জীবের শক্তি পরিচালনে বাধা উপস্থিত করে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই বলা হয় নাই। আমরা যথাস্থানে এ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা করিব। তবে এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রাণশক্তি মাতৃগর্ভে দেহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা যে প্রকৃতির উপাদান প্রাপ্ত হয়, নির্ম্মিত দেহ সেই উপাদানেরই প্রকৃতি লাভ করে। এই উপাদান মাতৃদেহের রসরুধির ও বাহ্যপ্রকৃতির ভূতপদার্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। জীবের শক্তি যেমন জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ শক্তিমূলক, তাহার ক্রিয়াক্ষেত্র দেহও তদ্রূপ, বায়ু, পিত্ত ও কফমূলক। তাই দেহনির্ম্মাণ কালীন উপাদানানুসারে কাহারও দেহ কফপ্রধান, কাহারও পিত্তপ্রধান এবং কাহারও বা বায়ুপ্রধান হইয়া থাকে। দেহের প্রতিদিন যে ক্ষয় হয়, আহারাদি দ্বারা তাহার পূরণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব বিশেষ জ্ঞান ও সংযমানুসারেই আহার্য্যবস্তুর সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ অজ্ঞান-নির্ব্বাচিত আহার্য্যবস্তু দেহস্থ হইয়া দেহের বিকৃতি উপস্থিত করে, এবং তাহার ফলে দেহের বিভিন্ন যন্ত্র আর জীবের শক্তি পরিচালন করিতে পারে না। তখনই বলা হয় যে, জীব বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। ক্রি

সূচীপত্র।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার ষষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক-নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণকরিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ এসমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGISTERED No. C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণসমাজ

(মাসিক পত্র)

A Non-Political Hindu Religious & Social Magazine.

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।॰ আনা।

সন ১৩২৫ সাল।

অগ্রহায়ণ সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

Registered No. C—575.

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়"

বর্ষ। ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, অগ্রহায়ণ। তৃতীয় সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ।

সত্যযুগেরপ্রান্তে জ্বালিয়া জ্ঞানের দিব্য বাতি
ব্রাহ্মণ এই বিশ্বে দিয়াছে ব্রহ্মবিদ্যাভাতি।
জাতিও কুলের সদৃশ যাহার স্বাধ্যায় ব্রত জপ,
অনাদি কালের গহ্বর হ'তে ধ্বনিত যাহার তপঃ
আত্ম-গরিমা মাখান যাহার অসীম হৃদয়বল—
নিরয়-নিকর অন্তর মাঝে উদিত করেনা ছল,
অপমান সদা হ'য়ে অমানিত দূরে দূরে যার রহে-
হর্ষ ও ভয় তিরোহিত যায়, ব্রাহ্মণ তারে কহে।

মুক্ত বিশদ গগনের মত শব্দ-বিহীন প্রাণ,
শান্ত শ্যামল মনোমোহিত তপোবন যার স্থান,
[illegible]
[illegible]
[illegible] যাদের শাক ও সবজি [illegible] চিরদিন

যাহানিবারিত আহুতি যাহার ত্রিদিব করেগো হীন,
কর্ম্মের স্বচ্ছ প্রবাহে যাহার ধর্ম্মের ধারা বহে
আলস্যবিহীন কর্ম্মের তরে, ব্রাহ্মণ তারে কহে।
চন্দনচয় ভস্মলেপিত অঙ্কিত চেতনায়
চিহ্ন উজ্জ্বল নিখিল অঙ্গে মস্তক হ'তে পায়,
সন্তোষ যার অন্নের মাঝে হৃদয় তৃপ্তিময়
পিছনে যাহার পাপের ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ ধর্ম্ম বয়।
রাজা ও প্রজার মস্তক যার চরণের তলে লোটে
কান্ত কোমল হৃদয় ছাপিয়া ভক্তির ধারা ছোটে।
উজ্জ্বল অগ্নিপরীক্ষা যার কীর্ত্তিবিনাশী নহে—
সেই ত' ভূদেব ভুবন ভিতরে ব্রাহ্মণ তারে কহে।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

হিন্দু অদৃষ্ট বিশ্বাস করেন, ইংরেজ পুরুষকারের পক্ষপাতী। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া "ন যযৌ ন তস্থৌ" না অদৃষ্টবিশ্বাসী, না পুরুষকারপরায়ণ; দুই নৌকায় পা দিয়া সংশয়-হ্রদে নিমজ্জিত। মনে করি হিন্দু কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ইংরেজ আয়ত্তাতীত অত্যুচ্চ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। আর আমরা ইতিকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় হরিশ্চন্দ্রবৎ শূন্যে অবস্থিত। হিন্দু জ্ঞানমার্গের পথিক। তাঁহারা ভগবানকেই একমাত্র প্রাপ্তব্য জ্ঞানে বিষয়কে তুচ্ছ মনে করেন। তাহা ভাল বা যুক্তিসঙ্গত বোধ না হওয়ায় আমরা তাহা ছাড়িয়া দিলাম। ইংরেজ পুরুষকারপরায়ণ। তাঁহারা বিষয়কেই উপাস্য জ্ঞানে কর্ম্মবীর সাজিয়া তদুপাসনায় জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম এবং জগতে উৎকর্ষ লাভের আশায় তাঁহাদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু আশা সফল হইল না। ফল বিপরীতভাবে বিকাশ পাইল।

সেবাবৃত্তির্ন্নয়তি মহত্তাং কর্ম্মণো বো বিপাকঃ।

কর্ম্মফলে আমরা কেবল দাসত্ব মাত্রই শিক্ষা করিলাম, মহত্ব কিছুই লাভ করিতে পারিলাম না। আপনার ধনরত্ন যাহা কিছু ছিল, সমস্তই পরের হাতে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ দরিদ্র হইয়া পড়িলাম। যে গুণে অনেক পাশ্চাত্য জাতি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহার কিছুই লাভ করিতে না পারিয়া একবারে সর্ব্বহারা হইলাম।

ভগবদ্বিশ্বাস প্রায় তিরোহিত, বৈষয়িক অবস্থা যার-পর-নাই শোচনীয়। অশন, বসন, চলন, লিখন সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। নিজের বলিতে প্রায় কিছুই নাই, নিজ পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই। পরের জিনিস পরমাহ্লাদে ব্যবহার করি, পরের গুণ কীর্ত্তনে জীবন সার্থক মনে করি। পিতৃপুরুষগণের নিন্দায় মুক্তকণ্ঠ, সমাজে উচ্ছৃঙ্খল, জাতীয়তা নষ্টকরণে উৎসাহান্বিত, কুপ্রবৃত্তি ও হীনপ্রবৃত্তি-পরায়ণ, সদনুষ্ঠানবিমুখ। ফলতঃ, অধঃপতিত জাতিকে যে সকল দোষ আশ্রয় করে, আমাদিগের তাহার কিছুরই অভাব নাই। অথচ মনে মনে অহঙ্কার আমরা বড়ই বুদ্ধিমান, বড়ই জ্ঞানবান। কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকায় যে মলিনতা ছিল, পাশ্চাত্যসংস্রবে তাহা অপনীত হইয়া আমরা যেন কি একটা অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছি বলিয়া বিকৃত বিশ্বাস।

সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক অদৃষ্ট ও পুরুষকার কি? অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া হিন্দুই বা কি প্রকারে এক সময়ে জগতের আদর্শ হইয়াছিলেন, পুরুষকারই বা কি প্রকারে বর্ত্তমান সুপ্রতিষ্ঠিত জাতিবর্গকে এরূপ উৎকর্ষ প্রদান করিল এবং আমরাই বা কেন এরূপ ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ হইয়া সাগ্রহে ও মহোৎসাহে রসাতলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জগৎ বৈষম্যময়। ঈশ্বর ন্যায়বান্। তাঁহার দয়া ও স্নেহ সকলের প্রতিই সমান। পাশ্চাত্য জাতি বলেন—কুম্ভকার একই মৃত্তিকা দ্বারা ভালমন্দ অনেক প্রকার পদার্থ নানা প্রয়োজন সাধনার্থে প্রস্তুত করে। প্রস্তুত পদার্থের ইতরবিশেষের জন্য যেমন কুম্ভকারকে পক্ষপাতী অর্থাৎ দ্রব্যবিশেষের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহপরায়ণ বলা যায় না, সেইরূপ সৃষ্টিবৈষম্যের নিমিত্তও আমরা ঈশ্বরের ন্যায়পরতা ও সর্ব্বজীবে সমদর্শিতায় দোষারোপ করিতে পারি না। হিন্দুমত অন্য প্রকার। তাঁহাদিগের মতে সৃষ্টির প্রথমে সকলেই সমান ছিল, কর্ম্মফলে বৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছে—

> ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
> ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্বর্ণতাং গতং॥

সংসার ব্রহ্মময়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত সংসারে কিছুই নাই। সকলই ব্রহ্মের বিবর্ত্তন।

> ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
> ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

কৌতুকপ্রিয় লীলাময় ভগবান নিজ দেহ হইতে তাঁহার লীলাক্ষেত্র সংসার রচনা করিয়া, তাহাতে তাঁহার চিদাংশভূত জীব সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে মোহে সমাচ্ছাদিত রাখিয়াছেন। মোহ বা মহামায়ার প্রভাবে জীবের আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে আর আপনাকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া চিনিতে পারিল না। মোহকল্পিত আত্মাভিমানপরায়ণ হইয়া আপনাকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল। জীবের আত্মাভিমানের নামই পুরুষকার।

নাদত্তে কস্য চিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

জীব আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা পাপপুণ্যাত্মক। উহা জীবের কর্ম্ম। জীবই উহার ফলভোগী। পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ। এই কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত জীব অনন্তকাল জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া নানা বেশে সংসারে গতায়াত করে। সংসারের যত কিছু বৈষম্য সমস্তই জীবের আত্মকর্ম্মফল। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জীবময় সংসার জীবের কর্ম্মফলে বিগঠিত। স্বর্গের দেবতা, মর্ত্ত্যের মনুষ্য, পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সমস্তই জীবের কর্ম্মফল। কর্ম্ম ফলে কেহ দেবতা, কেহ মনুষ্য, কেহ পশু, কেহ পক্ষী, কেহ বৃক্ষ, কেহ লতা, কেহ মৃত্তিকা, কেহ প্রস্তর ইত্যাদি অসংখ্য আকারে জগতে বিকাশমান। জাগতিক এই মায়াময় বৈষম্যের নামই "কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং"। সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর স্বয়ং বিবর্ত্তিত হইয়া যে সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না, পরে কর্ম্মানুসারে জীব অসংখ্য প্রকার বর্ণতা বা পার্থক্য লাভ করিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যেও বর্ণবিভাগ এইরূপ কর্ম্মফলমূলক। ন্যায়বান্ ঈশ্বর কর্ম্মানুসারে মনুষ্যদিগকে বিভিন্ন কর্ম্ম করার নিমিত্ত বিভিন্ন বর্ণাশ্রিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ণবিভাগ মনুষ্যকৃত নহে, উহা ভগবানের নিয়তি। তজ্জন্যই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন —

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

* * * * *

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপঃ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

এক জন্মের কর্ম্মফল পরজন্মের স্বভাবস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণাদিবর্ণে পরিণত হইয়াছে।

এস্থলে হয় তো এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে,—হিন্দু অসংখ্য বর্ণে বিভক্ত, তন্মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণাদি চারিটিমাত্র বর্ণের উল্লেখ কেন?—বর্ণবিভাগ যদি ঈশ্বরকৃত, তবে হিন্দুভিন্ন অন্য কোন জাতির মধ্যে বর্ণবিভাগ দেখা যায় না কেন?

তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু অসংখ্য বর্ণাশ্রমে বিভক্ত হইলেও তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণাদি চারিটি মহাবর্ণের অন্তর্গত। কর্ম্মবিভাগ ও বর্ণবিভাগ একই কথা। কর্ম্মবিভাগ ব্যতীত মনুষ্যের বৈষয়িক উৎকর্ষ কোন ক্রমেই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম বিহিত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা আছে, তদ্ব্যতীত কোন প্রকার সভ্যসমাজই গঠিত হইতে পারেনা। সুতরাং বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হউক বা না হউক, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সকল সমাজেই আছে; হিন্দুর মধ্যে প্রকট, অন্য সকলের মধ্যে অপ্রকট, এইমাত্র পার্থক্য।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলই লোকের স্বভাব এবং স্বভাবই অদৃষ্ট। ঈশ্বর যে কর্ম্মফলভোগার্থ জীবকে সংসারে প্রেরণ করেন, তাহাই তাহার স্বভাব বা অদৃষ্ট এবং মোহাভিভূত জীব আপনাকে কর্ত্তা-জ্ঞানে ফলপ্রত্যাশী হইয়া যেসকল কর্ম্ম করে, তাহাই তাহার পুরুষকার। অদৃষ্টের কর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর, জীব তাহার নৈমিত্তিক কারণ মাত্র। জীব তাহার অদৃষ্টায়ত্ত শুভাশুভ ফলভোগে বাধ্য, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জীবকে তাহার অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোন ক্রমেই কর্ম্মফল এড়াইতে পারিবে না। মোহ-মুগ্ধ জীব পুরুষকারের কর্ত্তা। জীবের হৃদিস্থিত বিবেকরূপী ঈশ্বর তাহার উপদেষ্টা মাত্র। ইংরেজ এই বিবেককে Conscience বলেন। বিবেকের উপদেশ মতে পুরুষকার-পরায়ণ যেসকল কর্ম্ম করে, তাহা সৎকর্ম্ম বা পুণ্য; উহা প্রশংসিত এবং ঐহিক বা পারত্রিক সুখ উহার ফল। বিবেকবিমথিত করিয়া যাহা করা যায়, তাহা অসৎ বা পাপ, সুতরাং নিন্দিত; ঐহিক বা পারত্রিক দুঃখ তাহার পরিণাম। ইহজন্মে যে কর্ম্মফল বিকাশ পায় না, তাহা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয় এবং পরজন্মে তাহা ভোগ করিতে হয়। অদৃষ্টায়ত্ত ফল পাপপুণ্যের অতীত। স্থূল-দৃষ্টিতে তাহা যেরূপই বোধ হউক না কেন, অদৃষ্টভোগে পাপপুণ্য কিছুই হয় না। কিন্তু লোক আত্মকর্তৃত্ব অঙ্গীকৃত করিয়া কার্য্যভাবে অদৃষ্টায়ত্ত শুভাশুভ ভোগ উপভোগ করিলে, অদৃষ্টায়ত্ত ফলও পাপ-পুণ্যাত্মক হয়। কিন্তু ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি তাঁহার আদেশ-পালক ভৃত্য মাত্র, এইরূপ জ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া কেবল মাত্র কর্ত্তব্যবোধে নিষ্কামভাবে স্বাভাবিক কর্ম্ম করিলে, তাহার পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না। এই অদৃষ্ট বা স্বভাব-প্রণোদিত কর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলে।

স্বাভাবিক কর্ম্মে ও আত্মকর্তৃত্ব অঙ্গীকৃত করিলে যে উহা পাপ বা পুণ্যাত্মক হয় এবং কর্ম্মীকে যে তজ্জন্য তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়, নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা গীতায় তাহা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥
অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥

আবার ঈশ্বরকে কর্ত্তা এবং আপনাকে তাঁহার আদেশপালক ভৃত্যজ্ঞানে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে পাপপুণ্য কিছুই হয় না; সুতরাং শুভাশুভ কর্ম্মফলভোগ করিতে হয় না, গীতায় তাহাও কীর্ত্তিত হইয়াছে—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

পুরুষকারের ফল ঐহিক ভোগ। বর্ণাধিকার তাহার চরমোৎকর্ষ। উহা সংসারে আবদ্ধ-কারক। পুরুষকারপরায়ণ কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত

তাঁহাকে অনন্তকাল সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অদৃষ্টবাদীর কর্ম্মফল নাই, সুতরাং তদ্ভোগার্থে তাহাকে সংসারে আবদ্ধও থাকিতে হয় না, সে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হয়। পুরুষকারলব্ধ যাবতীয় সুখ অদৃষ্টবাদীর ভোগায়ত্ত; কিন্তু মিথ্যাভূত, দুঃখসংলিপ্ত ও অচিরস্থায়ী জন্য অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অদৃষ্টবাদী উহা উপেক্ষা করে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল যে ব্রহ্মের একাংশ মাত্র, যিনি সেই পরব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন, সর্ব্ববিধ কাম্য ফল যে তাঁহার করায়ত্ত, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না। হিন্দু তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল বলিয়াই জগতের আদর্শ হইয়াছিল। এখনও প্রাচীন হিন্দুই সর্ব্বজগতের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি প্রাচীন, কি আধুনিক সমস্ত সভ্যসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির গূঢ় মর্ম্মদেশে এখনও হিন্দুআদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক পল্লবগ্রাহীর বিশ্বাস—প্রাচীন হিন্দু কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতিই করিয়াছিলেন, ঔদাসীন্যবশতঃ বৈষয়িক উন্নতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি বৈষয়িক উৎকর্ষেও অতুলনীয় হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ, রাবণ কর্ত্তৃক সমুদ্র পার হইতে সীতাহরণ, কালনেমির সুবর্ণ-মৃগরূপে প্রতারণা, ইন্দ্রজিতের আকাশযুদ্ধ, রাবণের মহীরাবণ-স্মরণ, রাক্ষসী মায়া, সমুদ্র-বন্ধন, রামের শূন্যগামী পুষ্পক রথ, লক্ষ্মণের অদৃশ্যভাবে রাবণ-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ বধ, হস্তিনা হইতে সঞ্জয় কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষীকরণ; অগ্নিবাণ, বায়ব্যাস্ত্র, বরুণাস্ত্র, সম্মোহন বাণ প্রভৃতি যেসকল অলৌকিক পৌরাণিক বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আধুনিক বা প্রাচীন অন্য কোন জাতিতে বিজ্ঞানের তেমন উৎকর্ষ দেখা যায় না। উহা কবির কল্পনা বলা যাইতে পারে না, কেননা কল্পিত ঘটনা এত দীর্ঘকাল পরমপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক কোন ক্রমেই সত্য বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে না। কল্পনাও সম্যকভাবে অমূলক হয় না। যাহা সর্ব্বসম্মত, কবি তাহাই কল্পনাবশে সংযোগ করেন। লোকে যাহা অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারে, তৎসংযোগে কবিত্বের সম্মান থাকে না। যাহা অযথার্থ, অথচ সম্ভব, তাহাই কবিকল্পনা বলিয়া কথিত। শ্রোতা বা পাঠক যাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারেন, তেমন কল্পনায় কবি সম্মানার্হ হন না। পূর্ব্বে লোক কামচর ও কামরূপী হইতে পারিত, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র যে কোন স্থানে যাইতে এবং যথেচ্ছ রূপ ধারণ করিতে পারিত। যোগবলে লোকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইতে পারিত। পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রে তদুপায় বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যদি কাহারও শক্তি থাকে, তবে তিনি অনায়াসে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আর্য্যগণের মধ্যে অনেকেই বাক্‌সিদ্ধ

ছিলেন, তাঁহারা যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাকে তাহাই করিতে অথবা রূপান্তরিত হইতে হইত। এই মহাশক্তি যে কেবল যোগী ঋষিগণই লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; অধিকারানুসারে সমস্ত হিন্দুতে নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান বিকীর্ণ হইয়াছিল। এখন আর্য্যাণেরা যে সকল বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ প্রদর্শন দ্বারা জগৎ স্তম্ভিত করিতেছে, অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের তজ্জ্ঞান থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখন আর সে হিন্দু নাই। আমাদিগের এখন ঘোর অবসাদ উপস্থিত, তজ্জন্য আমরা পৈতৃক জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্তই খোয়াইয়া প্রায় সর্ব্বাঙ্গীণ পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ এখন আমাদিগের নিকট কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। বিদেশীয় জাতি বিজ্ঞানবলে তাদৃশ কিছু আবিষ্কার করিলে, পৌরাণিক অলৌকিক কার্য্য কতক পরিমাণে সম্ভব মনে করি বটে, কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সংস্থাপন করিতে পারি না।

মঙ্গলময় ঈশ্বর অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ই আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন। অদৃষ্টকে কেন্দ্র করিয়া পুরুষকারকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া কর্ম্মবৃত্ত অঙ্কিত করিলে তাহা পরম উপাদেয় হয়, কিন্তু কুবুদ্ধিবশতঃ আমরা তাহা না করিয়া ভগবদ্দত্ত গুণের অপব্যবহার করায় ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ হইয়া অধোগতি লাভ করি। ভোগ-তৃষ্ণান্ধ কলিতে অদৃষ্টাপেক্ষা পুরুষকারই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এ নিমিত্ত যাহারা পুরুষকারই অবলম্বনীয় জ্ঞানে সংসারে বৈষয়িক উৎকর্ষানুসন্ধী, তাহারাই প্রশংসিত। অদৃষ্টের ভোগ কেহই পরিহার করিতে পারে না, এ নিমিত্ত যাহারা পূর্ণমাত্রায় পুরুষকারের পক্ষপাতী, তাহাদিগকেও অদৃষ্ট ফলভোগ করিতে হয়। হিন্দু যতকাল অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সামঞ্জস্য রাখিয়া সংসাররঙ্গে বিচরণ করিতেছিলেন, ততকাল তিনি জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। কালে পুরুষকারের প্রতি অনুচিত উপেক্ষা প্রদর্শনে ও বিকৃতভাবে অদৃষ্টানুবর্ত্তনে হিন্দু নষ্টগৌরব হইয়াও কতক পরিমাণে বহুমানাস্পদ থাকেন। এখন অদৃষ্টে ঘোর অবিশ্বাস এবং পুরুষকারেও শোচনীয় অনধিকারহেতু বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যজগতে প্রায় নগণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে পিতৃপুরুষগণের যেরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, তাহাও নাই। কর্ম্মবীর জাতিবর্গ যেরূপ পুরুষকারের সম্মান রক্ষা করেন, আমরা তাহাও পারি না। কাজেই আমরা উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতাই লাভ করিতেছি, উৎকর্ষ কিছুই জন্মিতে পারিতেছে না।

শ্রীরাধেশচন্দ্র সান্যাল।

সুখের কামনা।

কেন এই হাহাকার? অস্ত্রের ঝণঝণা, বজ্রনির্ঘোষে মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জ্জন, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রাণিহত্যার মহাশ্মশান, অগ্নিতে পতঙ্গরাজিসদৃশ আজ পৃথিবীর লোক ইয়ুরোপের কালসমরানলে ঝাঁপ দিতেছে কেন? জার্ম্মাণ-সম্রাটের কিসের অভাব ছিল? কেন তিনি পুত্রসম লক্ষ লক্ষ প্রজাকে সমরানলে আহুতি প্রদান করিতেছেন? নন্দনকাননপ্রতিম ইয়ুরোপের শত শত উদ্যান, বৈজয়ন্তধামকল্প কত প্রাসাদ, কত সুন্দর নগর, উদ্যান, কুসুম-সম কত নরনারী ভগ্ন, বিধ্বস্ত, দগ্ধ ও মৃত হইয়া অণুপরমাণুতে মিশিতেছে। চারি বৎসর যাবৎ বর্ষার বারিধারা, শীতের তুষার, ও অনিদ্রা অনাহার তুচ্ছ করিয়া আশ্রয়খাতে, জলের নিম্নে (সবমেরিণে), আকাশে (ব্যোমযানে) অবস্থিত থাকিয়া কোটী কোটী নরনারী প্রাণিহত্যায় কৃতসংকল্প কেন? কালানলের ন্যায় ইয়ুরোপের সমরানলের উত্তাপে আজ সমগ্র জগতের লোক উত্তাপিত, পৃথিবীময় হাহাকার, সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের সূচনা, অন্নবস্ত্রের মহাসমস্যা, জীবনের মহাচিন্তা—মহাত্রাস। অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর সম্রাটকুলের মুকুটমণি রুষজার রাজ্যচ্যুত, বন্দী ও হত হইলেন কেন? বলিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাঁহার অপত্যসম প্রজাগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াও ক্ষান্ত নয়, সম্রাট-পত্নী, এমন কি তাহার পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া পৃথিবীর ইতিহাস হইতে রুষ-রাজবংশের নাম পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে যত্নতৎপর। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল কেন? বেলজিয়ম্, সার্ব্বিয়া, মণ্টেনিগ্র, রোমানিয়া প্রভৃতি রাজ্যের বর্ত্তমান মানচিত্র কত পরিবর্ত্তিত, কত শোকাবহ, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। এই সোণার রাজ্যগুলি ছারখার হইল কেন? এতগুলি "কেন"র উত্তর কেবল "সুখের কামনা"। এত অঘটন ঘটনার কারণ একমাত্র সুখের কামনা। মানুষ চায় সুখ, জাগতিক জীবনিবহ একমাত্র সুখের জন্যই লালায়িত। কেহ সুখের স্বরূপ জানিয়া সুখানুসন্ধিৎসু এবং শতকরা নিরানব্বই জনই সুখের স্বরূপ না জানিয়া, মৃগমদগন্ধমুগ্ধ মৃগকুলের ন্যায় ইতস্ততঃ চারিদিকে সুখান্বেষণে ছুটাছুটি করিতেছে।

সুখের কামনায় মানুষ রত্নাকরের অতল জলে ঝাঁপ দিয়া রত্নাহরণ করিতেছে, পৃথিবীর ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া স্বর্ণাদির আকর আবিষ্কার করিতেছে। সুখের প্রবল কামনায়ই জার্ম্মাণ-সম্রাট এই সমরনাট্যের প্রধান অভিনেতা। সুখের কামনায়ই পৃথিবীর মানবগণ এই নরমেধ-যজ্ঞের সমিধরূপে দগ্ধ হইতেছে। মুসলমান [illegible] যুদ্ধক্ষেত্রে চান সুখ, আমাদের [illegible] যুদ্ধ করিয়া স্বর্গাদি লাভে সুখ। এই মহাসমর সুখের [illegible]।

জগতে মানুষ যাহা করে, কেবল সুখের কামনায়। তুমি সুখের জন্য সুগন্ধ যুঁই ও বেল ফুলের মালা পরিতেছ, মালী নিজে তাহা ব্যবহার না করিলেও তাহার সুখের জন্যই সে এই মালা গাঁথিয়াছে। তুমি সুখের জন্য চন্দন মাখিতেছ, একমাত্র তাহার নিজ সুখের জন্যই ঐ শ্রমজীবী সর্পভীতি তুচ্ছ করিয়া অরণ্য হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এই চন্দন তোমার জন্য লইয়া আসিয়াছে। সুখের জন্য তুমি শিবিকারূঢ়, এবং তোমার বাহক তাহার নিজ সুখের কামনায়ই নিদাঘের প্রখর তপনতাপে তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

হিমালয়ের সানুপ্রদেশে ঐ যে ঋষি ধ্যানমগ্ন, ঐ যে পুষ্করের পর্ব্বতকন্দরে চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পঞ্চতপা কঠোর তপস্যায় সমাসীন, তিনিওও সাত্ত্বিক সুখের অনুসরণ করেন, আর ঐ যে কাশীর দশাশ্বমেধঘাটে ভস্মমণ্ডিত জটাধারী সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বস্ব-ত্যাগের ভাণ করিয়াও গাঁজার কলিকা লইয়া পরস্পর ঝগড়া মারামারি রক্তারক্তি করিতেছে, ইহারাও চায় সুখ।

ঐ যে ষড়দর্শনাভিজ্ঞ পণ্ডিত, ইনিও সুখের কামনায়ই অব্যবস্থায় কুব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিতেছেন, সুখের—কামনায়ই ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ বৃত্তিবিচারশূন্য। ঐ কামনায়ই আহিতুণ্ডিক সর্পবিবরে হস্ত প্রদান করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে যে ভালমন্দ যাহা কিছু করে, সমস্তই সুখের কামনায়। মরুমরীচিকায় ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় জীবকুল সংসারমরুভূমিতে সুখের কামনায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে।

এই বহুবিধ সুখকামীর মধ্যে পণ্ডিত নির্দ্দিষ্ট আহার অনুসরণ করিয়া সাত্ত্বিক সুখের জন্য অগ্রসর, আর সাধারণ জনগণ কামনার প্রবল তাড়নায় বিচার-বুদ্ধিবিহীন হইয়া সুখের জন্য ধাবমান, সুতরাং সুখের কামনা লইয়া সকলেই ব্যগ্র। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি? কিরূপ সাধনাদ্বারা ইহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার বিচার করিবার উপযুক্ত অবসর ইহাঁদের প্রায় ঘটে না। মানবকুলের মঙ্গলের জন্য আর্য্যশাস্ত্র সকল উপায়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্র বলেন—জগতে কামনার উচ্ছেদসাধনই সাধনা, আর ঐ সাধনাই প্রকৃত সুখলাভের উপায়। এই কামনা আত্মতত্ত্ববিকাশপক্ষে অন্ধকার যামিনী; রাগ-দ্বেষাদি খেচরগণ এই যামিনীতেই জীবাকাশে বিহার করিয়া থাকে। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রগর্ভ আলোড়ন করিয়া আবর্ত্তের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ কামনা মনের বিক্ষোভ সম্পাদন করিয়া আন্তরিক ভ্রম উৎপাদন করে। তৃষাতুর চাতক 'ফটিকজল' রবে আকাশে উত্থিত হয়, কিন্তু পিপাসায় অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, কোথায় উড়িয়া যায়। তদ্রূপ চিত্ত ধর্ম্মার্জ্জনে উদ্যত হইলেও পাপরূপিণী কামনায় স্থানান্তরে নীত হয়। জালবদ্ধ পক্ষিগণের মত কামনাপীড়িত জীব-কুল সংসারজালে আবদ্ধ হয়; কামনা-অপ্রাপ্য বস্তুতেও আসক্ত হয়, অভাব না থাকিলেও

বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে এবং অনেকক্ষণ এক বস্তুতেই আসক্ত থাকে না, নানা বস্তু তাহার অবলম্বন। এই কামনা ক্ষণে আকাশ, ক্ষণে পাতাল এবং ক্ষণে দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া থাকে। সকল সংসারদোষের মধ্যে একমাত্র কামনাই চির দুঃখ প্রদান করে।

রামধনুঃ আকাশে মেঘের মধ্যে কত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নানা বর্ণ কত মনোহর, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জলকণা ও সূর্য্যতেজঃ ভিন্ন উহাতে আর কিছুই নাই। বিষয়-ভেদে কামনা কত প্রকার এবং কত বড়, অথচ কিছুই নহে—অস্তিত্বহীন পদার্থ। এই কামনা অজ্ঞানের অসার মনে জন্মিয়া থাকে।

কামনাই মোহরূপ মত্তমাতঙ্গকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কামনা আকাশের ন্যায় অনন্ত অসীম, আকাশে যেমন কখন আলোক, কখন অন্ধকার, কখন প্রখর উত্তাপ এবং কখন হিমানী, সেইরূপ মোহাত্মক সুখ ও দুঃখ কামনার সাধর্ম্ম্য। কামনা যতদিন নিবৃত্ত না হয়, ততদিন সংসারী পুরুষ অধ্যাত্মশাস্ত্রে মূক, ব্যাকুলচিত্ত ও মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। মৎস্য যেমন পাষাণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি সকল জিনিষকেই আমিষভ্রমে গ্রহণ করিয়া বড়িশবিদ্ধ হয়, কামনাগ্রস্ত ব্যক্তিও তদ্রূপ, অর্থাৎ সকলবিষয়েই তাহার আসক্তি থাকে। শরীরাদি জড়পদার্থে চৈতন্য বুদ্ধিরূপ-গ্রন্থি কামনাতে আছে। এই কামনা নিখিলভুবনস্থ যাবতীয় ভোগ্যবিষয়ে আবদ্ধ রহিয়াছে। মরীচিকায় ভ্রান্ত পথিক জলভ্রমে যেমন মরুভূমির চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, এবং কোথায়ও জল প্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটী করে, তদ্রূপ সংসারমরুভূমিতে সুখপিপাসু ভ্রান্তজীব সকল বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা সুখের অনুসন্ধানে অন্যান্য বিষয়ের দিকে ছুটাছুটী করে।

কোথায় সুখ, কি সুখ এবং কি করিলে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া সুখের অনুসন্ধান কয়জন করিয়া থাকে? অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্যভেদ সম্ভবপর হয় না।

কোথায় সুখ তাহা অগ্রে দেখা উচিত। আপাতরম্য যে সমুদয় বিষয়সুখের আশায় তুমি ব্যাকুল, তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ কি? জার্ম্মাণ-সম্রাট যে ইয়ুরোপের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের জন্য জগতের ধন-প্রাণ নাশে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সেই সাম্রাজ্য পাইলে তাহার রাজ্য-কামনা যাইত কি? তখন সমগ্র পৃথিবীগ্রাসের প্রবল কামনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। তুমি দরিদ্র, একলক্ষ টাকা ও কাশীর গঙ্গার উপরে একখানা দ্বিতল বাটী পাইলেই নিজকে সুখী করিতে পারিবে বলিয়া ঐ লক্ষটাকাও বাটীর জন্য শত অকার্য্য কুকার্য্য করিতেও কৃতসংকল্প হইয়াছ, কিন্তু অগ্রে চিন্তা করিয়া দেখ—যাহাদের একলক্ষ টাকা এবং গঙ্গার উপরে বাটী আছে, তাহাদের কামনা মিটিয়াছে কি না। যদি অনুসন্ধান কর, তবে দেখিতে পাইবে তাহাদের কামনা আরও বলবতী। যাহারা নিত্য নূতন ভাবে নানা বিষয় ভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে

বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ তুষ্ট নয়, তাহারা সুখের কামনায় কেবল নূতন খুঁজিতেছে, অথচ কোন নূতনেই কামনা মিটিতেছে না। তবে ত বেশ বুঝা যাইতেছে কোন বিষয়-প্রাপ্তিতেই সুখ নাই, উপভোগে কোন কামনারই শান্তির উপায় নাই, বরং অগ্নিতে মৃতাহুতির ন্যায় উপভোগে কামনানল বৃদ্ধিই পায়। বিষয়সুখপিপাসুগণ আমরণ প্রত্যহ শত শত আশাপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া কেবল বিষয়ের অনুসন্ধান করে, অথচ কোন বিষয়-ভোগেই সুখের পিপাসা মিটে না।

বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং যাহা আত্মমোহকর, বিষয়-সেবীর নিকট অমৃতোপম হইলেও পরিণামে কষ্টদায়ক বলিয়া তাহা প্রকৃত সুখ নহে। যে সুখে বিষয়সুখের ন্যায় পরিণামে কোন দুঃখের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যে সুখ লাভ করিতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হয়, যে সুখ অভ্যাসবৈরাগ্য ও সমাধির অনুষ্ঠানাদি বহু আয়াসসাধ্য উপায়দ্বারা লাভ হয় এবং যাহা কষ্টসাধ্য উপায়ে আয়ত্ত হইলেও পরিণামে অমৃতোপম, যাহা আত্মতত্ত্ববিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতায় উৎপন্ন হয়, সেই (সাত্ত্বিক) সুখই প্রকৃত সুখ।

আকাশে রাকাশশী উদিত হইলেও পঙ্কিল জলে যেমন তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না, তদ্রূপ অজ্ঞানাভিভূত চিত্তে আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দানুভূতি হয় না।

অন্তঃকরণের তিনপ্রকার বৃত্তি—শান্ত, ঘোর এবং মূঢ়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য প্রভৃতি শান্তবৃত্তি; বিষয়তৃষ্ণা, স্নেহ, অনুরাগ, লোভ ইত্যাদি বৃত্তির নাম ঘোর বৃত্তি এবং মোহ, ভয়, আলস্য প্রভৃতিকে মূঢ় বৃত্তি বলা হয়।

এই ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়, আর কেবল শান্তবৃত্তিতে চৈতন্য ও সুখ উভয়ই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

যেমন স্বচ্ছজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে অস্পষ্ট এবং নির্ম্মলজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে বিস্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ মালিন্যপ্রযুক্ত ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে সুখাংশ তিরোভূত হয়, আর ঈষৎ নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত চৈতন্য মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃষ্ট নির্ম্মলতাহেতু শান্তবৃত্তিতে সুখ ও চৈতন্য উভয়ই প্রতিবিম্বিত হয়।

গৃহক্ষেত্র বা ধনাদি বিষয়ে যে কামনা হয়, তাহা রজোগুণবিকার, সেই সেই বিষয় সিদ্ধ হয় কিনা এই আশঙ্কায় দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং সেই সেই বিষয় অসিদ্ধ হইলে তাহাতে দুঃখের বৃদ্ধি হয়। যে বাধায় কাম্যলাভে ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ বা দ্বেষ উপস্থিত হয়, তাহাও সুখপ্রতিবন্ধক। যদি বাধা পরিহার করিতে সামর্থ্য না হয়, তবে তাহাতে বিষাদ উপস্থিত হয়। সেই বিষাদ তমোগুণবিকার। ক্রোধাদিতে মহদ্ দুঃখ হয়, তাহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই। ধনাদি কাম্য বিষয় লাভ হইলেও, ভোগে ক্ষয়, রক্ষণে কষ্ট, প্রতিপক্ষে দ্বেষ এবং অপায় চিন্তা প্রভৃতি নিবন্ধন দুঃখ হয়। সমুদয় বিষয়ভোগে যে বিরক্তি, তাহাতে মহৎসুখ উপজাত হয়।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য সুখপ্রাপ্তির উপায়। ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয়দোষ দর্শনরূপ বৈরাগ্য ও তাহার অভ্যাস (নৈরন্তর্য্য) দ্বারা সেই ভাবকে দৃঢ় করিতে হয়। যোগপথ অবলম্বন করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বিনী বুদ্ধিদ্বারা ক্রমশঃ বিষয় হইতে মনকে উপরত করিবে, অন্য বিষয় চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে দোষদর্শনদ্বারা বিষয় হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া আত্মনিষ্ঠ করিতে হয়, আর যে অবস্থায় চিত্ত নিত্যযোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া সমুদয় বিষয় হইতে উপরত হয়, আর যে অবস্থায় যোগী স্বীয় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা আত্মচৈতন্য অনুভব করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হন এবং যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়াতীত বুদ্ধিগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখস্বরূপ অবগত হয়, যে অবস্থায় অবস্থিত যোগী আত্মতত্ব হইতে বিচলিত হন না। যাহা লাভ করিলে আর কোন লাভই তাহা হইতে অধিক বোধ হয় না, এইরূপ আত্মযোগ—অনুষ্ঠানকারী যোগী নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ নিরতিশয় সুখসম্ভোগ করেন। যেমন কুশাগ্রদ্বারা এক এক বিন্দু জল সেচনেও মহৎপাত্র স্থিত জলরাশি সেচন হয়, তদ্রূপ অনন্যমনে যোগানুষ্ঠান করিলে কালে মনের নিগ্রহ হয়। যেমন দাহ্য তৃণাদির অবসানে অগ্নি স্বয়ং উপশান্ত হয়, তদ্রূপ যোগাভ্যাসবশতঃ বৃত্তিক্ষয়ে অন্তঃকরণ স্বয়ং নিগৃহীত হইয়া উপশান্ত হয়। অন্তঃকরণকে সংশোধন করা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য, যেহেতু অন্তঃকরণ যাহাতে আসক্ত, জীবও তন্ময় হয়। চিত্তের প্রসন্নতায় শুভাশুভ সমুদয় কর্ম্ম বিনষ্ট হয়, পরে সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি পরমাত্মসুখে অবস্থিত হইয়া অক্ষয় সুখ উপভোগ করেন।

অন্তঃকরণ দুই প্রকার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কামনাসংপৃক্ত অন্তঃকরণ অশুদ্ধ এবং নিষ্কাম অন্তঃকরণই শুদ্ধ। অন্তঃকরণই মনুষ্যের বন্ধমোক্ষের কারণ হয়, অন্তঃকরণ বিষয়াসক্ত হইলেই বন্ধ, আর নির্ব্বিষয় হইলে মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। যোগাভ্যাস দ্বারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ আত্মাতে নিবেশিত হইলে যে সুখ হয়, তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব, কেবল তাদৃশ অন্তঃকরণ দ্বারা স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। অন্তঃকরণ যেমন বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে আসক্ত হইলে সকল সুখের নিদান আনন্দময় ব্রহ্মের অনন্ত আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে আনন্দময় হইতে পারা যায়। তখন ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক সুখের কামনা থাকে না। পূর্ণ ও নিত্যানন্দ লাভে কিছুরই অপূর্ণতা ও অভাব বোধ হয় না।

শ্রীনবকুমার শাস্ত্রী।

সাধকের গান।

আমি অসময়ে কোথা যাব ?
তোমার চরণতলে স্থান লইব।
ঘরে জায়গা নাহি হ'লে, বাহিরে রব ক্ষতি কিগো।
আমি তোমার নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥
রামপ্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইক যাব,
দুই বাহু প্রসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥

সাধকের এই সঙ্গীতটীতে যেমন তীব্র আর্ত্তি (আর্ত্তভাব) আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তেমনি আবার অভিমান বা বক্রমধুরা প্রীতি এবং পরিণামে সংবর্দ্ধিত প্রগাঢ় প্রীতির উচ্ছ্বাসে আরাধ্যার পাদপদ্মে পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন পরিস্ফুট হইয়াছে। "আমি কোথা যাব, তোমার চরণতলে স্থান লইব।" শাস্ত্রে আছে (কুলার্ণবতন্ত্রে)

ব্যাঘ্রীবাস্তে জরা চায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ।
নিঘ্নন্তি রিপুবদ্ রোগাস্তস্মাৎ শ্রেয়ঃসমাচরেৎ ॥
যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥
কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ।
সুখদুঃখৈর্জনো হন্তি ন বেত্তি হিতমাত্মনঃ ॥

সময় থাকিতে শাস্ত্রের এই অনুশাসন এবং উপদেশ গ্রাহ্য করি নাই। এখন সময় হারাইয়া চৈতন্যোদয় হইয়াছে। আজীবন দুর্নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া এই দেহ এবং মন পচিয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত মরুপ্রান্তর। পথে যাহাদের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, একে একে তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। আমি এই অসময়ে আর কোথায় যাইব ? তোমারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিব।

যৌবনে ধন সম্পত্তি এবং প্রভুত্বাদির সদ্ভাব যতদিন থাকে, ততদিনই সুসময়, এই সুসময় চিরদিন থাকে না। অসময় সকলেরই আসে, তখন "ঘর্ম্মসিক্ত দেহে—বন্ধু-বিমুখ-গেহে" সকলেরই প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। যাঁহাদের জন্মান্তরীণ সুকৃতি থাকে, এই পরম বন্ধু অসময় তাঁহাদের চোখ ফুটাইয়া দেয়।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে" ॥

উপনিষদের ঋষি যাহার সন্ধানে আকুল কণ্ঠে এই গীতি গাহিয়াছেন, সেই পরম সত্যের আস্বাদ লাভ করিবার জন্ত সেই সুকৃতিশালী পুরুষ তখন ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সাধকের সঙ্গীতটীর একদিক দিয়া আমরা এই ব্যাকুলতার ভাবটী সুপরিস্ফুট দেখিব। ইহার পরবর্ত্তী পদ দুইটীতে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাকে গূঢ় অভিমানও বলিতে পারা যায়, অথবা বক্রমধুরা প্রীতিও বলা যাইতে পারে। সাধক ভাবিতেছেন—তুমি যদি আমার আপনার হইতেও আপন, আমি আর তুমি যদি এক অভিন্ন, তবে আমার এদশা কেন? কেন এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের রূপরসাদিতে আত্মহারা হইয়া তোমা হইতে দূরে সুদূরে যেন অতি নিঃসহায় নিরবলম্বভাবে জড়ের মত পড়িয়া আছি। দ্বৈতাদ্বৈতভাবের শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের ভাব-সাগরে এইখানে অভিমানের তরঙ্গ উঠিয়াছে। অভিমানের ভাবটা যেন নিতান্ত অচেনা অজানা কাহারও নিকট আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। "আমি নই আটাসে ছেলে, আমি ভয় করি না চোথ রাঙালে"—"মমৈবাংশো" ভাবস্থ সাধকের এই যে অতি আপনার জনবোধক ভাব, সেটা অভিমানের তাড়নায় উড়িয়া গিয়াছে, এদিকে কিন্তু আর্ত্তি ও তীব্র প্রীতি প্রগাঢ়। পাঠক! এখানে একদিকে বক্রমধুরা প্রীতি, অপর দিকে তীব্র আর্ত্তির মিলনসৌন্দর্য্য দেখিয়া পার ত নিজেও তন্ময় হইয়া ধন্য হইয়া যাও।

অভিমানী অথচ আর্ত্ত রামপসাদ বলিতেছে—

"ঘরে জায়গা নাহি হ'লে
বাহিরে রব ক্ষতি কিগো!
আমি তোমার নাম ভরসা ক'রে
উপবাসী হ'য়ে পড়ে রব"।

তোমার ঘরে সাযুজ্য সালোক্যাদিরূপ তোমার গৃহবেষ্টনীর ভিতর যদি আমার স্থান না হয়, আর হবেই বা বলি কেন, কর্ম্মবিমুখ মহাপাতকী আমি, রসরক্তমেদমজ্জাস্থিপরিপূরিত এই দেহ-বৈতরণীর পূতিগন্ধ প্রতপ্ত শোণিত-প্রবাহে মগ্ন দুরাচার আমি—আমার দুষ্কৃতির দুর্গন্ধে আমি নিজেই অস্থির—আমি তোমার কে, যে স্বজনের ন্যায় আদর করিয়া তোমার গৃহে আমাকে স্থান দিবে? আমার নিকট তুমি চিরকাল অনির্দ্দেশ্য এবং অনির্দ্দিষ্টই আছ, তোমাকে মা বা মেয়ে বলিয়া সম্বোধন করিতে, তোমার সঙ্গে এইরূপ কোন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আছি বলিয়া মনে করিতে আমি ভরসা পাই না। তাই তোমাকে তুমি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছি। যাহা হউক, তোমার গৃহবেষ্টনীর ভিতর ত আমার স্থান হইবে না? সংসার ছাড়া আমি এ গণ্ডীর বাহিরেই পড়িয়া থাকিব। আর "তোমার নাম ভরসা করে উপবাসী হ'য়ে—পড়ে রব"। তোমার ভ্রান্তিরূপের, তোমার তৃষ্ণারূপের, তোমার ক্ষুধারূপের উপাসনা অনেক করিয়াছি, শান্তি পাই নাই, শুনিয়াছি তোমার স্বরূপের উপাসনায় শান্তি পাওয়া যায়, তারই জন্ত প্রাণপাত করিব।

রামপ্রসাদ বলে উমা আমায়
বিদায় দিলেও নাইকো যাব ।
দুইবাহু প্রসারিয়ে—
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥

সেই বক্রমধুরা প্রীতি—সেই তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ "মুখ পোড়ে ছাড়া নাহি যায়"—ভাবটা এখানে আসিয়া শুদ্ধ মধুরা প্রীতিতে পরিণত হইয়াছে। প্রগাঢ় প্রীতির পবিত্র মন্দাকিনীধারা এইখানে আসিয়া অভিমানরূপ ঐরাবতকে তীব্র সম্বেগে ভাসাইয়া নিয়া চলিয়াছে। আর দারুণ অভিমানভরে সাধনার ধনকে বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া যে কূট কটূক্তি করা হইয়াছিল, তাহার ফলে অনুতপ্তপ্রাণ ভক্ত তাঁহার সাধনার ধনকে, তাঁহার আদরিণী উমাকে (এখন; আর তুমি তুমি নাই, অভিমানের দূরত্ববোধক ভাবটা নাই) প্রেমোন্মত্তের আবেগ-উচ্ছ্বাসে প্রাণটা একেবারে ঢালিয়া দিয়াছেন। পাঠক ! চল আমরা সরিয়া দাঁড়াইগে। দূর হইতে এই উচ্ছ্বসিত প্রগাঢ় প্রীতি এবং সুতীব্র আর্ত্তির মিলনাভিনয় দেখিয়া ধন্য হইয়া যাই।

"রামপ্রসাদ বলে উমা আমায়
বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
দুই বাহু প্রসারিয়ে
চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব"—

এখানে হাত দিব না, ভাবশূন্য প্রীতিশূন্য হৃদয়ের ছায়াপাত করিয়া এ পবিত্র মন্দাকিনী-ধারা মলিন করিব না। পাঠক ! পার ত ডুব দাও। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—

"যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবৎ সংসারবাসনা
যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কুতঃ ?"

বাস্তবিক মনের এই শোচনীয় অবস্থা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত রূপরূপিণীর স্বরূপাববোধ ঠিক ঠিক হয় না; সুতরাং আমরাও সাধকের উচ্ছ্বাসের ভাব ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি না। ভাবটা কি ? সাধকের উমা এখানে কেবল মেয়েও নন,—কেবল মাও নন, দুই চাই। আর সাধকের এই যে মেয়ে এবং মা, তা' তোমার আমার মাতৃভাব বা কন্যাভাবের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নহে, সেটা অনুভূতিগম্য—বুঝাইয়া বলার নয়। সাধক জানেন—যাঁহাকে গুরুর আসন দিয়া, আরাধ্যার আসন দিয়া তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী করিয়াছেন—পরমার্থতঃ তিনি আর স্নেহ সাধনার ধন এক—অভিন্ন। তাই তিনি প্রাতঃকৃত্যে "অহং দেবী ন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং" ইত্যাকার ধারণাস্থৈর্য্য লাভের প্রয়াস করিয়া থাকেন। এবং এই অদ্বৈতজ্ঞানস্থৈর্য্যলাভের জন্য এই দ্বৈত-লীলা। তুমি পাঠক ! এইভাবে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা কর, তুমিও সময় সময় ইহার অম্লমধুরতা বা বক্রমধুরতা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

শ্রীহরিকিশোর ভট্টাচার্য্য আগমবাগীশ।

নিবেদন।

আমরা কলির ব্রাহ্মণ। ত্রেতায় বিভীষণ পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, হে রাম! যদি মিথ্যা বলিয়া আপনাকে প্রবঞ্চনা করি, তবে যেন কলির ব্রাহ্মণ হই। বাস্তবিক যে ব্রাহ্মণ-জাতির আত্মত্যাগ জন্য আসমুদ্র হিমাচলবাসী স্বতই ভক্তিভরে তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইত, আজ সেই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা কিরূপ অধঃপাতের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। একবার সেই পরার্থে আত্মত্যাগী মহর্ষি দধীচির কথা স্মরণ করুন। বশিষ্ঠ, পরাশর, ব্যাস, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য যে জাতির আদর্শ, আজ তাহাদের কি শোচনীয় পরিণাম! ত্যাগের স্থান ভোগ, পরার্থের স্থান স্বার্থ এবং জ্ঞানের স্থান অজ্ঞান আসিয়া অধিকার করিয়াছে। জাতীয় জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে আপনারা যে আমাদের যথার্থ স্বরূপচিন্তা করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন, ইহাই উপস্থিত আমাদের একমাত্র ক্ষীণ আশা। ব্রাহ্মণ আমরা চিরভিক্ষুক, সেজন্য দুঃখ নাই, কিন্তু জ্ঞানসম্পদে আমরা জগতের শীর্ষ স্থানে ছিলাম, কিন্তু দুঃখ এই যে আমাদের সেই পরম সম্পদ (যাহার বলে সসাগরাধরণীপতি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের পদতলে গড়াগড়ি যাইত) সেই অমূল্যধন হারাইয়া পাশ্চাত্যজাতির নিকট জ্ঞানভিখারী! আজ দেড়শত বৎসর হইতে সে চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু আমাদের সে পিপাসা মিটিয়াছে কি? মিটা দূরে থাকুক, সিন্ধুকূলে থাকিয়া আমরা পিপাসায় ছটফট করিতেছি। জগতের এই জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা আমাদের ঋষিরা মিটাইয়াছিলেন—সেই আর্য্যসন্তানদের পিপাসা অপর কেহ মিটাইতে পারিবে না; ইহা আপনাদিগকেই মিটাইতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যমোহে আমরা ঘোর বিকারগ্রস্ত, এ রোগ প্রশমনের শক্তি অপর কাহারও নাই। যে ঋষিরা ভারতের নৃপতিবর্গকে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রের বেশ ধারণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বীরবৃন্দকে যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রতি পদে শত্রুকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কর্ম্মীকে যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মফলস্পৃহা ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং গৃহীকে যাঁহারা অতিথিসৎকাররূপ ধর্ম্মে ব্রতী করিয়া গৃহখানি প্রতিবাসী অতিথি-অনাথে পূর্ণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভোগকে যাঁহারা সংযমের পথে ফিরাইয়া নির্ম্মল বৈরাগ্যে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানদিগের নিকট বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ ভয়াবহ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই ১৫০ শত বৎসরের শিক্ষায়ও একটা মানুষের মত মানুষ হইয়াছে কি? খুব বড় বক্তা, কিম্বা রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার একটা জাতীয় উন্নতি-অবনতির হিসাবে বিশেষ

[illegible] নয়। তাই বলিতেছি আপনাদিগকে এই ব্যাধি দূর করিতে হইবে। প্রাচীন ভারত যে আদর্শে, যে শিক্ষাদীক্ষায় জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, পুনশ্চ সেই শিক্ষা দীক্ষা দিয়া কতকগুলি যথার্থ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের মত এক মুহূর্ত্তে হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব গ্রহণ করিতে যেমন সক্ষম, তেমনি পরমুহূর্ত্তে উহা ফিরাইয়া দিতেও পরাঙ্মুখ হইবে না। আমরা ব্রাহ্মণ, নিঃস্বার্থ পরসেবাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল। আবার দধীচি ঋষির মত আত্মত্যাগীর সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা ধ্রুব জানিবেন, আমরা অধঃপাতের চরমসীমায় পৌঁছিয়াছি। এইবার আমরা উঠিব। উত্থান, পতন জগতের নিয়ম। কলির পরই সত্যের আগমন। এই বিশ্বধ্বংসী সংগ্রামের পর পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইবে। সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ জাতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণগণই প্রাচীন ভারতবর্ষকে মুক্তিপথে পরিচালন করিয়াছিলেন এবং যদি ভারতবর্ষ যথার্থ মুক্তির পথে পরিচালিত হয়, তবে ব্রাহ্মণদ্বারাই হইবে। তাই বলিতেছি, আপনারা আবার সেই আদর্শ নগরে, গ্রামে, তপোবনে প্রচার করুন। প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে বেদ, বেদান্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মের কত পুণ্যকাহিনী প্রচারিত ছিল, হে ব্রাহ্মণগণ! পুনশ্চ চেষ্টা করিলে কি তাহার পুনরুদ্ধার হইবে না? যদিও আমরা অন্নাভাবে শীর্ণ, দুর্ব্বল, জ্ঞানের অভাবে, ঘোরতর কুসংস্কারের প্রহেলিকায় মোহাচ্ছন্ন, তবু আজও আমাদের ধমনীতে সেই শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, গৌতম ও বাৎস্য ঋষির শোণিত প্রবাহিত। যাহাতে আমরা তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিতে পারি, বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভা সে চেষ্টা করিবেন কি?

ভারতের অবনত অবস্থায়ও কৃতিব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ৺গোখলে, তিলক, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, বঙ্গের সুরেন্দ্র, ব্যোমকেশ, আশুতোষ, গুরুদাস ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব। আজ আমরা যে রামমোহন লাইব্রেরীহলে সমবেত, সেই রামমোহনও ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, ভূদেব, আধুনিক ধর্ম্ম জগতে এক নূতন ভাব আনিয়া সমস্ত পৃথিবীতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন। সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসও ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি অতি সুদৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু কালের বক্ষে আজও ইহার গৌরব অক্ষত রহিয়াছে। মানবজাতির মধ্যে নিজেদের উদরপোষণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি নির্ব্বাচিত করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আজপর্য্যন্ত কেহ কি ব্রাহ্মণের মত সমাজসেবা করিয়াছেন? আজও দেখুন বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিজের স্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া অকাতরে জ্ঞানবিতরণ করিতেছেন। হিন্দুসমাজ এক সময়ে এই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট নিষ্কর জমি দান করিয়া ইঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকার্য্যে সহায়তা করিতেন, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে এখন আর সে ভাব নাই। এখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের উপর শ্রদ্ধাভক্তির স্থলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য [illegible] ভাব

আসিয়াছে। ফলও হাতে হাতে ফলিতেছে। আজ ব্রাহ্মণগণ সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া যজন যাজন ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া উদর পোষণের জন্য নানাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ-সভার ও ব্রাহ্মণ-সমাজের চিরশুভানুধ্যায়ী মাননীয় শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আমরা চিরঋণী। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্যও জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে বিরাট দান করিয়াছিলেন, যদি বাস্তবিক-পক্ষে উহা স্বর্গীয় ভূদেব বাবু প্রদর্শিত পথে ব্যয়িত হইত, তবে এ দেশে আবার শিক্ষার নূতন যুগ আসিত। অন্ন দান হইতেও জ্ঞানদান শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে জীবন, আর অজ্ঞানই মৃত্যু। সে দিনও আমাদের সুযোগ্য গভর্ণর বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, যে দেশের দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ দর্শনের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, দুঃখ এই যে, সেই দেশের ছাত্রগণ ইউনিভার্সিটীতে B, A পর্য্যন্ত পড়ার সময়ও হিন্দুদর্শনের কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। জাতীয় শিক্ষা ভাণ্ডারের এই বিরাট ধনরাশিদ্বারা এই শিক্ষাবিভ্রাট দূর হইবে কি ?

হে ব্রাহ্মণগণ! যদি বাস্তবিকই আপনারা ব্রাহ্মণ-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন, তবে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পুনশ্চ চতুষ্পাঠী স্থাপন করুন। আবার বশিষ্ঠের মত পুরোহিত, শুকদেবের মত গুরুর সৃষ্টি করুন। দেখিবেন হিন্দুসমাজ আবার আপনাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইবে। আর একটী কাজ আপনাদিগকে করিতে হইবে। মাতৃ ভাষায় গভীর জ্ঞান না থাকিলে কোন ভাষাই সহজে আয়ত্ত হয়না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে চৈতন্য হইয়াছে। আপনারা এই সব চতুষ্পাঠীতে আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গলার অনুশীলন করিলে বাস্তবিকই বঙ্গীয় যুবকগণ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতিও যখন তাহাদের জাতীয় ভাষায় উন্নতির জন্য দৃঢ় সংকল্প হন, তখন হইতেই যথার্থ ঐসকল জাতির উন্নতির সূত্রপাত হয়। যদি বঙ্গদেশের বর্ণাশ্রমসমাজকে উন্নত করাই আপনাদের যথার্থ প্রাণের কামনা হইয়া থাকে, তবে মাতৃভাষাকে চতুষ্পাঠীতেও স্থান দিতে হইবে।

(১) ব্রাহ্মণ-সভার শাখা বঙ্গের সর্ব্বত্র স্থাপন এবং প্রচারক ও কথক পাঠাইয়া এইসকল স্থানের অধিবাসীদিগকে দলাদলি প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে উপদেশ দান। অনাথা বিধবা রমণী-দিগকে সভা হইতে সাহায্য দান ব্যবস্থা।

(২) বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কটে, ব্রাহ্মণ-সমাজকে, রামকৃষ্ণমিশন, বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী, ভারত-সভা, বঙ্গীয়জনসভার মত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীতিকথা।

(১) শক্তেঃ কার্য্যং হি—রক্ষা,
ন হি পরদলনং।
(২) সৌম্য বুদ্ধেঃ ক্রিয়াপি—
সচ্চিন্তৈবে
ত্যশাঠ্যং।
(৩) ধনকৃতি—রখিলাপ্যায়নং
নাপকর্ম্ম।
(৪) কৃত্যা স্বীয়া—স্বকৃতেষ্বিহ সহচরতা,
নাপি হিংসা কথঞ্চিৎ।
এবং সদ্যৌবনস্যাস্পদমপি—কৃতিতা সাধনং,
নো কুবৃত্তিরিতি শিবম্॥

(অনুবাদ—তাৎপর্য্য।

"শক্তেঃ কার্য্যং হি রক্ষা, নহি পরদলনম্"

বিপন্ন প্রাণিগণের রক্ষা করাই শক্তি অর্থাৎ বলের কার্য্য। ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি বন্য পশুগণের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণিগণের পীড়ন করা বিদ্যাবুদ্ধিবিবেকাভিমানী মনুষ্যজাতীয়দিগের বলের প্রকৃত কার্য্য নহে। ইহার দ্বারা এই উপদেশ দেওয়া হইল, যাঁহারা শ্রীশ্রী৺ভগবৎকৃপায় একটুকু বল লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন বিপদ্‌গ্রস্ত প্রাণিগণকে সকল সময়ে সকল প্রকারে রক্ষাই করেন। যেন কোন সময়ে কোন প্রাণীকে কোন প্রকারে পীড়ন করিয়া ভগবৎ-প্রসাদলভ্য বস্তুর অপব্যবহার না করেন। ৺জগদীশ্বর তাঁহার সন্তান সমস্তপ্রাণিগণকে বিপন্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঐরূপ বল প্রদান করিয়াছেন। যে কার্য্যের জন্য যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই কার্য্যে তাহা ব্যয়িত না হইয়া দাতার অনভিপ্রেত কার্য্যে ব্যয়িত হইলেই তাহার অপব্যয় হইল।

(১) তথা চ শক্তিমন্তো জনাঃ বিপন্নজনান্ সর্ব্বথা সর্ব্বদা রক্ষেয়ুরেব। ন কথঞ্চন কদাচিৎ কাংশ্চিদপি ন পীড়য়েয়ুরিত্যুপদেশঃ। শ্লোকস্যৈতদংশেন ক্রিয়াবোধকঃ—কার্য্যশব্দস্য এবং নিষেধবোধক নহি শব্দস্য প্রয়োগঃ প্রদর্শিতঃ। এবং পরত্রাপি।

(৪) স্বী প্রত্যয়স্য স্ব শব্দ আত্মীয়জনবোধকঃ।

জগদীশ্বর সমস্ত জীবের আদর্শ পিতা, তাঁহার সন্তানগণ অপর সন্তানগণ হইতে লাঞ্ছনা ভোগ করুক ইহা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। শ্লোকের অন্তর্বর্ত্তী এই অংশটুকু দ্বারা ক্রিয়াবোধক কার্য্য শব্দ এবং অভাবের বোধক নহি এই অব্যয় (নিপাত) শব্দটির প্রয়োগের রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

বলের কার্য্য নিরূপিত হইল। এক্ষণে বুদ্ধির কার্য্য নিরূপিত হইতেছে।

"সৌম্য বুদ্ধেঃ ক্রিয়াপি,—সচ্চিন্তৈবেত্যশাঠ্যম্"

এখানে সৌম্য এই শব্দটি শ্রোতৃবৃন্দের সম্বোধন পদ। অথবা পরবর্ত্তি বুদ্ধির বিশেষণপদ। এবং সচ্চিন্তা শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট চিন্তা বা উৎকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা। এই অর্থলাভ হইল, হে প্রশান্তমূর্ত্তে ছাত্রবৃন্দ, যেরূপ বলের কার্য্য শুনিলে এইরূপ বুদ্ধির প্রকৃত কার্য্য কি, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অথবা প্রশস্তবুদ্ধির কার্য্য কি, তাহা বলিতেছি শোন। ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরের কার্য্যকলাপাদিচিন্তা, আত্মচিন্তা, আত্মকার্য্য চিন্তা, পরলোকচিন্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিন্তা এবং সৎপুরুষদিগের চিন্তা জীবহিতকর কার্য্যসমূহের চিন্তা, প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহোক্ত বিষয়ের চিন্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা। এইরূপ চিন্তাই প্রশস্তবুদ্ধির কার্য্য, পরবঞ্চনারূপ শঠতা বুদ্ধির প্রকৃত কার্য্য নহে। সচ্চিন্তা বুদ্ধির কার্য্য এইরূপ না বলিয়া সচ্চিন্তাই বুদ্ধির কার্য্য এইরূপ উক্তি দ্বারা এই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে যে সকল বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে, গভীর চিন্তা দ্বারা তাহারই সমর্থন করিতে সচেষ্ট হইবে। অভিমানবশতঃ শাস্ত্রকারদিগের ভ্রমবগমার্থ সুপ্রামাণিক বচনাবলির খণ্ডনে প্রয়াস পাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে যে, যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক বুদ্ধি ধারণ করেন, তাঁহারাও যাঁহাদের উক্তি ভগবদুক্তির ন্যায় সম্মান করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং চলিতেছেন, সেই অলৌকিক বুদ্ধিশালী, অনন্ত শাস্ত্রের পারদর্শী, পরম যোগী মহর্ষিসমূহের উক্তি সাধারণের উক্তির ন্যায় কখনই মিথ্যা হইবার নহে। ইহাদ্বারা এই উপদেশ প্রদত্ত হইল যে বুদ্ধি সৎপথে চালিতা হইলে পরম শান্তি এবং সর্ব্ববিধ সুখ ও মুক্তির হেতুভূতা হয়, বহু সঞ্চিত সৌভাগ্যফললব্ধা সেই পরমোপকারিণী বুদ্ধিকে অকিঞ্চিৎকর সামান্যলাভের আশায় অসৎপথে চালিত করা (ঠকাইয়া চারি পয়সা প্রাপ্তি স্থলে পাঁচ পয়সা লওয়া এই পাঁচ পয়সা দিবার স্থলে চারি পয়সা ইত্যাদি) বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এবং অংশটুকুর মধ্যে ক্রিয়াবোধক ক্রিয়া শব্দ এবং অভাববোধক অ এই অব্যয় শব্দটির ব্যবহার দেখান হইয়াছে।

হে বালকবৃন্দ, বুদ্ধির কার্য্য বর্ণিত হইল। অতঃপর ধনের কার্য্য বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশ কর।

"ধনকৃতিরখিলাপ্যায়নং নাপকর্ম্ম"।

যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত জীব আপ্যায়িত, পরিতৃপ্ত অর্থাৎ প্রসন্নমনা হইতে পারে, এইরূপ সৎকার্য্য সমূহের, দোল দুর্গোৎসবাদি, কূপ, আরাম প্রতিষ্ঠাদি ব্রহ্ম যজ্ঞ, দৈবযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানই

ধনের প্রকৃত কার্য্য। ধনাতিশয্যে দীন জনের প্রতি অবজ্ঞা, অপরে যাহাতে দুঃখ অনুভব করে, তদ্রূপ কার্য্য (পরদারসেবা, বলপূর্ব্বক পরধন হরণাদি) রূপ কুৎসিত কার্য্য, ধনের প্রকৃত কার্য্য নহে। ইহা দ্বারা এই উপদেশ প্রদত্ত হইল, যে চিরসঞ্চিত সৌভাগ্য-বলে লব্ধ, অথবা বহু পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ধনের যাহাতে উপচয় ও সার্থক হয়, এইরূপ কার্য্য করাই উচিত। যাহাতে অপচয় বা নিরর্থক হয় এইরূপ কার্য্য করা উচিত নহে। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ধনের উপচয় হয়। তদ্দ্বারা সৌভাগ্য সঞ্চিত হয়, সৌভাগ্যবলে পুনর্ব্বার অধিকতর ধনের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্মতঃ ভোগে ধনের সার্থকতা হয়। তদ্বৈপরীত্যে ধনের অপচয় ও নিরর্থকতা (ভোগ বিরহে বা অন্যায্য ভোগে) হয়। এই অংশটুকুতে ক্রিয়া বোধক কৃতি শব্দ এবং অভাব বোধক "ন" এই অব্যয় শব্দের ব্যবহার দর্শিত হইয়াছে।

ধনের কার্য্য বলা হইল। এক্ষণে জনের (পুত্র পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধবাদি) কার্য্য বলিতেছি। ছাত্রবৃন্দ, মনোযোগ কর।

"কৃত্যা স্বীয়া সুকৃত্যেষ্বিহ সহচরতা নাপি হিংসা কথঞ্চিৎ"

এখানে স্ব শব্দের অর্থ আত্মীয়জন। কোনও মহাত্মা কোনও রূপ একটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন মনঃস্থ করিয়াছেন, কিন্তু সহায়শূন্যতাহেতুক তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, যে সকল মহাত্মা জনসম্পৎসম্পন্ন, তাঁহাদের উচিত আপন আত্মীয়গণ দ্বারা যাহাতে তাঁহার ঐ সৎকার্য্যটি সুসম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে সহায়তা করা, উহাই জনের প্রকৃত কার্য্য। একত্র সম্মিলিত কতকগুলি কুক্কুরের মত কাহারও কোনও প্রকার হিংসা, মারণ, তাড়ন, ভয়প্রদর্শনাদি বা আপনারাই বিবাদ বিসম্বাদ করা জনের প্রকৃত কার্য্য নহে। ইহা দ্বারা এই উপদিষ্ট হইল যে, জনসম্পৎসম্পন্ন মহাত্মা, সুদুর্লভ সম্পত্তির ভোগ করুন্। বৃথা কলহে অপূর্ব্ব সম্পজ্জনিত সুখে বঞ্চিত হইবেন না। জনসম্পৎ ধনসম্পৎ অপেক্ষা ও সুদুর্লভ। ধনসম্পৎ বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম বলে লাভ হইতে পারে। কিন্তু পুত্র পৌত্র সহোদর সহোদরা প্রভৃতি জনসম্পৎ একমাত্র সৌভাগ্য বলেই প্রাপ্তি হয়। এই অংশটুকুতে ক্রিয়াবোধক কৃত্বা ও কৃত্য শব্দ এবং নিষেধ বোধক "নাপি" এই অব্যয় শব্দটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। জনকার্য্য নির্ণীত হইল। পরিশেষে যৌবনের কার্য্য কথিত হইতেছে—

"এবং সদ্ যৌবনস্যাপ্যদমপি কৃতিতাসাধনং নো কুবৃত্তিঃ"

বল বুদ্ধি ধন জন এই সম্পচ্চতুষ্টয়ের কার্য্য যেরূপ অভিহিত হইল, যৌবনের প্রকৃত কার্য্যও সেইরূপ কৃতিত্ব সাধন মাত্র। অর্থাৎ যে সকল কার্য্য অন্যের সাধ্য নহে, (যথা দুরব-গমার্থ শাস্ত্রসমূহের অর্থাৎ যে সকল শাস্ত্রের অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না, সেই সকল শাস্ত্রের) প্রকৃতার্থ নির্ণয়, অদ্ভুত যন্ত্র সমূহের নির্ম্মাণ ও প্রকাশ, বলবৎ প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত দুর্ব্বল প্রাণিসমুদায়ের পরিত্রাণ ইত্যাদি) সেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া নিজের কৃতিত্ব সাধন করাই যৌবনের প্রকৃত কার্য্য। পশু, কুক্কুটাদির মত কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করারূপ

যে কুবৃত্তি কুৎসিৎ ব্যবহার, তাহা যৌবনের প্রকৃত কার্য্য নহে। এখানে যৌবনের একটি বিশেষণ স্বরূপ "সৎ" এই শব্দটির ব্যবহার করা হইয়াছে, সৎ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। তাহা দ্বারা এইরূপ উপদেশের সূচনা করা হইয়াছে যে, যৌবনাবস্থাই সর্ব্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে উৎকৃষ্টাবস্থা; যে যৌবনাবস্থায় চেষ্টা করিলে অশেষ জনহিতকর, ও প্রীতিকর, সুকীর্ত্তিকর কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে, অনন্ত অনর্থের হেতু কেবল কুৎসিত ব্যবহার দ্বারা সেই যৌবনাবস্থার অবসান কখনই যুক্তিযুক্ত নহে ইতি। এই অংশতে ক্রিয়াবোধক আস্পদ শব্দ এবং অভাব বোধক "নো" এই অব্যয় শব্দটির ব্যবহার পরিদর্শিত হইয়াছে।*

শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্য্যশিরোমণি।

উন্মুক্তপত্র।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন :—

আপনার ২৪শে আষাঢ়ের পত্রের সহিত ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রের গত শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত পঞ্জিকা-বিভ্রাট-শীর্ষক প্রবন্ধের ঐক্য অতীব স্পষ্ট। এজন্য সাধারণ পাঠকের অমূলক-সন্দেহ-নিরসন ও আপনার সম্মান-রক্ষার্থ প্রবন্ধটীর কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

প্রবন্ধ হইতে বুঝা যায়, "বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত নামক একখানা পঞ্জিকা" বহু দোষের আকর, উহার কোন অংশই প্রশংসা-যোগ্য নহে। এরূপ সমালোচনা একান্ত বিস্ময়কর নহে। কারণ, গুণ-

* উক্ত শিরোমণি মহাশয়-প্রণীত "নীতিকথা" নামক গ্রন্থের প্রথমাংশ ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রকাশার্থ প্রেরিত হয়, কিন্তু এই সমাজ-পত্রে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় পণ্ডিতমহাশয়ের সম্মানার্থ তাহার সারাংশ এবার প্রকাশ করা হইল, এরূপ কোন প্রবন্ধ ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রকাশার্হ নহে।

ব্রাঃ সঃ সঃ

গ্রহণ বিশেষ আয়াসসাধ্য, দোষ-নির্দেশ তাদৃশ কঠিন কার্য্য নহে ;—যথা অথবা যাহা হয় দু'কথা বলিলেই হইল। সেইজন্য দোষ-নির্দেশ করিয়া সমালোচকের আসন গ্রহণ করিবার প্রলোভন বড়ই প্রবল। তবে উপস্থিত প্রবন্ধ এই প্রলোভনোৎপন্ন, একথা নিশ্চিত না হইলেও সন্দেহের বিষয়ীভূত বটে।—সন্দেহের ভিত্তি, প্রবন্ধ-কলেবরে অরঞ্জিত সত্যের অসদ্ভাব।

যাহা হউক্, প্রবন্ধ-পরীক্ষায় কি পাওয়া যায়, দেখা যাক্।

(১) প্রবন্ধোল্লিখিত প্রথম আপত্তি,—বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার মূল গুপ্ত ; সুতরাং গণনা-পরীক্ষার সুযোগ নাই।—উত্তরে বক্তব্য,—পুঁথী মিলাইয়া পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পঞ্জিকা বিরচিত হয় না, সূর্য্য-চন্দ্রের উদয়াস্তাদি দ্বারা পরীক্ষা প্রার্থনীয়। যেসকল বিষয় সাধারণ-চক্ষে অনুভূত হয় না, তজ্জন্য যাঁহারা পুঁথী মিলাইতে চাহেন, তাঁহারা সেই সকলের সহিত উদয়াস্তাদির সংস্রব গণিত-সাহায্যে মিলাইতে পারেন। আমাদের পরামর্শ যদি শুনেন্, তাহা হইলে বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার অর্থদাতা মহাশয়কে পঞ্জিকাখানি উঠাইয়া দিতে না বলিয়া একটী Altitude and Azimuth instrument কিনিয়া দিতে বলুন, ও তদ্দ্বারা পরীক্ষা করুন্. বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার বিশুদ্ধির উপলব্ধি হইবে। কোন্ দেশের নাবিকপঞ্জিকা ব্যবহার করা হয়, তাহার নামপ্রকাশে ঔদাস্যের এই কারণ। তৎপরে বিবেচ্য এই যে, যে দেশের পঞ্জিকাই ব্যবহার করা হউক্, তাহা বিশুদ্ধ হইলে, তদনুযায়ী কলিকাতার পঞ্জিকাও তদ্রূপ হইবে সন্দেহ কি ?—যেমন,—সূর্য্যোদয়। যে পঞ্জিকা-ভিত্তিতেই কলিকাতার সূর্য্যোদয় গণিত হউক্, ফল একই হইবে। সুতরাং যাঁহারা পুঁথী মিলাইতে চাহেন, তাঁহারা যেকোন বিশুদ্ধ পুঁথী ব্যবহার করিতে পারেন। কোন দেশবিশেষের পঞ্জিকার নামোল্লেখ না করার এই দ্বিতীয় কারণ।

অতএব এই 'মূলগোপন' আপত্তির আদর করিতে পারিলাম না, এবং আনুষঙ্গিক কথাও অরঞ্জিত বোধ হইতেছে না। "সাধারণ পঞ্জিকাসমূহ সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে গণিত," কথাটা কি অমিশ্র সত্য ? যে সকল পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্রাদি কি রাঘবানন্দের সারণী-প্রসূত নহে ?—উহাদের সূর্য্যোদয়াস্ত কি, কাহারও আলিপুর, কাহারও পোর্টকমিসনার সারণী-সম্ভূত নহে ?—উহাদের গ্রহণ কি গুপ্তমূল নাবিকপঞ্জিকা হইতে গৃহীত নহে ?

চতুর্থ আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপতঃ এই :—জ্যৌতিষিকগণনায় আদিবিন্দুর প্রয়োজন। আমাদের নিরয়ণগণনার আদি বিন্দু কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তর আপাততঃ যত সহজ বোধ হয়, বাস্তবিক তত সহজ নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে আদিবিন্দু-নিরূপণ বড়ই দুরূহ। যে পুস্তকে রাশিচক্রের আটাশটী যোগতারার ধ্রুবক দেওয়া আছে। কিন্তু প্রত্যেক তারা হইতে ভিন্ন ভিন্ন আদিবিন্দু আইসে। যদ্যপি প্রত্যক্ষ গ্রহসংস্থান নিরূপণ করিলে অপর একটা বিভিন্ন পূর্ব্বাভিমুখে গতি-বিশিষ্ট আদিবিন্দু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন স্থলে উপায় কি ? সমালোচকমহোদয়গণের এ ভাবনা নাই, বরং সুবিধাই আছে।

কেননা যে আদিবিন্দুই গৃহীত হউক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে। কিন্তু ৺বাপুদেব শাস্ত্রি-প্রমুখ গঠনশীল পণ্ডিতবর্গের পক্ষে এ ব্যাপার বড়ই সমস্যাজনক হইয়াছিল। বাপুদেব শাস্ত্রী ও কেরোপান্ত মহোদয়দ্বয়ের সুদীর্ঘবাগ্বিতণ্ডাবাদের পরও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। বাপুদেবশাস্ত্রী পূর্ব্বাভিমুখে গতিশীল সৌরসংস্থানমূলক আদিবিন্দু গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অনুকরণে ১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও রাঘবানন্দানীত বর্ষান্ত-সংক্রান্তির প্রত্যক্ষ সৌরসংস্থানকে তাৎকালিক আদিবিন্দুরূপে গ্রহণ করিল। পরে সন ১৩১১ সালের পৌষমাসে বম্বেসহরে যে মহাসভা আহূত হয়, তাহাতে প্রথম প্রশ্ন-সমাধানে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমান স্বীকার করা হয়। সুতরাং বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার এ অংশ শুদ্ধ করিবার অবসর হইল না। বাপুদেবশাস্ত্রী ও বম্বে মহাসভার অনুমোদিত মত অগ্রাহ্য করিয়া আদিবিন্দু নিরূপণ বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার পক্ষে হঠকারিতা হইত, তাহা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকিলেই বুঝা যায়। এতন্নিরূপণ পণ্ডিতসংহতিসমাদৃত হওয়া আবশ্যক। এজন্য পঞ্জিকা বহু দিবসাবধি রাজামহারাজাদির আনুকূল্যে কোন মহাসভার আহ্বান, অথবা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভাদির দ্বারা এসমস্যা মীমাংসার্থ সচেষ্ট আছে, আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

সাধারণের অবগতির জন্য আদিবিন্দুসম্বন্ধীয় এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে পঞ্জিকা-বিভ্রাটপ্রবন্ধের দুই একটা কৃতিত্ব সাধারণের গোচর করিব। স্থানাভাবে কার্য্যটা সংক্ষেপেই সারিতে হইল।

চতুর্থ আপত্তি -অয়নগতি পশ্চিমে; বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার আদিবিন্দু পূর্ব্বাভিমুখে গতিশীল; দোষ অমার্জ্জনীয়!—সম্পাত-বিন্দু পশ্চিমে চলিলে অপর কোন বিন্দু পূর্ব্বে চলিতে পারে না, এ যুক্তির মাধুর্য্য থাকিলেও সারবত্তা নাই। সম্পাত-বিন্দু পশ্চিমাভিমুখে গতিবিশিষ্ট, বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার আদিবিন্দু সম্পাতবিন্দু নহে;—তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন;—অতএব (?) ইহার পূর্ব্বাভিমুখী গতি অসম্ভব! - ইহা কোন্ দেশীয় যুক্তি?

বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের "আদিবিন্দুর বিপরীত গতিও কি দৃগ্‌গণিতৈক্যের একটী দৃষ্টান্ত?"—আমাদের উত্তর—গগন-সন্দর্শন করিলে, তাহাই বটে। প্রতিবৎসর যে সময় বর্ষ-সূচক সংক্রান্তি লিখিত হয়, সেই সময়ে -দিবা হইলে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে,—রাত্রি হইলে, পরম্পরা সম্বন্ধে—ছায়া বা তারকাতুলনায় রবিসংস্থান পরীক্ষা করিলে প্রতিভাত হইবে, যে আদিবিন্দুর, অর্থাৎ সূর্য্য যেস্থানে উপস্থিত হইলে বর্ষান্ত হয়, তাহার সামান্য পূর্ব্বাভিমুখী গতি আছে। -পুঁথী মিলাইলে কি হয় বলিতে পারি না।

"এই অভিনবমতের জন্য দায়ী কে?"—অবশ্য প্রথম দায়িত্ব জ্ঞানের।—রাঘবানন্দসারণী-প্রসূত যাবতীয় পঞ্জিকারই আদিবিন্দু ঐরূপ সচল;—সে তথ্যনিরূপণে অসামর্থ্যবশতঃই সে সকল পঞ্জিকা ও বিষয়ে নীরব।—তৎপরে দায়িত্ব সূর্য্যসিদ্ধান্তের, কেননা উঁহার বর্ষমানই উক্তবিন্দুর সচলতার কারণ।—তৃতীয় দায়িত্ব ৺বাপুদেবশাস্ত্রী ও বম্বে মহাসভাপ্রভৃতির। চতুর্থ দায়িত্ব বোধ হয়, সূর্য্যদেবের। পঞ্চম দায়িত্ব—যে সমালোচক মহাশয়েরা ঐ মতনির্দ্দেশানন্দে

সমালোচকের উদাসীন, তাঁহাদের। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ঘাড়ে কোন দায়িত্বই আরোপিত হইতে পারেনা।

পঞ্চম আপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব্ব প্রকরণ হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে। অধিকন্তু ইহার সত্যকে অরক্ষিত করিতে হইলে বলিতে হইবে—প্রচলিত বঙ্গপঞ্জিকা মাত্রেরই আদিবিন্দু বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের আদিবিন্দু হইতে অভিন্ন।

ষষ্ঠ আপত্তি—তিনটী দীর্ঘতম বা হ্রস্বতম দিন বা রাত্রি।—সিদ্ধান্তশাস্ত্রানুসারে এরূপ দিন বা রাত্রি একটী হওয়া আবশ্যক। কথা সত্য। কিন্তু ঐ তিন দিনের পার্থক্য এতাদৃশ অকিঞ্চিৎকর যে, পঞ্জিকায় তাহা উপেক্ষিত হইলে বিশেষ কোন অনর্থপাতের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ সূর্য্যোদয়াস্ত যে সারণী অনুসারে গণিত হয়, তাহাতে উপেক্ষণীয় স্থূলতা আছে। ১৩২৫ সালের পঞ্জিকার ভূমিকায় ৮০ পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য বৎসরের ভূমিকার অনুরূপ অংশে একথা লিখিত আছে। সেই স্থূল সারণীর গণনায় উপেক্ষণীয় বিপল পরিত্যক্ত হওয়ায় উক্ত তিন দিনের দিবামান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ উপেক্ষা সর্ব্বত্রই আছে ও বহুস্থলেই অপরিহার্য্য। আপত্তির তিন দিনের কথাই বিবেচনা করা যাউক।

৬ই আষাঢ় দিবামান দং৩৩।৩৯।৪০।—৭ই—দং ৩৩।৩৯।৫৫। ৮ই—দং ৩৩।৩৯।৫৫। ৯ই—দং ৩৩।৩৯।৫৫ ও ১০ই—দং ৩৩।৩৯।৪০। কিন্তু সূক্ষ্মগণনা অনুসারে ৬ই,—দং ৩৩।৩৯।৪০; ৭ই,—দং ৩৩।৩৯।৪৭; ৮ই,—দং ৩৩।৩৯।৫৫; ৯ই,—দং ৩৩।৩৯।৪৭ এবং ১০ই,—দং ৩৩।৩৯।৪০ এইরূপ হইবে। ৭ই ও ৯ইএর দিবামানে ভ্রম আছে বটে, সে ভ্রমের পরিমাণ ৮ বিপল বা ৩ সেকেণ্ড। মনে করুন আমরা অতি যত্নে এই ৩ সেকেণ্ডের ভ্রম সংশোধন করিলাম। কিন্তু যে তিন দিন লইয়া এত কথা হইতেছে, সে তিন দিন কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে দিবামানের প্রভেদ প্রায় ৩০ সেকেণ্ড।—ত্রিশ সেকেণ্ড উপেক্ষা করিয়া তিন সেকেণ্ড রক্ষার চেষ্টা আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবের প্রমাণ হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা সারণীর স্থূলতা সাধারণ চক্ষু হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করি নাই। ইহাতে সমালোচক মহাশয়গণের সুবিধা হয়, হউক।

সপ্তম আপত্তি—"বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের দৈনিক দিবা ও রাত্রিমানে ভুল আছে।" কারণ, ব্যক্তি-বিশেষের অজ্ঞতা। বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকা তাহার সূর্য্যোদয়াস্ত পরীক্ষা প্রার্থনা করে। ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমবিশেষ থাকিলেও পঞ্জিকা লিখিতকালে যদি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত যথাযথ পরিলক্ষিত হয়,—(যতবার পরীক্ষা হইয়াছে, কদাপি ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই)—তাহা হইলে পুঁথীর জ্ঞান অপেক্ষা কার্য্যসাধনক্ষম অজ্ঞতাই প্রশংসনীয় নয় কি? অল্প মূল্যের Portable altazimuth যন্ত্র হইলেই সূর্য্যোদয়াস্ত যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করা যায়। তৎপূর্ব্বে পরীক্ষা না করিয়াই ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা-সাহায্যে ভ্রম প্রদর্শন রহস্যজনক হইলেও অবৈধ সন্দেহ নাই। আর সমালোচক মহাশয়ের পুঁথীতেই বা কি লেখে?—বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের অজ্ঞতাই বা কি প্রকৃতির? এ সকল তথ্য প্রকাশ করিলে পঞ্জিকার হিতসাধন ত হইবেই,

সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন অধ্যাপক মহাশয় যে, কৃষ্ণকান্তি কাষ্ঠফলকে অঙ্কশাস্ত্রকে বটম্ তন্তুবায়ের অবস্থাপন্ন করেন, তাহারও কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে।

অষ্টম আপত্তি—সায়ন মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তিতে দিবা রাত্রি সমান লিখিত হয় না। "শাস্ত্রসমূহে" সমালোচক মহাশয় বিষুব দিনে দিবারাত্রি সমান হইবে,—এই বিধান দেখিয়াছেন। সে সকল বহু পুরাতন শাস্ত্র। ক্রমোন্নতিশীল জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিত্যই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। যিনি সময়ের সমানুপাতে দ্রুত পদবিক্ষেপে অক্ষম, তাঁহার সকল কথাতেই বিস্ময় জন্মিবে; আর অতিরিক্ত অভিমান থাকিলে সকলই ভ্রমময় বোধ হইবে। যে দিন সূর্য্যদেব বিষুবরেখা অতিক্রম করেন, তাহার নাম বিষুব দিন। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, ঐদিন দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়। এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তাহা হয় না। রশ্মিচক্রীভবনোৎক্ষিপ্ত সূর্য্য বিষুবদিনে দিনমানের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় সে দিন দিবারাত্রি সমান হয় না। আধুনিক তথ্য এই যে, বিষুবদিন ও সমরাত্রি দিবার দিন এক নহে। যেদিন বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকায় সায়ন মহাবিষুব বা জলবিষুব সংক্রান্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেদিন, তৎপূর্ব্বদিন ও তৎপরদিন transit যন্ত্রযোগে স্পষ্ট মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের ক্রান্তি দেখিয়া সামান্য গণিত করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, সেই দিনই সূর্য্য বিষুববৃত্ত অতিক্রম করিয়াছেন। আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় যেদিন সমরাত্রিদিবা লিখিত হইয়াছে, সেদিন astronomical theosolite ব্যবহার করিলে দেখিবেন, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত লিখিত সময়েই সম্পাদিত হইয়াছে। যন্ত্রাভাবে সামান্য বুদ্ধিসহকারে মাধ্যাহ্নিক ছায়াদ্বারা বিষুবদিন নিরূপণপূর্ব্বক চর্ম্মচক্ষে সূর্য্যোদয়াস্ত দর্শন করিলেও বুঝিতে পারিবেন, বিষুবদিনে দিবারাত্রি সমান হয় না। আর যদি পুঁথী মিলাইতে চাহেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য যে পঞ্জিকায় সূর্য্যোদয়াস্ত লিখিত আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে (সবিস্ময়ে!) দেখিতে পাইবেন, সায়ন বিষুব সংক্রান্তির (Epuinox) দিন দিবারাত্রি সমান নহে।—"প্রচলিত পঞ্জিকা সমূহে এ দোষ নাই।" সেই জন্যই প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহের সংস্কার আবশ্যক। এইরূপ বহু "দোষের" অভাবেই সে সকল পঞ্জিকা ঈদৃশ অকর্ম্মণ্য হইয়া আবর্জ্জনা রাশিতে পরিণত হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণেতি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহারাস।

(পরমাত্ম-তত্ত্ব)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপপরিজ্ঞানে ও তাঁহার আচরণে নিগূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে সাধারণ মনুষ্যগণ সমর্থ নহেন। সুতরাং, সাধারণ জনগণ শ্রীভগবানের রাসলীলার প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়া এই অতি পবিত্র পরমাত্মতত্ত্বঘটিত রাসলীলার অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম আবরণে পরমাত্মতত্ত্ব যে নিহিত রহিয়াছে, ঐ আবরণ উন্মোচন বা উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে তাহা পরিস্ফুট হয় এবং এই মহারাসের সৌন্দর্য্যশোভায়, নিগূঢ় সারতত্ত্বের সুবিমল জ্যোতির প্রভায়, মাধুর্য্যরসের—অমৃতময় আস্বাদনে এবং সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান পরমাত্মার পরমাত্মতত্ত্বের অনির্ব্বচনীয় প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হয় এবং নরনারী অমৃতত্ব লাভ করেন। এই মহান্ পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মহারাসের অধিষ্ঠাতা দেবতা ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ যে নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, নির্ব্বিকার, পরমাত্মা, তদ্বিষয়ের আলোচনাই একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ নাম ব্যুৎপত্তি :—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

ইতি শ্রীধরস্বামী।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণনামমাহাত্ম্যং :—

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ ভূমৌ যাতি মল্লয়তাং প্রিয়ে ॥

(বরাহ পুরাণম্)

ভগবান্ নারায়ণের শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাপনার্থ শ্রীবিষ্ণু ধ্যান :—

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥"

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পদ্মাসনস্থিত কেয়ূর, কুণ্ডল, কিরীট ও হারদ্বারা বিভূষিত এবং শঙ্খচক্রধারী ও সুবর্ণময় শরীরী শ্রীভগবান্ নারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান কর। নারায়ণকে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যতেজঃ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত। সৃ ধাতু গমনার্থ এবং য প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্য সুতরাং সূর্য্যশব্দে তৈজসরূপে যিনি সর্ব্বত্র গমনশীল। নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি নারশব্দে জীবসমূহ এবং অয়নশব্দে আশ্রয়, সুতরাং নারায়ণ শব্দে যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী। এই উভয়ার্থ প্রতিপাদনার্থ নারায়ণকে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ইত্যাদি বিশেষণ-

দ্বারা বিশেষিত করা সুন্দর ও সঙ্গত। নারায়ণ পদ্মাসনস্থিত, এই বিশেষণপ্রয়োগের সূক্ষ্ম অভিপ্রায় এই যে, পদ্ম অর্থে সত্ত্বগুণ, সুতরাং পরমাত্মা বিষ্ণু সত্ত্বগুণসন্নিবিষ্ট। কেয়ূরবান্ অর্থে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশব্যাপী, অর্থাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু যিনি সর্ব্বত্র স্থিত ও সর্ব্বত্রগামী। কুণ্ডলবান্ অর্থে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ, অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতি। সাংখ্যযোগ-স্বরূপ কুণ্ডল শ্রুতিমূলে দোদুল্যমান। কিরীটাদি ধারণে তদ্বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ যদুপরি আর নাই, এমন সর্ব্বোচ্চ পরমপদ, অর্থাৎ বিদেহ মুক্তি বুঝায়। তিনি সূর্য্যাভ্যন্তরস্থ বরণীয় তেজঃ স্বরূপ, তজ্জন্য তাঁহাকে হিরণ্ময়বপু বলা হইয়াছে। চক্রশব্দে সুদর্শন; অর্থাৎ মনঃ, তেজ ! ও সত্ব এবং শঙ্খ শব্দে জগত্তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুর এই ধ্যানানুযায়িনী মূর্ত্তি ব্রহ্মোপকারণাত্মক।

তিনি যজ্ঞপুরুষ, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যরূপের উপকরণ দ্বারা তাঁহার দেহ নির্ম্মাণ হইয়াছে, সুতরাং সে শরীর প্রাকৃত শরীরের ন্যায় নহে। ধ্যানকালে বাক্য সকলের এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সর্ব্বদেবগণের অধিষ্ঠাতা অধিদেব বৈরাজ পুরুষের উপাস্যত্ব বিধান করেন। "অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধি-দৈবতম্" (গীতা ৮ম অধ্যায়।)

হিমাচল হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সারস্বত, কাণ্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিলী ও উৎকল এই পঞ্চগৌড়-ব্রাহ্মণ এবং মহারাষ্ট্রী, সৌরাষ্ট্রী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, ও দ্রাবিড়ী এই পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমষ্টিতে দশ ব্রাহ্মণ। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ত্রিকাল সন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই ত্রিমূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণেরই উপাসনা করেন। সূর্য্যমণ্ডলেই ব্রহ্মলোক, সূর্য্যমণ্ডলেই সত্যলোক। দেবযানগতিতে জ্ঞানী উপাসকগণ সত্যলোকে গমন করেন। অধিক কি ব্রহ্মগায়ত্রীও বিশ্বপ্রকাশক সবিতৃদেবেরই উপাসনা। ইনিই শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই ত্রিমূর্ত্তি, ইনিই অ, উ, ম ত্রিমূর্ত্তিপ্রণব। শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার বলরামেরও রাসের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা, রুদ্র, কুবের, ইন্দ্র, যম সকলেরই রাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহারাস। তিনি ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া পূর্ণ। এই জন্য তাঁহার রাসময় লীলাই মহারাস। বলভদ্রাদির রাসকে মহারাস বলে না। শ্রুতিও বলেন—"রসো বৈ সঃ" তিনিই রসস্বরূপ। তাঁহারই রসময়ী আহ্লাদিনী প্রকৃতই রাসেশ্বরী।

"আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ॥"

আনন্দ হইতেই প্রাণিগণের উৎপত্তি, আনন্দ দ্বারা তাহাদের জীবন, আনন্দেই তাহাদের লয়। স্ত্রীপুরুষ পরস্পর দর্শন স্পর্শাদি দ্বারা কত আনন্দ অনুভব করে। আনন্দই তাহাদিগের সহযোগের কারণ, সেই সহযোগেই সন্তানসন্ততিগণের উৎপত্তি। তাহাদের দর্শন স্পর্শাদি আবার আরও আনন্দজনক। এই আনন্দই আদি। এইজন্য ইহাই আদি আনন্দ বা আদিরস। রসশব্দের অর্থ আনন্দ। আদিরস নবরসের আদি। নবরস-সাগর শ্রীকৃষ্ণ

সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীবৃন্দাবনে যে মহারাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আদি, বীর, করুণা, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত এই নবরসঘটিত। সপ্তমবর্ষীয় বালকের প্রাকৃত নরনারীর পাশববৃত্তির সম্ভাবনা নাই "নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভাগবতো নৃপ" মানবগণের পরম মঙ্গলের জন্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আদিপুরুষ ভগবান্ আবির্ভূত হন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

গীতা, ৪।৭

সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্ট:দুর্জ্জনগণের বিনাশসাধন জন্য এবং ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, ভগবান্ নারায়ণের অবির্ভাব হয়। উপনিষদে যিনি বিদ্যাবিদ্যা মায়া, তন্ত্রে যিনি আদ্যা, সাংখ্যশাস্ত্রে যিনি মূলাপ্রকৃতি, তিনিই রাসেশ্বরী। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" মায়া ও ঈশ্বর, দুর্গা ও শিব, রাম ও সীতা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, পুরুষ ও প্রকৃতির বিহার মিলন ও প্রেমই রাস। সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণভেদে প্রকৃতি ত্রিবিধা। এই তিনগুণে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। এই তিনগুণে পুরুষও ত্রিগুণাত্মক লীলা করেন। গোস্বামিমহাশয়েরা সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির এই তিন স্বরূপ স্বীকার করেন। পুরুষের স্বরূপও এই ত্রিশক্তিযোগে তিন সৎ, চিৎ ও আনন্দ। হ্লাদিনী সহযোগে তিনি রসময়। আনন্দভাব কামাদি তামস, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তামস। আনন্দকানন বৃন্দাবনধাম এই বিশ্ব। একবার বিরাটভাবে ভগবান্‌কে দেখা যাউক। সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই অষ্টধা বিভিন্না হইয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

(গীতা ৭।৪)

এই ভিন্না প্রকৃতির নাম অপরা। মূলাপ্রকৃতির নাম পরা। ভূমি, জল, অনল প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতিই সেই একই প্রকৃতি রসময়ী।

"দেখ এই ভূমণ্ডল কি সুখের স্থান।
সকল প্রকারে সুখ:করিতেছে দান॥"

নিদাঘতাপিত হইয়া সলিলাবগাহনে ও তৃষ্ণায় জলপানে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। অনল অনিল সকলই আনন্দময়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সকলেতেই আনন্দ। এই ভিন্না অপরা অষ্ট প্রকৃতিই অষ্ট নায়িকা অষ্ট রাধিকা। মূলাপ্রকৃতিই প্রধানা—তিনিই পরা, তিনিই শ্রীমতী, আর সেই রসময় পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই পরপুরুষ। তিনিই প্রকৃতি-সহযোগে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করেন। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্"—গীতা ১৩।২০। তাঃসপ্রকৃতির মানবগণ রসময় পুরুষের ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না।

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" গীতা ৫।

তাহার অজ্ঞানান্ধ। যিনি সেই রসময় ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই সাধু। সেভাবে বিষয়পিপাসা তিরোহিত হইয়া যায়।

"অভাসে ন পরং প্রেম ভাসে ন বিষয়স্পৃহা"। পঞ্চদশী)

রাসলীলায় শৃঙ্গার রসপ্রধান। কেবল সম্ভোগ বিপ্রলম্ভকেই শৃঙ্গার বলে না। ইহার অপর অর্থ বেশবিন্যাস। ভগবান্ শিখিপুচ্ছমৌলী অপূর্ব্ব বেশবিন্যাসসাধক, ভক্ত এবং সর্ব্বসাধারণের মনপ্রাণ বিমোহিত করেন।

"কস্তূরি তিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তভম্।
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুর্বীণা কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী,
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥"

গোপিকারাও নানাবেশে সুসজ্জিতা হইয়া নবরসসাগর মদনমোহনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া নৃত্যগীতাদির নানাবিধ অভিনয় করিতেছেন।

"কল-কোকিল-কাকলি-কূজিত কুঞ্জবনে বিহরে প্রভু রাসরসে।
বহুভাগ্যফলে যত গোপসখা তব সঙ্গ ল'য়ে কত রঙ্গ করে"॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে সাধকগণ জগন্নাথের উপাসনা করেন। এই পঞ্চভাব মধ্যে মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। গোস্বামিমহাশয়েরা এই গোপিকা-ভাবেই বিভোর। উজ্জ্বল নীলমণি ও রসমঞ্জরী ওই গোপিকা-ভাবেরই গ্রন্থ। নায়কনায়িকার ভাব অষ্টবিধ। অষ্ট নায়ক ও অষ্ট নায়িকার বিস্তারিত বর্ণনাই তত্তৎগ্রন্থের উদ্দেশ্য। আত্ম-নিবেদনই উপাসনার চরম। গোপিকাগণ যেরূপ আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। অঘটন-ঘটনপটীয়সী প্রকৃতি পরমপুরুষকে নানা রঙ্গে বিমোহিত করেন। কখন চরণে ধরেন, কখন দুর্জ্জয় মানভরে চরণে ধরান; কখন নিজে রাজরাজেশ্বরী হইয়া পুরুষো-ত্তমকে দ্বারপাল করেন, কখন নিজেই হন। এই মধুর প্রেমভাব জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস ইঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন, মধুরভাবের কোমলতা তাঁহাদেরই হৃদয়কে আনন্দরসে পরিপ্লুত করিয়াছে। কবিগণের হৃদয় নায়কনায়িকার বিহারভাবে সদাই মুগ্ধ হয়। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস মধুরভাবের লেখক; তাই তাঁহার আদিরসপ্রধান গ্রন্থাবলীর সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর। মধুরভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনভাব। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন অষ্ট নায়িকা পরিবৃত হইয়া রাসোৎসব করেন, তন্ত্রেও দেখিতে পাই মহাকালীও সেইরূপ বিপরীতরতাতুরা হইয়া মহাকাল শিবের সহিত বিহার করেন। অষ্টনায়ক—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কাপালী, ভীষণ ও সংহার নামা ভৈরবগণ; ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, চামুণ্ডা, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহী নাম্নী ভৈরবীগণ যথাক্রমে মিলিত হইয়া অষ্টদলপদ্মোপরে পরিবৃত হইয়া মহাকাল কালীর সহিত নিত্য রাসলীলা করেন

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসও নিত্য রাস। তিনি নিত্য বৃন্দাবনে রাস করেন। ধীর, জ্ঞানী, সাত্বিক, ভক্ত ও সাধক ভক্তের ভাব এবং ভাগবতের ভাব এক বলিয়া জানিতে এবং উপলব্ধি করিতে পারেন। সংজ্ঞাভেদে পন্থাভেদ। প্রেমের কোন ভেদ নাই। বস্তুরও কোন ভেদ নাই। এই প্রেমেরই নানা আখ্যা—প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদি। পিতার ভালবাসা, পুত্রের ভক্তি, বন্ধুর প্রীতি, গুরুবর্গে শ্রদ্ধা, আর্ত্তের প্রতি দয়া সকলই প্রেম। ভগবৎ প্রেম সকল প্রেমের সার। এ প্রেম সকলের ভাগ্যে ঘটে না। লোকে বহু তপস্যায় তৎ-প্রেমপ্রবণচিত্ত হয়। যিনি এই প্রেম লাভ করিয়াছেন, যিনি এই প্রেমে প্রেমিক হইতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তাঁহারই জন্ম সফল।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

(শ্রীভাগবত)

নিগমরূপ কল্পতরু হইতে বিগলতি ফলস্বরূপ উত্তমশ্লোক নারায়ণের অমিয় গুণানুবাদ শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ। এই ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শুকমুখনিঃসৃত অমৃতদ্রবসংযুক্ত, সুতরাং সকল রসের আলয়। ভূমণ্ডলে যাঁহারা সেই রসে রসিক, তাঁহারা ধন্য। রসিকগণ অহরহঃ সেই অমিয় রস পান করিতে থাকুন। মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী, কে উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদে বিরক্ত? যাহারা বিরক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই আত্মঘাতী পামর। নিবৃত্ততৃষ্ণ নারদাদি মুক্ত-পুরুষগণ হরিগুণানুবাদ গান করেন। মুমুক্ষুগণের হরিগুণানুবাদ ভবরোগের ভেষজ এবং বিষয়িগণের হরিগুণানুবাদ শ্রোত্রমনোরঞ্জন।

"নিবৃত্ততর্ষৈ রুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছোত্রমনোঽভিরামাৎ,
ক উত্তম শ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ"।

(শ্রীভাগবত, ১০—৪

শ্রীমদ্ভাগতের একমাত্র লক্ষ্য এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান, ধারণা, পূজা, অর্চ্চনা ও সেবা পরিচর্য্যা।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ,
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

নানা ইতিহাস ও আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ হইলেও শ্রীভাগবত বেদান্তগ্রন্থ ও ভক্তিগ্রন্থ। শ্রুতিবেদ্য পরব্রহ্ম স্বশক্তি মায়াবলে নানাবিধ নামরূপ পরিগ্রহ করেন। "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়, "একোঽহং" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা অবগত হওয়া যায় আমি এক, আমি বহু হইব। বহু প্রজা সৃষ্টি করিব। অনুশাসনেও সেই কথা।

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥"

(গীতা)

মহদ্ব্রহ্ম শব্দে প্রকৃতি। আমি প্রকৃতিতে গর্ভাধান করিলে ভূতগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বেদান্ত বলেন—

"পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরং।
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ।"

(পঞ্চদশী)

পরমাত্মা ব্রহ্ম নিজ মায়া দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া নিজেই জীবরূপে নিজরূপ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জগৎও জীবকে প্রকৃতি বলা যায়। প্রকৃতিই অধ্যাত্ম, পুরুষ অক্ষর। প্রকৃতি দ্বিবিধা,—মায়া ও অবিদ্যা। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা যিনি, তিনি মায়া, আর যিনি মলিন সত্বপ্রধানা, তিনি অবিদ্যা। মায়াপ্রকৃতির মিলনে পরমপুরুষ ঈশ্বর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। অবিদ্যা প্রকৃতির মিলনে তাঁহারই জীব সংজ্ঞা। তাহা হইলে একই পরব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ। মায়াতীত ভাব নির্গুণ, জীব ও ঈশ্বরভাব সগুণ, কেননা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত মিলনভাব। নির্গুণভাবে ব্রহ্মকে অক্ষর বলে এবং ভূতভাবে (মহাভূত পঞ্চ ও জীবভূত) তিনিই ক্ষর।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥"

(গীতা)

ক্ষর এবং অক্ষর ব্যতীত আর একটি ভাব আছে। সেইটী ঈশ্বরের ভাব, সেইটী উত্তম ভাব। ভূতভাব আবিদ্যক, ঈশ্বর ভাব মায়িক। ঈশ্বরভাব ক্ষরাক্ষর উভয় ভাবের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং ক্ষরাক্ষর উভয়াত্মক।

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহ মক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

(গীতা)

অন্য উত্তমপুরুষ পরমাত্মা ঈশ্বর, যিনি লোকত্রয় প্রবেশ করিয়া ধারণ করিয়া আছেন। আমিই সেই পরমাত্মা। আমিই ক্ষরেরও অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এজন্য আমাকে পুরুষোত্তম বলে। আমিই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্, আমিই ব্রহ্ম, আমিই পরমাত্মা। "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে"। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমিই ক্ষর পুরুষ, আমিই অক্ষর, অচিন্ত্য ও অব্যক্ত নির্গুণ ও গুণাত্মক পুরুষ। সমস্ত জগতের আমি আধার, আমিই ব্রহ্ম।

"অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

এই বলিয়া সকলে আমাকে প্রণাম করে। ক্ষরভাবে আমি জীব, প্রাকৃত মনুষ্যশরীরী ও প্রাকৃত মনুষ্যের মত নানালীলাকারী। লোকশিক্ষার জন্যই আমি লীলাকারী বিগ্রহ পরিগ্রহ করি। ঈশ্বরভাবকেও শ্রুতি অনেক স্থানে অক্ষর বলিয়াছেন:—"অক্ষরাৎ পরতঃপরঃ" অস্য রাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" পরব্রহ্ম অক্ষরের পর এ বাক্যে অক্ষর শব্দে সগুণ ঈশ্বর ভাব। ভূভার-হরণের জন্য নানারূপে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন্। মূঢ় ব্যক্তি তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, এজন্য তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

মূঢ়গণ আমাকে সামান্য মনুষ্য মনে করে; আমি ভূতমহেশ্বর, তাহারা আমায় সেভাব জানে না, ইহা গীতা বাক্য।

গীতা আবার বলেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

আমি যদিও অব্যয়াত্মা, ভূতগণের ঈশ্বর ও অজ, তথাপি স্বীয় প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া আত্মমায়ায় সম্ভূত হই। শ্রীমধুসূদনের অলৌকিক কার্য্যকলাপ স্মরণ করিলে তাঁহার অবতারবাদে অনুমাত্র সন্দেহ নিতান্ত পামরের মনেও স্থান পাইতে পারে না। গোবর্দ্ধন-ধারণ, কালীয়দমন, শ্রীকুরুক্ষেত্রলীলা প্রভৃতি অধিকাংশ কার্য্যই তাঁহার অবতার-বাদের পরিচায়ক। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার রাসলীলাও সামান্য অলৌকিক নহে। "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ" গোপিকাগণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি যুগপৎ প্রকটিত করা সামান্য মানবের সাধ্য নহে। কায়ব্যূহ শক্তি ঐশ্বরী, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। পুরুষোত্তমের দেবকীউদরে জন্ম প্রকৃত নহে, আবির্ভাব মাত্র। আবির্ভাব অন্তর্ধান ঐশী শক্তি। স্কন্ধারোহণ জন্য শ্রীমতী যখন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন, ইহা ভাগবতের উক্তি। অলব্ধবিনির্গমা গোপিকাগণ অন্তর্গৃহগতা থাকিয়াও শ্রীগোবিন্দের দর্শন ধ্যান মাত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তত্তৎ গোপিকাগণের পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবির্ভাব তিরোভাব, জন্ম মৃত্যু অবশ্য ঔপাধিক আবিষ্কক মাত্র। আত্মার জন্ম নাই, নিধন নাই; তিনি অনাদিনিধন, তিনি অজ অনন্ত, তিনি লীলাবপুঃ অনন্ত শরীরী ও অনন্ত লীলাময়। সামান্য কীটপতঙ্গাদির শরীরে অবস্থান করিয়াও তিনি কত অনন্ত লীলা করিয়া থাকেন, তাহাদেরও দেহ—বৃন্দাবনে তিনি বিরাজ করেন, সেখানেও তাঁহার রসময় পুরুষের রাস। ধন্য বৃন্দাবনের তরুলতা গুল্ম, ধন্য কালিন্দীতট, ধন্য কদম্ব তরু, ধন্য গোপ গোপিকাগণ, ভ্রমর, পিক ও মৃগগণ ধন্য, তাহারা শ্রীগোবিন্দের সহবাস করিয়াছেন।

পামর জীব যদি জন্ম সফল করিতে চাও, তবে শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ সংস্পর্শে পবিত্র যমুনাতটে গমন কর, তথায় শ্রীকৃষ্ণ নানা লীলাকেলিকরতঃ বিরাজ করিতেছেন। কলুষপরিপূর্ণ কলিকালে তাঁহার চরণারবিন্দভজনা ভিন্ন পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। তিনি ভবপারের কাণ্ডারী, তিনি করুণাময় ও রসময়। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি ভক্তিপ্রিয় মাধব। পঞ্চসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কেবল ভক্তিমার্গের উপাসক। শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়ের ধন। তাঁহারা আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমস্তই পুরুষোত্তমের প্রকৃতি বলিয়া জানেন। আত্মগোপিকাভাব তাঁহাদের সাধন। অর্চ্চন, বন্দন, স্মরণ, পাদসেবন, প্রভৃতি নবধা ভক্তিযোগে শ্রীগোবিন্দের তাঁহারা উপাসনা করেন। ভগবানের শ্রীমুখারবিন্দবিনিঃসৃত আদেশানুসারে তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া তাঁহারা ভোজন করেন না। পত্র, পুষ্প, ফল যাবতীয় প্রীতির বস্তু "কৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিয়া সমর্পণ তাঁহারা অভ্যাস করেন।

গীতানুশাসনে উক্ত আছে, ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

পত্র পুষ্প ফল জল ভ ি ভাবে আমাকে সমর্পণ করিলে, তাহা আমি গ্রহণ করি ও আমি প্রসন্ন হই। "ভগবৎ কৃপা হি কেবলম্" ইহা উপনিষদ্ বাক্য। তিনি প্রসন্ন থাকিলে কোন অভাবই থাকে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ তাঁহার কৃপায় অনায়াসে লাভ করা যায়।

তাঁহার আদেশ :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥" (গীতা)

তিনি সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি, কর্ম্মফলদাতা। যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষী নহেন, তাঁহাদিগকে তিনি নিজ সালোক্য, সাযুজ্যাদি প্রদান করেন। তাহাতেও যাঁহারা বীততৃষ্ণ, তাঁহাদিগকে তিনি রাতুল চরণে স্থান দান করেন। আত্মনিবেদক—মধুর রসসাধক এই পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্যই মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ। ইহাই রাস, ইহাই পরমার্থ, ইহাই তত্ত্ব। এই ভাবের যাঁহারা পিপাসু, তাঁহারাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাঁহারাই জ্ঞানী। আত্মনিবেদন অপেক্ষা কোন কর্ম্মই, কোন সাধনাই, কোন উপাসনাই শ্রেষ্ঠ নহে। সুতরাং আত্মনিবেদক কর্ম্মিগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সর্ব্বোপরি তাঁহাদের আসন। তাঁহারা জ্ঞানিগণেরও শ্রেষ্ঠ, যোগিগণেরও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই তপস্বী, তাঁহারাই মুক্ত। মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তি যতই মার্জ্জিত ও সূক্ষ্মরূপে পরিণত হউক, তথাপি পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিসহকারে কেহই ঐশ্বরিক কার্য্যকলাপের সর্ব্বতোভাবে মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে না। এই হেতু ঐশ্বরিক অবতার শ্রীভগবানের রাসলীলাঘটিত ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম উচ্চ অধিকারী ব্যতীত সামান্য হীনবুদ্ধি মানবের বোধগম্য নহে। ভগবান্ জগতের কুশল, দুষ্টের দমন, পাপের প্রশমন, ধর্ম্মের সংস্থাপন, বধ, নিয়ম ও আচারাদির সংরক্ষণ, কদাচার নাশ দ্বারা

সদাচারের পালন প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীণ নীতিসঙ্গত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা জন্ত মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক সংসারকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ের বহুতর প্রমাণাদি দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিলেই জীবের স্থায় ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যকতা সকলেই প্রতিপন্ন হয়।

আত্মা সর্ব্বগত অনির্ব্বচনীয়, নিরঞ্জন ও নির্ব্বিকার। কিন্তু তিনি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রাকৃত জীবের স্থায় লীলা করেন।

"মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ।
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ ইতি বিষ্ণুরচিন্তয়ৎ ॥
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্ব্বলোকমলাপহাং।
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ ॥

অধ্যাত্ম-রামায়ণ।

কর্ম্মানুসারে তাঁহার অনুকম্পায় যে লোকের নিজ নিজ অভিলষিত সুখলাভ হয়, ইহা সুখভোগ প্রদর্শন দ্বারা জানাইয়া গিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বিকারিত্ব স্বীকার করা যায় না। কেননা আত্মা অবিকারী। কিন্তু তিনি সাধকের সাধনানুসারে বিকারীর স্থায় প্রতিভাত হন। আপনি লিপ্ত না হইয়া লিপ্তবৎ নানাবিধ কামনার পূরণ করেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ" ॥
"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ (গীতা)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরিত বিষয় সাধারণে অনুকরণ করিয়া থাকে। দেখ অর্জ্জুন! ত্রিলোকের মধ্যে আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি অবাপ্ত অনবাপ্ত কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্ম করি। যদি আমি একেবারে কর্ম্মলিপ্ত না থাকি, তাহা হইলে আমার দৃষ্টান্তে সকলেই নিষ্কর্ম্মা হইয়া যাইবে ও লোক সকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। আমিই তাহা হইলে প্রজাগণের উৎসন্ন হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইব।" ভগবানের কর্ম্মানুষ্ঠান লোকশিক্ষার জন্য। রাস-লীলায় লোকশিক্ষা—সাধারণ লোকে না বুঝিয়া স্থূলদৃষ্টিতে অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশসাধন করেন, সমাজকে ব্যভিচার-স্রোতে প্লাবিত করেন, জাল' [illegible] যাইয়া

মন্দ করেন, অধর্ম্মের নিকট আত্মবিসর্জ্জন দেন। সাত্ত্বিক প্রেমই রাসের বিষয়। কেবল প্রেমশিক্ষাই রাসের উদ্দেশ্য। ভগবানে প্রেম, ভগবানে আত্মসমর্পণ, ভগবানে আত্মনিবেদন শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে পুরুষোত্তমের এই রাসলীলা। নরনারী নিজ নিজকে শ্রীভগবানের প্রকৃতি জানিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব দেহ মন প্রাণ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে, এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনার শিক্ষাই রাসের বিষয়, রাসের উদ্দেশ্য, রাসের উপদেশ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"কামং ক্রোধং তথা সৌখ্যং মৈত্রং পারুষ্যমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

(রাস পঞ্চাধ্যায়)

কাম, ক্রোধ, সখ্য প্রভৃতি নারায়ণে অর্পণ করিলে তন্ময়তা লাভ করা যায়। চেদীবংশীয় শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুভাবে ভগবানকে দেখিতেন। তাঁহারাও যখন সর্ব্বদা ভগবানকে চিন্তা করিতেন এবং সেই চিন্তনহেতু—তাঁহারাও ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রীতি এবং প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হন নাই, গোপিকাগণ কৃষ্ণকালী, তাঁহারা যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ব জানিয়াছেন, কৃষ্ণে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছেন—তাঁহাদেরই শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদেরই ভক্তিতে, তাঁহাদেরই প্রেমে বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ-বিধবা।

(গল্প)

(১)

ষোড়শী সধবা তাম্বুল-রাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর পার্শ্ব আস্তে আস্তে মুছিয়া, গণ্ডদ্বয় অঞ্চল দ্বারা উত্তমরূপে ঘষিয়া আর একবার ভাল করিয়া আয়নাতে মুখ দেখিলেন। কিন্তু নিজে দেখিয়া তত তৃপ্তি হইল না, তৎক্ষণাৎ মনে হইল এ সাজের আর গরব কি, যদি না সে দেখিল। তৎক্ষণাৎ গৃহের অপর পার্শ্বস্থ জানালায় দাঁড়াইয়া সজোরে কপাটের শব্দ করিলেন। জানালার পর রাজপথ, তাহার অপর পার্শ্বে রমণীবাবুর বাড়ীর বারান্দা।—সেই সময়েই বারান্দায় অর্থাৎ সধবার সম্মুখে এক সুন্দর পুরুষমূর্ত্তি, পশ্চাতে গৃহদ্বারে এক তরুণী বিধবামূর্ত্তি এবং সধবার অন্তরে কলুষমূর্ত্তি যুগপৎ আবির্ভূত হইল। ষোড়শী ঈষৎ হাসিমুখে জানালার অন্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইলেন; সুন্দর পুরুষ হাস্য-ভয়-লজ্জামিশ্রমুখে সূর্য্যোদয়ে আঁধারের ন্যায় বারান্দা হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। বিধবা অবনতমুখী নির্ব্বিকারা।

"ছোটবৌ !"—কথাটী বিধবার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই সধবা, পুরুষটীর ওরূপ ভাব দর্শনে ঈষৎ ভীতচিত্তে, পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন -ঠাকুরঝি ! সধবার ভয়জড়িত স্বরে "ঠাকুরঝি !"—সম্বোধন এবং বিধবার স্নেহ-প্রীতি মিশ্রিত "ছোটবৌ !"—সম্বোধন যমুনা-জাহ্নবীর ন্যায় পরস্পরে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ ভয়বিহ্বলচিত্তে বিধবার পায়ে পড়িয়া সরোদনে বলিলেন—"ঠাকুরঝি তোমার পায়ে পড়ছি, বল একথা ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না" বলিয়া অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

বিধবা অতি মাত্রায় বিস্মিতা হইয়া ও ছোটবৌকে উঠাইয়া বলিলেন, "ছোটবৌ, তুমি কি পাগল হয়েছ ? তুমি বড় ভাজ, আমার পূজনীয়া—পায়ে পড়িতে আছে কি ? কেন, ব্যাপার কি ?—এখন চল ভাত খাবে চল। ছেলেদের খাইতে দিয়া আসিয়াছি, আমি চল্লুম, তুমি এস। এই বলিয়া বিধবা দ্রুতগমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, সধবাও অন্যমনস্ক-ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

(২)

আজ সধবার অন্য ভাব উপস্থিত। আজ আর সকল সময় আয়নাতে নিজের মুখ দেখা নাই,—গাত্র পরিষ্কার করা নাই, হাসি হাসি ভাব নাই, কোনরূপ চপলতার লেশমাত্র নাই ; আজ সধবা স্থির ধীর গম্ভীর-প্রকৃতি। বারিপাত নাই, তড়িতের অট্টহাসি নাই, কোনরূপ গর্জ্জন নাই, প্রবল বায়ু নাই, আকাশ কিন্তু মেঘে আচ্ছন্ন—প্রকৃতির অতি স্থির নিস্পন্দভাব,—এই ভাবটী চিন্তা করুন, তাহা হইলে ষোড়শীর অন্তকার ভাবটী বুঝিতে পারিবেন।

অদ্য তাঁহার কাজ কেবল বিধবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান। যেন তাঁহাকে কত কি বলিবেন। মনের মধ্যে যেন ভীষণ সংগ্রাম, তুমুল কোলাহল—চাপিয়া রাখিয়াছেন ; একটু নির্জ্জন পাইবেন, আর বিধবাকে সেই সমস্ত কথা বলিবেন ; কিন্তু হায় ! সে অবসর পাইতেছেন না। বলি বলি করিতেছেন, বলা হইতেছে না। এদিকে বিধবারও কার্য্যের শেষ নাই, সুতরাং নির্জ্জনও হইতেছে না। বিধবা কেবল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ছোটবৌ ! আজ তুমি কেবলই আমার পাছু পাছু ঘুরিতেছ কেন ?"

বিধবার দৈনিক কার্য্য শেষ হইয়াছে। পিতা ভাগবত পাঠ করিবেন, সুতরাং ইতিমধ্যে বিধবা তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিয়া আসিয়াছেন। "ছোটবৌ, আমার সঙ্গ আজ ছাড়িতেছনা কেন ভাই ?" আর্দ্রবস্ত্র শুকাইতে দিয়া একটু বিস্মিত চিত্তে ষোড়শীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সেখানে অপর কোন লোক ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া সধবা পুনরায় বিধবার চরণে পড়িতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বিধবা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"ছোটবৌ ! আজ তোমার কি হয়েছে, বল দেখি ?" সধবা কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"বৌ! সংসারের কোনরূপ কুতূহল আমাদের ভালবাসা উচিত নয়। রহস্যময় কোনরূপ ঘটনা জানিতে আমার ইচ্ছা হয় না। সংসারের কার্য্য ও সৎপ্রসঙ্গে সময়াতিপাত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু কেন বৌ! তুমি নানাপ্রকারে আমাকে কুতুহলিনী করিতেছ? তোমার যাহা বলিবার থাকে, সহজে বল।"—কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেও বিধবা অতি নম্রভাবে, অতি ধীরে অতি স্নেহে সধবাকে ঐই কথাগুলি বলিলেন।

সধবা অগত্যা স্বীয় পাপবাসনা-সমুত্থিত সেই গৃহের ঘটনা সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—"তোমার ভাব দেখিয়া আমার চৈতন্য হইয়াছে। তোমার সুমুখে জানালা, তুমি ঘরে যাইয়াও সেদিকে দেখ নাই; আমি বুঝিয়াছি তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই নীচের দিকে থাকে। আর আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই বাহিরে যাইবার সুযোগে থাকে। তার পর তোমার অবস্থা ও আমার অবস্থার তুলনা করিয়াছি। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া যাহা বুঝিতে পারি নাই, আজিকার একটী ঘটনাতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি। ঠাকুরঝি, আমি নরকের ঘৃণিত কৃমি কীট, তুমি স্বর্গের দেবী। তোমার নিকটে থাকিতেও আমি উপযুক্তা নই। ঠাকুরঝি, বল আমার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?" সধবা কথাগুলি বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বিধবা কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। সধবার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন।

(৩)

সধবার প্রণয়পাত্র. বিধবাদর্শনে অন্তর্হিত সুন্দর পুরুষের নাম,—রমণীমোহন রায়। তিনি সেই গ্রামের প্রাচীন জমীদার-বংশসম্ভূত। রমণী বাবু সতীশ মুখার্জ্জীর পরমবন্ধু; সতীশবাবু ওকালতী পাশ করিয়া সহরে প্রাকৃটীশ করেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ষোড়শী সধবা তাঁর আদরের পত্নী—নাম সরলাবালা। বিধবা তাঁর ভগিনী, নাম নারায়ণী। এ ছাড়া বাটীতে তাঁর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ এবং দুটী ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। সকলেই একান্নভুক্ত। পিতা সেকেলে ধার্ম্মিক লোক, সুতরাং একালের হাবভাব দেখিলে চটিয়া যান। তিনি বৈকালে তাঁর পরিবারবর্গের নিকট ভাগবত পাঠ করেন। স্ত্রী ও বধূদ্বয়কে প্রাচীন রীতি-নীতি শিক্ষা দেন। ভাগবত কুরুচিপূর্ণ, পুরাতন রীতি-নীতি, কুসংস্কার ও কুশিক্ষার মূল—ইহাই সতীশের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সুতরাং এরূপ কার্য্যের প্রশ্রয়দাতা পিতা-মাতার উপর সতীশ যে সহজে ক্রুদ্ধ হইবেনই, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? কিন্তু "পাড়া গেঁয়ে" ছেলের মনে বিশেষ বিরাগ থাকিলেও জোর করিয়া পিতা-মাতার সে অত্যাচার একেবারে নিবারণ করিতে সাহসী হন নাই। তবে মাকে এক দিন বলিয়াছিলেন "মা! ছোট-বৌকে উঠান পরিষ্কার করিতে শিখাইও না। বেশী খাটাইও না, আর সর্ব্বদাই দেড়হাত ঘোমটা দিতে উপদেশ দিও না। ছাদে উঠিয়া বায়ুসেবন করিলে, বা—জানালাটা খুলিয়া একটু দাঁড়াইলে বাধা দিওনা। আর আমি বাড়ী থাকিলে

সে যেমন প্রত্যহ সাবান মাখে, বেশ-বিন্যাস করে, আমি বাড়ী না থাকিলেও সে তাহাই করিবে, তুমি তাতে বাধা দিওনা। আমি বাড়ী না থাকিলে সে যাতে মনের আনন্দে থাকে, তাহার চেষ্টা করিবে। রমণীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ছোট-বৌ'এর ভাব আছে—মাঝে মাঝে সেখানে যাইতে চাহিলে যাইতে দিবে। নতুবা স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে। আর বাবার "ভাগবতপাঠের" কাছে তাকে কদাচ লইয়া যাইও না। মা! তোমরা, সেকেলে অনেক কুসংস্কার নিয়ে থাক, তাই আমাকে একথাগুলি বলিতে হইল।"

এই কথা বলার একমাস পরে সতীশ মাকে আর একবার বলিলেন যে, মা! তুমি আমার কথা শুনিলে না, অনেক বিষয়ে ছোট-বৌকে খোঁটা দেও। আমি আর কি করিব? আমি বিদায় হইলাম—আমায় আর তোমরা দেখিতে পাইবে না। অকারণ 'নারী-নির্য্যাতন' আমি সহ্য করিতে অক্ষম।

সেই হইতে ছোটবৌ নিজের ইচ্ছামত চলিতেন, তাহাতে কেহ কোনরূপ বাধা দিত না। সতীশও মনের সুখে ছিলেন। জ্যেষ্ঠের উপর সতীশের অতিশয় ঘৃণা হইত। কারণ তিনি পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতেন না, তাঁহাদের সমস্ত কুসংস্কারকে তিনি অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। সেই জন্য সতীশ তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট জ্যেষ্ঠকে 'জড়ভরত' বলিয়া উপহাস করিতেন।

বালবিধবা নারায়ণীকে তিনি একটু অনুগ্রহ করিতেন—বিধবা অনাথা বলিয়া। তাঁহার জন্য দুঃখ করিতেন—আত্মদুঃখে অনভিজ্ঞা বলিয়া। এমন কি তিনি তাঁহার প্রাণের বন্ধু রমণী বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, যদি শীঘ্র পিতামাতার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বিধবা ভগিনীকে সুপাত্রে অর্পণ করিবেন।

প্রত্যহ বৈকালে যখন সতীশের পিতা ভাগবত পাঠ করিতেন, তখন শ্রীমতী ছোট বৌ নিজের ইচ্ছামত, অর্থাৎ সতীশের ব্যবস্থানুসারে রমণীবাবুর স্ত্রীর সহিত তাস খেলিতেন, নানারূপ উপন্যাস পড়িতেন, গান শিখিতেন। ভাগবতের কাছেও যাইতেন না, কারণ ওসব কুসংস্কার!

অদ্য রমণী বাবু ছট্‌ফট্ করিতেছেন ও সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। চিন্তাও আজ তাঁহার অনন্ত। নারায়ণী কি আমাকে ও তদবস্থাপন্না সরলাকে দেখিতে পাইয়াছে? না, সে যখন গৃহপ্রবেশ করে, তখন সে ত মাথা হেঁট করিয়াছিল। কিন্তু আমি যখন পশ্চাৎ ফিরিয়া ছিলাম, তখন যদি আমাকে দেখিয়া থাকে, অথবা সরলা তাহাকে দেখিয়া যদি থতমত খাইয়া থাকে? এমন কি হইবে? না, সরলা তত কাঁচা-মেয়ে নয়। আহা! নারায়ণীর কি লাবণ্য! বিধবা হইয়া তাহার যেন শ্রী বাড়িয়াছে। তাকে অনেক দিন দেখি নাই, দেখিবই বা কিরূপে? বাড়ীর বাহির হয় না। কোথায় লাগে এর কাছে সরলা! নারায়ণীর অঙ্গ সংস্কার নাই, পরিচ্ছদের বাহার নাই—তবু যেন রূপ ধরে না। কিন্তু তাহার দিকে মুহূর্তমাত্রও চাহিতে পারিলাম না।

ফাঁদ পাতিয়াছি মৃগ পড়িবে—যত মৃগ সব এই জালে পড়িবে। কিন্তু তবে মৃগের ভয়ে পলায়ন কি আমার মত লোকের উচিত হইয়াছে? নাই বা আমার সরলা হইত? না, ঠিক হইয়াছে,—সরলা ত আমার মুঠার ভিতর। নারায়ণীকে যে আমার করিতে পারিব, তার স্থির কি?" ভাবনার অন্ত নাই। অনন্ত, অসীম, অতল কূটচিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তখন অস্থির চিত্তে রমণীবাবু বারান্দায় বাহির হইলেন, মুখুয্যেমশাইয়ের ভাগবত পাঠও শুনিতে পাইলেন, কিন্তু অদ্য তাঁহার ভাগ্যে সরলাসমাগম হইল না। আজ তিনি সরলাকে কত কথা বলিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তিনি সেই গৃহের গবাক্ষদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া শিস্ দিতে লাগিলেন, একটু গলার শব্দও করিলেন। কিন্তু হায়! আজ সব বৃথা।

এইবার রমণীবাবুর মনে একটু ভয় হইল। বুঝিতে পারিলেন—নারায়ণী সমস্ত দেখিয়াছে এবং বাটীস্থ সকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। তখন তিনি নিরাশাব্যথিতচিত্তে নিজের ঘরে গিয়া উপস্থিত বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে বিধবা পরিত্যক্তা ছোটবৌ একবার গৃহে আসিয়াছিলেন, এবং রমণীবাবু যখন বাহিরে উক্ত প্রকার উপদ্রবে রত, সেই সময় সেই গৃহেই ছিলেন, অন্য দিন যিনি রমণীবাবুর একটু সঙ্কেত শব্দ শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতেন, অদ্য তিনি তাহার প্রণয়পাত্রকে নিজের গবাক্ষ দ্বারে উপস্থিত দেখিয়াও কোনরূপ সাড়াশব্দ দিলেন না। নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তখন তাঁহার মনে দাবানল জ্বলিতেছিল, এবং সেই মন-আগুনের উত্তাপে মুখমণ্ডল শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল।

অনেক পরে যখন রমণীবাবুর উপদ্রব থামিল, তখন আস্তে আস্তে অবনতমস্তকে সরলা গবাক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্বশুর যেখানে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া যথা-সম্ভব মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণীও তাঁহাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এদিকে কিন্তু পল্লীস্থ অন্যান্য বৃদ্ধারা, যাঁহারা ভাগবতপাঠ শুনিতে আসিয়াছিলেন বা প্রত্যহ আসিতেন, তাহারা হঠাৎ অদ্য সরলাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া একটু অস্ফুট তামাসা জুড়িয়া দিলেন, কারণ সতীশ তাঁহার মাতার নিকট যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাঁহারা তাহা অবগত আছেন। সরলার মন তখন ভাগবত পাঠ শ্রবণে ব্যগ্র। তাঁহার হৃদয় স্বাভাবিক আবরণে এবং বদন ও নয়ন অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল; সুতরাং বৃদ্ধা—মণ্ডলীর তামাসা ক্রমে লয় পাইল।

(৪)

রমণী বাবু কিয়ৎক্ষণ পরে আর একবার বারান্দায় আসিলেন। দেখিলেন সেই সুখময় গবাক্ষ যাহাকে তিনি একদিন পূর্ণিমা-সন্ধ্যা-শোভিত উদয়াচলের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন—সেই সরলা বদনকমল—বিকাশ—সরোবর সুন্দর গবাক্ষ, আজ যেন অমা রজনীর ঘোর অন্ধকারে আবৃত। সেদিকে আর চাহিতে পারিলেন না। এতক্ষণ মনে যাহা কিছু আশা ছিল, সম্পূর্ণ গবাক্ষাবরোধ দর্শনে, তাহা আর রহিল না। হতভাগী নারায়ণীকে

মনে মনে নানারূপ অভিসম্পাত করিলেন। আবার ভাবিলেন "উপায় স্থির করিয়াছি; নারায়ণীকে এবার দেখিব।—আচ্ছা, নারায়ণীর অপরাধ কি? সে ঘরে আসিয়াছিল বৈত নয়? তাহাকে অপদস্থ করিয়া কি হবে?"—

"নারায়ণী ষোলআনা দোষী। সে যখন সরলার মনের গতিক বুঝিতে পারিল, তখন সরলা এ কথা আর কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া নারায়ণীর নিকট নিশ্চয়ই অনেক প্রকার কাকুতি-মিনতি করিয়াছিল। আর নারায়ণী অহঙ্কারে সেকথা না শুনিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। তাই হায়! নিঃসহায়া সরলা, প্রাণের সরলা আমার আমার জন্য কতই না জানি তিরস্কৃত হইয়াছে; আজ সে গবাক্ষের সুন্দরী নিশ্চয়ই কোন গৃহে আবদ্ধ আছে। নতুবা একবার চকিতের মত আমাকে দেখা দিয়া যাইত। সেই কুসুম-কোমলার এরূপ নির্য্যাতনে কে দোষী? পাপিষ্ঠা নারায়ণী নহে কি?—আর অভাগিনী নারায়ণী! আমার বড় সাধে তুমি বাধ সাধিয়াছ; হস্তগত রত্নকে তুমি আমার হস্তচ্যুত করিয়াছ! সাবধান, আমি এবার কালসর্পরূপে তোমায় দংশন করিব, তোমার গর্ব্ব ঘুচাইব. তোমার সতীপণা দূর করিব।"

রমণীবাবু উৎকট উপায় স্থির করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ অশ্ব সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। বাড়ীতে অতিশয় কার্য্য-ব্যগ্রতা জানাইয়া অবিলম্বে অশ্বারোহণে করিলেন যাইবার পূর্ব্বে বাক্স হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া সঙ্গে লইলেন।

আজ একাদশী, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। জ্যৈষ্ঠ মাস, রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া একটী সধবা উপবাসিনী বিধবাকে বলিতেছেন;—"ঠাকুরঝি! তোমার আজ কষ্ট হইবে বলিয়া মা তোমাকে কোন কাজ করিতে দিলেন না। কিন্তু আমি তোমাকে কত জ্বালাতন করিতেছি। কি করিব ঠাকুরঝি, উপায় নাই। তিন দিন তোমার পেছনে ঘুরিয়াও গোটাকয়েক কথা বলিবার একটুও অবসর পাইলাম না। একটী সামান্য কথায় আমার মনের দাবানল তুমি নিবাইয়াছ। এখন আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, তুমি আমায় উপদেশ দিয়া সৎপথে না আনিলে, আমার মত পাপীয়সীর, নরকের ঘৃণিত কীটের কোন উপায় নাই।

বিধবা সস্নেহে বলিলেন ছোটবৌ! কষ্ট কি? মার মন—তিনি ভাবেন কাজ করিলে আমার কষ্ট হইবে। বিশেষতঃ আজ একাদশী, সেইজন্য তিনি আমাকে আজ কাজ করিতে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। মায়ের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, তাই ঘরে বসিয়া আছি। কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, এরূপ শুধু শুধু ঘরে বসিয়া থাকিলে আমার বেশী কষ্ট হয়। সে যাহা হউক, তুমি আমাকে উপদেশ দিতে বলিতেছ;—আমি কি জানি ভাই, যে উপদেশ দিব? সধবা বলিলেন "তুমি যা জান তাই জিজ্ঞাসা করিব"। বিধবা "বল"। সধবা "যৌবনে স্ত্রী-হৃদয় পবিত্র ও কামনা নির্ম্মল থাকিতে পারে কিরূপে? ঠাকুরঝি, তুমি বিধবা, আর আমি সধবা; দুই দিন না হ'ক, দশদিন অন্তরও আমার

স্বামীর সহিত দেখাশুনা হইতে পারে,—বিশেষ চেষ্টা করিলে স্বামীর সহিত আমি থাকিতে পারি, কিন্তু আমার সে দেরীও সহ্য হইল না, দুষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া পাপ-কালিমা-লিপ্তহৃদয়ে ব্যভিচারপাপে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হইতে ছিলাম। আর তুমি—তোমার স্বামি-দর্শন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সতী সাবিত্রী—তোমার স্বপ্নেও কখন ওরূপ দুষ্ট প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এই সকল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, হৃদয়ের পবিত্রতা, কামনার নির্ম্মল্যতা লাভ করা যায় কিরূপে?”

বিধবা—আমার তুলনা কেন করিতেছ? আমি অতি পাপিষ্ঠা। তবে তোমার কথার উত্তর, আমার জ্ঞান অনুসারে বলিতেছি, শোন। ভাই! মানুষের ইচ্ছা সুখের দিকে, সুখের উপায়ের দিকে, যে ব্যক্তি প্রকৃত সুখ কি তাহা জানে না, তাহার হৃদয় পবিত্র হয় না, কামনাও নির্ম্মল হয় না। সে সুখভ্রমে অভিভূত হইয়া দুষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হয়—হৃদয়ে পাপরাশি সঞ্চয় করে। এইজন্য কাহার নাম প্রকৃত সুখ, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত।

সধবা—ঠাকুরঝি! তোমার কথাটী ভাল বুঝিতে পারিলাম না। সুখ দুঃখ ত আপনা-আপনি বুঝা যায়, “এইটা সুখ, এইটা দুঃখ” ইহা কি আর অপরের কাছে শিখিতে হয়?

বিধবা—সুখ দুঃখ মানুষের অবস্থা বিশেষ মাত্র। সেই টুকুর অনুভবশিক্ষা মানুষ আপনা হইতে পায়, তার জন্য অপরের সাহায্য লইতে হয় না। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি, তাহা শিখিতে হয়। কাহারো নরহত্যা করিলে সুখ হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত সুখ নহে, কাহারও অপরের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলে সুখ, তাহাও প্রকৃত সুখ নহে, এইজন্য প্রকৃত সুখ কি তাহা শিখিতে হয়। মনে কর কাহারো মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিলে প্রকৃত সুখ হয়; কিন্তু না বলিয়া দিলে নূতন লোকে কি এ কার্য্যে সুখ অনুভব করে? তবে যাহার বাল্যকাল হইতে হৃদয় সুসংস্কারে গঠিত, তাহার আর যথার্থ সুখ কাহাকে বলে—শিখিতে হয় না। কিন্তু সে সংস্কারের মূলেও শিক্ষা বর্ত্তমান। স্ত্রীলোকের সেই প্রকৃত সুখ হইল স্বামি-সম্মিলনে।

সধবা—স্বামি-সম্মিলন ত প্রায় সবারই হইয়া থাকে?

বিধবা।—তা হ’তে পারে, আমি বলিতে পারি না। কিন্তু যথার্থ স্বামি-সম্মিলন কাহাকে বলে—বলিতে পার?

সধবা—কেন স্বামি-সহবাস?

বিধবা—না;—ঠিক তা নয়। স্বামি-সম্মিলন—স্বামীর সহিত মিলিয়া থাকা। ঠিক বুঝিতে হইবে—স্বামী আর আপনি এক। স্বামী আত্মা—আর আপনি দেহ। স্বামীর ইচ্ছা ভিন্ন নিজের কোন ইচ্ছা থাকিবে না। স্বামীর কামনা ভিন্ন নিজের কোন কামনা থাকিবে না। স্বামী যখন যাহা ভালবাসিবেন, নিজেও সেইরূপ করিবে। স্বামীর বর্ত্তমানে নিজেকে বর্ত্তমান, এবং তাঁহার অভাবে নিজেরও অভাব অনুভব করিবে। ছোটবৌ, বিধবার কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই, কামনা নাই। পরলোকগত স্বামীর প্রীতির জন্য সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্য করা উচিত। তবে কোন স্থানে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলে, মনে নানা চিন্তার উদয়

হয়, সেইজন্য নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে দমন করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া পরোপকার ও নানাবিধ সৎকার্য্যে সময়াতিপাত করা বিধবার কর্ত্তব্য। পরে বিধবার নিজের কার্য্যের মধ্যে তাহার প্রধান কর্ত্তব্য—স্বামিচিন্তা।

সধবা একেবারে কামনাশূন্যা বা প্রবৃত্তিশূন্যা নহে। স্বামি-কামনায় সধবার কামনা, স্বামি-প্রবৃত্তিতে সধবার প্রবৃত্তি। তা ছাড়া অন্যরূপ কামনা বা প্রবৃত্তি যাহার থাকিল, সে সধবার স্বামি-সম্মিলন হইল না। এইরূপ স্বামি-সম্মিলিতা হইতে চেষ্টা কর,—হৃদয় পবিত্র হইবে, কামনা নির্ম্মল হইবে।

বিধবার এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া সধবা তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে "তুমি দেবী" এই কথা বলিয়া বিধবার চরণে পতিতা হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্য।

শোক—সংবাদ।

৺স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন, সদ্‌গুণের আকর, ধার্ম্মিক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার রাত্রিকালে ভাগীরথীতীরে সজ্ঞানে আত্মীয়-স্বজনবর্গের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিনয়ী এবং সত্যবাদী একাধারে দুর্ল্লভ। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে তিনি একখানি ভগবদ্গীতা সর্ব্বদাই কাছে রাখিতেন এবং ভগবানের উপদেশ অনুসারে নিজের জীবনকে গঠিত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ ও নিরহঙ্কারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন, পরিশ্রম প্রভৃতি সকল কার্য্যেই নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়ায় তাঁহার একদিনের জন্য ঔদাসীন্য ছিল না।

এই মহাত্মা ৭৪ বৎসর বয়সে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, দৌহিত্র, প্রভৃতি বহু সংখ্যক আত্মীয়স্বজন রাখিয়া সজ্ঞানে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন। পীড়া হইবার পর যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার আরোগ্য লাভের আর কোন আশা নাই, তখন তিনি কলিকাতার উত্তরাংশে গঙ্গাতীরস্থিত স্বীয় বাটীতে গমন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। জননীকে গঙ্গাবাস করাইবার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

সেই বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গুরুদাসবাবুর উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার আদেশে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থিত ভবনে লইয়া যান। তথায় গিয়া গুরুদাসবাবু—তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রগণকে কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন। মৃত্যুর ছয়দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি গঙ্গাজল ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য ও পানীয় পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হারাণবাবুকে গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আদেশ করেন। গীতা শ্রবণ শেষ হইলে তিনি বলিলেন "আমার::চক্ষু ঢাকিয়া দাও"। প্রথমে হারাণবাবু পিতার আদেশ বুঝিতে পারেন নাই, গ্যাসের আলোকে কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া তিনি আলোক নিবাইয়া কক্ষটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি বারংবার চক্ষু ঢাকিয়া দিতে বলায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিয়া দেওয়া হইল। তখন গুরুদাসবাবু তিনবার বলিলেন,—"এই শেষ"। ইহার পর তিনি আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি গুরুদাসবাবুর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার রচিত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তকে তাঁহার উদার ও উন্নত ধর্ম্মভাব অতি সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ধর্ম্মে একান্ত আস্থা এবং অনুরাগ থাকাতে তিনি শাস্ত্রাদেশ অনুসারে জীবনযাপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। একে তঃ বিনয়, অমায়িকতা, নিরহঙ্কারিতা প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ গুণরাশিতে তিনি ভূষিত ছিলেন, তাহার উপর নিয়ত জ্ঞানচর্চ্চার ফলে তিনি আদর্শস্বরূপ হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্য গুরুদাসবাবুর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার বালকোচিত সরলতা ও অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং সদানন্দ ছিলেন এবং যাঁহার নিকটে গমন করিতেন, তাঁহাকেও আনন্দিত করিতেন। কি রাজপুরুষ, কি জনসাধারণ, কি হিন্দু কি অহিন্দু, গুরুদাসবাবু সকল শ্রেণীর সমান শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে সকল শ্রেণীর, সকল সমাজের লোকই মর্ম্মাহত হইয়াছে। গুরুদাসবাবুর তিরোভাবে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি সহজে পূর্ণ হইবে কি না কে জানে?

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার ষষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।০আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ এসমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক
৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে
ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non-Political Hindu Religious & Social Magazine.

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা।

পৌষ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৫ সাল।

এই সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাঁড়ে।

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত—

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—675

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, পৌষ। } চতুর্থ সংখ্যা

ব্রাহ্মণের প্রতি।

হে ব্রাহ্মণ! ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাদান!
কেন হেন শিথিলতা তব?
হের ধর্ম্মক্ষেত্র আজ জ্বলন্ত শ্মশান,
উঠে শুধু শিবাকণ্ঠরব।
সেথায় উঠেনা আর আবেগের স্বরে
সামধ্বনি লহর তুলিয়া,
আহুতির পূত অর্চ্চি প্রহরে প্রহরে
হোমকুণ্ডে থাকে না দীপিয়া।
যজ্ঞস্থল পরিণত বিলাসভবনে,
ব্রহ্মচর্য্য স্মৃতিতে কেবল,
সংযমের পরাজয় ইন্দ্রিয়ের রণে,
ব্রহ্মতেজ তুষার-শীতল!

বৈরাগ্য সঁপেছে প্রাণ আসক্তি লাগিয়া,
ক্ষমা দগ্ধ ক্রোধের অনলে,
লালসার লোলজিহ্বা ল'য়েছে টানিয়া
নিষ্কামতা আপন কবলে!
সত্বের আলোক রয় তমসা-আবৃত,
তত্বজ্ঞান বদ্ধ মোহজালে,
সরলতা কৌটিল্যের কুহকে পতিত,
নির্ম্মলতা নষ্ট পাপমলে!
হে ব্রাহ্মণ! জাগ, জাগ, ঘুমায়োনা আর,
সমাজের তুমি কর্ণধার,
নিত্য ধ্বংসপথে যায় সমাজ তোমার
দেখেও দেখনা একবার?
ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে ধনমত্ত হ'য়ে
বিষবৃক্ষ করেছ রোপণ,
সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙ্গি' স্বার্থের লাগিয়ে
হারায়েছ মহিম-আসন;
হের হের জাতিকুল সব টুটে যায়,
ধর্ম্মাচার থাকে নাক আর,
অধর্ম্মের 'বহ্নি জ্বলি' অনন্ত শিখায়
আর্য্যভূমি করে ছারখার।
উঠ, থাকিও না আর বিলাসের কোলে;
সংযমের রশ্মিটী টানিয়া
উদ্দাম সমাজে পুনঃ বাধহ শৃঙ্খলে,
লুপ্ত স্মৃতি দাও জাগাইয়া।
আবার উঠুক হেথা বেদের ঝঙ্কার,
হোমকুণ্ড জ্বলুক নিয়ত,
ব্রহ্মতেজ-দীপ্ত হ'য়ে ফুটুক আবার,
চাতুর্ব্বর্ণ্য হউক জাগ্রত।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

জগদীশ্বরের স্বরূপ কেমন ?

• গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠেও অবগত হইয়াছি যে, জগৎব্রহ্মাণ্ডের জীবসকলের দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞান, গ্রহণ, গমনাদি ক্রিয়া, সুখ, দুঃখাদির অনুভব ইত্যাদি জীবের যাহা কিছু, তাহা তাহাদের নিজস্ব নহে। জীবত্বটীও অবিদ্যার ফলমাত্র। প্রকৃত পক্ষে অসীম অনন্ত জগদীশ্বরের বক্ষে জ্ঞান পরিচালন ও পোষণশক্তি তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে। অর্থাৎ সমষ্টি জ্ঞান পরিচালনাদির মহাসমুদ্ররূপী জগন্মাতার বিশাল বক্ষে জীব ব্যষ্টিভাবাপন্ন জ্ঞান ক্রিয়াদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালাবৎ। জীব ও ঈশ্বরে কোনই ভিন্নভেদ নাই। কেবলমাত্র অবিদ্যাবশে আমিত্বের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করিয়া জীবনামে নিজের পৃথক্ একটা বস্তুসত্তা করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ কথা অনেক পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু যখনই ঈশ্বরের রূপ স্পষ্টভাবে বিশদরূপে বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তখনই বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে। ঐ সকল তত্ত্বকথা বারংবার যত পর্য্যালোচনা করিয়াছি, ততই জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে যে, তবে ঈশ্বর এই জগৎকে কিরূপ দর্শন করিতেছেন ? আমরা গাছের পাতা যেরূপ সবুজ দেখিতেছি, ফুল যেরূপ লাল দেখিতেছি, চন্দনের যেরূপ আঘ্রাণ পাইতেছি, শিরীষ যেরূপ কোমল বোধ করিতেছি, তিনিও কি সেই সেই রূপেই উপলব্ধি করিতেছেন ? অথবা তাহাই বা কেন ? ঐরূপ যে উপলব্ধি তাহা ত' তাঁহারই। না হয় জীবের অবিদ্যাবশতঃ ও প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্কীর্ণতাহেতু জীব এ বিচিত্র বিশ্বের নানাত্বের একত্ব কোথায় ও কিরূপ, কিম্বা সম্পূর্ণ অবয়ব কিরূপ দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু ঈশ্বর দেখিতে পাইতেছেন এ বিশ্ব তাঁহারই দেহ। তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই ; তাঁহার বাহিরও কিছুই নাই ; সমস্তই তাঁহার মধ্যে তাঁহার অবয়বস্বরূপ ভাসিতেছে। তবে যেমন আমাদের পদনখর হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তিনিও কি তদ্রূপই বিশ্বকে দর্শন করেন ? অধিকন্তু না হয় তিনি বুঝুন যে জীব ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাতেই ভাসমান মায়ার কণিকাংশ "অহং" জ্ঞান করিয়া সমস্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। জীবের এই ভ্রান্তি বুঝিতে পারাই কি ঈশ্বরের বিশিষ্টতা, কেবলমাত্র ইহাই কি জীব ও ঈশ্বরে ভিন্নভেদ ? অথবা ঐ যে লাল, সবুজ রূপ দর্শন, সৌরভাদির আঘ্রাণ ইত্যাদি রূপ জীবের জ্ঞান, অথবা তাহার অন্যান্য পরিচালন ও পোষণাদির ক্রিয়া, সমস্তই কি ভ্রান্তিপ্রসূত বলিয়া বিকৃত ? সুতরাং জগদীশ্বরের দর্শনাদি সমস্তই দিব্য ও প্রকৃত বলিয়া জীব হইতে কি বিভিন্ন ? তখনই প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। হে ভক্ত ! হে জ্ঞানি ! তোমরা যে কেহ তবে বলিয়া দাও, বুঝাইয়া দাও তাঁহার দর্শনাদি কি প্রকার ? তাঁহারই দৃষ্টিশক্তি যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকের মধ্য দিয়া ফুটিতেছে, তখন তাঁহার দর্শন ও আমাদের দর্শনে কেমন

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—675

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, পৌষ। } চতুর্থ সংখ্যা।

ব্রাহ্মণের প্রতি।

হে ব্রাহ্মণ! ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাদান!
　কেন হেন শিথিলতা তব?
হের ধর্ম্মক্ষেত্র আজ জলন্ত শ্মশান,
　উঠে শুধু শিবাকণ্ঠরব।
সেথায় উঠেনা আর আবেগের স্বরে
　সামধ্বনি লহর তুলিয়া,
আহুতির পূত অর্চ্চি প্রহরে প্রহরে
　হোমকুণ্ডে থাকে না দীপিয়া।
[illegible] পরিণত বিলাসভবনে,
　ব্রহ্মচর্য্য স্মৃতিতে কেবল,
সংযমের পরাজয় ইন্দ্রিয়ের রণে,
　ব্রহ্মতেজ তুষার-শীতল!

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—675

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

প্রথম বর্ষ। { ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, পৌষ। } চতুর্থ সংখ্যা

ব্রাহ্মণের প্রতি।

হে ব্রাহ্মণ! ভারতের শ্রেষ্ঠ উপাদান!
  কেন হেন শিথিলতা তব?
হের ধর্ম্মক্ষেত্র আজ জলন্ত শ্মশান,
  উঠে শুধু শিবাকণ্ঠরব।
সেথায় উঠেনা আর আম্বেয়ের স্বরে
  সামধ্বনি লহর তুলিয়া,
আহুতির পূত অর্চ্চি প্রহরে প্রহরে
  হোমকুণ্ডে থাকে না দীপিয়া।
যজ্ঞস্থল পরিণত বিলাসভবনে,
  ব্রহ্মচর্য্য স্মৃতিতে কেবল,
সংযমের পরাজয় ইন্দ্রিয়ের রণে,
  ব্রহ্মতেজ তুষার-শীতল!

বৈরাগ্য সঁপেছে প্রাণ আসক্তি লাগিয়া,
ক্ষমা দগ্ধ ক্রোধের অনলে,
লালসার লোলজিহ্বা ল'য়েছে টানিয়া
নিষ্কামতা আপন কবলে!
সত্বের আলোক রয় তমসা-আবৃত,
তত্বজ্ঞান বদ্ধ মোহজালে,
সরলতা কৌটিল্যের কুহকে পতিত,
নির্ম্মলতা নষ্ট পাপমলে!
হে ব্রাহ্মণ! জাগ, জাগ, ঘুমায়োনা আর,
সমাজের তুমি কর্ণধার,
নিত্য ধ্বংসপথে যায় সমাজ তোমার
দেখেও দেখনা একবার?
ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে ধনমত্ত হ'য়ে
বিষবৃক্ষ করেছ রোপণ,
সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙ্গি' স্বার্থের লাগিয়ে
হারায়েছ মহিম-আসন;
হের হের জাতিকুল সব টুটে যায়,
ধর্ম্মাচার থাকে নাক আর,
অধর্ম্মের 'বহ্নি জ্বলি' অনন্ত শিখায়
আর্য্যভূমি করে ছারখার।
উঠ, থাকিও না আর বিলাসের কোলে;
সংযমের রশ্মিটী টানিয়া
উদ্দাম সমাজে পুনঃ বাধহ শৃঙ্খলে,
লুপ্ত স্মৃতি দাও জাগাইয়া।
আবার উঠুক হেথা বেদের ঝঙ্কার,
হোমকুণ্ড জ্বলুক নিয়ত,
ব্রহ্মতেজ-দীপ্ত হ'য়ে ফুটুক আবার,
চাতুর্ব্বর্ণ্য হউক জাগ্রত।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

জগদীশ্বরের স্বরূপ কেমন ?

• গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠেও অবগত হইয়াছি যে, জগৎব্রহ্মাণ্ডের জীবসকলের দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞান, গ্রহণ, গমনাদি ক্রিয়া, সুখ, দুঃখাদির অনুভব ইত্যাদি জীবের যাহা কিছু, তাহা তাহাদের নিজস্ব নহে। জীবত্বটীও অবিদ্যার ফলমাত্র। প্রকৃত পক্ষে অসীম অনন্ত জগদীশ্বরের বক্ষে জ্ঞান পরিচালন ও পোষণশক্তি তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গেভঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে। অর্থাৎ সমষ্টি জ্ঞান পরিচালনাদির মহাসমুদ্ররূপী জগন্মাতার বিশাল বক্ষে জীব ব্যষ্টিভাবাপন্ন জ্ঞান ক্রিয়াদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালাবৎ। জীব ও ঈশ্বরে কোনই ভিন্নভেদ নাই। কেবলমাত্র অবিদ্যাবশে আমিত্বের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করিয়া জীবনামে নিজের পৃথক্ একটা বস্তুসত্তা করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ কথা অনেক পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু যখনই ঈশ্বরের রূপ স্পষ্টভাবে বিশদরূপে বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তখনই বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে। ঐ সকল তত্ত্বকথা বারংবার যত পর্য্যালোচনা করিয়াছি, ততই জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে যে, তবে ঈশ্বর এই জগৎকে কিরূপ দর্শন করিতেছেন ? আমরা গাছের পাতা যেরূপ সবুজ দেখিতেছি, ফুল যেরূপ লাল দেখিতেছি, চন্দনের যেরূপ আঘ্রাণ পাইতেছি, শিরীষ যেরূপ কোমল বোধ করিতেছি, তিনিও কি সেই সেই রূপেই উপলব্ধি করিতেছেন ? অথবা তাহাই বা কেন ? ঐরূপ যে উপলব্ধি তাহা ত' তাঁহারই। না হয় জীবের অবিদ্যাবশতঃ ও প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্কীর্ণতাহেতু জীব এ বিচিত্র বিশ্বের নানাত্বের একত্ব কোথায় ও কিরূপ, কিম্বা সম্পূর্ণ অবয়ব কিরূপ দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু ঈশ্বর দেখিতে পাইতেছেন এ বিশ্ব তাঁহারই দেহ। তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই; তাঁহার বাহিরও কিছুই নাই; সমস্তই তাঁহার মধ্যে তাঁহার অবয়বস্বরূপ ভাসিতেছে। তবে যেমন আমাদের পদনখর হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তিনিও কি তদ্রূপই বিশ্বকে দর্শন করেন ? অধিকন্তু না হয় তিনি বুঝুন যে জীব ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাতেই ভাসমান মায়ার কণিকাংশ "অহং" জ্ঞান করিয়া সমস্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। জীবের এই ভ্রান্তি বুঝিতে পারাই কি ঈশ্বরের বিশিষ্টতা, কেবলমাত্র ইহাই কি জীব ও ঈশ্বরে ভিন্নভেদ ? অথবা ঐ যে লাল, সবুজ রূপ দর্শন, সৌরভাদির অঘ্রাণ ইত্যাদি রূপ জীবের জ্ঞান, অথবা তাহার অন্যান্য পরিচালন ও পোষণাদির ক্রিয়া, সমস্তই কি ভ্রান্তিপ্রসূত বলিয়া বিকৃত ? সুতরাং জগদীশ্বরের দর্শনাদি সমস্তই দিব্য ও প্রকৃত বলিয়া জীব হইতে কি বিভিন্ন ? তখনই প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। হে ভক্ত ! হে জ্ঞানি ! তোমরা যে কেহ তবে বলিয়া দাও, বুঝাইয়া দাও তাঁহার দর্শনাদি কি প্রকার ? তাঁহারই দৃষ্টিশক্তি যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকের মধ্য দিয়া ফুটিতেছে, তখন তাঁহার দর্শন ও আমাদের দর্শনে কেমন

করিয়া পৃথক্ হইল? এরূপ এক এক করিয়া বলিয়া দাও তাঁহার জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ এবং তাহার শাখা-প্রশাখা কেমন? তাঁহার গ্রহণাদি কর্ম্ম কেমন? তাঁহার মনন কিরূপ? তাঁহাতে 'অহং' জ্ঞান আছে কি না? তাঁহার বুদ্ধি কিরূপ? তাঁহার প্রকৃতিই বা কিরূপ? আর কত জিজ্ঞাসা করিব? আর জানিই বা কি সে জিজ্ঞাসা করিব? জিজ্ঞাসারও সে শক্তি আবশ্যক। মোটের উপর আমার ইহাই অনুরোধ, ভগবৎতত্ত্বদর্শিগণ! মাদৃশ জিজ্ঞাসুর হৃদয়ের ঔৎসুক্য ও দৈন্য বুঝিয়া জগদীশ্বরের ও জীবের প্রতিমূর্ত্তি পাশাপাশি গঠন করিয়া তাহাতে প্রকৃতি হইতে অন্যান্য তত্ত্ব যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, কেমন করিয়া ঐ মহাসমুদ্র হইতেই শক্তিসমূহ তরঙ্গাকারে উত্থিত হইতেছে? উহারা কিরূপ এবং কেমন করিয়াই বা বিকৃত হইয়া জীবভাবাপন্ন হইতেছে? আরও বলিয়া দাও,—সত্য, দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি পরম পবিত্র ভাবসকল, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্যাদি রিপুসকল, সুখ, দুঃখ বোধ, এক কথায় বলিতে গেলে, জীবক্ষেত্রে উত্থিত তত্ত্ব, বোধ ও ভাবসমূহ ঈশ্বরক্ষেত্রে অবস্থান করে কি না? যদি করে, তবে তাহা কিরূপ? জীবের দয়া ও ভগবানের দয়া কি একই প্রকার, না ভিন্নভেদ আছে? অনাহারক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অস্থিচর্ম্মসার ব্যক্তি দেখিলেই আমাদের চিত্তে স্বতই দয়ার উদ্রেক হয়, স্বতই মনে হয় যে তাহাকে একমুষ্টি অন্ন দিই; ভগবানের কি তদ্রূপই ঘটিয়া থাকে? কিম্বা তিনি ত' সর্ব্বজ্ঞ; জীব নিজ কর্ম্মদোষে ঐরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে, ঐরূপ কষ্টভোগের দ্বারায় পূর্ব্বকৃত পাপ ক্ষয় হইতেছে, এ সমস্ত ত' তিনি বেশ বুঝিতেছেন। তিনি যাহা করেন, তাহা ত' জীবের মঙ্গলের জন্যই, তবে তদ্দৃষ্টে তাঁহার আবার দয়া হইবে কেন? ঈশ্বর পরিপূর্ণ, এ জগৎ ত' তাঁহারই লীলা? জীব কোথায়? তবে দয়া আবার কাহার উপর হইবে? এই প্রকার সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হইতেছে। অথচ জীবের ভাব তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, তাহার অস্তিত্বমাত্রও নাই, সমস্তই তাঁহাতেই ফুটিতেছে; সুতরাং সামঞ্জস্য করি কেমন করিয়া? ঈশ্বরের সম্বন্ধে যত ভাবি, যত চিন্তা করি, কেবল অন্ধকার; যত বুঝিতে পারি, ততই মনে হয় কিছুই বুঝিলাম না। হে বঙ্গদেশবাসী দার্শনিকগণ! কত দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করিয়া মাদৃশ অল্পবুদ্ধির চিত্তে নানা সংশয় যেরূপ উত্থিত করিয়াছ, আইস, আজ আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমরা কেহ উল্লিখিত মতে জীব ও ঈশ্বরের চিত্রাঙ্কণ করিয়া সংশয়বহ্নিদহন হইতে আমাকে রক্ষা কর'। ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্যক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, উপরের দুইচারিটী প্রশ্ন ভিন্ন আরও অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে। আমি কেবল বিষয়টার আভাস মাত্র দিবার জন্য সামান্য আকারে মাত্র কয়েকটী জিজ্ঞাসার অবতারণা করিয়াছি। সুধিবৃন্দ তাহার বিস্তারপূর্ব্বক উভয় তত্ত্ব নিঃশেষে আলোচনা করিবেন, ইহাই আশা ও প্রার্থনা।

শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ পাঁড়ে।

অম্বুবাচী-রহস্য

অম্বুবাচী হিন্দুদিগের একটী বিশেষ পর্ব্ব। এই পর্ব্বের সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের যোগ দেখা যায়। অম্বুবাচী সাধারণতঃ তিন দিবস ব্যাপী হয়। মিথুন রাশিস্থ সূর্য্যের আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগকালই অম্বুবাচী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অম্বুবাচীর তিন দিবস ভূমিখনন, বীজবপন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। যতি, ব্রতী ও বিধবাদিগের পক্ষে রন্ধনাদি নিষেধ ও অগ্নিপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ; এমন কি এই কয়দিবস অধ্যয়নাদিও নিষেধ। এই সমস্ত নিষেধ-বিধির কোনরূপ গভীর অর্থ আছে কি না এবং অম্বুবাচী পর্ব্বটী প্রকৃত কি, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিব।

অম্বুবাচীতে পৃথিবী রজস্বলা হন, ইহাই সাধারণ শাস্ত্রনির্দ্দেশ। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কিন্তু শাস্ত্রে স্পষ্টীকৃত হয় নাই। সেই তাৎপর্য্য আমাদিগকে অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

আমরা যতদূর অনুমান করিতে পারি, তাহাতে মনে হয় যে এই সময়ে পৃথিবী বৃষ্টিবর্ষণের দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনের অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই এই সময়টীকে পৃথিবীর ঋতুকাল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। নারীজাতি ঋতুমতী হইয়া গর্ভধারণ করে, পৃথিবীও বৃষ্টির দ্বারা আর্দ্রা হইয়াই শস্যধারণ যোগ্যা হয়, তাহাতেই বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীর আর্দ্রভাব যে ইহার ঋতুরূপে কল্পিত হইবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। প্রকৃতিবাদ অভিধানে অম্বুবাচীর এইরূপ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে যথা :—

"জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ দিবসে সূর্য্য যে বারে ও যে কালে মিথুনরাশিতে গমন করেন, তাহার পরের সেই বারে ও সেই সময়ে পৃথিবী রজস্বলা হন, (সম্ভবতঃ জলবর্ষণে পৃথিবী রসযুক্তা হইয়া বীজাদি ধারণ করিবার উপযোগিনী হন) ইহার নাম অম্বুবাচী।"

অম্বুবাচী শব্দের যোগার্থ হইতেও "অম্বু-জলবর্ষণ, বাচী যে বলে, অর্থাৎ সূচনা করে" * এইরূ অর্থেরই প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ আষাঢ়মাসেই বর্ষার বারিপাতের সূচনা হইয়া থাকে। বর্ষার এই প্রথম বারিপাতই "অম্বুবাচী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সময়েই শস্যোৎ-পাদনের পূর্ণ আয়োজন করিতে হয়। কিন্তু বর্ষণের মধ্যে কর্ষণ বা বপন সুবিধাজনক বা ফলজনক নহে বলিয়াই অম্বুবাচীতে হলকর্ষণ ও বীজবপন উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিষেধ সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোক্তি পাওয়া যায় :—

> "ন কুর্য্যাৎ খননং ভূমেঃ সূচ্যগ্রেণাপি শঙ্করি।
> বীজানাং বপনঞ্চৈব চতুর্ব্বিংশতিযামকম্"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মৎস্যসূক্তে মহাতন্ত্রে ৫৮ পটলঃ।

---

* "প্রকৃতিবাদ" দ্রষ্টব্য।

"হে শঙ্করি! সূচীর অগ্রভাগের দ্বারাও ভূমির খনন করিবে না; চতুর্ব্বিংশতি প্রহর বীজবপনও করিবে না।"

চতুর্ব্বিংশতি প্রহরে তিন দিবসই হয়। অম্বুবাচীতে ভূমিখনন ও বীজবপনের বিশেষ নিষেধ হইতে অম্বুবাচীর পর হইতেই যে রীতিমত কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইত, তাহার যথেষ্ট আভাসই পাওয়া যায়। ইহা হইতেই অম্বুবাচীকে হিন্দুদিগের শস্যোৎপাদনের বিশেষ পর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আষাঢ় মাসের প্রথম বারিপাতের পরই হৈমন্তিক শস্য রোপিত হইতে যে দেখা যায়, তাহাতে আমাদের অনুমানের যথেষ্ট সমর্থনই হয়। আষাঢ়মাস যে শস্যোৎপাদনের পক্ষে কিরূপ অনুকূল, বিশ্বকোষের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণই প্রদান করে।

"আষাঢ়মাস ধান্য-বপন করিবার প্রশস্ত সময়। এই মাসে কোন্ সময়ে ধান্য-বপন করিলে শস্যের শুভাশুভ ঘটে, তাহা কৃষিশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। কৃষিপরাশরে লিখিত আছে "আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিনে বাতাস পূর্ব্বদিকে বহিলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, ঐ বাতাস অগ্নিকোণে গেলে শস্যের হানি হয়, পশ্চিম দিকে গেলে জল হয়, বায়ুকোণে যাইলে ঝড় হয়, উত্তরদিকে যাইলে পৃথিবী ধান্যাদিশস্যে পরিপূর্ণ হয়, ঈশানকোণে গেলেও প্রচুর শস্য জন্মে।"

অম্বুবাচীতে আর্দ্রানক্ষত্রের সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধের যে উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, তাহাতেও পৃথিবী সিক্তা হওয়ার আভাসই যেন আমরা প্রাপ্ত হই। কারণ 'আর্দ্রা সিক্ত হওয়ার অর্থই প্রকাশ করে। এই নক্ষত্রে সূর্য্যের স্থিতিকালে বর্ষণ হইয়া পৃথিবী সিক্তা হওয়াতেই ইহার 'আর্দ্রা' নাম হইয়াছে কি না বলা যায় না।

আষাঢ়মাস মিথুনরাশি বলিয়া এবং মিথুনরাশিতে সূর্য্যের প্রবেশে অম্বুবাচী হওয়ায়, অম্বুবাচীতে যর্তা, ব্রতী, ও বিধবা কেন যে পাকাদি করিবে না, তাহা যেন কতকটা আমরা বুঝিতে পারি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় একত্রে "মিথুন"শব্দের বাচ্য। আষাঢ়মাসের মিথুনরাশি নাম হওয়ার মূলে স্ত্রীপুরুষের বিশেষ সম্মিলনের ভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। মিথুনরাশির নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় অমাদের অনুমানকে বিশিষ্টরূপেই দৃঢ়তা প্রদান করে:—

"স্ত্রীপুংসয়োঃ সমং ভদ্র-শয্যাসনপরিগ্রহৈঃ।
বীণাবাদ্যধৃগ্‌ মিথুনং গীতনর্ত্তকশিল্পিষু॥
স্থিতং ক্রীড়ারতির্নিত্যং বিহারো হবনিরস্য তু।
মিথুনং নাম বিখ্যাতং রাশির্দ্বৈধাত্মকঃ স্মৃতঃ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত বামনপুরাণ।

ইহার মর্ম্ম এই "যে সময়ে স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে শয্যাদি গ্রহণকরতঃ বীণাদি বাদ্যযন্ত্র ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বদা গীতনৃত্যাদি ক্রীড়া আমোদপ্রমোদ বিহারাদিতে রত হয়, তাহাই মিথুননামক রাশি বলিয়া বিখ্যাত।"

এইরূপে আষাঢ়মাস বিশেষ কামোদ্দীপনের কাল বলিয়া অথচ যতী, বিধবার পক্ষে কামোদ্দীপন দূষণীয় বিবেচনায়, তাহাদের সংযমের জন্যই যে অগ্নিস্পর্শ ও পাকাদি নিষিদ্ধ এবং বিশেষ সাত্ত্বিক আহারাদি বিহিত হইবে, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। আষাঢ় মাসের এক নাম 'শুচি'। ইহার আভিধানিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাতে বিরহিসকল শোকাভিভূত হয়। ইহা হইতেও আষাঢ়মাসে কামভাবের প্রবলতাহেতু যে বিরহ তীব্ররূপে অনুভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পায়। কালিদাসের "মেঘদূতে" আষাঢ়মাসের প্রথম দিবসেই বিরহপ্রপীড়িত হইয়া মেঘকে প্রিয়পত্নীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মেঘ দেখিলে যে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, কালিদাস "মেঘদূতে" তাহাও লিখিয়াছেন যথা—"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ" মেঘ দর্শনে সুখীব্যক্তির চিত্তেও ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আষাঢ়ের মেঘবর্ষণজনিত এই চিত্তবিভ্রম দমন করিবার জন্যই যতি, বিধবার জন্য ইন্দ্রিয়নিযমনের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ষার প্রথম মেঘে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ততাহেতু পাঠে মনঃসংযোগ হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই বোধ হয় অম্বুবাচীতে অধ্যয়নের নিষেধ হইয়া থাকিবে।

ব্রতীদিগের পলাশদণ্ডের এক নাম "আষাঢ়"। দণ্ড ইন্দ্রিয়সংযমনেরই রূপক। আষাঢ় মাসে ইন্দ্রিয়সংযমনের বিশেষ আবশ্যকতা হইতেই সম্ভবতঃ ব্রতীর দণ্ডের নাম "আষাঢ়" হইয়াছে। ইহা হইতে "অম্বুবাচীতে" ব্রতীর নাম, যতি ও বিধবার সঙ্গে কেন সংযোজিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। "চাতুর্ম্মাস্য" ব্রত আষাঢ় মাস হইতেই আরম্ভ হয়। এই প্রকারে আষাঢ় মাসের সহিত ব্রতের যোগ বিশেষভাবেই প্রমাণিত হয়।

এইরূপে হৈমন্তিক শস্যোৎপাদনের প্রধান পর্ব্বরূপে অম্বুবাচীর সহিত যে আরও ধর্ম্মানুষ্ঠান কিরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, আমাদের আলোচনায় তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বরপণ।

প্রায় চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কন্যা জন্মিলে সুখী হইতেন এবং পুত্র জন্মিলে কতকটা বিষণ্ণ হইতেন। ইহার কারণ কন্যাদ্বারা অনেকেই যথেষ্ট কন্যাপণ লাভ করিতেন, কিন্তু অপর দিকে পুত্রের বিবাহ অযথা কন্যা-পণের জন্য দুর্ঘট হইয়া পড়িত। কেহ বা অতি কষ্টে বিবাহ করিতেন, কেহ বা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ইহাদের ভাব এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে কন্যাপণ

দেওয়া তো দূরের কথা, বৈশ্ব কায়স্থাদির ন্যায় ইহাদেরও বরপণ দিতে হয়। বাস্তবিক যে স্রোতের বলে বৈশ্বকায়স্থাদির মধ্যে বরপণপ্রথা চরমে উঠিয়াছে, তাহারি প্রভাবে ব্রাহ্মণের দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন কৌলীন্যপ্রথার মূল শিথিল হইয়াছে। ইহাতে কতক স্থানে ব্রাহ্মণের পক্ষে কিছু উপকার ও হইয়াছে। কেননা এখন আর কোন পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয় না, এক বরে বহু কন্যাও অর্পিত হয় না, মেলপঠির বন্ধনও শিথিল হইয়াছে। কিন্তু এ উপকারসত্ত্বেও বরপণের ভীষণ ভাবী অনিষ্টাশঙ্কায় সকলেই শঙ্কিত হইতেছেন।

যাঁহারা এতদিন কৌলীন্য, কন্যাপণ-প্রথার বিষময় ফল দৃষ্টে বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকের কৃত কার্য্যে দোষারোপ করিতেছিলেন, তাঁহারা এই বরপণের অনিষ্টকারিতার জন্য কাহার দোষ দিবেন? এটা তো মূর্খ ও স্বার্থপর সেকেলে লোকের কৌলীন্যপ্রথা নহে? ইহা পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ও পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ সভ্যতার অঙ্গরূপে জাতও বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু ইহার বিশিষ্টতা এই যে কন্যার পিতা পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষস্থানে উঠিয়াও বরপণের কঠিন সমস্যায় মর্ম্মাহত হইতেছেন। ইহাও মন্দের ভাল, কারণ ইহাদ্বারা এই প্রতিপাদিত হয় যে, তিনি প্রাচ্যভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রাচীন রীতিনীতির বর্জ্জনাকাঙ্ক্ষী হইলেও যে উদ্দেশ্যে সে সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য তখনও বর্জ্জনীয় মনে করেন না। যদিও পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হইয়া তিনি বাল্যবিবাহ অনর্থের মূল মনে করেন, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতী হওয়ায় কোন দোষ দেখেন না, কিন্তু কন্যার সতীত্ব রক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এতদিন কন্যাপক্ষীয়গণ ধর্ম্মঘট করিয়া বরপণের পরিবর্ত্তে কন্যাপণের পুনরাবির্ভাব করাইতে পারিতেন। কেননা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যেমন মেয়ের আছে, পুরুষেরও সেইরূপ আছে, ইহাতে কোন প্রভেদ নাই। ক্রেতা বিক্রেতার গরজ অনুসারে যেমন পণ্যের দরের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে, বিবাহার্থীর গরজ অনুসারে সেইরূপ বর বা কন্যাপণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আমাদের হিন্দুর চক্ষে কন্যার অসতী হওয়া একটা ভীষণতম কলঙ্কের কথা। তাই আমাদের নবীন সম্প্রদায়ই হউন, আর প্রাচীন সম্প্রদায়ই হউন, পুত্র-বিবাহ অপেক্ষা কন্যা-বিবাহে বেশী গরজ না করিয়া পারেন না এবং সেই জন্যই বরপণ দেওয়া সমাজে অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই যে ক্রেতা বিক্রেতার গরজ অনুসারে পণ্যের মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হওয়া, কন্যাপণ বা বরপণ সম্বন্ধে এ নিয়ম আধুনিক। এ সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেও এভাব ছিল না। তখন সামাজিক নিয়ম বা কুলাকুলের উপর বিবাহ নির্ভর করিত। এ নিয়ম ভাল হউক বা মন্দ হউক, প্রাচীনগণ বিবাহটাকে জিনিষ কেনা-বেচার মত ক্ষুদ্রভাবে ব্যবহার করিতেন না; হিন্দুর সংসারে সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে ছিল এবং ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য ভিন্ন সকল কর্ম্মই অকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইত। কন্যাকর্ত্তা তাঁহার পিতা বা পিতামহের স্বর্গার্থে কন্যাদান করিতেন ও পাত্রও তাহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেন।

এখনও বচন সমস্তই ঠিক আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ বিবাহটী হইতেছে ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারবিশেষ এবং বিবাহের বহু দিবস পূর্ব্ব হইতে ইহার দরদস্তর আরম্ভ হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কুলীনবরের নিকট কন্যাদান করিতে সকলেই ব্যগ্র থাকিতেন, অকুলীনের নিকট অনেক অর্থ প্রত্যাশা থাকিলেও সে সম্বন্ধ অনেকে প্রত্যাখ্যান করিতেন, অথবা যিনি তাহা না করিতেন, তাঁহার সমাজে সম্মান কমিয়া যাইত। কৌলীন্যগত শত দোষ সত্বেও তখন বিবাহটী একটী অর্থগত ব্যাপার ছিল না, সামাজিক নিয়ম অনুসারেই হইত।

কৌলীন্যপ্রথা প্রথমে কিরূপ ছিল জানি না। কুলীনের লক্ষণ দেখিয়া তো মন্দ বোধ হয় না। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ ও দান এই নয়টী কুলীনের লক্ষণ। যে সমাজে ধনের গৌরব না করিয়া এই সকল গুণের গৌরব রক্ষা করা হয়, সে সমাজকে কে নিন্দা করিতে পারে? অন্ততঃ শ্রেষ্ঠত্বের এইরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে সমাজ পরিচালিত, তাহা নিশ্চয়ই এই পৃথিবীতে সর্ব্বাগ্রগণ্য।

আমরা কৌলীন্যপ্রথার শেষভাগে যাহা দেখিয়াছি, তখন কিন্তু ইহা তেমন প্রশংসনীয় মনে হইত না। এই সকল গুণ না থাকিলেও কুলীনের বংশধরগণ কুলীন বলিয়া গৌরব করিতেন। কুলীনের-মাহাত্ম্য না থাকিলেও কৌলীন্যপ্রথার একটা মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই ছিল, যেহেতু এই সামাজিক প্রথা অনুসারে চলিয়া কন্যার বিবাহে এখনকার মত বিভ্রাটে পড়িতে হইত না। কৌলীন্যটী কালক্রমে বংশগত না থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগত হইল, এক কৌলীন্যপ্রথা ভাঙ্গিল আর একটী গড়িয়া উঠিল। নিয়মবদ্ধ প্রথা রহিত হইল, উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল। বংশধর কুলীনের শ্রেষ্ঠতা যে কাল্পনিক বলিয়া অধুনা বলা হয়, তাহা সত্য; কিন্তু এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুসারে শ্রেষ্ঠতা স্থির হয়, ইহাও প্রথম অবস্থায় কতকটা ঠিক হইলেও, এখন কি কাল্পনিক নহে? সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগে এক সার্কুলার বাহির হইয়াছে যে শিক্ষাবিভাগে যদি ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ পাইতে হয়, তবে এম্-এ, পাশ করা আবশ্যক; বি,এ, পাশ করা ছাত্র প্রথম ৩৫৲ টাকার বেশী মাসিক বেতন পাইবে না। এই যে ৩৫ কি ৫০৲ মূল্যের ছাত্র, ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান কি কাল্পনিক নহে? আজকাল ভাল কৃষকগণ, সূত্রধরগণ ও রাজমজুরগণ ৩০।৩৫ টাকা মাসে উপার্জ্জন করে। ফৌজদারী আদালতের নগণ্য আমলা ও নকলনবীশগণ এবং পাটের ও অন্যান্য দ্রব্যের নিম্নতম ব্যবসায়িগণ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্জ্জন করে। অবশ্য শিক্ষিত ব্যক্তির সৎপ্রবৃত্তি ও মার্জ্জিত বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া যে অনেকেরই মার্জ্জিত বুদ্ধির নির্ম্মলতা থাকে না, উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে মাতালও আছে, সরকারী কাজে প্রবেশ করিয়া উৎকোচ গ্রহণ ও ওকালতি আরম্ভ করিয়া অসদুপায়ে একে অন্যের মক্কেল হরণ

ব্যাপারও আছে। তদ্ভিন্ন এই বরপণ গ্রহণই ইহার একটী উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। উচ্চশিক্ষিতমধ্যে কেহ বা নির্ব্বিকারচিত্তে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কেহ বা ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াও ইহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না; যিনি আজ ওজস্বিনী ভাষায় বরপণের বিপক্ষে বক্তৃতা করিলেন, তিনিই কল্য তাঁহার পুত্রের বিবাহে অযথা দাবী করিয়া বসিলেন।

কুলীনের যে নয়টী গুণের উল্লেখ করা হইল, আধুনিক পরীক্ষাগত কুলীনের তন্মধ্যে বিদ্যা ও বিদ্যাজনিত প্রতিষ্ঠা এই দুইটী গুণ থাকে, এরূপ কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু বিদ্যা বলিতে প্রাচীন হিন্দুগণ যাহা বুঝিতেন, এ বিদ্যা সে বিদ্যা নহে। যে বিদ্যাপ্রভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ সহজসাধ্য হয়, তাহাই বিদ্যা এবং সে বিদ্যালাভ করিলে সাত্বিকভাবে হৃদয় মন পরিপূর্ণ হয়; সুতরাং চরিত্রও আপনি সুগঠিত হয়।' এখনকার বিদ্যা যথোপযুক্তভাবে অর্থকরী না হইলেও অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে অর্জ্জিত এবং ইহা দ্বারা চরিত্র তেমন সুগঠিত হয় না, সুতরাং পরীক্ষাগত কুলীনের বিদ্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চধারণা এবং বিদ্যাজনিত প্রতিষ্ঠাও ভ্রান্ত।

এই বরপণ দ্বারা যে কেবল কন্যাপক্ষীয়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহা নহে, ইহা দ্বারা সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব ও শোচনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। যে বাল্যবিবাহ গৌরীদান প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া প্রাচীন সম্প্রদায়ে অপরিহার্য্যরূপে পরিগণিত ছিল, নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় কত বক্তৃতা ও কত চীৎকার করিয়াও যাহা বন্ধ করিতে পারেন নাই, তাহা ইহা দ্বারা আপনি বন্ধ হইয়াছে। কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় ঋতুমতী হওয়া অতি পাপজনক ও বীভৎস ব্যাপাররূপে সমাজের জ্ঞান ছিল, তাহা সমাজে চলন হইয়াছে। বৃদ্ধগণ ইহা দেখিয়া হৃদয়ে গোপনে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতেছেন। আবার কি কন্যাপক্ষ কি বরপক্ষ উভয়েই ইহা জানিয়া শুনিয়া অথচ যেন জানেন না এইরূপ ভাণ করিয়া ঋতুমতী কন্যার বিবাহের পর প্রত্যক্ষ ঋতুতে দ্বিতীয় সংস্কার করিতেছেন, আবার কোন কোন স্থলে বরপক্ষের সহিত আধুনিক শিক্ষা-বিভ্রাট মিলিত হইয়া কন্যা বিবাহের ৬ মাস মধ্যে সন্তান প্রসব করিতেছেন। হে পাশ্চাত্যশিক্ষাদীপ্ত নবীন হিন্দু! তুমিও কি ইহা শুনিয়া কর্ণে হস্ত প্রদান করিবে না? তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বহুকাল পর সাত্বিক ভাবাপন্ন সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিলেও, এরূপ ঘটনা এখনও নিত্য ঘটনা মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।

অর্থের অপব্যয় বরপণের আর এক দোষ। নিজের দেশে নিজের টাকায় বিবাহ দিতে যে খরচ করা সম্ভব, বৈবাহিকের টাকায় হইলে নিশ্চয়ই তদপেক্ষা বেশী খরচ করার প্রবৃত্তি জন্মে; পরন্তু বহু টাকা পণ পাইয়াও যদি বরপক্ষ একটু ধুমধাম না করিয়া বিবাহ দেয়, তবে স্থানীয় লোক তো নিন্দা করিবেই, কন্যাপক্ষ আরও অসন্তুষ্ট হয়েন। আজ যিনি পুত্রের বিবাহে অযথা পণ লইয়া মহাসমারোহে বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন, দুই এক মাস বা দুই এক বৎসর পর তিনিই আবার ঋণে জড়িত হইয়া কন্যার বিবাহে অযথা বরপণ দিয়া বরপক্ষকে

ঐরূপ মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করাইলেন; অথচ নিজ নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিলে ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় করিতেন কি না সন্দেহ। কি আশ্চর্য্য! কন্যা ও পুত্র প্রায় সকলেরই আছে, সকলকেই তাহাদের বিবাহে খরচ করিতে হয়, অথচ এই বরপণ-প্রভাবে খরচের উপর কাহারও হাত নাই। সকলকেই নিজের টাকা পরকে দিয়া পরের ব্যয়-শীলতায় অথবা পরের খামখেয়ালে নিজের টাকা খরচ করিতে হয়।

আর এক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমাজের প্রত্যেকেই বরপণ গ্রহণের পক্ষপাতী আবার প্রত্যেকেই ইহার ঘোর বিরোধী। যিনি আজ বরপণপ্রথার সমাদর করিয়া পুত্রের বিবাহে দুই তিন হাজার টাকা নগদ চাহিতেছেন, সোণার চেইন ঘড়ি চাহিতেছেন, ওজন করিয়া পুত্রবধূর সর্ব্বাঙ্গের ও সকল রকমের গহনা চাহিতেছেন, তিনিই আবার দুই চার মাস পর কন্যার বিবাহের সময় এই প্রথার বিরোধী হইয়া "বরপণে দেশ উৎসন্ন গেল, লোক জাতি মান গেল ইত্যাদি" বলিতেছেন। বরপণের দ্বারা সমাজে আর একটী শোচনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল লোক দরিদ্রতানিবন্ধন বিবাহ করিতেন না এখন বরের দর বেশী হওয়াতে, তাঁহারা ও পণের লোভে বিবাহ করেন এবং অল্পদিন মধ্যে অনেক সন্তান সন্ততির পিতা হইয়া সংসারের গুরুভারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহারা বিবাহ না করিলে, অথবা অর্থসঞ্চয়ের পর বিবাহ করিলে, কখনও এরূপ দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হইতেন না।

বরপণের এই সকল বর্ণিত দোষ এখন আর সমাজের অজ্ঞাত নহে। কি ব্রাহ্মণ-সভা, কি অম্বষ্ঠ সভা, কি কায়স্থ সভা, সকলই ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা, প্রস্তাবনা করিতেছেন। বাস্তবিক বরপণ দ্বারা, কি নবীন সম্প্রদায় কি প্রাচীন সম্প্রদায়, সকলেই সমভাবে বিপন্ন, কিন্তু নবীন সম্প্রদায়ের অগ্রগামিগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের মধ্যে বরপণ প্রথা নিবারিত হওয়া সম্ভব। তাঁহারা কন্যাবিবাহের জন্য ব্যস্ত নহেন; তাহাদিগের স্কুলে কলেজে পড়াইতেছেন, শিল্পশিক্ষা দিতেছেন, তাহারা বিদুষী হইয়া, শিক্ষয়িত্রী বা অন্য যে কোন কাজে নিযুক্তা হইতেছে। ইতোমধ্যে বিনা বরপণে বিবাহও মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘটিত হইতেছে। কেহ বা বিবাহ না করিয়াই থাকিতেছেন। বরপণ নিবারণের এই প্রণালীর সমালোচনা করা আমাদের নিষ্প্রয়োজন, তবে পূর্ব্বে বলিয়াছি এ প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের নিকট ইহা ছারপোকানিবারণের জন্য বিছানা পোড়াইয়া ফেলার মত অনুষ্ঠান। তাঁহাদের মধ্যে কিরূপে এই কুপ্রথা নিবারিত হইতে পারে, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

দুই একটী সাধুচরিত্রের লোক দুই একটী বিবাহে বরপণ লইতেছেন না। ইঁহারা বিনা বরপণে মেয়ে বা ভগিনী বিবাহ দিতে পারেন, তবেই ইঁহাদের সাধুতা বজায় থাকে। কারণ এরূপও দেখিয়াছি যে,সৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ প্রথম ২।১টী পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ করেন নাই। পরে যখন মেয়ের বিবাহে অযথা পণ দিতে হইল, তখন পূর্ব্বকৃত সৎকার্য্যের

জন্য অনুশোচনা করিয়া তৎপর হইতে পুত্রের বিবাহে পণ লইতে আরম্ভ করিলেন। উৎকোচ গ্রহণ ও উৎকোচ দান উভয়ই আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য। বরপণ গ্রহণ এবং বরপণ দানও সামাজিক হিসাবে দূষণীয়, এমন কি এজন্য অনেকে অর্থশালী কন্যাপক্ষকে বেশী দোষী মনে করেন, কারণ তাঁহারাই বাজার গরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা অক্লেশে সমধিক বরপণ দিয়া সৎপাত্র বাছিয়া লয়েন এবং অপর বরপক্ষ সেই নজীর দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কন্যাপক্ষকে ধনে প্রাণে বিনাশের চেষ্টা করেন। উৎকোচ সম্বন্ধেও ওরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কারণ সচ্চরিত্র নূতন শিক্ষিত যুবক বিষয়কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক সময়ই উৎকোচদাতা অর্থী বা প্রত্যর্থীর দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াই উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তবে বরপণবর্জ্জনদ্বারা সমাজে যে একটী সদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়, তাহার ভুল নাই। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে থাকিলে লোকের উচ্চ হওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু আর এক প্রকার অর্থশালী লোক আছেন, যাঁহারা বরপণ গ্রহণ করেন না, কিন্তু কৌশলে তাহার দ্বিগুণ আদায় করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিজেকে বেশ কৌশলী মনে করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কৌশল কি কন্যাপক্ষ, কি জনসাধারণ, কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাকে না এবং বরপণগ্রাহী অপেক্ষা লোকে তাঁহাদিগকে নিম্নতর স্থানই প্রদান করে। *

পূর্ব্বে যে কন্যাপণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা একটী পাপকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। যিনি কন্যাপণ নিতেন, তিনি সমাজে একটু হেয় হইতেন, কিন্তু বরপণের সে ভাব নাই। ধনরত্নসহ কন্যাদান শাস্ত্রসঙ্গত; বোধ হয় এই যুক্তিতে যিনি যত বেশী পণ লইতে পারেন, তিনি যেন নিজেকে ততই গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় দান এক কথা, আর আধুনিক দস্যুদিগের ন্যায় পিস্তল হাতে লইয়া দান করিতে বাধ্য করা আর এক কথা; উপরি উক্ত সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা নিশ্চয়ই এই অযথা গৌরবের কিছু খর্ব্বতা হইতে পারে, সুতরাং যে যতটা পারেন উক্তরূপে সদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে বরপণ নিবারণ পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয়, তাহার সংশয় নাই। তবে কথা হইতেছে, সংসারে এইরূপ সাধুপ্রকৃতির লোকের সংখ্যা অধিক নহে, কিন্তু এইরূপ সাধু কার্য্যে সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা এখনও তেমন কম নহে এবং তাঁহাদের দ্বারা সমাজের পুনঃসংস্কার ও শাসন-পদ্ধতি প্রচলন প্রত্যাশা করা যাইতেও পারে। সামাজিক শাসন চিরকালই বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং এখনও যদি ইহাকে রক্ষা

* বরপণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার কোন বিশিষ্ট সভ্যের এবম্বিধ আচরণ লক্ষ্য করিয়া লেখক ইহা লিখিয়াছেন কি?

ব্রাহ্মণ-সভা সম্পাদক।

করিতে হয়, তবে সামাজিক শাসন ভিন্ন হইবে না। কেহ নিজ ইচ্ছায় সৎকার্য্য করে, কাহাকেও বা বাধ্য করিয়া সৎকার্য্য করাইতে হয়, সমাজের নীতিই এই। যেস্থলে যাহার যাহা ইচ্ছা করিবে, একের অন্যকে অন্য মত কাজে বাধা দিবার সুযোগ নাই, সেস্থলে সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল বলিলেও ঠিক হয় না, সমাজের অস্তিত্বই লোপ পাইয়াছে বলিতে হইবে।

বল্লালসেন রাজা ছিলেন, কেবল সেই জন্যই যে তাঁহার কৌলীন্যপ্রথা সমাজ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এমত নহে, কারণ তখন সমাজের এতটা দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি যেই অন্যায় পথে পদচালনা করিলেন, অমনি সমাজের অনেকে তাঁহাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। তারপর দেবীবর ঘটক রাজা ছিলেন না, তথাচ তাঁহার প্রচারিত মেলবন্ধন সমাজে অকাট্য হইয়াছিল। সমাজের একটা প্রবল শাসনক্ষমতা না থাকিলে দেবীবরও ইহা পারিতেন না। এই মেলবন্ধন এখন আমাদের চক্ষে একটা অর্থহীন ও অনিষ্টকারী প্রথা মনে হইতে পারে, কিন্তু সে সময় নিশ্চয়ই ইহা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, নচেৎ সমাজে ইহা গ্রহণ করিত না। মেলবন্ধনের সূত্র হইতেছে "দোষাম্বয়ী মেল"। সম্ভবতঃ তখন বহুলোক যবনসংস্রব প্রভৃতি নানাভাবে দোষী হওয়াতে এখনকার মত সমাজে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। দেবীবর তাই মেলবন্ধন করিয়া তাহার নিরাকরণ করেন; কিন্তু এখন যে আবার নানাভাবে সমাজে দোষ প্রবেশ করিয়াছে। কেহ বা বিলাতে গমন করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণজন্য দোষী, কেহ বা স্বদেশে থাকিয়াই জাহাজের খালাশীদের উচ্ছিষ্টান্ন খাইয়া দোষী, কেহ বা বরপণ গ্রহণ করিয়া দোষী, কেহ বা গায়ত্রীবিহীন হইয়া দোষী, এই সকল দোষীর সংখ্যা তথাকথিত প্রাচীন সম্প্রদায়েও এখন কম নহে, কিন্তু যাহারা এই সকল দোষ পরিত্যাগ ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধতা অবলম্বন করিবে, তাহাদের দোষ ও গুণানুসারে একটা মেলবন্ধন এখনও হইতে পারে। কিন্তু সে মেলবন্ধন এখন করে কে? এখন সমাজের সে দৃঢ়তা নাই, সেই দেবীবর ঘটকের মত লোকও এখন সমাজে সর্ব্ববিষয়েই উদাসীন। বরং নবীন সম্প্রদায় তাঁহাদের সমাজের বিস্তৃতি বা প্রাচীন সমাজ ধ্বংসের জন্য কিছু চেষ্টা করিতেছেন। কারণ এখন প্রাচীন সম্প্রদায় যদি কেবল নিজ স্বার্থ সাধনার জন্য ব্যস্ত না থাকিয়া প্রচেষ্টাকে অভিযুক্ত না করিয়া নিজ মঙ্গলের সহিত সমাজের মঙ্গল ও জগতের মঙ্গল মিশাইয়া সেই উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে থাকেন, তবে তাঁহাদের সমাজ নিশ্চয়ই স্বল্পকাল মধ্যে জগৎ-বরেণ্য হইয়া উঠিবে।

আজকাল যে স্বরাজ সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার উপযুক্ত হইতেও ঐরূপ মহা-প্রাণতার আবশ্যক। কিন্তু এই যে আপনারা বরপণের জ্বালায় দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া স্বসমাজে ইহার প্রতিকার করিতে অলসতা প্রদর্শন করিতেছেন, আপনাদের স্বরাজের অনুপযুক্ত-তার কি ইহা প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? স্বরাজের কার্য্যে পররাজ্যের লোক বাধা দিতে পারে, কিন্তু স্বসমাজের কার্য্যে কেহ বাধা দিবার লোক নাই। নিজেরা ভ্রমাত্মক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সমবেতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেই কৃতকার্য্যতা অবধারিত। ৭৩

যে সামাজিক শাসনের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রবর্ত্তন করিতে সামাজিক নিয়ম থাকা প্রয়োজন। নিয়ম থাকিলেই নিয়মলঙ্ঘনকারীর শাসন করা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি নিয়মই না থাকে, তবে কাহার শাসন কে করিবে? সে অবস্থায় সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা অলঙ্ঘনীয়। পূর্ব্বে আপনাদের যেসকল সামাজিক নিয়ম ছিল, এখন নানা কারণে তাহার সমুদায়টী উপযোগী নহে। সামাজিক নিয়ম বেদ ও শাস্ত্রের কার্য্যের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় নহে; কিন্তু আধুনিক বিধি অনুসারে যেমন আবশ্যকতা অনুযায়ী উপবিধি প্রস্তুত বা বিধি সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত হয়, এই সামাজিক নিয়মও সেইরূপ পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে হইবে। এখন উচ্ছৃঙ্খলভাবে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাতে শাস্ত্রবাক্য পদদলিত হইতেছে, ও সমাজের সাত্ত্বিক ভাব লোপ পাইতেছে; সুতরাং নূতন উপবিধি বা সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তনের এই সময়। যদি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সম্পাদন না করেন, তবে সমাজ কিছুতেই রক্ষা হইবে না।

এই যে সভায় সভায় বরপণের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী সভা নিযুক্ত করা, বরপণ বর্জ্জনেচ্ছুদের নাম সংগ্রহ করা, তাহাদিগকে দলবদ্ধ করা, সামাজিক নিয়ম সংগঠন করা ও তদনুযায়ী কার্য্যপরিচালনের সাহায্যার্থ ঘটক নির্ব্বাচন করা এবং এই সকল নিয়মভঙ্গকারিগণকে সামাজিক নিয়মে শাসন করা প্রভৃতি করিলে কি প্রকৃত কাজ হইত না? কিন্তু এ সকল অনুষ্ঠান কোথাও দেখিতে পাইতেছি না।

কেহ কেহ বলেন ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কোন অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে কেবল ঈর্ষা, দ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং কার্য্যে কুফল ভিন্ন সুফল হয় না। তাঁহারা বলেন সদ্ধর্ম্ম ও সদাচার প্রচার কর, চতুষ্পাঠী স্থাপন কর, নিজে ভাল থাকিতে চেষ্টা কর, তাহাতে সমাজ আপনি ভাল হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই হয়? তাঁহাদের উপদেশ অনুযায়ী সদ্ধর্ম্ম ও সদাচার প্রচার ও সদনুষ্ঠান তো অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শাসন-পদ্ধতি না থাকিলে কি লোকের যথেচ্ছাচার নিবারিত হয়? পৃথিবীতে কি এমন কোন রাজ্য আছে, যাহা কেবল সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা উচ্চ অবস্থায় পরিণত, যাহাতে কোন রাজা নাই বা স্বতন্ত্র হউক বা প্রজাতন্ত্র হউক, কোন শাসন-পদ্ধতি নাই? রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের আবশ্যকতা একই শ্রেণীর; আমি ইহা নূতন কথা বলিতেছি না। কেহ কি এমন কোন সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন, যখন এরূপ শাসন ভিন্ন সমাজ সুপরিচালিত হইয়াছিল? এইরূপ শাসন-প্রণালী এখনও যে এখানে নাই, তাহা নহে। অশিক্ষিত জনগণ মধ্যে এখনও স্বাভাবিক সামাজিক স্বায়ত্ত-শাসন বর্ত্তমান; শিক্ষিতের মধ্যেও ইহা ইদানীং আংশিক ও গুপ্তভাবে [illegible]ই তাঁহাদের যথেচ্ছাচারের প্রবলতা। এই শাসন ঠিক প্রকাশ্য ও সাধুভাবে কারিত বলাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কথা হইতেছে, যেস্থলে সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন

করিয়া কোন শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কা নাই, সেস্থলে লোক সে নিয়ম মানিতে প্রস্তুত হইবে না। শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে গ্রামের মধ্যে কোন ব্যক্তি সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার সহিত আহারাদি ও ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ হইত, এমন কি তাহার ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিত। সুতরাং ভয়ে কেহ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিত না। এইক্ষণ গ্রাম্য সমাজের সে ক্ষমতা নাই। শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসায় উপলক্ষে এখন অনেকেই বিদেশে ও সহরাদিতে থাকেন ও তাঁহারা গ্রাম্য-সমাজের কোন ধার ধারেন না, বরং গ্রাম্য লোকই অনেক সময় তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন এবং সহরেও নানাস্থানের লোক একত্র থাকাতে, তাঁহাদের কোন সামাজিক বন্ধন নাই। এই জন্যই সমাজে সর্ব্ব বিষয়ে যথেচ্ছাচারের এত প্রবলতা হইয়াছে। এইক্ষণ ইহা নিরাকরণ করিতে হইলে গ্রামে ও সহরে ও এই প্রদেশের সমস্ত সমাজে আন্দোলন করা আবশ্যক। যদিও এখন আহারাদি বর্জ্জন বা ধোপা নাপিত বন্ধ করার কথায় কেহ ভীত হয়েন না; কিন্তু বিবাহাদি কার্য্যে এখনও কেহ সমাজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে সাহস করেন না। আর বরপণের দ্বারা সমাজে যে বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহাও সম্ভবতঃ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন্। এ অবস্থায় এই বঙ্গদেশে বরপণবর্জ্জন উদ্দেশ্যে বিবাহসম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন ও নিয়মলঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে কতকটা শাসন নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে নিশ্চয়ই সুফল প্রসূত হইবে, এমত মনে করি। কয়েকজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি যদি দেশের জন্য ও সমাজের জন্য কিছু পরিশ্রম করিয়া এ সম্বন্ধে লোকমত সংগ্রহ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তবে বরপণ নিবারণ একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না।

যে সকল মহানুভব ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সম্বন্ধে নানা গ্রামেও নানা সহরে থাকিয়া প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা পত্রাদি দ্বারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া যদি একটা কার্য্য-প্রণালী স্থির করেন, তবে সমুদয় বঙ্গদেশে তদনুসারে কার্য্য চলিতে পারে। কে কোথায় এ সম্বন্ধে উদ্যোগী আছেন, তাহা না জানা থাকাতে এরূপ পরামর্শের বাধা হইতে পারে। কিন্তু যদি সকলেই তাঁহাদের মত "ব্রাহ্মণ-সমাজে" কিম্বা এইরূপ অন্য কোন পত্রিকায় প্রেরণ করেন ও তিনি তাহা নিজের ও অন্যের কাগজে প্রকাশ করেন, তবেই এ বাধা দূরীভূত হইতে পারে।

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যেমন একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগান নূতন অবস্থায় অতি মনোহর থাকে, কিন্তু কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাহাতে ক্রমশঃ নানারূপ অকর্ম্মণ্য লতাগুল্মাদি জন্মিলে সে মনোহর দৃশ্য আর থাকে না এবং তাহারপূর্ব্ব দৃশ্য আনিতে হইলে সম্মুখের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মৃত্তিকা পরিপাটী করা ও ফুলগাছগুলির কেয়ারী করা আবশ্যক হয়, আমাদের সমাজে সেইরূপ কালে কালে নানা আকারের ব্যাভিচার পরিষ্কার করা আবশ্যক হয়। আদিশূরের যজ্ঞ, বল্লালী কৌলীন্য ও দেবীবরের সংস্কার এইরূপ জঙ্গল পরিষ্কারের উপমাস্থল। এইক্ষণও

আমাদের এই সমাজরূপ বাগানে পুনরায় দেশী বিদেশী নানারূপ আগাছা জন্মিয়াও ইহাকে ধ্বংসের মধ্যে আনিয়াছে ও ইহার পুনঃসংস্কার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমরা কোথাও আদিশুর বা বল্লালসেনের আবির্ভাব আশা করিতে পারি না। এমন রাজ্যশাসনবিষয়ে যেমন প্রজাতন্ত্রপদ্ধতির প্রাবল্য, সামাজিক বিষয়েও সেইরূপ সকলে মিলিয়াই এ কাজ করিতে হইবে। তবে একটী বিষয়ে সাবধানতা আবশ্যক যে এই সংস্কারে শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন করা না হয়; ফুলবাগানের ফুলগাছ কাটিয়া জঙ্গল রাখা না হয়, অথবা ফুলগাছ ও জঙ্গল সকলই উন্মূলিত করিয়া পেঁয়াজ, রসুনের ক্ষেত্র করা না হয়। তহাতেও একপ্রকারের একটা প্রয়োজন সাধিত হইবে বটে, কিন্তু আর্য্যঋষিগণের অতি সাধের অতি মনোরম ফুলের বাগানটীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইবে। যাহাতে সেরূপ সংস্কার না হয়, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

শ্রী -

আমাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের এ অবস্থা কেন? আমাদের দেশ আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের জ্ঞান, আমাদের কর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ভক্তি, আমাদের বিশ্বাস, এই আমাদের বলিতে যাহা কিছু, তৎপ্রতি একটুও দৃষ্টি করিলে স্বভাবতই মনে জাগিয়া উঠে, আমাদের এ অবস্থা কেন?

আজ সারাটা বিশ্ব পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত, আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। সমগ্র জীবজগৎ আজ উন্নতির উন্নত শিখরে সমারূঢ়, আর আমরা শুধু অবনতির অতলতলে নিমজ্জিত। সুস্থ ও সবল দেহে আজ নিখিল মানবসমাজ উৎসাহকে অঙ্গরাগ করিয়া কর্ম্ম জগতে কর্ম্মবীর। আর আমরা রোগ শোকশীর্ণ দেহে আলস্য অঙ্গরাগ মাখিয়া নীরব প্রান্তরে নিক্রিয়। এ প্রভেদের হেতু কোথায়, আমাদের এমন অবনতি, এমন দুরবস্থা ঘটিল কেন? এস্থলে আমরা বলিতে "হিন্দু" এবং আমাদের দেশ বলিতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকেই বুঝিতে হইবে।

এখন এই "কেন"র মীমাংসা করিতে হইলে প্রথম দেখিতে হইবে—আমরা কি চির দিনই এইরূপ ছিলাম? তাহা নহে, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে যখন কিছুই চিরদিন সমান থাকে না, যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব-দেহেও উন্নতি অবনতির সুখ ও দুঃখের চক্রাকারে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, তখন আমাদের এই বিশাল সমাজ-দেহেরও বর্ত্তমান অবনতিই পূর্ব্বোন্নতির প্রমাণ।

এ ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাসে ও আমাদের ভারতাদি পুরাণশাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুভ্রযশঃকিরীটিনী অনন্তসাগরাম্বরা ভারতভূমি একদিন মানবের মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত ছিল, এক দিন এই পুণ্যভূমি জগতের শিক্ষাগুরুর সমুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, এক দিন ভারতের হিন্দুই সভ্যসমাজে আদর্শ বলিয়া জগতের চক্ষে প্রতিভাত ছিল।

কিন্তু সে উন্নতির মূল কোথায়? প্রত্যেক দেশ বা প্রত্যেক জাতিকেই দেখা যায় একটা না একটা বিশিষ্টতা লইয়া তাহারা সমুন্নত, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য। কিন্তু আমাদের সেই সভ্যতার, সেই সুশিক্ষার, সেই উন্নতির দিনের বিশিষ্টতা কি? কি লইয়াই বা আমরা তেমন হইয়া ছিলাম। একটু অনুসন্ধিৎসা লইয়া অগ্রসর হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়—আজ প্রায় অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর ইংরাজরাজ ভালবাসা ও রাজনীতি লইয়া জগতে সমুন্নত, আমেরিকা বিজ্ঞানতত্ব ও অর্থনীতি লইয়া সমুন্নত, ভারতও তেমন একদিন স্ব স্ব ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভগবানে ভক্তি লইয়াই জগতে সমুন্নত ছিল।

আর আজও যে সেই ধর্ম্মের ক্ষীণ আলোক,সেই আধ্যাত্মিকতার অস্পষ্ট রেখা ভারত-ভাগ্যে যে অঙ্কিত নাই, তাহাও নয়। ভারতে কেহ স্বাস্থ্যরক্ষা উদ্দেশ্য লইয়া একাদশী করে না, ধর্ম্ম তাহাদের বাঞ্ছনীয়। ভারতে কেহ দরিদ্রের সাহায্য জন্য ধন দান করে না, পুণ্য তাহাদের প্রার্থনীয়। ভারতের যাগযজ্ঞ উৎসবের জন্য নয়, স্বর্গপ্রাপ্তিই তাহার উদ্দেশ্য। আর শুধু ইহাই নয়; ভারতের জল, স্থল, আকাশ, বাতাস, বিবেক, বৈরাগ্য সকলই ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তিতেই অনুপ্রাণিত; এক কথায় বলিতে গেলে ভারতের বা হিন্দুর যাহা কিছু, রাজ্য-পালন বা সমাজবন্ধন, দেবতার্চ্চন সকলই ধর্ম্ম ও ভক্তিমূলক।

এখন সহজেই বুঝা যায় ধর্ম্মের অপচয়, ভক্তির অভাবই ভারতের বর্ত্তমান অবনতির কারণ, এবং বেদেও উক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মং প্রজা উপসর্পন্তি।
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি॥ (শ্রুতিঃ)

ধর্ম্ম, জগতের আশ্রয়, জনগণ ধর্ম্মেরই উপাসক, ধর্ম্মে দুঃখরূপ পাপ নষ্ট নয়, সেই হেতু সজ্জনগণ ধর্ম্মকে পরম সহায় বলিয়া থাকেন। এবং নারদ ভক্তিসূত্রেও উক্ত আছে –

"সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা"

সেই ভক্তি আবার কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ হইতেও প্রধান। এখন আমাদের পূর্ব্বাবস্থার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, উন্নতিযুগের অবলম্বন সেই ধর্ম্ম ও ভক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। সভ্যজগতে পুনঃপরিচিত হইতে হইলে, বাহ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতির সংসাধন করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় শক্তিকে একত্র করিয়া এক বিশাল শক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। ঈর্ষা বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া ভক্তি, (ভালবাসা) কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল মাল মসলা লইয়া ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ়রূপে গঠন করিতে হইবে।

বিলাস লইয়া বিব্রত থাকিয়া স্বার্থচিন্তায় আত্মহারা হইলে চলিবে না। অলসতায় অচল

হইয়া বিহারাবাসে শীতল সুখশয্যায় শায়িত থাকিলে মানাবে না। শুধু মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া সভামণ্ডপ মুখরিত করিলে হইবে না। কেবল বাহিরে হিন্দু সাজিয়া বসিলেও চলিবে না। প্রাণের সহিত প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে—

"হীনং দূষয়তে যস্মাৎ তস্মাৎ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ"

(মেরুতন্ত্রং)

মনের সহিত প্রত্যেক মানবকে ভাবিতে হইবে—

ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ (উত্তরগীতা):

যদি উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে হয়, তবে বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। তরঙ্গ দেখিয়া তীরে তরী ডুবাইয়া কে কবে পরপারে পৌছিতে পারিয়াছে? বিলাসব্যসনে মুগ্ধ থাকিলে চলিবে না। ভীরুতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মী হইতে হইবে। কর্ম্ম হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি লাভ করিতে হইবে। এবং সেই ভক্তিকে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণ্যে উপস্থাপিত করিতে হইবে। জাগিতে হইবে, জাগাইতে হইবে। মুগ্ধকে আত্মবোধ জন্মাইয়া দিতে হইবে। অন্ধকে হাতে ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, পঙ্গুকে বুকে তুলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুর অলস নয়নের সম্মুখে তাহাদেরই নিজস্ব বেদ, বেদান্ত, বিজ্ঞান, উপনিষৎ সাদরে খুলিয়া ধরিতে হইবে।

দীনা ভারত জননীকে রত্নপ্রসবিনী হিন্দুজননী বলিয়া ডাকিতে হইলে, হিন্দুর দুরবস্থাকে অবস্থাপন্ন করিতে হইলে, নীরব রোদন হাস্যে পরিণত করিতে হইলে, এই ভারতকে সেই ভারত করিতে হইলে, মাতৃসেবায় সন্তানজনম স্বার্থক করিতে হইলে, আত্মপর-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীকে প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া একযোগে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে, কর্ম্মক্ষেত্রে বীর বীর্য্য ধারণ করিয়া জল, স্থল, কানন বিকম্পিত করিয়া সমস্বরে গাহিতে হইবে।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

তখন শুনিবে অনন্ত আকাশও প্রতিধ্বনি গাহিতেছে—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

সে দিন।

না ছিল জড়তা, না ছিল বিলাস,
না ছিল বিষয়ে হর্ষ,
ঘোর অহঙ্কার, স্বার্থের সন্ধান,
না ছিল মোহ অমর্ষ।
দীনতা হীনতা না ছিল তখন,
না ছিল দাসত্বকাল,
'পণ-ব্যবহার পাপের আধার,
শুনিলে হইত লাল।
"পর-উপদেশে পাণ্ডিত্য" তখন
না ছিল কাহারো জানা,
শ্রুতির বিস্মৃতি না ছিল কখন,
না ছিল স্বধর্ম্মে হানা।
ঐশ্বর্য্য-কারণ না ছিল পীড়ন—
না ছিল তাড়না দীনে,
না ছিল করম অবনী-ভিতর—
ঈশ্বরসাধন বিনে।
ছিল রীতি নীতি, আচার বিচার,
কর্ত্তব্য-সাধন কত,
উৎসাহ উদ্যম ছিল অনুপম,
স্বধর্ম্মে নিয়ত রত।
ছিল আত্মভাব মানবে তখন,
বৈরাগ্য ভোগের প্রতি
ত্যজিয়ে কামনা কাঞ্চনবাসনা
ঈশ্বরে সতত মতি।
ছিল দ্বিজগণ অবনীভূষণ,
অধর্ম্ম আতপ নাশি'
ছড়ায়ে জগতে বেদের মহিমা,
অধ্যাত্ম বৈভবরাশি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

অসবর্ণাবিবাহ-বিলের প্রতিবাদ।

(পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিত)

শ্রীযুক্ত পাটেলের প্রস্তাবিত অসবর্ণাবিবাহ-বিধায়ক পাণ্ডুলিপি রাজবিধিতে পরিণত হইলে নিম্নলিখিত সাত প্রকার দোষ ঘটিবে এবং পরিণামে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী সমাজের অপ্রতিবিধেয় মহা অনিষ্ট সংসাধিত হইবে। এইজন্য আমাদিগের প্রার্থনা—ঐরূপ বহুকোটী প্রজার অনিষ্টসাধক রাজবিধি ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লাবক মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায়ের অনুরোধে যেন সংঘটিত না হয়।

উপরে যে সাত প্রকার দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, একে একে তাহা দেখাইতেছি;—

(১) ধর্ম্মহানি।

যে কার্য্য বিধিবাক্য দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মকার্য্য নামে কথিত। প্রমাণ—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাদর্শন ১ম অধ্যায়।)

সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ। মনু বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥

(ষষ্ঠ অধ্যায়)

ইহার ভাবার্থ এই—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি এই চারিটী বিভিন্ন আশ্রম গৃহস্থ হইতে উৎপন্ন এবং এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ; কেননা, তৎসম্বন্ধে বেদে বহু প্রকার স্পষ্টবিধি আছে এবং স্মৃতিতেও বহু বিধি আছে। বিশেষতঃ গৃহস্থ অপর আশ্রমত্রয়ের প্রতিপালক। গৃহস্থ হইবার প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য এস্থানে মনু গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্পষ্ট বিধিও আছে;—

চতুর্থমায়ুষোভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥

(মনু ৪র্থ অঃ)

আয়ুর প্রথমভাগ বর্ত্তমান সময়ে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহস্থ হইয়া থাকিবে। গৃহস্থাশ্রমী হইতে হইলে প্রথমেই দারগ্রহণ করিতে হয়।

"গৃহে বসেৎ" এইটী গৃহস্থ হইবার স্পষ্ট বিধি। লিঙ্, তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত বাক্য বিশেষ বাধা না থাকিলে বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকৃত। গৃহস্থ হইলে যে দারগ্রহণ করিবার কথা মনু বলিয়াছেন, তাহার বিধি কিরূপ, ইহাও মনুসংহিতা হইতে দেখাইতেছি,—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্‌বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্‌॥

(৩য় অঃ)

দ্বিজ ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া লক্ষণান্বিতা সবর্ণা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবে। এখানেও "সবর্ণাম্‌ উদ্‌বহেত" ইহা বিধি। অসবর্ণাবিবাহ-বিধি প্রচলিত হইলে, যদি একজন প্রজাও তদনুসারে অসবর্ণা বিবাহ করে, তাহাতে তাহার পক্ষে গৃহস্থ হইবার বিধি এবং সবর্ণাবিবাহের বিধি প্রতিপালিত হইবে না; সুতরাং উক্ত বিধিবাক্য দ্বারা যে ধর্ম্মকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার অকরণে ধর্ম্মহানি ঘটিবে।

(২) অতীব গর্হিত অধর্ম্ম সমাজে প্রবিষ্ট হইবে। কেননা, অসবর্ণা বিবাহ (marriage) দুই ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য;—

(ক) উচ্চজাতি কর্ত্তৃক নীচজাতির কন্যাগ্রহণ বা অনুলোম বিবাহ। (খ) নীচজাতি কর্ত্তৃক উচ্চ জাতির কন্যাগ্রহণ বা প্রতিলোম স্ত্রীসংগ্রহ। শেষোক্ত কন্যাগ্রহণ বিবাহপদবাচ্য নহে, এইজন্য বিবাহের স্থলে উপরে আমরা ইংরাজী (ম্যারেজ) শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কেন যে ইহা বিবাহ নহে, পরে বুঝাইব।

(ক). অসবর্ণাবিবাহ শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তাহা ধর্ম্ম নহে। সেই বিবাহকার্য্যের প্রবর্ত্তক বিধিবাক্য নহে, কামই তাহার প্রবর্ত্তক। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।

(৩য় অঃ)

কামপ্রবর্ত্তিত হইয়া যদি কেহ অসবর্ণা বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে যথাক্রমে করিতে হইবে, এই অংশেই বিধি আছে। যদি কেহ সবর্ণা বিবাহ না করিয়া অসবর্ণা বিবাহ করে, তাহার পক্ষে সবর্ণাবিবাহবিধিলঙ্ঘনজনিত অধর্ম্ম এবং যথাক্রমে বিবাহবিধিলঙ্ঘনজনিত অধর্ম্ম আচরণ করা হইবে। বিধিলঙ্ঘনে কেবল যে ধর্ম্মহানি, তাহা নহে, অধর্ম্মও হইয়া থাকে। ইহা স্বয়ং মনু বলিয়াছেন,—

অকুর্ব্বন্‌ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্‌।
প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥

(১১শ অঃ)

অর্থাৎ বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। যে কার্য্য না করিলে প্রজাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, সে কার্য্যে বাধা উপস্থিত করা রাজপক্ষের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। দ্বিজাতি পুরুষের পক্ষে বিবাহ যতদূর আবশ্যক, স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রের পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক। মনু বলিয়াছেন,—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।

[২য় অঃ]

অর্থাৎ বিবাহ-বিধি বা বিধিবোধিত বিবাহ স্ত্রীজাতির বৈদিক সংস্কার। মনুর বিধিবোধিত বিবাহ যে সবর্ণাবিবাহ, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। মনু যে এই বিধিবোধিত বিবাহকে স্ত্রীজাতির পক্ষে বৈদিক সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূলে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, তন্মধ্যে একটী এই—"গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্" এই মন্ত্রের ভাবার্থে বুঝা যাইতেছে যে, বর কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছেন। মনু বলিয়াছেন,—

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে। (৩য় অঃ)

সবর্ণাতেই পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট। তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতেছি, বেদ এবং তাহার অনুগত মনুস্মৃতির সিদ্ধান্ত এই যে, পাণিগ্রহণ দ্বারা স্ত্রীজাতির সংস্কার না হইলে, তাহা বৈদিক সংস্কারনামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। সুতরাং অসবর্ণাবিবাহে স্ত্রীজাতির বৈদিক সংস্কার সিদ্ধ হয় না।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যধৃত যমবচনে আছে—

বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাং সদা।

অর্থাৎ শূদ্রের পক্ষে বিবাহই প্রধান সংস্কার এবং উহা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন,—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য। (৩য় অঃ)

শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা কদাচন। (৯ম অঃ)

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রাই ভার্য্যা। শূদ্রের অসবর্ণা বিবাহ একেবারেই নাই এবং ঐরূপ বিবাহের নামে স্ত্রীসংগ্রহ করিলে সংস্কারসিদ্ধি কদাচ হইবে না। অতএব সংস্কাররূপ অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্যের হানি এবং বিধিলঙ্ঘনজনিত অধর্ম্ম অসবর্ণাবিবাহবিধি প্রচলিত হইলে স্ত্রীজাতি ও শূদ্রের পক্ষে বিশেষতঃ অনিবার্য্য।

শ্রুতি এবং স্মৃতির একবাক্যে সিদ্ধান্ত এই যে, গৃহস্থের পক্ষে সবর্ণা-বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিবাহধর্ম্ম পালন করিবার পর কামনাবশে যদিও তিনি অসবর্ণা-বিবাহ করেন, তাহা হইলে যথাক্রমে উহা করিতে হইবে। তবেই হইল, দ্বিজাতির পক্ষে একাধিক বিবাহ না হইলে আর অসবর্ণা-বিবাহ ঘটে না; অথচ অসবর্ণা-বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে। যাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত ধর্ম্ম নহে, কামপ্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানমাত্র, কামনার প্রবলতা সময়ে তাহার নিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় মুনিগণ কলিযুগে তৎসমস্তই বর্জ্জনীয় মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। প্রমাণ—

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

* * * *

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।

নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

(হেমাদ্রিপরাশরভাষ্যধৃত আদিত্যপুরাণ)

মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের মতে যে বিবাহ বিধিবোধিত নহে, তাহার নিবর্ত্তন করিবার অধিকার পুরাণবচনের সম্পূর্ণই আছে। এস্থলে স্মৃতি ও পুরাণের সহিত বিরোধের সম্ভাবনা নাই। যে স্থলে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলেও বলাবল নির্ণয় করিবার পক্ষে অন্য প্রকার যুক্তি আছে। এস্থলে তাহার অবতারণার প্রয়োজন নাই। তাহার পর এই পুরাণবচনের যে কতদূর বল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, যুধিষ্ঠিরের পর সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য কোন হিন্দু নরপতির ঘটে নাই, অথচ এই পুরাণবচন অন্ততঃ জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পরে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং কোন বিশেষ রাজশক্তির সাহায্যে সমগ্র ভারতে যে এই বচনের প্রামাণ্য বা প্রাবল্য সংসাধিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, যে দক্ষিণাপথে বিবাহ বিষয়ে মনুর মতও সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হওয়ায় মাতুলকন্যাবিবাহ প্রচলিত আছে, সেই দক্ষিণাপথেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় অসবর্ণা বিবাহ প্রভৃতি অকর্ত্তব্য মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে, আদিত্যপুরাণ-বচন ভারতের সর্ব্বত্র সমভাবে আদৃত। সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরোধে যে বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া মুনিগণের স্থিরীকৃত, বর্ত্তমান সময়ে সেই বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিলে তাহার ফলে যে সন্তান জন্মিবে, তাহারা জারজ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কেননা, মনু ঔরস পুত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন;—

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্॥ (৯ম অঃ)

যে সন্তান পাণিগ্রহণসংস্কারে সংস্কৃতা স্বীয় পত্নীর পুত্র বলিয়া গণ্য, অথচ নিজ পরিণীতা পত্নীর গর্ভে বিবাহকর্ত্তার স্বয়ং উৎপাদিত, তাহাকে ঔরসপুত্র বলিয়া জানিবে। এই ঔরস পুত্রই পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে 'সংস্কৃতায়াং' এই পদটী আছে বলিয়া এবং মনু ইতিপূর্ব্বে কোন্ পত্নী সংস্কৃতা হইবে, "পাণিগ্রহণ-সংস্কারঃ" ইত্যাদি বচনে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া সংস্কৃতা পত্নী যে অসবর্ণা নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজঃ" ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে উৎপাদিত পুত্রই ঔরস পুত্র। সবর্ণা পত্নীই ধর্ম্মপত্নী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; কেননা, সবর্ণাবিবাহই বিধিবোধিত, অসবর্ণা-বিবাহ বিধিবোধিত নহে, কামপ্রবর্ত্তিত। বিশেষতঃ মনু বলিয়াছেন,—

ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যকম্।
সা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন॥
(৯ম অঃ)

অর্থাৎ ভর্ত্তার শুশ্রূষা নিত্য কর্ম্ম এবং অপর ধর্ম্মকার্য্য সবর্ণা পত্নীই করিবে, অসবর্ণা পত্নী করিবে না। সুতরাং সবর্ণা পত্নীই যে ধর্ম্মপত্নী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, ইহা বলাই বাহুল্য।

বৌধায়ন ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসং বিদ্যাৎ।

সবর্ণা ভার্য্যা না হইলে ঔরসপুত্র হইবে না; ইহাই এই সমস্ত বচনের ঐকবাক্যসম্মত অর্থ। যে আধুনিক বিবাহবিধি শাস্ত্রসম্মত জারজ সন্তানেরই প্রশ্রয় দেয়, তাহা যে সমাজের ঘৃণিত অধর্ম্মাচরণের প্রবর্ত্তক, তাহা বলাই বাহুল্য।

(খ) নীচবর্ণ কর্ত্তৃক উচ্চবর্ণসম্ভূতা কন্যাগ্রহণ কোন শাস্ত্রেই বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, তাহা বিবাহ এই প্রকার পবিত্র নামের যোগ্য একবারেই নহে, বরং ঐরূপ কন্যাগ্রহণ যে ঘোরতর অপরাধ, তাহা মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপি দাপয়েৎ।

*   *   *   *

উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি। (৮ম অঃ)

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে—হীনজাতি উৎকৃষ্ট জাতীয়া কন্যা গ্রহণ করিলে তাহার বধদণ্ড। ঐরূপ অপরাধজনক মহাপাপের ফলে যদি সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তান অনার্য্য। মনু বলিয়াছেন—

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।

জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ।

তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥

(১০ম অঃ)

অর্থাৎ অনার্য্য রমণীগর্ভে আর্য্যের ঔরসে সন্তান জন্মিলে গুণশালী হয় ত তাহাকে আর্য্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু অনার্য্য পুরুষের ঔরসে আর্য্যনারীগর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে সে অনার্য্যই হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং ঐ দ্বিবিধ সন্তানই সংস্কারের অযোগ্য, ইহাই ধর্ম্মব্যবস্থা।

বিষ্ণুও বলিয়াছেন,—

সমানবর্ণাসু সবর্ণাঃ পুত্রা ভবন্তি ... . প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।

(১৬শ অঃ)

প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ। (১৫শ অঃ)

অর্থাৎ সবর্ণাভার্য্যাগর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহারা সবর্ণ; কিন্তু প্রতিলোমা অর্থাৎ উচ্চজাতীয়া রমণীর গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহারা আর্য্যগর্হিত এবং তাহারা ধনাধিকারী নহে।

ক্ষত্রিয়ের প্রতিলোমজাত সন্তান সূত, বৈশ্যের মাগধ এবং বৈদেহ, শূদ্রের আযোগব ক্ষত্তা এবং চাণ্ডাল। ইহারা সকলেই অপসদ অর্থাৎ পিণ্ডদানাদির অনধিকারী, নিকৃষ্ট।

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমস্ত সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল; গ্রামমধ্যে তাহাদের বাস হইবে না, শববস্ত্র লইয়া তাহারা পরিধান করিবে, তাহারা গোধনের অধিকারী

হইবে না, কুক্কুর ও গর্দ্দভই তাহাদের ধন হইবে, তাহাদিগকে ভোজন পাত্র দিবে না। যথা—

আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেঽপরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ॥
*　　*　　*　　*
চণ্ডালশ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্॥
বাসাংসিমৃতচেলানি * * * * *॥

(মনু ১০ম)

তাহাদের অপর কার্য্য —

অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ।
বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া॥

(১০ম)

অর্থাৎ বন্ধুশূন্য শবের দাহ এবং রাজবিচারে বধদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের হনন কার্য্য ইহাদিগের জীবিকা। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে মুর্দ্দাফরাস নামে প্রসিদ্ধ যে জাতি আছে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত চণ্ডালের অন্তর্গত।

অসবর্ণাবিবাহবিধি প্রবর্ত্তিত হইলে, সমাজ এই প্রকার চণ্ডালে পরিপূর্ণ হইবে। হইতে পারে, তাহারা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিবে এবং যথেচ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনার্জ্জন করিবে, কিন্তু তাহাতে আসে যায় কি? শাস্ত্র যে তাহাদের বৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা দ্বারা স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজে ইহার প্রচলন হইলে যেরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

শ্রীযুক্ত প্যাটেলের উপস্থাপিত বিল রাজবিধিতে পরিণত হইলে সাত প্রকার দোষ ঘটিবে, ইহা উল্লেখ করিয়াছি এবং দুইটী দোষের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও করিয়াছি। অবশিষ্ট পাঁচটী দোষের নাম নির্দ্দেশ করিয়া নবাগত ৩টী প্রশ্নের সমাধান করিব। (৩য় দোষ) জলপিণ্ডলোপ (৪র্থ) হিন্দুর দায়াধিকারক্রমে অযৌক্তিকতা, (৫ম) হিন্দুবিবাহবিধির অন্যান্য অসামঞ্জস্য (৬ষ্ঠ) রাজদণ্ড প্রতিশ্রুতির প্রতি প্রজাসাধারণের অবিশ্বাস এবং (৭ম) বহুকোটি প্রজার হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত। এই পাঁচ দোষের ব্যাখ্যা, প্রশ্ন-সমাধানান্তে করিব।

প্রশ্ন— ১।

যে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্॥

এই বচনের সরল অর্থ,—বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে বিবাহকর্ত্তার স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস বলিয়া জানিবে।

আপনি তাহা না করিয়া নূতন অর্থ করিয়াছেন, যথা—

"যে সন্তান পাণিগ্রহণ-সংস্কারে সংস্কৃতা স্বীয় পত্নীর পুত্র বলিয়া গণ্য, অথচ নিজ পরিণীত পত্নীর গর্ভে বিবাহকর্ত্তার স্বয়ম্ উৎপাদিত, তাহাকে ঔরস পুত্র জানিবে"। এরূপ অর্থ পাইলেন কোথা হইতে?

প্রশ্ন—২। ঐ বচনের কুল্লূকভট্টব্যাখ্যা এই—

"স্বভার্য্যায়াং কন্যাবস্থায়ামেব কৃতসংস্কারায়াং যং স্বয়মুৎপাদয়েৎ তং পুত্রমৌরসং মুখ্যং বিদ্যাৎ সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসপুত্রং বিদ্যাদিতি বৌধায়নদর্শনাৎ সজাতীয়ায়ামেব স্বয়মুৎপাদিত ঔরসো জ্ঞেয়ঃ।"

অর্থাৎ "কন্যাবস্থায় কৃতসংস্কারা নিজভার্য্যার গর্ভে (বিবাহকর্ত্তা) স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাকে মুখ্য পুত্র ঔরস বলিয়া জানিবে। "সংস্কৃতা সবর্ণাগর্ভে বিবাহকর্ত্তার) স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস বলিয়া জানিবে" বৌধায়নের এই উক্তি দর্শনে বুঝিতে হইবে—"সজাতীয়া স্ত্রীগর্ভে স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্রই ঔরস।" কুল্লূকভট্ট বৌধায়নবচনের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা মনুমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কেননা, মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার পুত্র, দায়াদ অর্থাৎ পৈতৃক ধনে অধিকারী। যথা—

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদাবান্ধবাশ্চ ষট্॥ ৯ম)

শেষ ছয় প্রকার পুত্র দায়াধিকারী না হইলেও পুত্র বটে।

যথা মনু—

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥ (৯ম)

কুল্লূকভট্টের সিদ্ধান্ত এবং আপনার লিখিত মত মানিলে স্বীকার করিতে হয়, ব্রাহ্মণের ঔরসে তদীয় পরিণীতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ঔরস হইতে পারে না। মনু অপর যে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিজ পরিণীতা ভিন্নরমণীগর্ভে নিজ ঔরসজাত পুত্র তৎসমুদায়ের অন্তর্গতও হইতে পারে না। যথা—

যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।

* * * *

স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥ (৯ম অঃ)

(১) নিয়োগানুসারে একের বিবাহিতা পত্নীতে অন্যের উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রজ কথিত। (২) দত্তক—বর্ত্তমানেও প্রসিদ্ধ। (৩) কৃত্রিম শ্রাদ্ধাদির জন্য পালিত স

সন্তান, বর্ত্তমানে পালিত পুত্র বা পালক পুত্র নামে প্রসিদ্ধ। (৪) গূঢ়োৎপন্ন—নিয়োগধর্ম্ম ব্যতীত—অজ্ঞাত পরপুরুষের উৎপাদিত সন্তান। (৫) অপবিদ্ধ—পিতা মাতা উভয়ের বা একতরের পরিত্যক্ত—অন্যকর্ত্তৃক গৃহীত সন্তান। (৬) কানীন—কুমারী অবস্থায় উৎপাদিত সন্তান। সেই পুত্রজননী কুমারীকে যে বিবাহ করে, ঐ কানীন পুত্র তাহার পুত্র বলিয়া গণ্য। (৭) সহোঢ়—গর্ভবতীকে বিবাহ করিলে সেই গর্ভে যে সন্তান হয়—তাহার নাম সহোঢ়। (৮) ক্রীত—জনকজননীর নিকট হইতে ধন দ্বারা ক্রীত সন্তান। (৯) পৌনর্ভব—পতি-পরিত্যক্তা বা বিধবা বাগদত্তার স্বেচ্ছায় অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান। (১০) স্বয়ংদত্ত—পিতৃমাতৃহীন বা পিতামাতা কর্ত্তৃক অকারণ পরিত্যক্ত সন্তান কাহাকেও আত্মদান করিলে, সেই সন্তান স্বয়ংদত্ত নামে অভিহিত। (১১) শৌদ্র—ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীগর্ভজাত কামজ সন্তান, নামান্তর পারশব।

কাজেই পরিণীতা অনুলোমা দ্বিজরমণীগর্ভজাত সন্তান ইহার অন্তর্গত না হওয়াতে বৈধ-পুত্রই হয় না, সুতরাং কুল্লূকভট্টের মতেও জারজ সন্তান হইয়া পড়ে, আপনি ত তাহা স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন। বেশ মহাশয়, তবে বলুন দেখি, মনু স্পষ্টাক্ষরে সেই সকল পুত্রের দায়াধিকার নির্দ্দেশ করিলেন কিরূপে?

যে মনু নিকৃষ্ট পুত্রেরও দায়াধিকার সহজে প্রদান করিতে সম্মত নহেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ মনু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপত্নীগর্ভে নিজ ঔরসজাত সন্তানের সঙ্গে ক্ষত্রিয়াদিপত্নীগর্ভে তদীয় ঔরসজাত পুত্রের অংশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।

... .

চতুরোঽংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ॥ ৯ম অঃ

অতএব আপনার মত ত ভ্রান্ত বটেই, কুল্লূকভট্টের সিদ্ধান্তও মনুবিরুদ্ধ। সুতরাং, পরিণীতা পত্নীগর্ভে বিবাহকর্ত্তার ঔরসে যে পুত্র হয়, সেই ঔরস, ইহাই মনুর মত। "স্বে ক্ষেত্রে" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের সরল অর্থই—অভ্রান্ত। বৌধায়নবচনে যে সবর্ণার কথা আছে, তাহা প্রশংসার্থ অর্থাৎ ঐরূপ ঔরসপুত্র শ্রেষ্ঠ, ইহাই বৌধায়নবচনের মর্ম্ম। অনুলোমা পত্নীগর্ভে যে ঔরসপুত্র হইবে না, এমন অভিপ্রায় বৌধায়নের হইতে পারে না, তাহা হইলে মনুবচনের সহিত বিরোধ হয়। "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

মনুবচনার্থবিরুদ্ধ অন্য স্মৃতি আদরণীয় নহে বলিয়া সেই বৌধায়ন-স্মৃতিও অগ্রাহ্য হইয়া উঠে। এ বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?

প্রশ্ন—৩। প্রতিলোমা বিবাহ আপনি মানেন না বটে, কিন্তু শাস্ত্র তাহা স্বীকার করেন, নতুবা প্রতিলোমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের পিতৃধনে অধিকার থাকিত না। ভগবান্ বিষ্ণু প্রতি-লোমাজাত সন্তানের জাতি-নাম নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বেষাঞ্চ সমানজাতিভির্ব্যবহারঃ স্বপিতৃবিত্তানুহরণঞ্চ॥" (১৬ অঃ)

আযোগব প্রভৃতি প্রতিলোমাগর্ভজাত পুত্রগণের সজাতির সহিত কুটুম্বিতাদি হইবে এবং তাহারা পিতৃধনে অধিকারী হইবে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"শূদ্রাপুত্রবৎ প্রতিলোমাসু।"

প্রতিলোমাজাত পুত্রের ধনাধিকার শূদ্রাপুত্রের ন্যায় হইবে।

অতএব অন্ততঃ শূদ্রা বিবাহের ন্যায় প্রতিলোমাবিবাহ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। শূদ্রাবিবাহে নিন্দা থাকিলেও তাহা যে অসিদ্ধ বা "বিবাহ"পদবাচ্য নহে, তাহা তো আপনিও বলিতে পারেন না, তবে প্রতিলোমাবিবাহকে একেবারে উড়াইয়া দেন কোন্ যুক্তিতে?

এরূপ স্থলে আপনার কি বক্তব্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।—

ভগবান্ মনুর লিখনানুসারেই ঐরূপ অর্থ পাইয়াছি। তবে "নিজপরিণীতা পত্নীর গর্ভে" এই কথাটা একটু সংক্ষেপে বলিয়াছি। তাহার স্পষ্ট ও বিস্তৃত অর্থ পরে করিব। মনু বিবাহকে স্ত্রীজাতির সংস্কার নামে যেখানেই অভিহিত করিয়াছেন, সেইখানেই পাণিগ্রহণের সম্বন্ধ আছে। ২য় অঃ যে—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাংসংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।

এই বচনাংশ আছে, তদ্বর্ণিত বৈদিক সংস্কারে পাণিগ্রহণমন্ত্র বিদ্যমান্, অতএব বৈদিক সংস্কার বলাতেই তাহা যে পাণিগ্রহণ, তাহা বুঝিতে হইবে, তৎপরে —

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।

(৩য় অঃ)

এখানে সবর্ণারই পাণিগ্রহণ সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পতিহীনা বা পতিপরিত্যক্তার যে পুনঃসংস্কার-কথা মনুতে আছে, তাহা পুনঃসংস্কার নামে কথিত "পাণিগ্রহণ-সংস্কার" নহে, কেননা মনু বলিয়াছেন,—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ॥"

(৮ম অঃ)

পাণিগ্রহণের উপযোগী মন্ত্র কন্যাতেই প্রতিষ্ঠিত, যাহাদিগের কন্যাভাব নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের বিবাহধর্ম্মক্রিয়া বিলুপ্ত, তাহাদিগের পক্ষে ঐ সকল মন্ত্র নাই। যে ভগবান্ মনু বিবাহকে সংস্কার নামে অভিহিত করিবার সময়ে পাণিগ্রহণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং পাণিগ্রহণকেই বিবাহের পবিত্র ভাব রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী ভাবে উপদেশ করিয়াছেন—সেই মনু "সংস্কৃতায়াং" কথাটী উল্লেখ করিবার সময়ে যে পাণিগ্রহণকে বিস্মৃত হইয়া যে কোন বিবাহই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলিতে হইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। তাহা কিন্তু নাই। সুতরাং "সংস্কৃতা" শব্দের মুখ্যার্থ "পাণিগ্রহণ সংস্কারে সংস্কৃতা" এই অর্থ আমি গ্রহণ করিয়াছি। তাহার পর "সংস্কৃতায়াং" এই পদটী "স্বে ক্ষেত্রে" এই অংশস্থ ক্ষেত্রের বিশেষণ

নহে, তাহা হইলে "সংস্কৃতে" হইত, স্ত্রীলিঙ্গ হইত না। "সংস্কৃতায়াং" এই পদকে বিশেষ্য করিলে সংস্কৃতা ভার্য্যা এই অর্থে "সংস্কৃতা" পদের লক্ষণা করিতে হয়, এবং "ক্ষেত্রে" এই পদটী ব্যর্থ হয়। বিনা প্রয়োজনে লক্ষণা স্বীকার এবং ব্যর্থ পদপ্রয়োগ দুইটাই দোষ। বিশেষতঃ, "গতপ্রত্যাগতা" পুনর্ভূস্থলে তদ্গর্ভজাত পৌনর্ভব পুত্রে ঔরস লক্ষণের বাধা ঘটাইবার জন্য "স্বে ক্ষেত্রে" এই অংশের তাৎপর্য্য পরিষ্কৃত করিতে হইবে। সেই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে "সংস্কৃতায়াং" এ পদটীও নিরর্থক হয়। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি,—যে কয় প্রকার পুনর্ভূ আছে "গতপ্রত্যাগতা" তন্মধ্যে একটী। বিবাহকর্ত্তার পরিত্যক্তা হইয়া যে রমণী পুরুষান্তরে সঙ্গতা হয় এবং পরে সেই পুরুষান্তরকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ-কর্ত্তাকেই ভজনা করে, তাহাকেও পুনর্ভূ বলা যায়। পুনর্ভূ হইবার পরে ইহার গর্ভে বিবাহকর্ত্তার স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রও পৌনর্ভব। মনুর পৌনর্ভবলক্ষণ এই—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥ (৯ম)

স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যভাবে পুরুষান্তর গ্রহণই পুনর্ভবন, পুরুষান্তর গ্রহণের পর তদ্গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহার নাম পৌনর্ভব। নিজপরিণীতা পত্নীও প্রথম পরিত্যক্তা হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে তদ্গর্ভজাত সন্তান আর "ঔরস" এই শ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য থাকে না। ঐ পুত্র অদায়াদ—উহার পৈতৃক ধনাধিকার নাই। প্রশ্নকর্ত্তা—যে "স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু" এই বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে উক্ত পৌনর্ভব পুত্রও "ঔরস" পদবাচ্য হইয়া উঠে। অন্ততঃ ঐ পুত্র "ঔরস" বলিয়া দায়াধিকারী মুখ্য পুত্র হইবে? না "পৌনর্ভব" বলিয়া দায়ানধিকারী গৌণপুত্র হইবে? তাহার নির্ণয় হয় না। অতএব "স্বে ক্ষেত্রে" ইহার অর্থ—যে "নিজপরিণীতা পত্নী" তাহা আপাততঃ বোধের জন্য। সূক্ষ্ম অর্থ এই,—যে রমণীতে স্বামীর স্বত্বাধিকারে শাস্ত্রীয় নিন্দা নাই,—সেই রমণীই "স্ব ক্ষেত্র"—তিনিই প্রকৃতপক্ষে নিজপরিণীতা পত্নী; অনিন্দিত স্বত্বই প্রকৃত স্বত্ব; (স্বত্বের এই উৎকর্ষ লইয়াই "স্বে ক্ষেত্রে" ইহার সূক্ষ্মার্থ প্রদর্শিত হইল) পুনর্ভূ স্ত্রীতে স্বামীর যে স্বত্ব বা পুনর্ভূ পতিত্ব তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত—মনু শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় নিন্দিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে পুনর্ভূপতিকে বিশেষভাবে গণনা করিয়াছেন। যথা—

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ (৩য়)

মেষ-মহিষজীবী, পুনর্ভূপতি এবং শবদাহজীবী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ বর্জ্জনীয়। অতএব "স্বে ক্ষেত্রে" এই অংশ দ্বারাই পৌনর্ভব পুত্রে ঔরস-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হইতেছে; "সংস্কৃতায়াং" এই পদ দ্বারা সে দোষ নিবারিত হয় না। কারণ পাণিগ্রহণ-সংস্কারে সংস্কৃতা কোন পত্নী যদি "গতপ্রত্যাগতা" পুনর্ভূ হয়, তাহা হইলে সে ত "সংস্কৃতা" বটেই, সুতরাং তদ্গর্ভজাত পুত্রকে "ঔরস" বলিবার পক্ষে বাধা হইবে কেন? অতএব

ঔরসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হইল না। "স্বে ক্ষেত্রে" এই অংশের উপরি প্রদর্শিত অর্থ করিলে "সংস্কৃতায়াং" পদ নিরর্থক। ব্রাহ্মণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাপত্নী-গর্ভজাত সন্তানকে "ঔরস"রূপে গণনায় বাধা জন্মাইবার জন্যই "সংস্কৃতায়াং" পদ আছে, একথা স্বীকার করিলে ত প্রশ্নকর্ত্তার ষোল আনা হার। বিশেষতঃ প্রশ্নকর্ত্তা ২য় প্রশ্নে দেখাইয়াছেন, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি পত্নীগর্ভজাত পুত্রও মনুর মতে ঔরস, আমিও তাহা একেবারে অস্বীকার করি না, তবে ভিতরের একটু কথা আছে। আমি বলি, প্রথমতঃ সবর্ণাবিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণ যদি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই ক্ষত্রিয়াদি পত্নীগর্ভে বিবাহকর্ত্তা ব্রাহ্মণের স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্র "ঔরস" হইবে, তাহার দায়াধিকারও হইবে, এইরূপ ক্রম-বিবাহই মনুর অনুমোদিত।—

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ। [৩য়)

এই বচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছি। যে ব্রাহ্মণের সবর্ণা পত্নী আছে, তাহার ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি পত্নীগর্ভে স্বয়ম্ উৎপাদিত সন্তান—সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত না হইলেও তাহার পুত্র বলিয়া গণ্য; কেননা মনু বলিয়াছেন,—

সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥ [৯]

ভাবার্থ—এক ব্যক্তির বহু পত্নী মধ্যে এক পত্নীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে, সেই পুত্র সকল পত্নীরই পুত্র বলিয়া গণ্য। সবর্ণা-বিবাহ না হইলে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া প্রভৃতি পত্নীগর্ভজাত সন্তান "ঔরস" বলিয়া গণ্য হইবে না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই মনু "সংস্কৃতায়াং" বলিয়াছেন, আমিও "পাণিগ্রহণসংস্কারে সংস্কৃতা পত্নীর পুত্র বলিয়া গণ্য" এইরূপ অর্থ করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"সংস্কৃতায়াং" এই পদটী "ক্ষেত্রে" এই পদের বিশেষণ নহে, বিশেষণ হইলে স্ত্রীলিঙ্গ হইত না,—অতএব উহার পৃথক্ ভাবে অন্বয়,—তাহা এই,—"সংস্কৃতায়াং" পাণিগ্রহণসংস্কারো-পেতায়াং সত্যাং স্বে ক্ষেত্রে যং স্বয়মুৎপাদয়েৎ স্বামী ইতি শেষঃ, তম্ ঔরসং বিজানীয়াৎ। "সংস্কৃতায়ান্তু" তু' এই পদ থাকায় "পুনঃ" অর্থ পাওয়া যাইতেছে—এই "পুনঃ"—হইতে "স্বে ক্ষেত্রে" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অংশ 'স্ব' পদার্থ অনুবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব,—"স্বীয় পাণিগ্রহণসংস্কারে সংস্কৃতা পত্নীসত্বে—শাস্ত্রে অনিন্দিত স্বত্বাধিকারে অধিকৃতা পত্নীর গর্ভে স্বত্বাধিকারীর স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্রকে ঔরস বলিয়া জানিবে"—ইহা হইল আক্ষরিক অর্থ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমার প্রদর্শিত অর্থ ইহারই সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য মাত্র। পাণিগ্রহণসংস্কৃতা পত্নীর গর্ভে বিবাহকর্ত্তার স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্র ত ঔরস হইবেই কেননা পাণিগ্রহণসংস্কৃতা পত্নী উক্ত সন্তানের গর্ভধারিণীরূপে বর্ত্তমানা, সুতরাং ঐ সন্তান ত তাহার পুত্ররূপে গণ্য বটেই এবং বিবাহকর্ত্তার অনিন্দিত স্বত্বাধিকারে অধিকৃত ক্ষেত্রে স্বয়ম্ উৎপাদিতও বটে।

সিদ্ধান্ত এই—পতিব্রতা-সবর্ণাপত্নীর গর্ভে বা উহার পতিব্রতা সপত্নীগর্ভে বিবাহকর্ত্তার স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্রই ঔরস। সবর্ণাবিবাহ না হইলে এরূপ ঔরসের সম্ভাবনাই নাই।

সবর্ণাবিবাহ ব্যতীত বিবাহকর্ত্তার স্বয়ম্ উৎপাদিত অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ঔরসও নহে—অপর কোন পুত্রেরই অন্তর্গত নহে, সুতরাং অবৈধপুত্র "জারজ" আখ্যায় আখ্যাত হইবার যোগ্য। এই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য—"ধর্ম্মপত্নীজঃ" এবং বৌধায়ন "সবর্ণায়াং" বলিয়াছেন। সবর্ণা পত্নীর বা ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে বিবাহকর্ত্তার স্বয়ম্ উৎপাদিত পুত্র সর্ব্বত্রই "ঔরস" হইবে, তাহার ব্যতিক্রম কোথাও ঘটিবে না। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই স্থানেই সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

আমার মত প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি সে মতে মনুবচনের সহিত কোনই বিরোধ নাই। যে স্থলে ব্রাহ্মণ যথাক্রমে চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ করিয়াছেন—সে স্থলে ঐ সকল অনুলোমাপত্নীগর্ভজাত পুত্রও আমার মতে "ঔরস" হইবে; সুতরাং মনুকৃত দায়াধিকার নির্দ্দেশ সুসঙ্গত। সেই জন্যই মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।"

ব্রাহ্মণের যথাক্রমে বিবাহিতা চারবর্ণের পত্নী থাকিলে তৎপুত্রগণের বিভাগ নির্দ্দেশ হইতেছে। নতুবা ক্ষত্রিয়াপুত্রাদির বিভাগ একেবারেই নির্দ্দেশ হয় নাই। তবে যদি ব্রাহ্মণ সবর্ণাবিবাহ না করিয়া অনুলোমা বিবাহ করেন, তাহাতে যে সন্তান হইবে, সে অবৈধপুত্র, অতএব দায়াধিকারী নহে। মনুর বিবাহক্রমবিধি [৩ অঃ ১২] এবং ঔরস লক্ষণ এ বিষয়ে প্রমাণ।

কুল্লূকভট্ট যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কলিযুগাভিপ্রায়ে। কলিযুগে অনুলোমা-বিবাহ পুরাণবচন দ্বারা নিবর্ত্তিত —বৌধায়ন স্মৃতি ঔরস লক্ষণে সবর্ণা পত্নীর উল্লেখ দ্বারা অসবর্ণাবিবাহ নিবৃত্তির সমর্থক। মনুর যে ক্ষত্রিয়াদি পুত্রের দায়াধিকার নির্দ্দেশ আছে, তাহা অন্য যুগের জন্য। যাহাই হউক, কুল্লূকভট্টের ন্যায় একজন প্রধান ও প্রাচীন ব্যাখ্যাকার যে অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে "ঔরস" বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহাও অসবর্ণা অবিবাহ্যতায় সদাচারপ্রমাণ পক্ষে অল্প বলবৎ নহে।

আর একটী কথা এই, প্রশ্নকর্ত্তা যে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মনুসম্মত; কিন্তু তাহা এখন চলে কি? উক্ত একাদশবিধ গৌণ পুত্রমধ্যে এক দত্তকই প্রচলিত আছে, অপর পুত্র কাহার শাসনে অবৈধ হইয়াছে বলিতে পার? যে পুরাণবচন দ্বিজগণের অসবর্ণাবিবাহ নিবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই পুরাণবচন বা সেই মুনিগণ-শাসনই ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্রের অবৈধতা ব্যবস্থা করিয়াছেন। "দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ" কলিবর্জ্জনীয় মধ্যে গণিত। অতএব ২য় প্রশ্ন সর্ব্বথা অকিঞ্চিৎকর, প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইতেই অপর বিষয় জ্ঞাতব্য, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখানেই ২য় প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হইল।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

"দ্বিজগণের অসবর্ণাবিবাহ নিবর্ত্তিত হইলেও শূদ্রের অসবর্ণাবিবাহ বা প্রতিলোম বিবাহ ভ

নিষিদ্ধ হয় নাই” এরূপ উক্তি নিতান্ত হাস্তোদ্দীপক, কারণ যাহা বিবাহনামে প্রচলিত ছিল, নিবর্ত্তন তাহারই হইয়াছে, যাহা বিবাহও নহে, প্রচলিতও ছিল না, তাহার নিবর্ত্তনের সম্ভাবনা কি? অশ্বডিম্বভোজনের নিষেধ না থাকাতে অশ্বডিম্বের অস্তিত্ব শাস্ত্রসম্মত ইহা স্থির করিতে হইবে কি? দ্বিজগণের অসবর্ণাবিবাহই নিবর্ত্তিত হইয়াছে, শূদ্রের ভগিনীবিবাহ প্রভৃতি ত নিবর্ত্তিত হয় নাই, অতএব উহাও প্রচলিত করিতে প্রশ্নকর্ত্তার প্রবৃত্তি আছে নাকি? যাহা হউক, প্রতিলোমা স্ত্রীসংগ্রহ যে বিবাহ নহে, এবং তাহা যে অপ্রচলিত তাহা দেখাইতেছি।

মনু বলিতেছেন,—

"শূদ্রস্ত তু সবর্ণৈব নান্তা ভার্য্যা বিধীয়তে।"

(৯ম অঃ)

অর্থাৎ শূদ্রের সবর্ণা ভার্য্যাই বৈধ, অন্ত ভার্য্যা অবৈধ।

ব্যাস বলিতেছেন—

"উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্॥

(ব্যাস-সংহিতা ২য় অঃ)

("স তু শূদ্রাং" এই পাঠ প্রুফের দোষে ঘটিয়াছে।)

ভাবার্থ সবর্ণা বিবাহ করিবার পরে অসবর্ণাবিবাহ করিতেও পারে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী-বিবাহ করিবার পরে ক্ষত্রিয়া, পরে বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয় সবর্ণা বিবাহ করিয়া বৈশ্যাবিবাহ করিতেও পারে। কোন দ্বিজই শূদ্রাবিবাহ করিবে না এবং অধস্তন বর্ণ উর্দ্ধতন বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবে না। ভগবান্ বিষ্ণু ২৪শ অ:—৪র্থ সূত্রে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ ৫৭ শ্লোকে, মহর্ষি শঙ্খ ৪র্থ অঃ ৮ম শ্লোকে এবং মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্ব ৪৭ অঃ ৫৬ শ্লোকে ও ৪৮ অঃ ৮ম শ্লোকে শূদ্রের যে কেবলমাত্র সবর্ণাবিবাহ কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে শূদ্র যে অন্য জাতি হইতে ভার্য্যা সংগ্রহ করিতে পারিবে, এ বিধান কোথাও নাই। যে রমণী যে জাতির অবিবাহ্যা, তাহাকে বিবাহ অর্থাৎ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে তৎপ্রসূত সন্তান বর্ণসঙ্কর হইবে।

মনু বলিয়াছেন,—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥

(১০ম অঃ)

ব্যভিচারদোষ, অবিবাহ্যাবিবাহ এবং উপনয়নাদি স্বকর্ম্মত্যাগ ফলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। কোন্ অধস্তন বর্ণের ঔরসে উচ্চবর্ণসম্ভূতা নারীর গর্ভে কোন্ জাতির উৎপত্তি হয়, তাহা

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। প্রতিলোম-রমণীজাত সন্তানের যে ধনাধিকার নাই, তাহাও দেখাইয়াছি। তবে যে "স্বপিতৃবিত্তানুহরণং" ইহা বিষ্ণুসূত্রে আছে, তাহার অর্থ অন্যরূপ। প্রতিলোমা রমণীগর্ভজাত সন্তানপ্রসঙ্গে সেই জাতির ব্যবহার ও ধনাধিকার নির্ণয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে চাণ্ডালজাতীয় পিতার ধনে চাণ্ডালজাতীয় পুত্রের অধিকার হইবে, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ, তৎপুত্রাশ্চ পৈতামহেঽপ্যর্থে।"

বিষ্ণু ১৫শ অঃ ৩৬।৩৭

অর্থাৎ প্রতিলোমা গর্ভজাত পুত্রের ধনাধিকার নাই, সেই পুত্রের যাহারা পুত্র হইবে, তাহারাও পিতামহধনে অধিকারী হইবে না। (পরন্তু পিতৃধনে অধিকারী হইবে)

চাণ্ডালজাতীয় পুত্রের যে পুত্র, সেও চাণ্ডালজাতি। সুতরাং পিতামহ শূদ্র অর্থাৎ চাণ্ডাল নহে বলিয়া পৌত্র তাহার ধনে অধিকারী হইল না। পিতৃধনে যে তাহার অধিকার হইবে, এ বচনে তাহার উপদেশ না থাকাতে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন,— 'স্বপিতৃবিত্তানুহরণঞ্চ', ১৬ অঃ ১৬। গৌতমসংহিতাতে যে "শূদ্রাপুত্রবৎ" ধনাধিকারের কথা আছে, তাহার মূল দেখিলে বুঝা যায় "শূদ্রাপুত্রোঽপ্যনপত্যস্যশুশ্রূষুশ্চেল্লভেত বৃত্তিমূলম্" দ্বিজ পিতার উপযুক্ত কন্যাপুত্র না থাকিলে, শুশ্রূষানিরত শূদ্রাপুত্র ভরণপ্রাপ্ত হইবে। চাণ্ডালাদিপুত্রও সেইরূপ পাইবে। ভাবার্থ এই যে, শূদ্রাদিজাতি উচ্চবর্ণজা কন্যাগমনে পতিত হয়, সেই পতিতাবস্থায় উপার্জ্জিত ধন হইতে জারজসন্তানের ভরণপোষণ হইবে। বিবাহ অসিদ্ধ হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মে ঐরূপ সন্তান জন্মিলে তাহার অধিকার কতটুকু, সর্ব্বকল্যাণকর মহর্ষিগণ ব্যতীত তাহার উপদেশ কে দিবে? এইজন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ প্রতিলোমজগণ যে ধর্ম্মহীন, তাহা মহর্ষি গৌতম স্পষ্টই বলিয়াছেন—"প্রতিলোমজাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ" ৪ অঃ; পাঠান্তর "প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ। এইভাব মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে ৪৮ অঃ বিবৃত হইয়াছে। ৪৭ অঃ বৈধবিবাহ এবং তৎপ্রসূত সন্তানের দায়াধিকার নির্দ্দিষ্ট হইবার পর —যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, —

অর্থাল্লোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥

অর্থাৎ অর্থহেতু লোভ, বা কামদোষ অথবা অজ্ঞানতঃ (এমন স্ত্রীপুরুষসংযোগ ঘটে) যাহাতে বর্ণের নিশ্চয় সম্ভবে না, সে স্থলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। (এ শ্লোকের নীলকণ্ঠসম্মত ব্যাখ্যান্তর আছে—তাহাও ইহার অনেকাংশে অনুরূপ)

তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্ম্মঃ কানি কর্ম্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ!

অর্থাৎ হে পিতামহ! এইরূপ অর্থলোভাদি কারণে বর্ণসঙ্করজাতগণের ধর্ম্মকর্ম্ম কি তাহা আমাকে বলুন।

সঙ্করের বর্ণধর্ম্মে অধিকার নাই, ইহা জ্ঞাপনের জন্য ভীষ্মদেব সংক্ষেপে বর্ণধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া বর্ণসঙ্করের প্রসঙ্গ তুলিলেন,—

অতোঽবিশিষ্টস্ত্বধমো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ।
বাহ্যং বর্ণং জনয়তি চাতুর্ব্বর্ণ্যবিগর্হিতম্॥
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাহ্যং—সূতং—ইত্যাদি —

অর্থাৎ অধমবর্ণ যদি উচ্চবর্ণজা রমণীগমন করিয়া সন্তান উৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান চাতুর্ব্বর্ণ্যবিগর্হিত বাহ্যবর্ণ হইবে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীগর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান বাহ্যবর্ণ, সূত ইত্যাদি ক্রমে বহু বর্ণসঙ্করজন্মাদি কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই বর্ণসঙ্কর শুদ্ধবর্ণজ পিতার ধনাধিকারী যে হইবে না, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত (৪৭ অঃ) দায়াধিকার-ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। এই বর্ণসঙ্কর বিবাহের ফল নহে, ব্যতিক্রমের ফল।

ইত্যেতে সঙ্করে জাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥"

(অনু ৪৮)

পিতামাতার ব্যতিক্রম ফলে সঙ্করজাতগণ প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন যেভাবেই থাকে, নিজকর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে চিনিয়া লইবে। বিশেষ ধর্ম্ম চতুর্ব্বর্ণেরই আছে—

চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্ম্মো নান্যস্য বিদ্যতে।
বর্ণানাং ধর্ম্মহীনেষু সংখ্যা নাস্তীহ কস্যচিৎ॥

চতুর্ব্বর্ণেরই ধর্ম্ম আছে, অন্যের ধর্ম্ম নাই, সেই ধর্ম্মহীনের সংখ্যা করা যায় না।

অতএব প্রতিলোমাজাতগণ সর্ব্বথা অবৈধ পুত্র। তাহাদিগের দ্বারা পিতার পারলৌকিক উপকার একেবারেই নাই। এইজন্য কথিত হইয়াছে—

"যথোপদেশং পরিকীর্ত্তিতাসু নরঃপ্রজায়েত বিচার্য্য বুদ্ধিমান্।
নিহীনযোনির্হি সুতোঽবসাদয়েৎ তিতীর্ষমাণং হি যথোপলো জলে॥"

শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বকথিত (সবর্ণা ও অনুলোম দ্বিজাতি) পত্নীগর্ভে বুদ্ধিমান্ মানব বিচার-পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করিবে। জলে সন্তরণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়—অধমজন্মা সন্তান পিতার নিস্তারের উপায় না হইয়া মজ্জনের হেতু হইয়া থাকে। অতএব ৩য় প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর। এইখানেই তৃতীয় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর সমাপ্ত হইল।

রূপের মোহ।

(১)

সে একদিন গিয়াছে, যখন আমি ছোট ছোট ভাই বোনদের নিয়া সারাদিন খেলা করিতাম। ধূলা মাটি জ্ঞান ছিলনা, সময় অসময় বোধ ছিল না, শুধু স্কুলের বেলা হইলে বই খাতা নিয়ে ভাল মানুষটীর মত স্কুলে যাইতাম। তারপর ছুটি হ'য়ে গেলে বাড়ীতে এসে কিছু খাবার খেয়ে আবার ছুটোছুটিতে ঝুঁকিয়া পড়িতাম। তখন ছিল সুখের শৈশবকাল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কৈশোর এসে পড়ল। প্রকৃতির কোন্ এক সোণার কাঠির মোহন পরশে শরীরের মাঝে কি যেন কি একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরও যেন কি একটা আকস্মিক মধুর স্পন্দন জেগে উঠল। শৈশবের সেই ধূলাখেলা ভুলে গেলাম। লেখাপড়ার দিকে মন ঝুকে পড়্‌ল, অনায়াসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিলাম। পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র আমি। আমারে পড়াবার জন্য কলিকাতার সহরেই মেস্ ঠিক হইল। খরচ পত্রেরও অভাব নাই। যথাসময়ে আসিয়া সিটি-কলেজে সিট্ নিলুম। ষোল বছর বয়স হয়েছে, এ পর্য্যন্ত গ্রাম্যলক্ষ্মীর কোল ছাড়িয়া কখনও সহরে পা মাড়ায় নি। গ্রামাসরলতা ছাড়া নগরের কুটিলতা তখনও আমার কাঁচা হৃদয়ে পাকারূপে গভীর রেখাপাত করে নাই। এতদিন চক্ষু ছিল শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যে, এখন দেখ্‌ছি শুধু কৃত্রিম শোভাসম্পদ, সকলই যেন মানুষের হাতের গড়া। দিনের পর দিন নূতন নূতন কল-কারখানা, রাস্তাঘাট, ট্রাম, ইঞ্জিন, এমারত দেখে দেখে বিজ্ঞানের উপর ও বৈজ্ঞানিকদের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে উঠ্‌তে লাগল। গ্রামের সেই কুঞ্জকাননের পাখীর ডাক এখন পিয়ানো, হারমোনিয়ম, ফনোগ্রাফ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাঝ দিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু দুঃখ হয়, সহরে এসে অবধি একটা কদভ্যাস আমাকে অধিকার :করে বসেছে। দেশে থাক্‌তে রাত্রিশেষে পাখীর ঊষাকীর্ত্তনে ও মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, এখন কিন্তু গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢন্ ঢন্ ভীষণ শব্দ হইলেও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। শিশুকালের সেই অভ্যাসগুলির সঙ্গে সঙ্গে চাণক্য পণ্ডিতের বাছা বাছা শ্লোকগুলিও ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি।

যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহবন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্‌গতাং রক্ষেৎ চত্বারি কুক্কুটাদপি॥

এই সমস্ত শ্লোক ধূয়া ধূয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু "প্রাতরুত্থানং" প্রভৃতি উপদেশ পালনের জন্য বাবা, মা কিংবা ঠান্‌দিদি কেহই শাসন করেন না। বাবা আমাকে সুদূর কলিকাতায় যাঁহাদের শাসনে রাখিয়া গিয়াছেন, সে অধ্যাপকগণও (Professor) ছেলেদের নৈতিক উন্নতিতে বড় একটা মন দেন না। মাহিনার হিসাবে তাঁহাদের কলেজের খাটুনীটা শেষ হইয়া গেলেই সেই দিনকার মত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ চুকিয়া যায়। এইভাবে দিন

কাট্‌ছে। গ্রামের নীরবতা ছেড়ে এখন সহরের কোলাহলে গা ঢালিয়া দিয়াছি। সমান বয়সের বন্ধুগণ নিত্য নূতন খরচ জোগাইতেছে। বন্ধুদলের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম রংতামাসায় মাসে মাসে বহু পয়সা উড়িয়া যাইতেছে। বেশ আমোদেই যেন দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে। অমূল্য সময় জমার ঘরে কি মূল্য রাখিয়া যাইতেছে, সেদিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

এক দিন কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে মৃণালকান্তি ভায়া সংবাদ দিলে যে, ২রা মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া পনর দিনব্যাপী ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। এই পনর দিনের উৎসবে স্কুল কলেজের ছেলেদের শিক্ষার বিষয় ঢের আছে। অথচ সকল শ্রেণীর লোকেরই এই উৎসবে যোগদান করিবার অধিকার রহিয়াছে। অবিলম্বেই ঠিক হইয়া গেল যে, দুই একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ-ছেলে ভিন্ন আমাদের মেসের প্রায় সকলেই সেই উৎসবে যোগ দিবে।

(২)

মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীত। কলেজ আমাদের বন্ধ। কাজেই দিনের খাওয়াটা একটু বিলম্বেই হয়। বেলা যখন তিনটা তখন সকলেই ব্রাহ্ম-সমাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বন্ধুগণ নানা রকমের শীতবস্ত্র নিজ নিজ বাক্স হইতে খুলিতে লাগিল। রেশমী 'ষ্টকিং' শালের 'কম্ফটার', সার্জ্জের 'আল্‌ষ্টার', 'ওয়েষ্ট-কোট', 'ওভার-কোট' 'সোয়েটার' প্রভৃতি যার যা কিছু ছিল, সকলেই তাহা পরিধান করিল। বলিতে কি শর্ম্মারাম নিজেও কিন্তু সে বিলাসিতায় বাদ পড়েন নাই। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলে মিলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আজ "ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" বিষয়ক বক্তৃতা। কিন্তু মন্দিরের দরজায় যাইতে না যাইতেই এ কি এ? মন্দিরের ভিতরে মহান্ কোলাহল! বাহিরে অসংখ্য লোক জড়সড় হ'য়ে গণ্ডগোলেরই বৃদ্ধি করিতেছে। কিসের গোলযোগ হইতেছে জানিবার জন্য মৃণাল ভায়াকে ভিতরে পাঠাইয়া দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মৃণাল ভায়া সংবাদ দিল যে "ও গণ্ড-গোল কিছুই নয়, শুধু এই নিয়ে কথা উঠেছিল যে আজকের সভায় সভাপতি হবেন কে? কেউ বল্‌ছেন সুধীরনাথ মজুমদার সভাপতি হবেন, কেউ বল্‌ছেন, না, তা নয়, বিনয়ভূষণ ঘোষাল উপযুক্ত সভাপতি। এই নিয়ে দুইটা দল বেঁধে গেছে। একদল সুধীরবাবুর গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করছে, অপর দল বিনয়বাবুর জাত্যাভিমান প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং সভাই ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হইয়াছে।" প্রকৃত পক্ষে সুধীরবাবুর চেয়ে বিনয়বাবু লেখা পড়ায় একটু খাটো হইলেও High familyতে (উচ্চ বংশে) জন্ম বলিয়া বিনয়বাবুই সভাপতি হওয়ার অধিকারী। তা যা হউক, অবশেষে বিনয় বাবুর পক্ষেই ভোটের সংখ্যা বেশী হ'য়ে পড়েছে, তাই অপরপক্ষ কিছু শান্ত হওয়ায় রবটা একটু কমেছে।

তখন আমরা সকলে মিলিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমাদের গ্রামদেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত সে মণ্ডপে কোথাও কোন দেবতার মূর্ত্তি বা অপর কিছু পূজার আয়োজন না দেখিয়া মনটা যেন কেমন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু আমার চেয়েও বয়সে ছোট

অনেক ছেলেকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া এবং সারি সারি চেয়ারের উপের নীচে উভয় স্থলে বহু যুবক যুবতীর একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমিও বক্তৃতা শুনিবার প্রলোভনটা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কতক ইচ্ছায় ও কতক অনিচ্ছায় সেই লম্বা লেক্‌চার শুনিবার নিমিত্ত স্থিরমনে ও অস্থির নয়নে কাল কাটাইতে লাগিলাম। "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান"-প্রসঙ্গে সাকার নিরাকার-তত্ত্ব, স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বহু বিষয়ের অবতারণা হইল, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাখাদ্য বিচার, বিলাসিতা ও পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিলাম। শৈশবের পর কৈশোরে পদার্পণ করিয়া শরীরে ও মনে যেরূপ একটা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়াছিলাম, আজ যেন ঠিক তেমনি একটা কিসের পরিবর্ত্তন অলক্ষিতে আমার মনের মাঝে ঘটিয়া গেল। অতিকষ্টে চিত্তের আবেগ দমন করিয়া বন্ধুদের সহিত মেসে চলিয়া আসিলাম। অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না যে মনের ভিতরে কিসের তোলপাড় হচ্ছে এবং তার পরিণামই বা কি।

(৩)

চৈত্রমাস—প্রাতঃকালে খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বেলা এক প্রহর হইলেও সূর্য্যদেবের করুণা হইতেছেনা। ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ তৈল মর্দ্দন করিতেছে। সুগন্ধি তৈলের মনোরম গন্ধে আশে পাশের লোকেরও নাসারন্ধ্র সুবাসিত হইয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘকাল "কুন্তলবিলাস" ব্যবহার করিয়াও হারুবাবুর চুল-উঠা কমিতেছে না, সেই জন্য ইনি বড়ই আক্ষেপ করিতেছিলেন। রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় না, চক্ষুর জ্যোতিঃ কমিয়া গিয়াছে, চশ্‌মা দিয়াও দূরের জিনিষ হুবহু দেখা যায় না, মাথা বেদনায় সর্ব্বদায়ই অস্থির থাকিতে হয়, এম্, এ পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, পড়াশুনা ভালরূপ চল্‌ছেনা, হরেক রকমের শীতল তৈল ব্যবহার করিয়াও শিরঃপীড়া কমিতেছে না। এই সকল কারণে হারুবাবু তিন বেলাই স্নান করেন, এমন কি মাঘমাসের সেই প্রচণ্ড শীতেও তিনি তিন বেলা স্নান করায় 'অনিয়ম' করেন নাই। মাঝে মাঝে ভাগীরথীর জলেও অবগাহন করিয়া থাকেন। হারুবাবুর সাবানটা চিলের মত ছো মারিয়া নিয়া নীরুবাবু অদূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত শরীরে তাহা ঘসিলেন। তাহাকে দেখিয়া একখানা মহাদেবের মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। ছেলেরা স্নান করিতেছে, পাচকঠাকুর মসলার জন্য চাকরকে তাগাদা দিতেছে, বারান্দায় বসিয়া ঝি তরকারী কুটিতেছে, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক সদর দরজা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স অনুমান ৫০ কি ৫৫। গায়ে একখানা চাদর, পায়ে এক জোড়া চটি জুতা। ইনি আসিয়া মধুসূদন চক্রবর্ত্তীকে অনুসন্ধান করায় আমি তাঁহাকে উপরে নিয়া গেলাম। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে ইনি মধুবাবুর কাকা। এই মধুবাবুই কিন্তু সেই দিন "ব্রাহ্ম-মন্দিরে" বক্তৃতা শুনতে যান নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইনি তৈল মাখিয়া গঙ্গায় চলিলেন এবং প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টার পর স্নান করিয়া ফিরিয়া

আসিলেন। ঝি আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভিজা কাপড়খানা চাহিয়া নিয়া গেল। তিনি উপরে উঠিতে যাইবেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, বারান্দায় ও প্রকোষ্ঠের ভিতর প্রায় ১৫।১৬টী ছেলে খাইতে বসিয়াছে, উহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় গা ঘেষিয়া মিলিয়া মিশিয়াই আসন নিয়াছে। বিস্মিত হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন যে; "এঁরা কি সকলেই এক জাতি ?" নিকটেই মৃণালবাবু ভোজনাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি একটু রূঢ় ভাষায়ই উত্তর করিলেন "একজাতি হবে কেন ? নানান্ জাতি এখানে আছে। কলেজে বা মেসে আবার জাতের বাচবিচার করলে চলে ?"

"নারায়ণ! নারায়ণ!—জানিতাম না যে, এমনি ভাবে কলিকাতার ছেলেরা শূদ্র, কায়স্থ, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ সকলে মিলেমিশে এক পঙ্ক্তিতে আহার করে। হায়! কি কুক্ষণেই মধুকে কলিকাতায় পাঠিয়েছিলাম। সকলের সঙ্গে মিশে সেও বোধ হয় জাতি হারিয়েছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি ঘেন্না, কি ঘেন্না।"

তখন মৃণালকান্তিবাবু একটু রকম করেই যেন বল্লেন—জাত যাওয়ার কথাটা কি বল্লেন, বুঝতে পারলুম না। সহরে বোধ হয় আর আসেননি, তাই ওকথা বলছেন ? আজ মধুর জাত গেল, কাল চারুর জাত গেল, পরশু অমুক জাত হারাল, এই করেই বুঝি আপনারা জাতটাকে উড়িয়ে দেন ? এই ত আমরা এখানে ৩০।৩৫ জন আছি, তবে কি আমাদের সকলেরই জাত নষ্ট হ'য়ে গেছে ? জাতটা কি তেমনই একটা হাল্‌কা জিনিষ যে ফু দিলে উড়িয়ে যাবে ? আমরাও মশাই লজিক্ পড়েছি, ফিলসফী পড়েছি, কিন্তু আপনি আমাকে বোঝাতে পারেন জাতিটা নিত্য কি অনিত্য ?"

ব্রাহ্মণ—"জাতের্নিত্যত্বম্ অজন্যত্বাৎ; যদ্ যদ্ অজন্যম্ তত্তদবিনাশী।" অর্থাৎ জন্ম নাই বলিয়া জাতিটা নিত্য পদার্থ, যে যে বস্তুর জন্ম নাই, তার ধ্বংসও নাই। পক্ষান্তরে যাহার জন্ম আছে, তাহার ধ্বংসও আছে। কাজেই অনৈমিত্তিক বলিয়া জাতিটা নিত্য বস্তু।

মৃণাল—হাঁ, হাঁ তাই বলুন। তবে কি করে বল্‌ছেন যে মধুবাবু জাত হারিয়েছে ?

ব্রাহ্মণ—গ্রামদেশের নিরীহ লোক এসে এই ভাবেই বুঝি তোমাদের নিকট বোকা বনে যায় হে। গুটিকয়েক ইংরেজী পুঁথির পাতা উল্‌টিয়েছ, তাও আবার সমগ্র বইখানি পড়নি। পরীক্ষায় পাশ দিবার আন্দাজ এ পাতার কিছু, ওপাতার কিছু পড়ে পরীক্ষককে ফাঁকী দেওয়া তোমাদের অভ্যাস; কয়েক পৃষ্ঠা গলাধঃকরণ করে পরীক্ষার হলে গিয়ে বমন করে দাও; ব্যস, দিব্বি ইউনিভার্সিটির মার্কাগুলি সব নামের পাছে যোগ হতে থাকে। কিন্তু বাপু হে! এক বৎসর পর ওসকল লজিক্, ফিলুসফী সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে, ছাই ভস্ম কিছু বলতে পার কি ? সব চুলোর দোরে যায়।—চটোনা হে, চটোনা। বল্‌ছি এ চটবার কিছু নয়, দিন কালই এমন ধারা হয়ে গেছে, তা তুমি ত ছেলেমানুষ।

মৃণাল। মাপ করবেন মশাই, হাজার হোক্ তবু আমরা আপনার ছেলের বয়সী। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না। শুনতে পাই পাড়াগাঁয়ের অনেক বামুন

এবং বামুনপণ্ডিতও নাকি নিজে কিছু না জেনে না শুনে এমনিভাবে 'জাতি যাচ্ছে, জাতি যাবে' ব'লে চেঁচিয়ে বেড়ান। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি তাঁদের কথায় কাণ দেয় কয়-জনে? তারা কি বুঝিয়ে বলতে পারেন যে কি ক'রে চিরদিনের এই নিত্য সত্য জাত পদার্থটা লুপ্ত হ'য়ে যাবে? জাতি যদি নিত্য, তবে তাহা সৎপদার্থ, সৎপদার্থের কস্মিন্ কালেও বিনাশ নাই।

"নাসদুৎপদ্যতে নাপি সদ্ বিনশ্যতি
উৎপত্তিবিনাশয়ো রাবির্ভাবতিরোভাবস্বরূপত্বাৎ।"

গীতায়ও ভগবান্ বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

তবে কি ক'রে আমাদের হিন্দুজাতিটা এমনি ধাঁ ক'রে উড়ে যাবে বলছেন?

ব্রাহ্মণ। বলছি হে তবে শুন। জাতি ও ধর্ম্ম যে নিত্য পদার্থ, তাতে কারও মতদ্বৈধ নাই। ধর্ম্মী যতদিন থাকে, তার ধর্ম্মও ততদিন থাকবেই। ব্রাহ্মণ যতক্ষণ থাকবে, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বও ওতপ্রোতভাবে চিরকালই থাকবে। সেইরূপ হিন্দু আছে বলিয়া হিন্দুত্বও আছে, অবয়বীর সঙ্গে অবয়বের নিত্য সম্বন্ধ, অবয়বীকে ছাড়িয়া অবয়ব থাকিতে পারে না। তাই বলিয়া ব্যক্তির জাত্যন্তর পরিণতি হয় না,একথা বলিতে পারা যায় না। যদি কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের সঙ্গে আদানপ্রদান প্রভৃতি করে, তখন কি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? এদেশের যত মুসলমান, তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছে, এখন যাহারা মুসলমান বা খৃষ্টান হয়, তাহাদিগকে হিন্দু কেহই বলে না। তুমি বলিতে পার বস্তুতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি তাহাদের আছে, কিন্তু আচার-ব্যবহার মুসলমানের হইয়াছে বলিয়া তাহাকে মুসলমান বলে, একথাটী তর্কস্থলে আপাত বলা গেলেও সিদ্ধান্তে কিন্তু টেকে না। কেননা মানুষ আর গরুর জাতিভেদ তাহাদের অবয়ব ভেদ লইয়া, মানবের মধ্যের জাতিভেদ তো তাহা নয়?—মুসলমানের একটা সিং বেশী, আর হিন্দুর এক লেজ আছে, এমন পার্থক্য তো নাই? আছে কেবল আচার ব্যবহার, সেই আচার-ব্যবহার লইয়াই মানবের জাতিভেদ। যে স্বভাবমূলক আচার-ব্যবহার ভেদ হয়, সেই স্বভাবই তাহাদের জাতি; সুতরাং জাতির মাপকাঠী আচার-ব্যবহার, সেই আচার-ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইলে বুঝিতে হইবে পূর্ব্বজাতি—অর্থাৎ পূর্ব্বস্বভাব তাহাতে নাই, সুতরাং তাহার সে জাতিও তাহাতে নাই। উহার পরিবর্ত্তে নূতন জাতি আসিয়াছে, উহাতে জাতির নিত্যতা নষ্ট হয় না। যেমন মনুষ্যত্ব জাতি নিত্য এবং একটীই মাত্র, মনুষ্য বহু হইলে মনুষ্যত্ব কিন্তু এক। আর এক বলিয়াই একটী মাত্র মনুষ্য দেখিলেই যত রকম মানুষই হউকনা কেন, কেহ মানুষ বলিয়া পরিচয় না করিয়া দিলেও সেই মনুষ্যত্ব জাতি আছে বলিয়া তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কোন একটী মানুষ-শরীর মরিলে, তাহার সহিত মনুষ্যত্বজাতি মরে না। সেই মানুষ-শরীর হইতে মনুষ্যত্ব

জাতি সরিয়া যায়, আবার মানুষ জন্মগ্রহণ করিলে সেই শরীরে মনুষ্যত্বজাতি আসিয়া উপস্থিত হয়, এইরূপে মানুষে মনুষ্যত্বজাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে, তাহাতে যেমন মনুষ্যত্ব জাতি নষ্ট হয় না, সেইরূপ স্ব স্ব জাতীয় আচার-ব্যবহার থাকিলে, স্বীয় স্বীয় জাতি বর্ত্তমান থাকে, আবার ঐ আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে ঐ আচার-ব্যবহারবোধ্য জাতি ঐ ব্যক্তি হইতে সরিয়া যায়। যে সকল আচার-ব্যবহার অবলম্বন করা যায়, ঐ আচার-ব্যবহারবোধ্য জাতিরই ঐ ব্যক্তিতে তখন আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই আবির্ভাব-তিরোভাবে কোন জাতির বিনাশ উৎপত্তি হয় না। সুতরাং জাতির নিত্যতার কোনই ব্যাঘাত হইতে পারে না। ইহাই সিদ্ধান্ত, আর এই সিদ্ধান্তবলে ব্যক্তিবিশেষের হিন্দুত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব যাইতে পারে, সে যাওয়া চিরকালই যাইতেছে ও যাইয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না—এমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও হইয়াছে, খস, যমন প্রভৃতি জাতির উৎপত্তিও ঐরূপ দুই দশজন ব্যক্তির জাতি ত্যাগ লইয়া। উহাতে যদি বড় বেশী হয় তো, নূতন একটা দলঘটন বা জাতিগঠন; কিন্তু আজকালকার দিনে জাতি নিয়ে সমস্যা উপস্থিত হ'য়েছে সেই জায়গায় যে জায়গায় সমগ্র হিন্দুজাতিকে ধরে টান পড়েছে। হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের উৎপত্তি বা বিনাশ নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না বা ঐ জাতীয় ব্যক্তি নিয়ে কোন কথা নহে, কথা হচ্ছে তোমরা যাকে বল "নেশন্" (Nation) সেই নেশনটাকে নিয়া। পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম (জাতি) বা আচার নিয়া আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ গঠিত। জগতের সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর আচার-ব্যবহার এক হ'য়ে গেলে ভারতে নেশনালিটি বা জাতীয়তা ব'লে একটা কিছু কথা থাকত না, অথচ জাতির প্রতি সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক একটা টানও থাকত না। এই ত আমরা ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছি, আমাদের আচারব্যবহার ইংরেজ বা মুসলমানের আচার-ব্যবহার হইতেই সম্পূর্ণই ভিন্ন। কিন্তু পেটের দায়ে ও বিলাসলালসার মোহে আমরা যদি একতিল, দুইতিল করে নীচে নেমে পড়ি, তবে একটা মস্ত ভুল হইবে না কি? বিশ বচ্ছর পর তবে আমাদের দশাটা কি হবে ভাবতে পার কি? তখন আমরা দেখিব যে পরের ধর্ম্মের অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা নিজের ব্রাহ্মণত্ব হইতে অনেক সরিয়া পড়িয়াছি। তারপর একটী দুইটী করিয়া শত শত হিন্দুর হাজার হাজার ছেলে বিদেশীয় আচারের অনুষ্ঠান করতে থাকবে। অবশেষে হিন্দুজাতিটাতে পড়িয়া থাকিবে গোটাকয়েক শূন্য। অথচ আমাদের দেশের জনসংখ্যার দ্বারা বিদেশের বা বিধর্ম্মীর জাতিটাই পুষ্ট হইয়া যাইবে। এই ভাবের অন্ধ অনুকরণে শতেক বছরের মধ্যেই যে একটা বিশাল জাতিরও আমূল ধ্বংস হইতে পারে, তা কি তোমরা বিশ্বাস কর না? তোমাদের ইংরাজী ইতিহাস পড়িয়া দেখিও, পাশ্চাত্য দেশের কত প্রদেশের জাতি এইভাবে কালের করালকবলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে তাহাদের নাম থাকিলেও এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, সকলেই তাহা জানে। কেবল সেই কবল হইতে হিন্দুই বাঁচিয়াছিল, এখন বুঝি আর বাঁচে না। তোমরা কি ভাব না যে ব্রাহ্মণত্বের কঠোরতা থেকে বৈদেশিকের বিলাসিতায় গা ঢেলে দেওয়া সহজ

বটে, কিন্তু নিজের জাতি ও নিজের দেশ ব'লে একটা কিছু আছে এইকথা সকলকে জানাইতে হইলে, আমাদের দেশের শাস্ত্রবিধি মানিয়া আমাদের চলা কর্ত্তব্য। আজকালকার দিনের হাল্কা ফুলবাবুরা সকলেই মুখরোচক অভিনব খাদ্যের প্রতি রসনাকুকুরকে লেলিয়ে দেয়, জাতির চিন্তা তাহাদের হৃদয়েই স্থান পায় না, পূর্ব্বপুরুষের গৌরব তাহাদিগকে "একুশ হাত" বাড়িয়ে তোলে না। বংশানুক্রমে তাহারা যে জীর্ণ, শীর্ণ, দীন, ক্ষীণ ও হীন হইয়া পড়িতেছে, ও সকল ভিতরের খবর কিছুই রাখে না; শুধু নিজের প্রতি নিজের অবিশ্বাসে সব হারাইতে বসিয়াছে।

মৃণাল—(নরমসুরে) হিন্দুদের জীর্ণ ও অল্পায়ু হওয়ার প্রধান কারণ বোধ হয় বাল্যবিবাহ। জাতিধর্ম্মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে ব'লে ত মনে হয় না। কি বলেন আপনি?

ব্রাহ্মণ—এখন ওসব কিছু বলিবার সময় বোধ হয় হইবে না। তোমাদের কলেজের সময় হ'য়ে আসল।

মৃণাল—তা হ'ক আপনি বলুন, আজ আমি class attend করছিনা। আর এদের মাঝেও অনেকে আজ ক্লাসে যাবেনা বলছে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে উপরে আসুন। সেই খানেই আপনার কথা শুনব। "ঝি, ও ঝি, মঙ্গলাকে বল ত, বাজার থেকে ভাল কিছু ফল ও দুধ চিনি নিয়ে আসতে।"

মধু—ওসব আমি এনে রেখেছি।

এই সময় আমরা সকলে উপরে উঠিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণকে একটী চেয়ারে বসাইলাম। আমরা সব আশেপাশের সিটে বসিয়া ব্রাহ্মণের বক্তব্য বিষয় শুনবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। ব্রাহ্মণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ—আমাদের সমাজে আরও যে সমস্ত দুর্দ্দৈব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মানে নিজের ধর্ম্মের প্রতি নিজের অবিশ্বাস করাটাই প্রধান। মনে কর আজ যিনি বৈশ্য আছেন, তিনি যদি কাল নিজের হিন্দুধর্ম্মটাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলে শতমুখে নিন্দা করেন এবং সেই সনাতন আর্য্য-পদ্ধতিকে দূর করিয়া দিয়া অন্য কোনও বিধর্ম্মীর আচারের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তবে একদিন হয় ত এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে যে, তিনি সেই নব অবলম্বিত ধর্ম্মটাকেও বিনা কারণে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। বিশেষতঃ যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে বড় বড় কাজে নিযুক্ত আছেন, তাদৃশ মহাপুরুষগণ সমাজের সম্পর্ক এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। এইভাবে কেউ মিশছেন তাঁতিকুলে, কেউ বা বৈষ্ণবকুলে। আবার কেউ বা হচ্ছেন "ত্রিশঙ্কু"। পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া "নূতন কিছুর" দিকে ঝোঁক গেলেও ঘটনাক্রমে সেই "নূতনের" মাঝেও যে অবিশ্বাসের ফল্গুনদী সকলের অলক্ষিতে ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হইবে না, তাহাই বা কে জানে? বাহিরের চাকচিক্যে মজিয়া পড়াটাই আজকালকার ধর্ম্ম। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—মোহের বশে যাঁহারা নিত্য নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও বর্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে কি আখ্যা দেওয়া যায়?

নাস্তিক না আস্তিক? হিন্দুদের আস্তিক্য বুদ্ধিতে যার অবিশ্বাস, তাদৃশ ব্যক্তির অন্য কোনও ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস আসতে পারে না—এ নিশ্চয় কথা। বড়ই পরিতাপের বিষয় আজকাল এই সকল হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দুই বিন্দুমাত্রও চিন্তা করে না। কেহ বুঝতে চায় না

"আত্মীয়ে সংশ্রিতো:ধর্ম্মে মৃতোঽপি স্বর্গ মশ্নুতে।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

এই সকল শাস্ত্রীয় বচন আর্য্যদের জাতীয়তাকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে। আর ইহারই বলে এখনও হিন্দুজাতি বাঁচিয়া আছে,—বাল্যবিবাহের ফলে হিন্দুর অকালমৃত্যু মনে করাও পাগলের কথা। হিন্দুশাস্ত্রে উপনয়নের পর দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে অধ্যয়নের ব্যবস্থা, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালাভের পর গৃহে আসিয়া বিবাহ করিতে হইবে এই বিধান, ইহাতেই তো বাল্যকাল অতীত, অন্ততঃ ২০।২২ বৎসর বয়ঃক্রমের কমে শাস্ত্রানুসারে তো পুরুষের বিবাহ হইতেই পারে না। কন্যার বাল্যবিবাহ শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ যে 'ম্যারেজ' নয়, এটী তোমরা ধারণা করিতে পার না। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং পাশ্চাত্য আদর্শে বিবাহ হইলেই স্ত্রীসহবাস করিতে হয়, তোমরা এইটীই বোঝ, কিন্তু তোমাদের হিন্দুর বিবাহ যে কি তাহা জান না। কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে স্বামীও যদি সহবাস করেন, হিন্দুশাস্ত্র তাহাকেও দণ্ডার্হ বলিয়াছেন,—গর্ভাধান-সংস্কার দ্বিতীয়বিবাহ বলিয়া বা ব্যবহার হিন্দুর আছে, উহাই তোমাদের "ম্যারেজ", উহার পূর্ব্বে স্বামীস্ত্রীর একত্র বাস পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, এখনও শ্রদ্ধাবান্ হিন্দুর গৃহে এ নিয়ম প্রতিপালিত হয়। কন্যাকে বাল্যকাল হইতে শ্বশুরকুলের করিয়া লইয়া শ্বশুর শাশুড়ীর উপদেশ প্রদানে যে কতই সুফল হয়, তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। এখন বয়ঃপ্রাপ্ত বিবাহেরও কুফল উৎপন্ন হইতেছে, স্কুল কলেজের ছেলেরা কুসংসর্গে পড়িয়া ধর্ম্ম-উপদেশের অভাবে কতরূপে কৈশোর হইতে অসংযমের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, সে কথাটী একবারও ভাবিয়া দেখনা। ধন্য তোমাদের শিক্ষা ও ধন্য তোমাদের উপদেশ, ইত্যাদি বহুকথা বলিয়া অতিথিব্রাহ্মণ বর্ত্তমান পণপ্রথা ও হিন্দুদের দশকর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া জল খাইতে গেলেন। আমরাও যার যার "রুমে" চলিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ।

সংবাদ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজের সম্পাদকমহোদয়

সমীপেষু।

মহাশয়!

আমি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বসমর্থক বলিয়া 'ত্রিপুরা-গাইডে' পূজার পূর্ব্বে আমার নামে এক দুর্ণাম প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বসমর্থক নহি বা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানি না। আমাদের দেশীয় কায়স্থগণ শূদ্রাচারসম্পন্ন হইলেও তাঁহারা সদাচারী বলিয়া ক্ষত্রিয়ের আসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্রিয়াকর্ম্মে শূদ্রোচিত নামোল্লেখ হইয়া থাকে, এবং তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় মাসাশৌচ ব্যবহার করিয়া থাকেন। গত পূজার পূর্ব্বে কস্‌বার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্রমহাশয়ের কন্যার সহিত কালীকচ্ছের পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ-সভায় কন্যার পিতার আহ্বানে আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখানে বিবাহের সময় জানিতে পারিলাম বরপক্ষ ক্ষত্রিয়ত্বপ্রয়াসী, কিন্তু কন্যাপক্ষের সেরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। কন্যার পিতার সহিত বিশেষ আত্মীয়তা থাকায় আমি ইচ্ছাসত্বেও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই নাই। তবে আমি সেই বিবাহ উপলক্ষে অন্য কোনরূপ সাহায্য করি নাই। বিবাহের মন্ত্রপাঠ তাহাদের পুরোহিতই করাইয়াছিলেন। এই বিষয়টী আপনারা সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশ করিতে পারেন।

এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা হওয়ার পর কস্‌বার মুন্সেফী আদালতস্থ উকিল ও আমলাবর্গ আমাদের দেশস্থ পণ্ডিত-সমাজের নিকট যাহা পত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একখণ্ড প্রতিলিপি এতৎসহ পাঠাইলাম। ইতি—

শ্রীচন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন।

সাহাপুর—ত্রিপুরা।

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহোদয়গণ

সমীপেষু।

মহোদয়গণ!

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারিগণ বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, গত শ্রাবণ মাসে ত্রিপুরা জেলার কসবা মুন্সেফীর মুন্সেফবাবু হেমচন্দ্র মিত্রমহাশয়ের কন্যার সঙ্গে কালীকচ্ছনিবাসী পেনসন্‌প্রাপ্ত ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সিংহের পুত্রের যে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সাহাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য

মহাশয়কে হেমবাবুর পক্ষ হইতে পরিদর্শন জন্য আহ্বান করা হয়; তদনুসারে তিনি সেই বিবাহ-আসরে উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের কুলপুরোহিতগণের পৌরহিত্যে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। তিনি বরপক্ষের মনোমত দেশের প্রথার বিরুদ্ধে কোন মন্ত্রাদি পাঠ করান নাই, বরং তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধীই ছিলেন। বিবাহের মন্ত্রাদি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহের পুরোহিত কালীকচ্ছনিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাঠ করাইয়াছেন। উক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন মহাশয় বিরুদ্ধমত প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং কতক ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানিতে পারিলাম যে কতকগুলি কূটবুদ্ধি লোক নাকি এই সত্যবাদী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বৃথা লাঞ্ছিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। অতএব আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে, উক্ত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন মহাশয় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আপনারা ইচ্ছা করিলে ইহার বিশেষ তত্ত্ব লইতে পারেন ইতি।

নিবেদকগণ—

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, নাজির—কসবা মুন্সেফী আদালত। শ্রীগিরিজামোহন সেনগুপ্ত, একাউন্টেন্ট—কসবা মুন্সেফী। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি,এল। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরাজ। শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্ত্তী, শিক্ষক—কসবা। শ্রীঅঘোরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পেসকার কসবা মুন্সেফী। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি,এল, উকীল—সাং হাল কসবা। শ্রী প্রসন্নকুমার গুপ্ত, উকীল—কসবা মুন্সেফী। শ্রীজয়কুমার কর, উকীল—কসবা মুন্সেফী। শ্রীউমেশচন্দ্র দেব বি,এল, উকীল। শ্রীরোহিণীকুমার দত্ত, উকীল—কসবা মুন্সেফী।

জ্যোতিষশাস্ত্রবলে একদিন ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজ নিজ ভাগ্যফল পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিত, সর্ব্ববিধ কার্য্যেই ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া অগ্রসর হইতে পারিত। যে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান লোকে জানিতে পারিত, কালের কঠোর শাসনে সেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন লুপ্তপ্রায়। এ হেন সময়ে যদি কোন জ্যোতিষী গণনাদ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ যথাযথভাবে প্রকাশ করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, সাধারণের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করা আমাদের কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতেই আমরা আজ শ্রীমানী বাজারে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ ভাগ্যগণনা কার্য্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রীকে পাঠক-সমীপে উপস্থিত করিলাম। ইনি ৺কাশীধামে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিয়া ৺বারাণসীর জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় উপাধি পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কএক বৎসর জ্যোতিষ শাস্ত্রানুশীলনে ব্রতী হইয়াছেন, ইঁহার কৃত কোষ্ঠী, কোষ্ঠীবিচার যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বস্তুতঃই আনন্দিত হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার ষষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহকরি সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণকরিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ এসমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২ নং সিমলাষ্ট্রীট্‌, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C-675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণসমাজ

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা।

মাঘ ও ফাল্গুন।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

এই সংখ্যা ৷৷০ আনা।

সন ১৩২৫ সাল।

মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি
কুমার শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—675

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, মাঘ। } পঞ্চম সংখ্যা।

চরমে।

মরতের সুখ দুঃখ
ভুলে যেতে দাও অবসর,
ধ'রনা অধরে আর
বিষয়-মদিরা মোহকর।
দেখাওনা মোরে আর
ভবিষ্যের সুখ চিত্রখানি,
চোখের উপরে দাও—
সমাপ্তির যবনিকা টানি।
সংসারের কেনা-বেচা
শেষ ক'রে আনিয়াছি ক্রমে,
দেখায়ে সুখের ছবি
যেন আর ফেলনা'ক ভ্রমে।

আমার বলিতে যাহা
ছিল এই ধরণীর মাঝ,
চ'লে গেছে একে একে
না ফুরাতে জীবনের কাজ।
আমি তবে কেন আর
এ জগতে রব কি আশায়?
দিয়েছিলে যাহা কিছু
ফিরায়েত নে'ছ সমুদায়।
ধরণীর ধূলিখেলা
ভালবাসা প্রমোদের হাসি,
স্বেচ্ছায় বৰ্জ্জিয়া আমি
আজি মহাপ্রস্থান-প্রয়াসী।
রিক্তহস্তে সাশ্রুনেত্রে
আসিয়াছি তোমার দুয়ারে,
তুমি বিনে মনোব্যথা
কে বুঝিবে—বুঝাইব কারে?
করযোড়ে পাদপদ্মে
মিনতি জানাই সকাতরে,
ডুবায়োনা যেন আর
বাসনার কলুষ-সাগরে।
গেছে সুখ গেছে দুঃখ
অবসান বিষয়-লালসা,
চরমে এখন হরি!
শুধু তব চরণ ভরসা।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ব্যাধি-রহস্য।

(২)

দেহীর পরিচয়।

ইতঃপূর্ব্বে "মনুষ্যের ব্যাধি" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, দেহেতে দেহী যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহাই হইল ব্যাধি। অতএব ব্যাধি বুঝিতে হইলে এই দেহ ও দেহী যে কিরূপ পদার্থ, তাহার সম্যক জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। মোটের উপর দেখা যায় যে, ব্যাধি হইতেছে—অবস্থা বিশেষে দেহ ও দেহীর প্রতিকূল সংঘর্ষরূপ কারণের ফলমাত্র। সুতরাং ফলের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে কারণের প্রকৃতিই বুঝিতে হইবে। তাই, প্রথমতঃ আমরা দেহীর স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

বিদ্যুৎশক্তি তড়িদুৎপাদক যন্ত্র (Battery) মধ্যে উৎপন্ন হইয়া যেমন তৎসংলগ্ন তাম্রাদি ধাতুনির্ম্মিত তারসমূহের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পরে কোথাও আলোক (electric light) প্রজ্বলিত করে, কোথাও তারবার্ত্তা (telegraphic message) বাহিত হয় এবং কোথাও বা বায়ুসঞ্চালনক্রিয়া (electric fan) সম্পন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মার সংস্কার মস্তিষ্করূপ যন্ত্রে যথাকালে উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎসংলগ্ন অসংখ্য স্নায়ুপথে Nervous system) প্রবাহিত হয় এবং তাহার ফলে দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শনাদি জ্ঞানক্রিয়া, গমন গ্রহণাদি পরিচালনক্রিয়া এবং পান, ভোজন, রক্তসঞ্চালনাদি পোষণক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

একই তড়িৎশক্তি যে এইরূপ বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ—উহা যে সকল যন্ত্রের ভিতর দিয়া গতায়াত করে, সেই সকল যন্ত্রের নির্ম্মাণ-বিচিত্রতা। এইরূপ চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বত্র এক হইলেও, উহা যে জাতীয় অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হয়, তাহার ক্রিয়াও সেই জাতীয় হইয়া থাকে। জীব বলিলে এই অন্তঃকরণের সহিত মিলিত চৈতন্যকেই বুঝায় এবং সেই অন্তঃকরণের ক্রিয়াই জীবের ক্রিয়া। বৈদ্যুতিক আলোক, তারবার্ত্তা প্রভৃতির উৎপাদন-রহস্য বুঝিতে হইলে, তড়িতের রহস্য না বুঝিয়া যেমন এই সকল আলোকাদি তড়িৎ-ক্রিয়া-উৎপাদক যন্ত্রের রহস্য বুঝিতে হয়, তেমনই দেহী বা জীবের রহস্য বুঝিতে হইলে চৈতন্যের রহস্য না বুঝিয়া অগ্রে অন্তঃকরণ-রহস্যই বুঝা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বেদান্তসার বলেন,—

সূক্ষ্মশরীরাণি তু পঞ্চদশাবয়বানি। অবয়বস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং, বুদ্ধিমনসী, কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকঞ্চেতি।

অর্থাৎ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান পাঁচটী প্রাণশক্তি এবং মন ও বুদ্ধি এই মোট ১৭টী চৈতন্যোপেত সংস্কার বা শক্তি সংহতভাবে অবস্থিত থাকিয়া সূক্ষ্মদেহ নামে পরিচিত। এই চৈতন্যোপেত সূক্ষ্মদেহই জীব নাম ধারণ করে।

বংশদণ্ড অঙ্কুরিত হইয়া যেমন একটীর পর আর একটী পর্ব্ব উৎপাদন করে, অন্তঃকরণও তদ্রূপ যথাকালে ক্রিয়াশীল হইলে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই বুদ্ধি মনাদি উক্ত জীবের দ্বিবিধ দেহ বিদ্যমান। ইহার এক দেহ শক্তিময়, অপর দেহ ভৌতিক। শক্তিময় দেহ যখন ভৌতিক দেহচারী হয়, তখনই বুদ্ধিমনাদির ক্রিয়া হইতে থাকে। ফলকথা, শুধু কেবল ভৌতিক বা শক্তিময় দেহ একাকী নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে। বলা নিষ্প্রয়োজন, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই আলোচ্য বুদ্ধিমনাদি বৃত্তির সংস্কার জন্মিয়া থাকে।

এই অন্তঃকরণ-রহস্য বুঝাইবার জন্য আমরা আর একটী দৃষ্টান্তেরও অবতারণা করিব। এই অন্তঃকরণকে একভাবে আম্রাদি কোন একটী ফলের বীজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আম্রবীজের মধ্যে যেমন আম্রবৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, মুকুল ও ফলের সংস্কার লীন অবস্থায় থাকে, অন্তঃকরণের মধ্যেও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার বিরাজিত থাকে, অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, এই বুদ্ধি মনাদি সংস্কার-সমষ্টিরই অপর নাম অন্তঃকরণ। আবার দেখা যায় যে, আম্রফল যখন পূর্ব্বসংস্কার ও মৃত্তিকাদি ভৌতিক পদার্থের সংস্রবে অম্ল, মধুরাদি রসযুক্ত হয়, আলোচ্য অন্তঃকরণও তদ্রূপ ত্রিগুণোপেত হইলেও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ও ইহজন্মের সঙ্গ ও শিক্ষানুসারে যথাক্রমে সত্ত্ব-প্রধান, রজঃপ্রধান বা তমঃপ্রধান হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই অন্তঃকরণীয় বুদ্ধি, মনাদিও ঠিক ঐরূপ বিভিন্ন গুণসম্পন্ন হয়।

অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়-প্রণীত ধর্ম্মব্যাখ্যা নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে আলোচ্য অন্তঃকরণ সম্বন্ধে যে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলা হইয়াছে। পাঠক-গণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করা হইল,—

"অন্তঃকরণ। যে শক্তিবিশেষের দ্বারা আমরা কোন বিষয়ের ভাবনা, চিন্তা, তর্কবিতর্ক করিতে পারি, কিম্বা যাহা দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বিষয়সমূহের প্রত্যুপলব্ধি বা প্রত্যালোচন, অথবা বিবিধ সংকল্প করিয়া থাকি, যাহাতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার প্রতিধ্বনি বা প্রতিকৃতি হয়, যাহাতে পঞ্চপ্রাণের ক্রিয়ার প্রতিস্ফূর্ত্তি হয়, আর যাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত অগ্রসর হয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আপনাপন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, এবং পঞ্চপ্রাণ নিজ নিজ ক্রিয়ায় উন্মুখীন হয়, আর যাহা হইতে ভাবনা, চিন্তা এবং নানাবিধ তর্কবিতর্কাদি বিষয়ে ব্যগ্রতা হয়, তাহারই নাম মন। আর ঐ কয়প্রকার ঘটনাই তাহার বৃত্তি।

তন্মধ্যে প্রথম চারিটিকে তাহার "প্রক্রান্তবিষয়াবৃত্তি" আর অপর কয়টী "প্রক্রম্যমান বিষয়া বৃত্তি"। এবং এই উভয়বিধ বৃত্তিমধ্যে অবস্থাকে মনের "স্বরূপ" বলে।

"যে শক্তিবিশেষের দ্বারা মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং তাহাদের আয়ত্তীকৃত এই সর্ব্বাবয়ব—সমন্বিত দেহ, এতৎ সমস্তের প্রতি বা সমস্তের কোন অংশের প্রতি, আত্মার সহিত অভিন্নভাব সংস্থাপিত হইয়া সকলগুলিই আমাদের আত্মার মধ্যে পরিগণিত হয়, অর্থাৎ "আমি" ভাবে প্রকাশিত হয়, আর ঐ মন প্রভৃতির উক্ত উভয়বিধ বৃত্তিগুলিও "আমার বৃত্তি" বলিয়া যে প্রতিভাত হয়, তাহাই "অভিমান" নামক বস্তু। অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমি ভাবিতেছি, আমি বুঝিতেছি, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি করিতেছি, আমি যাইতেছি, আমি বলিতেছি, আমি ভোজন করি, আমি জীর্ণ করি, এবং আমি শ্বাস-প্রশ্বাস করি ইত্যাদি নানাবিধ "আমি ও আমার" ভাবের পরিস্ফূর্ত্তি হয়, তাহার নাম অভিমান। আর ইহার এই সকল ভাবের নাম "প্রক্রান্ত বিষয়া বৃত্তি" এবং এই সকল ভাব হওয়ার নিমিত্ত ইহার বাগ্রতাবস্থা বিশেষের নাম ইহার "প্রক্রম্যমান বিষয়া বৃত্তি"। আর এই উভয়-বিধ বৃত্তিশূন্য অবস্থাই অভিমানের "স্বরূপ"।

"যে শক্তি হইতে অভিমান অবধি পঞ্চপ্রাণ পর্য্যন্ত সকলের উল্লিখিত কার্য্যাবলীসাধনের নিমিত্ত অধ্যবসায় উৎপন্ন হয় "অমুক কার্য্য করিতে হইবে" এইরূপ ইচ্ছা বা নিশ্চয় ভাবের সূচনা হয়, আবার সমস্ত কার্য্যের পরে, এক প্রকার তৃপ্তিবিশেষ সঞ্জাত হয়, তাহার নাম "বুদ্ধি"। প্রক্রম্যমান বিষয়া বৃত্তি" এবং সেই তৃপ্তিবিশেষ অবস্থার নাম তাহার "প্রক্রান্ত বিষয়া বৃত্তি"। আর এই উভয়বিধ বৃত্তিশূন্য অবস্থাকে বুদ্ধির "স্বরূপ" বলে।

যেখানে এই বুদ্ধির মূল সূচনা হয় এবং উল্লিখিত যাবৎ বৃত্তিগুলির শেষ সংস্কারাবস্থা অবস্থিতি করে, তাহার নাম প্রকৃতি। আর সেই সূচনাবস্থাই প্রকৃতির "প্রক্রম্যমান বিষয়া-বৃত্তি" এবং সেই সংস্কারাবস্থা তাহার "প্রক্রান্ত বিষয়া বৃত্তি"। আর এই উভয়বিধ বৃত্তিশূন্য অবস্থাই প্রকৃতির "স্বরূপ" বলিয়া জানিবে।"

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত মন, অভিমান, বুদ্ধি ও প্রকৃতি এই চারিটী বস্তুই অন্তঃকরণ নামে অভিহিত। ইহাদের সকলের মধ্যেই প্রকাশ (সত্ত্ব), পরিচালন (রজঃ) এবং পোষণ (তমঃ) শক্তির সংমিশ্রণ আছে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের ক্রিয়ার মূলও এই চারিটী বস্তু। মোটের উপর অন্তঃকরণকে একখানি ইঞ্জিন এবং বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদিকে ঐ ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। চালকের (Driver) শক্তি নিয়োজিত হইলে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন সমস্ত ইঞ্জিন-খানি চলিতে থাকে, চৈতন্যের সংমিশ্রণে তদ্রূপ অন্তঃকরণাংশ প্রকৃতি, বুদ্ধি, মনাদির মধ্যে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া সমস্ত অন্তঃকরণেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই ক্রিয়াই দেহী বা জীবাত্মার ক্রিয়া এবং ইহাই হইল তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে দেহী বা জীবাত্মার দেহগঠনব্যাপারে নির্ম্মাতা এত অধিক কৌশল ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দেহী আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য কি না? উত্তরে বলা যায় যে, জীবাত্মা স্বয়ং দৃশ্য পদার্থ না হইলেও তাঁহার অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়াক্ষেত্র দেহমধ্য প্রতিবিম্বই অব্যভিচারী অনুমান প্রমাণ। ইতঃপূর্ব্বে আমরা তড়িৎশক্তির সহিত জীবাত্মার শক্তিসমূহের তুলনা করিয়াছি বটে, কিন্তু তড়িৎশক্তি যখন লৌহ বা তাম্রনির্ম্মিত তারের উপর দিয়া গমনাগমন করে, তাহার কোন রূপ বা ছায়া দৃষ্ট হয় না; তবে আলোক প্রজ্জ্বালন (Electric light) বা তারবার্ত্তা বহন (telegraphic message) রূপ ক্রিয়া দ্বারা মাত্র তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু অন্য পক্ষে জীবশক্তি যখন দেহযন্ত্ররূপ আধারে অবস্থানপূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার একটা প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়।

অতএব এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিবিম্বের সহিত অদৃশ্য তড়িতের তুলনা না করিয়া অগ্নিদগ্ধ লৌহপিণ্ডের দৃশ্যমান্ রক্তবর্ণের তুলনা করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ অগ্নির তাপজ রক্তবর্ণ ও জীবাত্মার প্রতিবিম্ব এতদুভয়ই আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত বিষয়। আবার দেখা যায়, অগ্নিদগ্ধ লৌহপিণ্ডের তাপশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে যেমন তাহার তাপজ রক্তবর্ণ ক্রমশঃ কমিয়া আসে, তেমনই জীবশক্তির ক্রিয়ার মাত্রা কমিয়া গেলে, তাহার ক্রিয়াক্ষেত্র দেহের অস্তিত্ব মলিনতর হইয়া পড়ে। অপিচ, তাপ একবারে অন্তর্হিত হইলে লৌহপিণ্ড যেমন রক্তবর্ণ হারাইয়া স্বকীয় স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহযন্ত্র হইতে জীবাত্মা পৃথক্ হইয়া পড়িলে, অর্থাৎ মৃত্যু হইলে, মাত্র একটা কান্তিবিহীন জড়দেহ পড়িয়া থাকে।

যে কোন সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী পাঠকই আমাদের এবম্বিধ উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়তই তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতেছে। আজ একজন হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থকায় লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আপ্যায়ন হইল, আর যদি রাত্রির মধ্যে তাঁহার সামান্য সর্দ্দিকাসি হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাই তাঁহার দেহের শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার কি কোন অসুখ হইয়াছে বলিয়া আমরা একটা প্রশ্নের অবতারণা না করিয়াও ক্ষান্ত হই না। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝা যায় যে, তাঁহার দেহের শাসক ও রক্ষক যে বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক ত্রিদোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে কফ নামক দোষের বৈষম্য উপস্থিত হইয়া শারীর-যন্ত্রের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে এবং তাহার ফলে জীবাত্মার শক্তিগুলি আর সেই যন্ত্রের মধ্যে পূর্ব্ববৎ গমনাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। কাজেই দেহ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

মোটের উপর দেখা যায় যে, জীবাত্মা স্বয়ং আমাদের দৃশ্য বস্তু না হইলেও তাঁহার প্রতিবিম্ব আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। জীবাত্মার শক্তিময় দেহ গঠন-প্রণালীও আমরা ইতঃপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং, আমাদের আলোচ্য দেহী বা জীবাত্মার পরিচয় পাঠকগণ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, এইবার আমরা এই দেহীর আশ্রয় দেহ সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং তাহার ফলে আমরা দেহী ও দেহ এতদুভয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া ব্যাধির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।

মধ্যদেশী রাঢ়ীয় বা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ।

মেদিনীপুর জেলায় রাঢ়ীয়, বৈদিক ও ব্যাসোক্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। ইঁহারা মধ্যশ্রেণীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহারা কোন্ সময়ে, কোন্ স্থান হইতে ও কি হেতু মেদিনীপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং কি কারণে ইঁহাদের মধ্যশ্রেণীয় এই আখ্যা লাভ হইয়াছিল; ইঁহারা সামবেদীয় কুথুমী শাখাধ্যায়ী এবং ভবদেব-পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন এবং গাঁই, গোত্র, প্রবর উপাধি সমস্তই অবিকল রাঢ়ীয়গণের ন্যায় হইলেও কি জন্য যে ইঁহারা রাঢ়ীয়গণের সহিত আদান-প্রদান ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ মহাবংশাবলী-প্রণেতা সুবিখ্যাত কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র ৺সর্ব্বানন্দ মিশ্রের রচিত “কুলতত্ত্বার্ণব” নামক একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থটী এতাবৎকাল অপ্রকাশিত ছিল; সম্প্রতি মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ-সভার কেন্দ্রসভা-কর্ত্তৃক সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা আদিশূরের সময় হইতে দেবীবরের সময় পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের (মধ্য শ্রেণীয়গণের) একটী ধারাবাহিক ইতিহাস। আমি উক্ত গ্রন্থাবলম্বনে মধ্যশ্রেণীয়গণের আমূলবৃত্তান্ত ব্রাহ্মণ-সমাজের সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণের অবগতির নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিলাম।

কুলতত্ত্বার্ণবের—

“রাঢ়োৎকলয়োর্মধ্যদেশে চক্রুস্তে বসতিং দ্বিজাঃ।
মধ্যশ্রেণীতি বিখ্যাতা মধ্যদেশনিবাসতঃ॥”

এই শ্লোকের সহিত মিলাইলে মধ্যদেশ শব্দের অর্থ ও মধ্যশ্রেণী এই নামের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। এক্ষণে কোথা হইতে কোন্ সময় উক্ত দ্বিজগণ, এবং কি হেতুই বা স্বদেশ ও স্বজাতি

পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত মধ্যদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কুলতত্ত্বার্ণবকার লিখিয়াছেন যে ১২১১ শকে অর্থাৎ ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে মাধব (দনুজমাধব) নৃপতির দেহান্তে পুনর্ব্বার মহাপরাক্রান্ত যবন নৃপতিগণ ব্রাহ্মণগণের উপর নির্য্যাতন করায় তাঁহারা রাঢ়দেশে বাস করিতে অক্ষম হইলেন, তখন বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর ভেদ পরিত্যাগ করতঃ শ্রেণীভেদ ও কুলাকুল বিচার না করিয়া পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করিতে লাগিলেন। এই একতা-প্রভাবে যবনগণ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মবিনাশে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে যবনভূপতিগণের অধিকারে ব্রাহ্মণগণ শতবর্ষাধিককাল বহু কষ্টে অতিবাহিত করিলেন।

পরে কংসনারায়ণনামা নৃপতি (রাজা গণেশ) যবনদিগকে জয় করিলেন ও গৌড়দেশ অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনানুসারে তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠ দত্তখাস নামক মন্ত্রীকে সত্বর ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া কুলগ্রন্থানুসারে তাঁহাদিগের গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক কুলবন্ধনের জন্য আদেশ করিলেন। মন্ত্রিবর রাজার আদেশে দেখিলেন যে আহূত দ্বিজগণের মধ্যে কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের সপ্তশতী সম্পর্ক এবং স্থানভ্রংশহেতু মহান্ কুলবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের পঞ্চগোত্র ও ছাপ্পান্নটী গাঁই ছিল—এক্ষণে কেয়াড়ী, পুংসিক, ভাদাড়ী, দীঘল, ভট্টগ্রামী ও পিতাড়ী এই ছয়টী প্রবেশ করায় সর্ব্বশুদ্ধ বাষট্টিটী গাঁই হইয়াছে। তিনি এতাদৃশ বিপর্য্যয় দর্শনে চিন্তান্বিত হইয়া কাচ্না মুখজ শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলাচার্য্য দ্বারা উনপঞ্চাশবার যেরূপ ভাবে সমীকরণ হইয়াছিল, তদনুক্রমে কুলীন ব্রাহ্মণগণের গুণদোষাদির বিচারপূর্ব্বক সমীকরণ করিতে উদ্যত হইলে, কাটাদিয়া বন্দ্য দাশরথি, বংশজ ঈশান তাঁহাকে বলিলেন,—"যাঁহারা আচারাদি নবগুণসম্পন্ন, পূর্ব্বে মহারাজ বল্লালসেন তাঁহাদিগকেই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন—এক্ষণে তত্তদ্বংশজাত বহু ব্রাহ্মণের উক্ত গুণের লেশমাত্রও নাই। অধুনা কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের নবগুণের কিছু মাত্র বিচার না করিয়া যাঁহাদিগকে কুলীন বলেন, সেই সেই বংশীয়েরাই কুলীন হন। বস্তুতঃ "কুল গুণগত, বংশগত নহে। অতএব আপনি ব্রাহ্মণগণের গুণসমূহের বিচারপূর্ব্বক কুল-বন্ধন করুন।"

কিন্তু ঈশানের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য বহু কুলাচার্য্য ও কুলীন বংশজগণ অনুমোদন না করায় মন্ত্রী দত্তখাস কুলীনদিগের সমীকরণপূর্ব্বক আটজন মাত্র ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য প্রদান করেন।

যথা:—(১) ফুলিয়া মুখজ বিদ্যাধর, (২) কাচ্না মুখজ সদাশিব, (৩) অবসথী চট্টজ বলভদ্র, (৪) কাঁটাদিয়া বন্দ্যজ আদিত্য (৫) দিগম্বর, (৬) কাঞ্জিজ বাসুদেব, (৭) গাঙ্গজ মাধব, (৮) এবং পূতিজ বশিষ্ঠ।

ঈশানের সমীচীনবাক্য অবলম্বিত হইল না দেখিয়া উক্ত কুলীনগণের প্রত্যেকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রহ্মকর্ম্মনিপুণ আচারাদি নবগুণপূর্ণ মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণগণ দত্তখাসের সভা হইতে উত্থিত হইলেন।

যথা :—ফুলিয়া মুখজ নৃসিংহবংশজাত বিদ্যাধরানুজ "গদাধর", (২) কাচ্না মুখজ্ ভাকর বংশজ সদাশিবানুজ 'মহেশ্বর', (৩) কাঁটাদিয়া বন্দ্যজ দাশরথিবংশজ আদিত্যানুজ 'ঈশান' ও (৪) দিগম্বরানুজ 'শিব', (৫) অবসথী চট্টজ তেকড়িবংশজ বলভদ্রানুজ 'রাঘব', (৬) পূতিজ চক্রপাণিসুত বশিষ্ঠানুজ সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ 'দক্ষ'; (৭) কাঞ্জিজ কানুবংশজাত বাসুদেবানুজ ব্রহ্মকর্ম্মনিপুণ 'অনিরুদ্ধ' এবং (৮) গাঙ্গজ শিশোবংশজ মাধবানুজ 'কেশব'।

এই আটজন কুলীনকুল-সম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে উত্থিত হইতে দেখিয়া মহাত্মা শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সিদ্ধশ্রোত্রিয়গণের মধ্যে পরিহালবংশজ গোবিন্দ, (২) বটব্যাল বংশজ ভূধর, (৩) কুলভি-বংশজ রাম ও (৪) কৃষ্ণ, (৫) কেশরকোণিবংশজ সর্ব্ব, (৬) মাশ্চটক-বংশজ বিকর্ত্তন ও (৭) সুদর্শন, (৮) পলসাইবংশজ গোপাল, (৯) গুড়বংশজ মধুসূদন, (১০) তৈলবাটীবংশজাত কৌতুক, (১১) হড়বংশজ ত্রিবিক্রম, (১২) পালধিবংশজ পীতাম্বর, (১৩) শিমলাইবংশজ কানু, (১৪) চোৎখণ্ডীবংশজ শ্রীগর্ভ, (১৫) শ্রীনিবাস, (১৬) শ্রীকান্ত ও (১৭) শ্রীপতি, (১৮) মহিন্তাবংশজ রাঘব, (১৯) চতুর্ভুজ, (২০) জহ্নু, (২১) দুর্গাবর, (২২) ভীম, (২৩) সর্ব্বানন্দ ও (২৪) জনার্দ্দন, (২৫) পিপ্পলীবংশজ মদন, (২৬) হলায়ুধ, (২৭) অনন্ত, (২৮) মাধব, (২৯) বিষ্ণু, (৩০) ঘোষাল-বংশজ মুরারী ও (৩১) কেশব, (৩২) সাণ্ডেশ্বরীবংশজ নারায়ণ।

এই ৩২জন "সিদ্ধশ্রোত্রিয়" ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। এই চল্লিশজন, গাঁইসংখ্যা বাইশটী। মন্ত্রী দত্তখাস ঐ চল্লিশজন ব্রাহ্মণকে সভা হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়া সভাস্থ অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—"আমার অবমাননা করিয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চলিয়া গিয়াছেন, আপনারা তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন না।" দত্তখাসের উক্ত আদেশ শ্রবণ করিয়া "বাইশগ্রামী" চল্লিশজন ব্রাহ্মণ পরস্পর বিচার করিলেন, "রাজার বিশেষতঃ জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় হইয়া থাকা অপেক্ষা এদেশ পরিত্যাগ করা বিধেয়।" সর্ব্বদা কলহের আশঙ্কায় তাঁহারা রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকলত্রাদির সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া রাঢ় ও উড্রদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাসহেতু "মধ্যশ্রেণী" এই আখ্যা লাভ করিলেন।

> বিহায় রাঢ়দেশঞ্চ সদা কলহশঙ্কয়া।
> অবাচীং ককুভং জগ্মুর্ভার্য্যা পুত্রাদিভিঃসহ ॥
> রাঢ়োড্রয়োর্মধ্যদেশে চক্রুস্তে বসতিং দ্বিজাঃ।
> তদা প্রভৃতি তে সর্ব্বে চত্বারিংশদ্দ্বিজোত্তমাঃ ॥
> মধ্যশ্রেণীতি বিখ্যাতা মধ্যদেশনিবাসতঃ।
>
> (কুলতত্ত্বার্ণব)

মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের মধ্যে মুখোটী, বন্দ্যঘটী, চট্ট, গাঙ্গুলী, কাঞ্জিলাল ও পূতিতুণ্ড এই ছয়টী গাঁই কুলীনকুল-সম্ভূত এবং পারিহাল, বটব্যাল, কুলভি, কেশরকোণি, মাশ্চটক,

পলসায়ী, গুড় তৈলবাটী, হড়, পালধি, সিমুলায়ী, চোৎখণ্ডী মহিন্ত্যা, পিপ্পলী, ঘোষাল ও সাণ্ডেশ্বরী (বাটেশ্বরী) এই ষোলজন ব্রাহ্মণ সিদ্ধশ্রোত্রিয়-বংশজ। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়োপলক্ষে সমগ্র সমাজকে আহ্বান করাই যে "বাইশী"করা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। যদিও এক্ষণে উক্ত সমাজে বাইশ গাঁইএর বহির্ভূত ব্রাহ্মণ প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তথাপি "বাইশী" শব্দটী রূঢ়ি অর্থলাভ করিয়া অবাধে প্রচলিত রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে, এই গ্রন্থের ভিতর দুইটা কথার উল্লেখ আছে। একটী মধ্যদেশ, আর একটী মধ্যশ্রেণী, আমরা দুইটীকেই এক বলিয়া ধরিয়া বিচার করিতে পারি, অথবা দুইটীকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মেদিনীপুরকে মধ্যদেশ বলিয়া বিচার করা যাইতে পারে, যেহেতু গঙ্গার পশ্চিম পারকে প্রাচ্যদেশ বা রাঢ়ভূমি বলে, হুগলী এবং বর্ত্তমান হাবড়া জেলার এবং চব্বিশপরগণা জেলার কিয়দংশের পশ্চিমে এবং বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাংশেই মেদিনীপুর জেলা অবস্থিত। উড়িষ্যাদেশে ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর প্রভৃতি জেলা উড়িষ্যা বিভাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব ও উত্তর; সুতরাং মেদিনীপুর রাঢ় ও উড়িষ্যার সীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বলিয়া "মধ্যদেশ" নামে অভিহিত হইতে পারে। মেদিনীপুর রাঢ় ও উৎকল দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ ছিল। অতএব ঐ দেশবাসী রাঢ়াগত নূতন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তন্ত্রার্ণবকার কর্ত্তৃক মেদিনীপুর জেলা রাঢ় ও উড্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ বলিয়া মধ্যদেশ এই নামে অভিহিত হইলেও অতি প্রাচীনকাল হইতে উহা প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পুরাণ ও কাব্যাদিতে পাওয়া যায়। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে সুহ্মের বিশেষ পরিচয় আছে। যথা—

তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ॥
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাঃ সুহ্মাশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশা সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥
অঙ্গস্যাঙ্গোঽভবদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।

মহাভারত আদিপর্ব্ব।

মহর্ষি দীর্ঘতমা, বলিরাজ-মহিষীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটী পুত্র হইবে। অঙ্গের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গের নামানুসারে বঙ্গ, কলিঙ্গের নামানুসারে কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের নামানুসারে পুণ্ড্র ও সুহ্মের নামানুসারে সুহ্মদেশ।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন—সুহ্মই রাঢ়দেশ "সুহ্মাঃ-রাঢ়াঃ।

বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সুহ্মদেশের পরিচয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

উশীনরস্যাপি শিবিনৃগনরকৃমিধর্ব্বাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রাঃ বভূবুঃ। বৃষদর্ভ সুবীর কৈকেয়-মদ্রকাশ্চত্বারঃ শিবিপুত্রাঃ তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ ততো হেমঃ হেমাৎ সুতপাঃ তস্মাদ্বলি যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত॥

উশীনরের পাঁচপুত্র শিবি, নৃগ নর, কৃমি ও ধর্ব্ব। শিবির চারিপুত্র বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক। তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, তৎপুত্র হেম; হেমের পুত্র সুতপা, সুতপার পুত্র বলি, এই বলিরাজা মহিষীর গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নামানুসারে তাঁহাদের অধিকৃত পাঁচটী প্রদেশের নামকরণ হয়।

মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সুহ্মদেশের নাম পাওয়া যায়, যথা —

স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুল্য প্রাচীনবর্হিষা।
অহিতান্ অনিলোদ্ধূতৈ স্তর্জয়ন্নিব কেতুভিঃ॥
স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ॥
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামং স্তাং স্তান্ জনপদাঞ্জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামং উপকণ্ঠং মহোদধেঃ
অনম্রানাং সমুদ্ধর্ত্তু তস্মাৎ সিন্ধুরবাদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীং॥
বঙ্গান্ উৎসায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু চ॥
আপাদপদ্মপ্রণতা কলমাইব তে রঘুম।
ফলৈঃ সম্বর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত প্রতিরোপিতাঃ॥
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলা দর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহারাজ রঘু সেনাসমূহ লইয়া পূর্ব্বসাগরের তালবন দ্বারা শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপনীত হইলে বঙ্গীয় নরপতিগণ নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হওয়ায় রঘুরাজ ভূপতিগণকে পরাস্ত করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। তদনন্তর ভূপতিগণ বিপুল ধন প্রদানপূর্ব্বক প্রণত হইলে পুনরায় তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তি-সেতু দ্বারা কপিশা নদী (কাঁসাই) পার হইয়া উৎকল দেশ দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে গমন করেন। ইহাতে সকলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, সুহ্মদেশ হইতে কপিশা নদী পার হইয়া উৎকলের উপর দিয়া কলিঙ্গদেশে যাইবার পথ।

সপ্তম শতাব্দীতে রচিত দণ্ডীর দশকুমার-চরিতে লিখিত আছে—দমোলক সুহ্মদেশের

একটী নগর। "অস্তি সুহ্মেষু দেশেষু দমোলকো নগরঃ"। উক্ত দমোলক যে আধুনিক তমলুক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা অপর বহু নামে অভিহিত যথা—তমোলিপ্ত, তমোলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনা, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহ ইত্যাদি। তমোলুকে বর্গভীমানামে এক দেবী আছেন, তিনি যে কত কালের কেহ তাহা বলিতে পারেন না।

তাম্রলিপ্তপ্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুরপ্রান্তে চ কালী সুরধুনীতটে॥

খৃষ্টপূর্ব্ব:চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস ভারতে আসিয়া পাটলীপুত্রনগরে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থিতিকালে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, সমুদ্রের উপকূলে তালাক্তি নামে এক রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে প্লিনী তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, ৩৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতভ্রমণে আসিয়া তমলুক সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, তমলুক সহর প্রায় তিন মাইল, সমগ্র রাজ্যের পরিমাণ প্রায় দুইশত মাইল এবং সমুদ্র ও রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী; উক্ত রাজ্য উত্তরে বর্দ্ধমান, পশ্চিমে উড়িষ্যা ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং সমগ্র মেদিনীপুর জেলাই যে প্রাচীন সুহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল, তাহা অবি-সংবাদিতরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে। এস্থলে একটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইতে পারে যে, মেদিনীপুর জেলা যদি রাঢ়েরই অন্তর্গত হইল, তাহা হইলে উহা রাঢ় ও উড্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, উক্ত জেলা চিরকাল সুহ্ম বা রাঢ় নামেই অভিহিত ছিল; কিন্তু পালরাজাদের সময় হইতে উহা রাঢ় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া আরঢ়া নামে খ্যাতিলাভ করে, তাহা উক্ত জেলার স্থান বিশেষের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। যথা—

"ব্রাহ্মণভূমি"। চলিত কথায় বামুন ভুঁই, ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এবং প্রসিদ্ধ সহর চন্দ্রকোণার দুইক্রোশ দক্ষিণে। এই ব্রাহ্মণভূমির উত্তর সীমায় রাঢ় দেউল, তথায় এক "শিবলিঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত আছেন, রাঢ়দেউলের দক্ষিণেই ব্রাহ্মণভূমির আরম্ভ। ব্রাহ্মণভূমি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ষোলক্রোশব্যাপী, ব্রাহ্মণভূমিতে বহুকালপূর্ব্ব হইতে এক ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের নামানুসারে সমগ্র রাজ্যটীর নাম ব্রাহ্মণভূমি হইয়াছে। রাঢ়দেশ হইতে পৃথক ছিল বলিয়া আরঢ়া ব্রাহ্মণভূমি নামে অদ্যাপিও খ্যাত। এই ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ অব্দ (খৃঃ ১৫৭২ অব্দ) হইতে ১৫২৫ শাক (খৃঃ ১৬০৩ অব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎকালে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ভুবনবিখ্যাত মোগলকুলতিলক আকবরসাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রঘুনাথের পিতার নাম বাকুড়া রায়, পিতামহের নাম বীরমাধব রায়, রাজা রঘুনাথের অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আরঢ়া ব্রাহ্মণভূমিতে অবস্থানকালে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ অমরকবি দামুন্যাগ্রাম নিবাসী ৺মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য কবিকঙ্কণ মহাশয় তাঁহার

অমৃতস্রাবী সুমধুর চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়া ছিলেন, কবি স্বীয়গ্রন্থে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি
দশআড়া মাপি দিল ধান॥
বীরমাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত।
শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত
গুরু করি করিলা পূজিত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

বীরমাধবের পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭।১৮ পুরুষ ব্রাহ্মণভূমিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই রাজবংশকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বলা যাইতে পারে। তৎকালে গৌড়ের সিংহাসন পালবংশীয় নরপতিগণের অধিকারে ছিল। ব্রাহ্মণভূমির রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। পালবংশীয় গৌড়েশ্বরেরা প্রায় সমগ্র রাঢ়দেশ করতলগত করিলেও ব্রাহ্মণভূমিকে রাঢ় হইতে পৃথক করিবার জন্য যখন "রাঢ়াদেউলে" তাহার সীমানির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণনরপতিগণ আপনাদের রাজ্যকে আরড়া বলিয়া গিয়াছেন,তখন ইহা স্থির যে, তাঁহাদের সহিত গৌড়েশ্বর বা প্রবল-প্রতাপান্বিত মল্লভূমীশ্বরগণের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে ব্রাহ্মণভূমির রাজগণ মুসলমানদিগের এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দেবীমাহাত্ম্য সপ্তশতী চণ্ডীর টীকাকার ৺ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রাহ্মণভূমির যদুপুরগ্রামে বাস করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পিতৃভূমিতে বাস করিতেছেন। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি শিবায়নপ্রণেতা রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও অগ্রে এখানে বাস করিতেন, পরে মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ জমিদার যশোমন্তসিংহের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া কর্ণগড়ে তৎ-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়া দেবীসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ় ১৩২—৩ পৃষ্ঠা।

প্রাগুক্ত মধ্যদেশ যে রাঢ়েরই অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত সীমানির্দ্দেশ হইতে তাহা বুঝা যায়। প্রাচীন রাঢ়ের সীমা এইরূপ যথা—উত্তরে রাজমহল, পূর্ব্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে জঙ্গল মহল ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। মোগলরাজত্বে দিগ্বিজয় প্রকাশগ্রন্থে লিখিত আছে।

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তর রাঢ়ের সীমা, সমগ্র রাঢ় আরও বড়। তিরুমলয় গিরিস্থ শিলা-লিপি পাঠে জানা যায় রাঢ়দেশ উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত। মহারাজ বল্লালসেনের

তাম্রশাসনে দেখা যায়, অজয়নদের উত্তর উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ দক্ষিণ রাঢ়। সাধারণতঃ তখন দক্ষিণ রাঢ়ই সুহ্মনামে অভিহিত হইত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে কলিঙ্গাধিপতি সোমবংশীয় মহাপরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বা কুলোত্তুঙ্গদেব দক্ষিণরাঢ় বা সুহ্মাধিপতি রাজা রণশূর এবং উত্তর রাঢ়ের অধিপতি পালবংশীয় শেষ বিক্রমশালী রাজা মহারাজ মহীপালকে পরাভূত করেন; অনন্তর তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সামন্ত রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণের কাল হইতেই পালবংশের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং তাঁহারা কেবলমাত্র উত্তর বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। রাজেন্দ্রচোলের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্ববৎই ছিল, কারণ, তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎবংশীয় হরিবর্ম্মদেব নামক এক রাজকুমার বিক্রমপুরে আধিপত্য লাভ করিয়া উক্ত অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সম্মানিত করিতেন। তাঁহার রাজসভায় ভবদেব ভট্ট ও বাচস্পতি মিশ্র নামে দুই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, ইহাঁরা বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। হরিবর্ম্মদেব প্রায় সমগ্র বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয়পুত্র পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় সামন্ত রাজগণ সকলেই স্বাধীন হইয়া উঠেন।

রাজা হরিবর্ম্মের রাজত্বকালে শ্রীধল্লসেন বংশীয় সামন্ত সেন নামক এক বৈদ্যবংশীয় রাজপুত্র সুহ্ম বা দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিতেন, তৎপুত্র হেমন্ত সেন রাঢ়ের হীনভাগ্য শূরবংশীয় শেষ রাজা অপুত্রক সোমশূরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দক্ষিণরাঢ়ে শূর রাজাদের স্থলাভিষিক্ত হন।

মহারাজ আদিশূরের রাজ্য মালাবার উপকূল পর্য্যন্ত হইলেও (১) তদ্বংশীয় সোমশূর সামান্য রাজার ন্যায় বাস করিতেন। হেমন্তসেন তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে প্রায় সমগ্র গৌড়ে আধিপত্য লাভ করেন, উক্ত হেমন্তসেনের পৌত্র মহারাজ বল্লাল সেন রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য আপনার অধিকৃত রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত করেন, যথা রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ী ও মিথিলা। ভাগীরথীর পশ্চিম দিগের জনপদ পূর্ব্বের ন্যায় রাঢ় নামেই অভি-

(১) গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরো।
নানাবিদেশ নৃপতেরমুকুটাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিঃ॥
জেতাবলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনো।
দাতাবদাতকুল মাধবশূর সূনুঃ॥ ৫॥

অঙ্গান্, বঙ্গান্, কলিঙ্গান্, বিবিধনৃপবরান্, স্বীয়দেশান্ বিদেশান্
কর্ণাটং কেরলাখ্যং নরবরভটকৈরন্বিতং কামরূপম্।
সৌরাষ্ট্রং মাগধাস্তং নৃপমপি জিতবান্ মালবং গুর্জ্জরঞ্চ
হিত্বা বৈ কান্যকুব্জাধিপতিমথ নৃপাস্তস্য বশ্যাস্তদাসন্॥ ৬॥

কুলতত্ত্বার্ণব। ২য় পৃষ্ঠা।

হিত রহিল, কিন্তু বল্লালাধিকার হুগলী ও হাবড়া জেলার শেষ সীমা রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল; কারণ উক্ত নদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী রাঢ়ের দক্ষিণাংশ তাম্রলিপ্তে তৎকালে প্রবল-প্রতাপান্বিত স্বাধীন রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাম্রলিপ্ত হইতে কপিশানদী পর্য্যন্ত বল্লালের রাজ্যসীমার বহির্ভূত ছিল বলিয়াই বল্লালাধিকৃত রাঢ় ও কপিশা পরবর্ত্তী উৎকলের মধ্যস্থ ভূভাগ সাধারণতঃ তৎকাল হইতে মধ্যদেশ নামেই অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং, রাজা কংস-নারায়ণের সমীকরণ সভা হইতে উত্থিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ উক্ত মধ্যদেশে বাস নিবন্ধন "মধ্যদেশী রাঢ়ীয় বা মধ্যশ্রেণীয়" এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।　　　ক্রমশঃ

রূপের মোহ।

[৪]

তারপর চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বি-এ পাশ করার পর ১৩১৭ সনের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ আমার বিবাহও হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর কলিকাতায় আসিয়া এবার আর সেই পুরাণ মেসে সিট্ নেই নাই। ৪৮ নং হ্যারিসন রোডে আসিয়া বাসা নিয়াছি। এখন্ এম, এ পড়িতেছি, বয়সও একটু হইয়াছে, কাজেই অন্যান্য ছেলেদের উপর কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে বেশী কিছু বেগ পাইতে হয় না। আমরা আট দশ জন ব্রাহ্মণের ছেলে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়াই চলিতেছি। এখন আর সন্ধ্যা মন্ত্র জপ না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না, জল ব্যতীত কেহই প্রস্রাব করিতে সাহস পায় না, এক পংক্তিতে সকল জাতি আহারের আসনে বসে না, দোকানের কেনা 'গরম চা' ও আলুর তরকারী সকল ছেলেই দূষিত বলিয়া মনে করে। এমন কি কবাই খানার খরিদ ছাগমাংসও এখন আর আমাদের মুখে অপূর্ব্ব আস্বাদ বিতরণ করিয়া যায় না। যে সকল ছেলে এ সমস্ত বিষয়ে দোষী ছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেই অনুতাপধ্যাপন পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিয়া দৈনিক একশতবার গায়ত্রীপাঠ দ্বারা পাপের ক্ষালন করিতেছে। একজনের দেখাদেখি অপরেও সকল প্রকার অত্যাচার হইতে বিরত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য মেস হইতে আরও কয়েক জন ব্রাহ্মণের ছেলে আসিয়া আমাদের মেসে সিট নিলেন। একমাত্র সিটি কলেজের সেই মৃণালভায়া তাহার পুরাণ মেসের মায়া পরিত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন না।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত পা ধুইতেছি, এমন সময় পিয়ন আসিয়া দুইখানা বন্ধ চিঠি আমার হাতে দিয়া গেল, দুইখানা চিঠির উপরই আমার নাম। একটীর উপর ছোট ছোট পাঁচটী সিন্দূরের চিহ্ন শ্রেণীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া দেখিলাম যে, আমার শ্বশুর লিখিয়াছেন 'আগামী ২০শে শ্রাবণ আমার শ্যালিকা শ্রীমতী তরুবালার বিবাহ। বরের নাম মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।'

চিঠি পড়িয়া আমার চোক্ মুখ শুকাইয়া গেল। কে যেন আমাকে উচ্চৈঃস্বরেই শুনাইতে লাগিল যে, এই কিন্তু সেই সিটিকলেজের মৃণাল ব্যানার্জ্জি! কুটিল ভ্রুভঙ্গীতে চক্ষু দুইটী

কপালের উপর উঠিয়া না পড়িলেও স্বেচ্ছায় অধরে ওষ্ঠ দংশন না করিয়া পারিলাম না। ভাবিলাম শ্বশুর মহাশয় এ ছেলের খবর পাইলেন কোথায়? তিনি চিঠির শেষভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে বরের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, এ মৃণাল যে সেই মৃণাল!! কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! এ বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে যে শ্বশুর-বাড়ীর মান্ মর্য্যাদা, গৌরব, সম্ভ্রম সব এককালে অন্তর্হিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে মৃণালবাবুর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিনা কার কথায় পড়িয়া শ্বশুর মহাশয় এমন সর্ব্বনেশে বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিতেছেন?

তারপর অপর চিঠিখানা খুলিতে গিয়া দেখিলাম যে উহাতে কলিকাতারই সিল (Seal) রহিয়াছে। চিঠি ছিঁড়িয়া দেখিলাম—বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা মৃণালভায়ার এক অতিদীর্ঘ আত্ম-কাহিনী। সংক্ষেপে চিঠির সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ না করিলে কাহাকেও কিছু বুঝাইতে পারিব না।

ওঁ সত্যমেব জয়তি।

৩ নং শম্ভু চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১২ শ্রাবণ। ১৩১৮ সাল।

প্রিয়বরেষু,

অজিত ভায়া! হৃদয়ের একটা অদম্য আবেগ লইয়া আজ আমি তোমার কাছে উপস্থিত হইতেছি। ভরসা করি, বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার নিকট কিছুতেই উপেক্ষিত হইব না। চারি বৎসর তোমার সঙ্গে একত্রে থেকে তোমাতে আমি যে সকল বন্ধুর লক্ষণ অনুভব করেছি, তাতে তোমার নিকট আমার কিছুই গোপন করিবার নাই।

গত জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমরা প্রায় ৪০ জন সেই বিয়েতে বরযাত্রী হ'য়ে গিয়েছিলুম। কত রং ঢং ক'রে তিন চার রকমের "প্রীতি উপহার" লিখলুম, কিন্তু আমি একলাই বুঝি বিয়ের আমোদটা উপভোগ করিতে পারিনি। বল্‌তে কি ভাই, বিয়ের রাত্রিতে তুমি মজ্‌লে শৈলবালার রূপে, আর আমি বেচারী কি না তোমার শ্যালিকা তরুবালার রূপেই মজে পড়্‌লুম। তুমি রাত্রি জাগ্‌লে প্রেয়সীর রূপ দেখে ও রূপ কথা শুনে, আর আমার—? আমার সেদিন রাত্রিতে ঘুম হ'ল না শুধুই তরুবালার পুষ্প-পেলব স্বর্গীয় চেহারা খানা চিন্তা ক'রে। সে পাগলিনীর কথা কি বল্‌ব ভাই, তুমি হয়ত খানিকটা শুনেই লাঠিনিয়ে চটে উঠবে। কিন্তু আজ আমি নাচার! তোমার নিকট সবকথা না বল্লে আমার কিছুতেই সোয়াস্তি নাই। মধুরিমামাখা তরুবালার কোমল কমনীয় মুখখানি, তাহার সেই ডাগর ডাগর ভাষা চোখের টভুরচাহনী, ভোমরার মত কালো কুচ্‌কুচে কোঁকড়ান চুলের রাশ, আর পাখীর মত অমৃতমধুর গলার আওয়াজ, এই সবে আমাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। আমার মনপ্রাণ সব আকাশে বাতাসে ঘুরছিল। বিয়ের গান, বাজনা, মন্ত্র, হুলুধ্বনি কিছুই আমার কাণে যায়নি। শুধু তরুরই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।"

তারপর ক'ল্‌কাতায় এসে আমি যে কাজ ক'রেছি, তা একটা নেহাৎ পশুতেও করে না। তুমি আমাকে চোর বল, জুয়াচোর বল, জালিয়াৎ বল, ধড়ীবাজ বল, সব সহ্য ক'রব; তবু আজ সব কথা বলতেই হবে।

কথাটা কি জান? ক'লকাতায় এসেই তোমার শ্বশুরের কাছে লম্বা চওড়া এক চিঠি লিখে পাঠালুম। চিঠিখানা লিখলুম আমি, কিন্তু নীচে নাম দিলাম অপরের। শুনেছিলুম যে তোমার শ্বশুর দুই মেয়েকেই একসঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পছন্দসই বর জুটলনা ব'লে, তা পেরে উঠেননি। এই ভরসা পেয়েই আমি জাল ক'রে পরের নাম দয়ে তোমার শ্বশুরের কাছে চিঠি লিখি। সেই চিঠিতে শুধু আমারই গুণবর্ণনা, রূপপ্রশংসা, কৃত্রিম বংশাবলীর বিবরণ ও মিথ্যামাহাত্ম্য বর্ণন।

তারপর তিনি দয়া করে চিঠির উত্তর দিলেন, আমি হাতে আকাশ পেলুম। যদিও চিঠির উপর নাম ছিল অপরের, তবু চিঠিখানা দখল করতে আমার কোন বেগ পেতেই হয় নাই। তার পর আবার চিঠি দিলুম। কত মিথ্যাকথা, কত সাজানো কাহিনী, কত গুছানো বর্ণনা,—এমন কি তোমার সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা আছে, সে সব পর্য্যন্ত লিখে তোমার শ্বশুরকে হাত করলুম। তাঁর সাদা মন ভিজে গেল। চিঠির মাঝে তোমার নাম শুনেও তোমার অভিমত আছে জেনে তিনি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক করেছেন। আসছে ২০শে শ্রাবণ বিয়ের শুভদিন। এখন তোমার নিকট নিবেদন এই:—শুধু নিবেদন নয় অনুরোধ এই;—তুমি যেন আমার এই জীবনের সাধে বাদ সাধিও না। আশা করি তুমি এতে অবশ্যই সম্মতি দিবে। ইত্যাদি—

২০শে শ্রাবণ তারিখে সত্য সত্যই তরুবালার সঙ্গে মৃণালের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহটা যাতে না হয়, তার জন্যে কত চেষ্টাই না করেছি, সব ফাঁসিয়া গেল; কিছুতেই আমি সত্যসন্ধ শ্বশুরকে নিজের বাক্য থেকে টলাতে পারি নাই। মৃণালের প্রলোভনীয় কৌশলের ভিতর তাঁহার সরল বুদ্ধি সহসা প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। দূরদেশ থেকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে এই কন্যার বিবাহ দিয়ে তিনি সমাজের একটা ভবিষ্যৎ গ্লানি ও নিন্দার বোঝা স্বেচ্ছায় মাথায় নিলেন। মৃণালের চতুরতায় সে যে একটা গোঁড়া ব্রাহ্ম, তাহা কাউকে জানতে দেয় নাই। আচ্ছা আদমি বটে, এমন ব্যক্তির সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল! হায় কি কুক্ষণেই আমি চল্লিশটী বরযাত্রী সঙ্গে নিয়েছিলুম!

শ্যালীর বিবাহে আমি ইচ্ছা করিয়াই উপস্থিত হই নাই। তারপর পূজার ছুটিতে বাড়ী এসে জানিতে পারিলাম যে এই বিবাহে বড় বেশী জমক কিছু হয় নাই। যারা যারা খবর রাখ্‌ত, তাদের মধ্যে সকলেই বিপক্ষতা আচরণ করতে ত্রুটি করে নাই। আর যারা কিছু জান্‌ত না, অথচ খুব নিকট সম্পর্কীয়, তাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্বশুরের দলেই যোগ দিয়েছেন। সমাজের দলাদলিতে শ্বশুরকে একঘরে করিবার আয়োজন চল্‌তে লাগল। এই সময় আমি বাড়ী এসে তাঁহাকে ছোট মেয়ের স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করিতে বলিলাম। সম্মানের ভয়ে তিনি

অকপটচিত্তে আমার কথা গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় কুটুম্বগণও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না।

উপসংহার।

দুই বৎসর পর এম্, এ পাশ করিয়া কলেজের প্রফেসর হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সহাধ্যায়ী মৃণালের নাম সেবারের লিষ্টিতে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। এম্, এ ফেইল করে সে একটা 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক মাসিকপত্রের আফিসে প্রবন্ধ লেখার কাজ আরম্ভ করেছে। সেই আফিসে প্রতি মাসে দুইবার ব্রাহ্মদের সম্মিলন বস্ত। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তরুণ, কিশোর, কিশোরী, সকলেই একত্র সমাবেশ! তারপর এক বৎসর যায়; হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইলাম যে মৃণাল ভায়া অবলা তরুবালাকে অবহেলা ক'রে অপর এক মৃণালের মালা গলায় জড়িয়ে সহর থেকে চম্পট দিয়েছেন। এই নূতন প্রেমিকার নাম নাকি মৃণালিনী বোস্জা। ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে, শোকে আত্মহারা হয়ে "রূপের মোহ" নাম দিয়ে কাগজে কাগজে এক লম্বা প্রবন্ধ ছাপাইয়া দিলাম। তাহাতে হিন্দুদিগকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে, যে তাহারা যেন তরুবালার দৃষ্টান্ত দেখে অন্ধকার ছেড়ে নিতানূতন'অচিরসুন্দর' রূপের আলোতে পতঙ্গের মত জ্বলে পুড়ে না মরে। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-পুরাণ-ব্যাকরণতীর্থ।

শ্রীপঞ্চমী।

(বীণা-আবাহন)

আজি শুভ্র বাসন্তী তিথিতে
এস মা ভারতী ত্রিলোকপূজ্যা,
সুরভিমোদিত মহীতে;
নীরব নীলিম গগনের গায়
ছুটি পিকবধূ আগমনী গায়,
হাসিছে কুসুম শ্যামল শাখায়
চরণপ্রান্ত চুম্বিতে॥ ১॥

অয়ি! সাধকসিদ্ধিদায়িনী,
সাধনায় আজ রত চরাচর
এসগো বিশ্বে জননী,
কতনা আশায় প্রকৃতি ধরাতে
পেতেছে আসন পঞ্চমী প্রভাতে,
মলয়-অঞ্চলে চরণ মুছাতে
উৎসুকা কত ধরণী॥ ২॥

অই উষার অরুণ কিরণে
এসমা জননী বিদ্যাদায়িনী
ভকত মানস গগনে,
করুণ কণ্ঠে ডাকিছে সন্তান
ব্যাকুলা ধরণী, প্রকৃতি পাষাণ,
হায়গো পাষাণি! প্রতিধ্বনি-তান
বাজে নাকি তোর পরাণে? ॥ ৩ ॥

এস শ্বেতসরোজশোভিতা
অজ্ঞান-আঁধার-মুগ্ধ ভারতে
বিজ্ঞানদ্যুতিভূষিতা
এ শুভ লগনে প্রসীদ জননী
অবোধ তনয়ে, বেদবিলাসিনি!
নখরকিরণে হাসুক ধরণী
এসগো ত্রিলোকপূজিতা ॥ ৪ ॥

আজি শুভ্র কুসুমভূষণে
সাজাবে তনয় মনের মতন
নিখিলসেবা চরণে,
এসগো আর্য্য-গরিমা,
রটাক বিশ্বে তোমার মহিমা,
আঁকিয়া মানসে তোমার প্রতিমা
(সবে) দেখুক মানস-নয়নে ॥ ৫ ॥

শ্রীঅমৃত লাল ভট্টাচার্য্য

চার্ব্বাক-দর্শনে ধর্ম্মোপদেশ।*

(২)

চার্ব্বাক—সূত্রগুলি অনুসন্ধান করিলে তাহার বহুস্থলেই কর্ম্মের নিন্দামুখে ব্রহ্মজ্ঞানের উপাদেয়তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এইরূপ একটা সূত্র এই—

(৩) পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গে জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন কিং নু! তস্মান্ন হিংস্যতে?

পশু জ্যোতিষ্টোমে নিহত হইয়া যদি স্বর্গে গমন করিবে, তাহা হইলে যজমান তাহার পিতাকে হিংসা করেন না কেন?

* প্রথম প্রবন্ধ আশ্বিনের পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাস্তিকেরা বলিলেন ঠিক ত, যজ্ঞে যে সকল পশু কাটা হয়, তাহারা যদি যজ্ঞের ফলে বা মন্ত্রের গুণে স্বর্গে যাইতে পারে, তবে স্বর্গে পাঠাইবার জন্য যজমান্ তাহার নিজ পিতাকে যজ্ঞে বলি দেন না কেন? এই সকল ব্যাখ্যা হইতেই নাস্তিকদলের যজ্ঞাদি কার্য্যে অবিশ্বাস।

আমরা এই সূত্রটা অনুভবে দেখিলে এইরূপ বুঝিতে পারি—পশু, অর্থাৎ বদ্ধজীব নিহত হইয়া যদি জ্যোতিষ্টোম স্বর্গে অর্থাৎ সত্যলোকে গমন করে, তবে যজমান কি তাহার স্ব-স্বরূপ পিতাকে হিংসা করেন না?

পশু শব্দের অর্থ বদ্ধজীব, এই নিমিত্ত অপশু শব্দে নিত্যমুক্ত পরমাত্মা বুঝায়। এই সূত্রস্থ জ্যোতিষ্টোম শব্দ যজ্ঞের বিশেষণ না হইয়া স্বর্গেরই বিশেষণ হওয়া সঙ্গত। সত্যলোকই উৎকৃষ্ট জ্যোতির্ম্মণ্ডল, সুতরাং জ্যোতিষ্টোম বিশেষণে সেই সত্যলোকই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

যজ্ঞের বলে যজমান মৃত্যুর পর সত্যাদি স্বর্গলোকে গমন করেন। এই স্বর্গগমনেও তাহার মুক্তি হয় না। কেননা কর্ম্ম মোক্ষের কারণ নহে।

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন,
ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ॥

এই সকল শ্রুতি কর্ম্মকে মুক্তির অসাধক বলিয়াছেন।

ব্রহ্মলোক গমনেও মুক্তি হয় না, পরম পুরুষার্থসাধিত হয় না, ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন আছে।

সাংখ্যকার বলেন,—

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ।
(২২ সূত্র ৪র্থ অধ্যায় সাংখ্যদর্শন)

পঞ্চাগ্নিযোগে জন্মশ্রুতি আছে, অর্থাৎ আকাশ পর্জ্জন্য, ধরা, অমর ও যোষিৎ এই পঞ্চাগ্নিতে পঞ্চ আহুতি প্রদত্ত হইয়া জীবের জন্ম হয়। অর্থাৎ সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে থাকিলেই পঞ্চাগ্নিযোগে জন্ম হইবে, সুতরাং ব্রহ্মলোকগমনেও নির্ব্বাণমুক্তি হয় না। বৈকুণ্ঠস্থিত জয়বিজয় নামক দ্বারিদ্বয়ের মুনিশাপে পৃথিবীমণ্ডলে আবর্ত্তনই তাহার দেদীপ্যমান নিদর্শন।

অতএব কর্ম্মফলে জীব ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও তাহার স্ব-স্বরূপ পিতার (পরমাত্মার) হিংসা করা হয়; কেন না স্বর্গাদিলাভ আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক স্বরূপ পিতার বিস্মৃতির কারণ।

এ সূত্রের স্বপিতা পদের স্ব-অর্থে জীবাত্মা, এবং তাহার কারণ বলিয়া পিতা অর্থে পরমাত্মা। জীব-ব্রহ্মের কার্য্যকারণ ভাব হইতেই স্ব-ও পিতার ভেদ নির্দ্দিষ্ট। আবার জীব ব্রহ্মের ঐক্যভাব ধরিলে স্ব-স্বরূপ যে পিতা, অর্থাৎ পরমাত্মা এইরূপ বুঝাই সঙ্গত।

যজমান মৃত্যুর পর সত্যলোকাদিতে আবদ্ধ হইলে এবং তথায় স্বর্গসুখে মোহিত হইলে, স্বপিতার অর্থাৎ পরমাত্মার কি হিংসা করা হয় না? অবশ্যই করা হয়, কেন না স্বর্গপ্রাপ্তি পরমপুরুষার্থের অন্তরায়।

অতএব কর্ম্মে আবদ্ধ না হইয়া মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক জ্ঞানের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মফলে স্বর্গভোগ, স্বর্গসুখে আত্মবিস্মৃতি বা প্রকারান্তরে আত্মহিংসা হয়। চার্ব্বাকসূত্রে এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। চার্ব্বাকের আর একটী উক্তি এইরূপ;—

(৪)

বলাৎ কুরুত পাপানি তদ্‌ভবন্ত্যকৃতানি বঃ।
সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ।

এই শ্লোকের অর্থ নাস্তিকেরা বুঝিলেন,—বলপ্রয়োগে পাপ করিলে, তাহা না করার মধ্যেই গণ্য হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনুও বলেন, বলকৃত যাবতীয় অর্থই অকৃতের ন্যায় হয়।

অতএব বলপ্রয়োগে পরধন অপহরণ কর, বলাৎকারপূর্ব্বক পরদার গমন কর, তাহাতে দোষ হইবে না, এই সকল দোষ বলবানের জন্য নহে। পাপ ও তজ্জন্য দণ্ডভোগ কেবল দুর্ব্বলের জন্যই, বলবানের কার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারে না, সুতরাং বল যাহার সমগ্র পৃথিবীই তাহার।

অতএব বল থাকে ত যাহার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, পাপ হইবে না; ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনুরও ইহাই মত।

নাস্তিকের ব্যাখ্যা শুনিলাম; তবে কি সত্যসত্যই ন্যায়ধর্ম্মবিবর্জ্জিত বিষম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবর্ত্তন জন্য বৃহস্পতি সূত্র রচনা করিয়াছেন? আমরা এই সূত্রটী অন্যরূপ বুঝিতেছি—

সংসারক্ষেত্রে থাকিয়াও কিরূপে পাপের সংস্রব হইতে দূরে থাকা যাইতে পারে, এইরূপ প্রশ্নের ভাব হৃদয়ে রাখিয়া বলা হইতেছে, তুমি নিষ্কাম হও, অভিমানশূন্য হইয়া যাও। লোকযাত্রানির্ব্বাহার্থ পাপাচরণ করা অনিবার্য্য হয় ত, সেই পাপ ইচ্ছাবশতঃ করিবে না; প্রকৃতি বলপূর্ব্বক তোমাকে নিযুক্ত করুক, তাহাতে তোমার পাপ হবে না। কেননা তুমি অভিমানশূন্য, ফলাভিসন্ধানবর্জ্জিত; স্বভাবের বশে অবশ হইয়া পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, সেই পাপবাসনা তোমার বুদ্ধিতে পহুছিবে না। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেই সেই কর্ম্মের সংস্কার বুদ্ধিতে আসিতে পারে, এবং ভবিষ্যতে নরকাদির কারণ হয়।

যাহার অভিমানই তিরোহিত, স্বভাবের প্রবর্ত্তনে সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিলেও সেই কর্ম্ম তাহার বুদ্ধি পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত মনের দ্বারা সংকল্পিত ও অহঙ্কার দ্বারা অভিমত হইয়া বুদ্ধিতে অধ্যবসায় হয়। তাহার পর জ্ঞানের সংস্কার বুদ্ধিতে থাকে। এই বাসনার বিপাকেই জীব স্বর্গনরকাদি ভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং, মধ্যে অহঙ্কারটী না থাকিলে কর্ম্ম বুদ্ধিকৃত হয় না, সুতরাং তাহা নিষ্ফল হয়। নির্লেপ ও নিষ্কামভাবে পাপাচরণ করিলেও তাহা অনিষ্টের হেতু হয় না।

শ্রীশ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

চার্ব্বাকসূত্রে মনুর সম্মতির অবতারণা করিয়া এইরূপ অর্থ আরও বিস্পষ্ট করিয়াছেন, মনু-সংহিতার ব্যবহারাধ্যায়ে লিখিত আছে :—

বলাদ্দত্তং বলাদ্‌ভুক্তং বলাদ্‌ যচ্চাপি লেখিতম্‌।
সর্ব্বান্‌ বলকৃতানর্থান্‌ অকৃতান্‌ মনুরব্রবীৎ।

১৬৮ শ্লোক ৮ অঃ—

বলপূর্ব্বক দান, বলপূর্ব্বক ভূমিগ্রহণ,বলপূর্ব্বক লেখ্য সম্পাদন অসিদ্ধ। মূলকথা যেমন স্বাধীন-ভাবে স্বেচ্ছায় দানাদি না করিলে, বা দলিলাদি সম্পাদন না করিলে, তাহা আইনসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না—অকৃতের মতই হয়, তেমনি পাপাচরণটীও বুদ্ধিপূর্ব্বক না হইয়া কেবল স্বভাবের বশে সম্পন্ন হইলে, তাহা অকৃতের মধ্যেই গণনীয়, এইরূপ পাপ অনিষ্টের কারণ হয় না।

অতএব নিষ্কামভাবে অভিমানশূন্যরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মক্ষয় করিবে, ইহাই চার্ব্বাক-সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

(৫)

স্বর্গস্থিতা যদাতৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্নদীয়তে॥

এই সূত্রদ্বারা নাস্তিকেরা বুঝেন, এখানে দান করিলে এই দানদ্বারা যদি স্বর্গস্থিত দেবগণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তবে প্রাসাদের উপরিতলে যাঁহারা আছেন, তাহাদের জন্য নীচে অন্ন দেওয়া হয় না কেন? এইঁ স্থানের অন্নেই সেই স্থানে থাকিয়া তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করুন, কিন্তু এইরূপ হইতে কখনই দেখা যায় না; সুতরাং স্বর্গবাসীর জন্য এখানে সে সকল কাজ করা হয়, তাহার কোনও ফল নাই, ইহা কেবল ব্রাহ্মণের জীবিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কিন্তু আমরা বুঝিতেছি যাঁহারা ভগবানের সেবায় বিমুখ হইয়া বিশেষ ফল কামনায় স্বর্গবাসী পুরন্দরাদি দেবতার অর্চ্চনায় শ্রদ্ধাবান্‌ হন, চার্ব্বাকসূত্রে তাঁহাদিগকে কটাক্ষ করিয়া বলা হইতেছে —দান করিয়া যদি স্বর্গস্থিত দেবগণের (সেখানে) তৃপ্তিসাধন করিতে হয়, তবে এখানে ভূমণ্ডলে যাহারা প্রাসাদের উপর বাস করেন,তাহাদিগকে কেন পূজা কর না?

বস্তুতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্বর্গবাসী পুরন্দরাদি দেবতা এবং মনুষ্য মধ্যে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। কারণ স্বর্গবাসীরাও কর্ম্মের অধীন, তাঁহাদেরও উত্থান পতন আছে; আমাদেরও তাহাই। তবে দেবগণ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী এবং উর্দ্ধদেশে সুরম্যস্থানে বাস করেন; এই সকল গুণের আধিক্য দেখিয়াই যদি তাঁহাদের পূজা দিতে হয়, তবে এই দৃশ্যবান ভূমণ্ডলেও যে সকল রাজা মহারাজ বা ধনিগণ উত্তুঙ্গ প্রাসাদশৃঙ্গে অবস্থান করেন, তাঁহারাও যে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবযুক্ত ও উচ্চদেশে সুরম্য স্থানে বাস করেন; অতএব তাঁহারাও পূজ্য, তাঁহাদেরও অর্চ্চনা করা হউক। ফলতঃ ইন্দ্রাদির সহিত অপর জীবের বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই।

বিবেকী কবি বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রস্যাশুচিশূকরস্য চ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যান্তরং
স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনম্।
রম্ভাচাশুচিশুকরী চ পরমপ্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ,
সন্ত্রাসোঽপি সমঃ স্বকর্ম্মগতিভি রন্যোন্য ভাবঃ সমঃ॥

সুরপতি ইন্দ্র ও অপবিত্র শূকরের সুখে দুঃখে প্রভেদ নাই। কেননা ইন্দ্রের সুধা যেমন উপাদেয় খাদ্য, শুকরের পক্ষে বিষ্ঠাও তেমনি। ইন্দ্রের রম্ভা যেমন পরমপ্রণয়িনী, শূকরের পক্ষে তাহার সেই অশুচি শুকরীও তাহাই। মৃত্যুত্রাসও কর্ম্মফলভোগও উভয়েরই তুল্য, তবে আর উভয়ের সুখ দুঃখের প্রভেদ কি রহিল?

অবশ্য ইহা সংসার-নিস্পৃহ বিবেকীর উক্তি, কিন্তু সংসারিকগণ প্রভাবশালী ইন্দ্রাদি-দেবতার পূজা করিয়া অভীষ্টফল লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্যই এই সকল দেবতার পূজায় বিধান হইয়াছে। যদ্যপি ইন্দ্রাদি দেবতার পূজাতেই ভগবানের পূজা হইতেছে, তথাপি এইরূপ পূজা বিধিপূর্ব্বক পূজা নহে এবং ইহার ফলও অক্ষয় নহে। শ্রীশ্রীভগবান্ ইহা বলিয়াছেন;—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়! যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

ভগবান্ বলেন যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে অন্যদেবতার পূজা করে, তাঁহারা আমাকেই ভজনা করে। তবে এই অর্চ্চনা অবিধিপূর্ব্বক ভগবদারাধনা।

ভগবান্ আরও বলেন —

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥

সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের দেবপূজনজনিত ফল ক্ষয়শীল, কেননা দেবযাজী দেবগণকে এবং আমার ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

দেবগণেরও বিনাশ আছে; উত্থান পতন আছে, সুতরাং দেবপূজার ফলে দেবতা হইলেও বিনাশ ও উত্থান পতনের অধীন হইতে হয়। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবান্‌কে পাইলে আর উত্থান পতনের ক্লেশ সহ্য করেন না। ভগবান অব্যয় নির্ব্বিকার আনন্দস্বরূপ, তাঁহাকে পাইলে আর পাইবার কিছু থাকে না। মৃত্যুভয়ও তিরোহিত হয়।

শ্রুতি বলেন,—

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি—
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

এই সকল আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কর্ম্মিগণকে অনিত্য স্বর্গফলসাধক স্বর্গবাসী দেবতার পূজা হইতে নিবৃত্ত করিয়া, অক্ষয় ও অনন্ত ফলপ্রদ শ্রীভগবানের অর্চ্চনায় প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত চার্ব্বাকসূত্রে উপহাস করিয়া বলিতেছেন,—

প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্নদীয়তে।"

(৬)

তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তু পথ্যশনং ভবেৎ॥

নাস্তিকগণ বুঝিলেন, শ্রাদ্ধ করাটা মিথ্যা; কেননা অন্যে ভোজন করিলে যদি অপর পুরুষের তৃপ্তি হইতে পারে, তবে প্রবাসীদের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ করা হউক, পথে আর তাহাদের ভোজনের প্রয়োজন হইবে না। বাড়ীতে তাহাদের শ্রাদ্ধ হইতে থাকুক, আর অমনি প্রবাসিগণ সেখানে পরিতৃপ্ত হউন। তাহা হইতে যখন কেহই দেখে নাই, সুতরাং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়াগুলি কেবল পুরোহিতদের অর্থ শোষণের চাতুরী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমরা কিন্তু এই সূত্র অন্যরূপ বুঝিতেছি—শ্রাদ্ধীয় অন্ন ব্রাহ্মণের মুখে অর্পণ করিয়া যাঁহারা ভাবেন "এই অন্নগুলি বুঝি ব্রাহ্মণই উদরসাৎ করিলেন"। মৃত আত্মা যেরূপ প্রণালীতে ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধীয় ভোগ গ্রহণ করেন, যে সকল যজমান তাহা অবগত নহেন, তাহাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলা হইতেছে;—"ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ"।

বাস্তবিক ব্রাহ্মণ হোমের আধারমাত্র। শাস্ত্র বলেন;—"ব্রাহ্মণস্ত্বাহবনীয়ার্থে" সম্যকরূপ হোম করা হয় যাহাতে তাহাকেই আহবনীয় বলে। এই নিমিত্ত হোমাধার অগ্নির নাম আহবনীয়। শ্রাদ্ধব্যাপারেও ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধীয় হোমের আধারমাত্র; ভোক্তা সেই পরলোকগত আত্মা। "যে ভুঞ্জতে বিপ্রশরীরসংস্থাঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পিতৃগণ শ্রাদ্ধভোগ করেন। সুতরাং, এই দৃশ্যমান্ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের ভোক্তা নহেন; এই নিমিত্ত অজ্ঞগণকে উপহাস করিয়া বলা হইতেছে—

"দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তু পথ্যশনং ভবেৎ"

অথবা এই চার্ব্বাকসূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে; অন্যেন (ব্রাহ্মণেন) ভুক্তং, যদি পুংসঃ (পরমাত্মনঃ) তৃপ্তয়ে জায়তে (ইতি শ্রদ্ধধাসি তদা) প্রবসতাং (পরলোকগামিনাং) শ্রাদ্ধং দদ্যাৎ, তদ্ অশনং নতু পথি ভবেৎ নিষ্ফলং ন ভবেদিত্যর্থঃ।

ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে যদি পরমাত্মা সন্তুষ্ট হন, ইহা বিশ্বাস কর, তবে পরলোকবাসীর তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ করিও, এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে সেই শ্রাদ্ধ পথে যাইবে না, বা নিরর্থক হইবে না।

ভগবান্ বলেন,—"ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ" ব্রাহ্মণ আমার শরীর। শাস্ত্র বলেন,—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার পরমাত্মা। এই দৃশ্যমান ভূদেবরূপ পরমাত্মাতে অর্পণ করিলেই সেই সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বকারণ সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মা সন্তুষ্ট হন, এই বিশ্বাস স্থিরতর রাখিয়া প্রবাসী অর্থাৎ পরলোকবাসিগণের শ্রাদ্ধ করা উচিত। "তস্মিং স্তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্" সেই ব্রাহ্মণের তুষ্টিতেই জগৎ পরিতুষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের তৃপ্তিতে যদি সমষ্টি

জীব পরমাত্মা তৃপ্ত হইতে পারেন, তবে আর ব্যষ্টিজীব মৃতাত্মা পরিতৃপ্ত না হইবে কেন? এইরূপ জ্ঞান থাকিলেই শ্রাদ্ধ সার্থক হয়। তাহা হইলেই এই ব্রাহ্মণভোজন পথে মারা যায় না, নিরর্থক হয় না। ব্রাহ্মণ ও ভগবানে অভেদজ্ঞানে শ্রাদ্ধ করিবে, ইহাই চার্ব্বাকের উপদেশ।

(৭)

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥

নাস্তিকের ব্যাখ্যা;—স্বর্গ নাই,—অপবর্গ (মুক্তি) নাই, পরলোকগমনশীল কোনও আত্মা নাই। বর্ণাশ্রমাদি ক্রিয়ার কোনও ফল নাই। তাহাদের মতে অঙ্গনালিঙ্গনাদি-জনিত সুখই স্বর্গ, মৃত্যুই মুক্তি, দেহই আত্মা ইত্যাদি—

আমরা বুঝিতেছি, এই চার্ব্বাকসূত্র দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে;—তজ্জন্য প্রথমতঃ বলিয়াছেন,—আত্মা পারলৌকিক নহেন, অর্থাৎ পরলোকের সহিত আত্মার কোনও সম্পর্ক নাই; আত্মা নিত্য বিভু, নির্লেপ; লোকান্তর-গমনাগমন আত্মার নহে, জীবের, ইহলোক পরলোক জীবের, সুতরাং আত্মা পারলৌকিক নহেন, একথা ধ্রুবসত্য।

তৎপর বলা হইতেছে,—ন স্বর্গঃ, স্বর্গ নাই কাহার পক্ষে? এই আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ সন্নিহিত আত্ম শব্দের গ্রহণ করিয়া বুঝিতেছি যে আত্মার স্বর্গ নাই, অপবর্গ বা মুক্তি নাই ও বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ক্রিয়ার ফল আত্মার নাই, একথাও অতীব সত্য; কেননা স্বর্গ সুখবিশেষ,—শাস্ত্র বলেন,— -

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদং॥

যাহা দুঃখ মিশ্রিত নহে, যাহা পরিণামে ক্ষীণ হয় না, এবং অভিলাষমাত্র কাম্য বস্তু উপস্থিত হওয়া, এইরূপ সুখ স্বর্গপদবাচ্য।

আত্মা নিঃসঙ্গ, সুখ দুঃখাদি আত্মাতে বাস্তব নহে, বদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতিগত সুখ দুঃখাদির প্রতিবিম্ববশতঃ আত্মাতে সুখ দুঃখাদির অভিমান হয়;—সুতরাং আত্মার স্বর্গ বা সুখ নাই, এই কথাই প্রকৃত কথা।

আত্মার অপবর্গও নাই, কেননা যিনি বদ্ধ তিনিই মুক্ত হন, আত্মা নিত্য মুক্ত। প্রকৃতি বদ্ধও হন এবং মুক্তও হন।

রূপৈঃ সপ্তভি রাত্মানং বধ্নাতি প্রধানম্
কোশকারবৎ বিমোচয়ত্যেকরূপেণ। সাংখ্যসূত্রে।

কোশকার কীটের—গুটীপোকার ন্যায় প্রকৃতি, ধর্ম্ম, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এই সাতরূপে নিজকে বন্ধন করেন এবং একরূপে অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা নিজে আবার মুক্ত হন। অতএব বন্ধ মোক্ষাদি যাবতীয় ধর্ম্মই প্রকৃতির, নির্গুণক পুরুষে তাহা নাই। সুতরাং আত্মার অপবর্গ নাই, একথাও সত্য হইল। নিঃসঙ্গ নির্গুণ আত্মাতে

বর্ণাশ্রমাদি ক্রিয়ার ফলও থাকিতে পারে না; এই সকলও বুদ্ধিতে সংস্কাররূপে অবস্থান করে। অতএব এই সূত্রের আদ্যন্তই পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(৮)

ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ

এই চার্ব্বাকসূত্রমূলে নাস্তিকেরা বলেন, ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর, ইহারা একত্র মিলিত হইয়া বেদত্রয় রচনা করিয়াছেন।

বেদের জ্ঞানকাণ্ডে কেবল ভণ্ডতা, কর্ম্মের নিষেধ দ্বারা লোককে সুখ হইতে বঞ্চিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আর কর্ম্মকাণ্ডে ধূর্ত্ততা ও নিশাচরতা বিদ্যমান, কেননা স্বর্গাদির লোভ দেখাইয়া ধূর্ত্তগণ মনুষ্যকে যাগে প্রবৃত্ত করে এবং দক্ষিণাদি উপলক্ষে বিপুলধনরত্নাদি ঠকাইয়া লয়। আর নিশাচরগণ অর্থাৎ রাক্ষসপ্রকৃতি মাংসাশীরা যাগাদি পশু আলম্ভনের ব্যবস্থা দিয়া রসনাতৃপ্তির সুযোগ ঘটায়। তবেই স্থির হইল ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর এই তিনটী মিলিত হইয়া বেদ রচনা করিয়াছেন।

এই হইল নাস্তিকের কথা, আমরা বুঝিতেছি অন্যরূপ; —"বেদস্য ত্রয়ঃ কর্ত্তার ইতি ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরা বদন্তি। অর্থাৎ শ্রুত্যাদির অর্থ সম্যক অবগত না হইয়া কেবলমাত্র একদেশদর্শনে যাঁহারা বলেন, যে বেদের তিনটী কর্ত্তা আছেন, তাঁহারা ভণ্ড (বঞ্চক) ধূর্ত্ত (শঠ) ও নিশাচর (অজ্ঞ), কেননা যদিও শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—

অগ্নে ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্ব্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ, যাহারা এই মন্ত্র দেখিয়া অগ্নি বায়ু ও রবিকে, ঋক্ যজু ও সামবেদের কর্ত্তা ভাবেন, তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া চার্ব্বাকসূত্র ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর বলিতেছেন, যেহেতু বেদের কোনও কর্ত্তাই নাই, বেদ অপৌরুষেয়।

"নাহরাসীন্ন রাত্রিরাসীৎ স তপোঽতপ্যত
তস্মাত্তপস্তপনাৎ ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত"।

অর্থাৎ দিন ছিলনা, রাত্রি ছিলনা, তিনি তপস্যা করিলেন, তাঁহার তপঃপ্রভাবে বেদত্রয় আবির্ভূত হইল।"

অস্য মহতো নিশ্বসিতং যদেতদৃগ্বেদঃ

এই মহতের যাহা নিশ্বাস তাহাই ঋগ্বেদ। শতপথে অগ্ন্যাদি দেবতা হইতে বেদের আবির্ভাবের কথা থাকিলেও বাস্তবিক তাঁহারা বেদের কর্ত্তা নহেন, প্রচারকমাত্র; কারণ মনু এই ব্রাহ্মণ ভাগের ছায়া লইয়া বলিতেছেন—

অগ্নি-বায়ু রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋগ্ যজুঃ সামলক্ষণম্॥

বেদ সনাতন, পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মের স্মৃত্যারূঢ় ছিল, পরকল্পে অগ্নি বা রবির সাহায্যে বিরাট্-পুরুষ পরমাত্মা হইতে যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য বেদ আকর্ষণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

ভক্তি ও প্রাপ্তি।

তটশালিনী যমুনার এক নিভৃত নিকুঞ্জ পার্শ্বে বল্লরীবিজড়িত ঘন তরুশ্রেণীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় একখানি জীর্ণপ্রায় পর্ণকুটীরে একটী চতুর্বিংশতি বর্ষবয়স্কা আভরণহীনা মলিন-বেশা কামিনী তণ্ডুলের কণিকা বাছিতে বাছিতে পার্শ্বস্থিত অনাবৃত তুলসীমঞ্চমধ্যস্থ গৌরকান্তি স্বামীকে কহিতে ছিলেন—আর কতদিন তোমাকে বলিব। প্রভাসে কৃষ্ণচন্দ্র এখন রাজা, তোমার সহপাঠী; তিনি অকাতরে দান করিয়া দুঃখীর দুঃখ দূর করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে নিশ্চয়ই আমাদের কষ্ট নিবারণ হইবে।

মুদিতনেত্র ধ্যানগম্ভীর ব্রাহ্মণ; পত্নীর উত্তেজনায় একটু বিরক্তির সহিত একটু সঙ্কোচক্ষুব্ধ হৃদয়ে কহিলেন—যাঁহার দর্শনে-যাঁহার নাম স্মরণে ভবক্ষুধা নিবারণ হয়, আমি তাঁহার নিকট সামান্য উদরের যাতনায় ভিক্ষাপ্রার্থী হইব? না—তা পারিব না। ব্রাহ্মণ হইয়া জগৎপূজ্য ঋষিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুর নিকট সংসারের কামনা লইয়া দাঁড়াইব? না পত্নি! তা পারিব না। যেতে হয় তুমি যাও। সুদামা-ব্রাহ্মণের ধর্ম্মসঙ্গিনী পরিচয় দিয়া তুমি তাঁহার নিকটে গিয়ে দাঁড়াও। যদি তাঁহার দয়া হয়, তোমার আমার যদি কর্ম্মফল থাকে, তবে কষ্ট যাইবে। আমার আর সাধনার বিঘ্ন করিও না।

বিরক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে তমসা কহিল—পারিবে না,—তবে কি খাইব? এই মুষ্টিমাত্র ক্ষুধকণায় আর কয় দিন চলিবে? দুই জনের উদর কয়দিন পূর্ণ হইবে? এ সময়তো ভিক্ষা দুষ্প্রাপ্য। আবার তাহাও সাধনার বিঘ্ন জন্য করিতে চাহ না। কি ক'রে প্রাণ থাকিবে? দেখ—ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য প্রধান।

"যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ।

তুমি ইহার কোনটী করিতেছ? যজমান নাই যে, এক অঞ্জলি সিক্ততণ্ডুল ঘরে তুলিব। আবার গৃহে এক কণিকা তণ্ডুল, তিল কি যব নাই যে, পরের যজমান হইবে। অন্য দ্বারা যাজন কার্য্য করাইয়া সেই উদ্দেশ্যে এক গণ্ডূষ শীতল জল পিতৃপুরুষকে দিবে। আছেতো মাত্র ঘরে একরাশি তালপত্রের পুঁথি; তাহাও পড়াইবার ছাত্র নাই। নিজের উদর যমুনার জলে আর আমলকীফলে পূর্ণ করিতেছ, চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র রাখিবার শক্তি নাই। মাত্র সম্বল ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের দ্বারে প্রতিগ্রহ করা—তাও তুমি করিবে না। তোমাকে লোকে ব্রাহ্মণ বলিবে কি কারণ? ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণ, আর বিষহীনসর্প তুল্য জীব। না পারিলে দান করিতে, না পারিলে গ্রহণ করিতে; তবে গৃহধর্ম্ম রাখিয়াছ কেন? গৈরিক তো পরিয়াছ, চিমটা লইয়া সন্ন্যাসী হও। এত যে বেদ বেদান্ত পড়িলে, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত মুখস্থ করিলে, সমস্তই যে পণ্ড হ'লো, আর কয়দিন তুমি এরূপ অনাহারে সাধনা করিতে পারিবে? আমিই বা আর কয়দিন তোমার ফুল, জল, তুলসী সংগ্রহ করিতে পারিব?

আমার কথা শোন, এই ক্ষুধকণা ভাজিয়া দিতেছি, ইহা উত্তরীয়াংশে বান্ধিয়া দ্বারকায় যাও! কৃষ্ণচন্দ্র বাল্যে রাখালের উচ্ছিষ্ট অর্দ্ধভুক্ত ফল খাইয়াছেন, এখনও তাঁহার বাল্যলালসা যায় নাই। এই ক্ষুধকণা বাল্যসঙ্গী সখার হাতে পাইয়া তুষ্ট হইবেন। রাজার তুষ্টিতে প্রজার সুখ; বিশেষ তুমি তাঁহার বাল্য সহপাঠী, তাঁহার নিকট প্রার্থী হইলে নিশ্চয় আমাদের কষ্ট নিবারণ হইবে। আমার কথা শুন, একবার যাও। এই দারিদ্র্য-দহন আর সহ্য হয় না। তুমি পুরুষ, বিশেষ ব্রাহ্মণ; অনশনব্রত তোমার কৌলিক আচার। আমি ব্রাহ্মণ-শোণিতের বিন্দুমাত্র কণিকা বিলাসবাসনাপূর্ণ কামিনী। আর অনাহারক্লিষ্ট হৃদয় লইয়া থাকিতে পারি না। আজ যদি তুমি না যাও, তবে জন্মের মত বিদায় দাও, যমুনার নীলজলে নারীদেহ বিসর্জ্জন দি।

তপস্যানিরত সাধক ব্রাহ্মণ পত্নীর বাক্য শুনিয়া আর ভালমন্দ বিচার করিলেন না; ভাঙ্গা ক্ষুধ লইয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার চিরশান্তিপূত হৃদয় একবার কাঁপিল। ভাবিলেন হায় রে! আমি কি হতভাগ্য! যাঁহাকে দেবতারাও সুধা দিয়া তৃপ্ত নহে, আমি তাঁহার জন্য ভাঙ্গা ক্ষুধ লইয়া যাইতেছি? কিন্তু হরি! তুমি অন্তর্য্যামী।

(২)

সমচতুষ্কোণ উচ্চ রত্নবেদীর উপর মুক্তার ঝালরে উজ্জ্বলীকৃত দোদুল্যমান নীলচন্দ্রাতপতলে একখানি নাতিবৃহৎ স্বর্ণাসনে দ্বারকার নবীন ভূপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখা উদ্ধবের সহিত আলাপ করিতে করিতে সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার পঙ্কজবিনিন্দিত নীলআঁখি চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভৃগুপদ চিহ্নিত সুপ্রশস্ত হৃদয় কম্পিত হইল, মস্তকের রাজ-উষ্ণীশ শীর্ষস্থ শিখিপাখাসংলগ্ন মণির দ্যুতি অঙ্গসঞ্চালনে বিদ্যুৎঝলকের ন্যায় আন্দোলিত হইল। বারিধিগম্ভীর অনন্ত চৈতন্য যেন চঞ্চল লহরীর তুল্য দুলিয়া উঠিল। উদ্ধব ইহ পরলোকের সখা শ্রীকান্তের আকস্মিক ভাব দেখিয়া, ভীত চকিত হৃদয়ে করযোড়ে কহিলেন—একি সখে? সহসা এ ভাবান্তর কেন? কোন দুর্জ্ঞেয় অচিন্ত্য ভাবাবেশ হইল কি? শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন—না, এ তা নয়। বহুদিন পরে একটী বাল্যসখা সহপাঠী দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হৃদয়ে "হরেরাম নারায়ণ" বলিতে বলিতে আমার নিকটে ভিক্ষায় আসিতেছে। ভাই! আমি দ্বারকায় আসিয়া বড়ই আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছি—সুদাম আমার বৃন্দাবনের খেলার সঙ্গী—সান্দীপনিমুনির অবন্তীবিদ্যালয়ের সহপাঠী; তাহার দারিদ্র্যকষ্ট এতদিন নিবারণ করি নাই, তাই আজ আমার হৃদয় লজ্জায় আর করুণায় অবনমিত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ বিস্মিত উদ্ধব বলিল—সখা ব্রজসুন্দর! ব্রজভাব তোমার প্রকৃতই বিস্মৃতিতে ডুবিয়াছে। রাজনীতির কঠোর অনুশাসনে তোমার কোমল হৃদয় কঠোরতার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে। ভুলিয়াছ গোপগোপিকা, মনে নাই যশোমতী, স্মরণ হয় না বৃন্দারণ্যের শ্যামদ্যুতি। রাখালের রাজা আজ দ্বারকার সম্রাট। রাধিকার দাসখতের আসামী, আজ রুক্মিণী-সত্যভামার কলহের বিচারক। বিশাখার চিত্রপটের ছবি, আজ

রাজমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত। এ এক নূতন ভাব, নবীন খেলা। মাধুর্য্য এখন ঐশ্বর্য্যে পরিণত। প্রীতি কর্ত্তব্যের কঠোরতায় আবদ্ধ। সরলতা সন্দেহে পূর্ণ, দেবমোহকরী লীলা এখন কর্ম্মের দৃঢ়তায় আবদ্ধ। সুদাম সাধক—বড় দরিদ্র, একনিষ্ঠ ভক্ত। তাহার বাসনায়, তাহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি প্রকৃতই পূর্ণ কর নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বুঝিলাম ভাই—আমার ব্রজমাধুর্য্য দ্বারকার ঐশ্বর্য্যে ডুবিয়াছে। কিন্তু সখা এক স্থানে দুই সাধনা দাঁড়াইয়াছে। সুদাম চাহে ভক্তি, তমসা চাহে প্রাপ্তি। তাই এতদিন কোনটিই পূর্ণ করি নাই। আজ ভক্তির অনাবিল শান্ত মাধুর্য্যে—প্রাপ্তির উজ্জ্বল বাসনা মিশিয়া এক অভূতপূর্ব্ব "প্রার্থনা" আসিয়াছে। তাই আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তুমি সাত্যকিকে ডাক দেখি।

উদ্ধব উঠিয়া পুরীর বাহির হইল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই সময় মনের কল্পনা প্রবৃত্তিকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা শক্তি কল্পনায় মিশিয়া কার্য্যের এক প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল। স্থির করিলেন ভক্তি আর প্রাপ্তি দুই দিতে হইবে। তমসার প্রাপ্তিস্পৃহা পূর্ণ করিতে কার্য্যপ্রবাহ আপাততঃ গুপ্ত রাখিব। সুদামের ভক্তির সহিত তাহা মিশাইয়া জগতকে শিখাইব যে, ভক্তি ও প্রাপ্তি দুইটি পূর্ণ বিভিন্ন স্পৃহা; প্রাণের ঐকান্তিকতার সহিত মিশিলে উভয়ে এক পরম রত্ন মিলে। মানবজীবনের সার্থকতা এই স্থানে পূর্ণ—এই স্থানে সিদ্ধ।

এই সময় সাত্যকি আর উদ্ধব উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সাত্যকি! তুমি প্রভাসের এক পার্শ্বে একটী রাজপুরী নির্ম্মাণ কর। তথায় হস্তী, অশ্ব, রথ ইত্যাদি এবং তৈজস পদার্থ প্রভৃতি সংরক্ষা কর। দারুকের সহিত ব্রজমণ্ডলের পশ্চিম পার্শ্বে যাও, তথায় যমুনাতীরে এক পর্ণকুটীরে তমসা নামে একটী দরিদ্রা ব্রাহ্মণ কন্যা আছেন, তাঁহাকে আনিয়া রাণীগিরী শিখাও। নূতন পুরীর নাম "সুদামাপুরী" রাখিও। কৃত্রিম নদী-স্রোতের নাম "তমসা" রক্ষা করিও। আমি এক ব্রাহ্মণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া কোন বিষয় বিচারপ্রার্থী হইব। ভক্তি ও প্রাপ্তির সামঞ্জস্য করিব।

রাজ-আজ্ঞায় সাত্যকি প্রস্থান করিলেন। উদ্ধব ভক্তি প্রাপ্তির বিচার দেখিতে লালায়িত হইয়া তৃষিত নয়নে রাজদ্বারাভিমুখে চাহিয়া রহিল।

(৩)

সিংহদ্বারের এক পার্শ্বে তকমাধারী দৌবারিক দাঁড়াইয়া একটী মলিন বসন পরিহিত শুষ্ক দেহ ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেখিল—স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, পুলকপূরিত—ব্রাহ্মণ অবশ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দৌবারিক ব্রাহ্মণদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিল। রাজ-আদেশ আছে, যদি কোন ভূদেব দ্বারে বা পুরীর পার্শ্বে অনাদরে অশুশ্রূষায় কাতর হয়, তাহা হইলে দ্বারাবতীর জনসঙ্ঘ রাজআদেশে কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে। এই আদেশ রাজ-

অন্তঃপুর পর্য্যন্ত তুল্যভাবে পালনীয়। তাই দৌবারিক ব্রাহ্মণদেহ অঙ্কে করিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে রাজসমীপে সংবাদ প্রেরণ করিল।

ব্রাহ্মণের চিরমর্য্যাদারক্ষক ব্রহ্মণ্যদেবের বাহুমূর্ত্তি দ্বারকাধিপতি মনে মনে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং দ্রুতপদে দ্বারে আসিলেন। দেখিলেন তাঁহার বাল্যসখা সহপাঠী সুদাম বাহ্যজ্ঞানরহিত, সংজ্ঞাহীন। তাঁহার পবিত্র সাধক আত্মা মাত্র মহাচৈতন্যে মনোনিবেশ করিয়া হৃদয়-দর্পণে হিরণ্ময়বপু সহস্রশীর্ষ অনন্তসবিতৃ-মণ্ডলের মধ্যে অবলোকন করিতেছে। বাহ্য চৈতন্য অন্তরের মহাচৈতন্যে মিশিয়া তাহার প্রাণবায়ু হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সুদামের এই মহাভাব অবলোকন করিয়া পদ্মহস্ত তাহার বক্ষে সংলগ্ন করিলেন। ডাকিলেন—সখা সুদাম ওঠ; এই যে আমি এসেছি। তোমার ভিতর বাহির দুই চক্ষুরি দৃশ্য হইয়াছি; ওঠ ভাই! একবার সখা বলে উঠিয়া আমাকে কি উপহার দিবে দাও। শ্রীঅঙ্গের বাতাস লাগিয়া আর ভগবৎবাক্যসুধার স্বরলহরী কর্ণে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিত ভূলুণ্ঠিত ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন—অন্তর বাহির এক হইয়া যে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তাহা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিবামাত্র সামান্য একটুকু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। বলিলেন গোবিন্দ! বৃন্দারণ্যবিহারী সখা তুমি, তুমি আমার জ্ঞানচক্ষুর দৃশ্য হইয়াছিলে? ভাল বুঝিলাম ব্রাহ্মণের উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেব আর তুমি ভিন্ন নহ। এইমাত্র বলিতে বলিতে সুদামের সাংসারিক জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল। বলিল সখা আমি বড় দরিদ্র, আর বলিতে পারিল না জিহ্বা জড়িত হইয়া উঠিল। মাথা ঘুরিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন—সখা, তোমার বস্ত্রের পুটলিতে কি? সুদাম ক্ষুধের পুটলি চাপিয়া ধরিল। বলিল ব্রাহ্মণী সামান্য ক্ষুধ ভাজিয়া দিয়াছেন। রাজদর্শনে রিক্তহস্তে যাইতে নাই, উপহার দিতে হয়। তাই আনিয়াছি, কিন্তু দেব না, যাহার হাতে সুধা দিয়া দেবতারাও তৃপ্ত নহেন, আমি তাঁহাকে সামান্য ক্ষুধ, আর বলিতে পারিল না।

যিনি ভক্তের নিবেদিত বিষ একদিন বালক প্রহ্লাদের নিকট আহার করিয়াছেন, গোকুলে মাটি খাইয়া যশোমতীকে বিরাট বিশ্ব দেখাইয়াছিলেন, তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত সুদামের ভর্জ্জিত ক্ষুধ পদ্মহস্তে গ্রন্থি খুলিয়া আহার করিলেন।

উপস্থিত জনগণ স্তম্ভিত হইল। কৃষ্ণ সুদামকে লইয়া রথে উঠিলেন; সারথি রথ চালাইয়া প্রভাসের পূর্ব্বাংশে সুদামা পুরীর দ্বারে গিয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিল।

(৪)

ভিখারিণী আজ রাজরাণী, পর্ণকুটীরের অধিবাসিনী, আজ এই স্থানে প্রাসাদের অধীশ্বরী, লালসূত্রে যাঁহার সধবার লক্ষণ সূচিত হইত, মণিময় কঙ্কণে আজ তাহার করশোভা বৃদ্ধি

করিতেছে। এক দিন যিনি মৃন্ময় কলসীতে জল আনিয়া স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতেন, আজ শত শত সুরূপা সুবেশা দাসীতে তাঁহার স্নানের জল সঞ্চয় করিতেছে। ভাগ্যনেমির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সুদামাপত্নী তমসা একটী সুরূপা সহচরীসহ কোমল শয্যায় বসিয়া তাহার ইহ জগতের সর্ব্বস্বধন মহারাধ্য স্বামি দেবতার অদর্শন জন্য উৎকন্ঠিতা হইয়া মুহুর্মুহুঃ দূত দ্বারা সন্ধান লইতেছে।

সহচরী কহিল রাণীজী! বাবা বোধ হয় কোন ঐশ্বর্য্যললামমণ্ডিতা ষোড়শীর রূপে ভুলিয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, কেননা দ্বারাবতী অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। শত শত রাজা, প্রজা, ধনী, মহাজন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দ্বারা দ্বারকার অঙ্গশোভা বর্ত্তমানে অমরাবতী ইন্দ্রালয় হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। হয়তো তথায় কোন ধনশালিনী মহাজনের রূপসী কন্যার রূপসাগরে ঝাঁপিয়া পড়িয়াছেন। আপনার বিগতযৌবন অঙ্গদ্যুতি, আর সাংসারিক কার্য্য জন্য বাগ্‌ভঙ্গিতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার মন রূপতৃষ্ণায় আর প্রেমবিগলিত শান্তবাক্যে মুগ্ধ হইয়াছে। রাণী মা! আমি জানি বহু পুরুষ এই সংসারে এই ভাবের আছেন, তাঁহারা নারীর হৃদয় বুঝিতে না পারিয়া অথবা নারীচরিত্র বিশ্লেষণে অপারক হইয়া দ্বিপত্নীক হইয়া বসেন। ইহাতে যে পরিণামে গ্লানি আছে, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে অক্ষম।

তমসা কহিল—না সখি, স্বামী আমার রাজা নহেন, ধনী নহেন, বিলাসীও নহেন। তিনি ব্রাহ্মণ সাধক। বিলাসকামনা, ভোগ তৃষ্ণা, তাঁহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমি পূর্ব্বে বড় দরিদ্রা ছিলাম, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সাত্যকির চেষ্টায় এই রাণীগিরী পাইয়াছি। স্বামী আমার শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী, তাই তাঁহার নিকট ভিক্ষায় এই বিভব পাইয়াছি। কিন্তু পতীর চক্ষু বা ভোগদেহ এই ব্যাপার এখনো প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। তিনি যে পবিত্র আত্মা যেরূপ সরল সহজ ব্রাহ্মণ্যপূর্ণকান্তি, পূর্ব্বে ছিলেন, এখনো তাই আছেন। তাঁহার পরম পবিত্র চিত্তে পাপস্পর্শ হইতেই পারে না। তিনি জগতের পবিত্র শিক্ষাদাতার বংশধর, জ্ঞানগৌরবের পূত ধারা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-দেহে কি ব্যভিচার, বিলাস, ভোগানুরক্তি, অজ্ঞানতা আসিতে পারে? আমি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, সাত্যকির ইঙ্গিতে এই ঐশ্বর্য্যাভিনয় করিতে বসিয়াছি, তাই তাঁহার নিকট সহসা পরিচিতা হইবনা। কেননা তাঁহার ভক্তি আর আমার প্রাপ্তি, দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, আজ এই স্থানে তাহাদের একাসরে সমাবেশ হইবে। সেই জন্য নিখিল জ্ঞানময় নারায়ণ জগতের লোক শিক্ষার জন্য এই মহাকার্য্য বিরাট অনুষ্ঠান সংঘটন করিয়াছেন। ধন্য লীলাময়ের লীলা! আর শত ধন্য ভক্তির অকৈতব ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। আমি কামিনী কামনার কিঙ্করী, স্বামী আমার ব্রাহ্মণ, কামনাহীন, সংযত চিত্ত, পরহিতৈষী বিশ্বদেব। তাঁহারি সাধনার ফলে তাঁহারি তপস্যার মাহাত্ম্যে—আমি আজ রাণী, আমি আজ মাধুর্য্যের বিনিময়ে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী; কিন্তু কামনার

কিঙ্করী হইয়া যাহা আজ লাভ করিলাম, তাহা অতঃপর যদি বিশ্বপ্রেমিকতায় মজিয়া ভোগের শেষ সীমায় লইতে পারি, তবেই বুঝিব—আমি ব্রাহ্মণী, আমি বিশ্বমাতার অংশিনী, আমি সাধকের ধর্ম্মপত্নী। সহকারিণী সাধিকা হিন্দুর হিন্দুত্ব, বিশ্বশিক্ষক ব্রাহ্মণের ইহাই আচরণীয়, ইহাই শিক্ষণীয়, ইহাই করণীয়। জগন্মঙ্গলের দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। ভারতের এই শ্রেণী ব্রাহ্মণ বিশ্বদেবতা। ব্রাহ্মণ্যে আর দেবত্বে প্রভেদ নাই। সদাচার, শুদ্ধতা, কামনাহীন, জ্ঞানগুরুত্ব সংরক্ষাকারী জাতিই সাধারণ মনুষ্য-সমাজের আদর্শ। আমি এই বংশের নারী; এইরূপ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী; আমার প্রতি কার্য্যে বা প্রত্যেক বাক্যে সমদুঃখতা আর পতিসেবা, নারায়ণসেবা পরিস্ফুট না হইলে, ব্রাহ্মণী বলিয়া উচ্চস্তরে স্থান পাইব কেন? ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি, ইহাকে মাধুর্য্যে লইয়া বিশ্বের নারীমণ্ডলীকে শিক্ষা দিব যে, জাতীয়তা, কর্ত্তব্যবোধ, আত্মশক্তি আর বিশ্বহিতকামনায় নারীজীবন দেবীজীবন হইতে ব্রহ্মণ্যশক্তির অনাবিল সাহায্যে ধরায় আপতিত হইয়াছে। এই দেবীত্ব এই মাতৃত্ব এই বিশ্ববিমোহন পবিত্র স্নেহময়ী দাসীতা ব্রাহ্মণকামিনীর করণীয়।

আজ যে কৌতুককণিকা প্রকাশ জন্য চির রহস্যময় অচিন্ত্য শিবশান্তিময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আমার উপাস্যদেব স্বামি-দেবতাকে লইয়া আমার নিকট আসিতেছেন, তুমি ভাই তাহার একটা কৌতুকাংশ গ্রহণ কর। স্বামী আমার উপস্থিত হইলে, আমাকে রাণী বলিয়া পরিচিতা আর. তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী চলিবে।

তমসায় আর সখীতে যখন আলাপ চলিতেছিল, তখন সহসা দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল—রাণীমা একটী কৃষ্ণবর্ণের নধর দেহ উষ্ণীষধারী পুরুষ আর জীর্ণশীর্ণ গৌরকান্তি আনত শীর্ষ ব্রাহ্মণ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন, কি অনুমতি হয়?

উত্তর হইল-উভয়কে অগ্রে অর্ঘ্য দিয়া তাহার পর লইয়া এস। প্রতিহারী সসম্মানে যুক্তকরে অতিথিদ্বয়কে লইয়া উপস্থিত করিল। কৃষ্ণচন্দ্র রাণীজীকে অভিবাদন করিলেন। বলিলেন সখা! রাণীজীকে প্রণাম কর। পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি সুদাম ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণতঃ হইল। তখন উভয়ের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। কৃষ্ণচন্দ্র উপবিষ্ট হইয়া সুদামকে একটী উচ্চ আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন—ভীত ত্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ কম্পিত দেহে ভূশয্যায় বসিয়া পড়িলেন। তাহার দৃষ্টি নির্নিমেষশূন্যভাবে রাণীজীর মুখের উপর আপতিত হইল। দেহযষ্টি কম্পিত বল্লরীতুল্য দোলিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের হৃদয়ের ভাব মুখে অভিব্যক্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—সখা এরাণী কে—ইহার পাণি কোন মহাপুরুষ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আমাকে এইস্থানে আনিলে কেন? আমি বুভুক্ষিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি রাজদরবারে উচ্চ আসনে বসিবার অধিকার আছে? সামর্থ্যহীন অপরিচিত ব্রাহ্মণ রাজসমীপে বসিবার অনধিকারী—যাহার মুখ হইতে ললিত শ্লোকচ্ছটা প্রকাশ না পায়, সেরূপ ব্রাহ্মণ ধনী বা রাজার নিকট আদৃত নহেন। আমি শ্রীর সপত্নী পুত্র হইয়াও

মাতৃপ্রসাদে এই রাণীজীর রূপ বা ঐশ্বর্য্যের কোন কবিতা বলিতে প্রস্তুত হই নাই। আমার এইস্থানে উপবেশন সম্পূর্ণ ধৃষ্টতামূলক। তোমার অভিপ্রায় কি? সুদাম এইরূপ বলিতে বলিতে একটী উৎফুল্ল কুসুমস্তবক নাড়িয়া অনন্তমনে আবার কহিলেন—দ্বারকাধীশ গোবিন্দ! আমি আজ সপ্তাহপ্রায় একাকিনী কাঙ্গালিনী পত্নীকে পর্ণকুটীরে রাখিয়া আসিয়াছি। আমায় বিদায় দেও। সহধর্ম্মিণীর সহিত কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত ফল উপভোগ করি গিয়ে। এই সময় তমসা হাসিল। শ্রীকৃষ্ণ নীরব রহিলেন; সহচরী কহিল—ঠাকুর তোমার নামে রাণীজীর নিকট এই ঠাকুর বিচার প্রার্থী হইয়াছেন। তুমি ক্ষুদভাজা খাওয়াইয়া ইহার উদরপীড়া জন্মাইয়াছ। আর দ্বারকার রাজদরবারে রাজাকে "রাজা" না বলিয়া পল্লীসুলভ "বন্ধু—সখা—মিতা" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছ, এবং অপরিচিত দরিদ্র হইয়া রাজদরবারের পুষ্পস্তবক মলিন করিয়াছ। এই তিন অভিযোগের এই স্থানে বিচার হইবে। সম্ভবতঃ তোমায় দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

সুদামের তালু শুকাইয়া গেল, হৃদয় কাঁপিল। শ্রীকৃষ্ণ এই সময় উঠিয়া গললগ্নীকৃত-বাসে কহিলেন—রাণীমা! এই আমার আবেদনপত্র গ্রহণ করুন। প্রতিবাদীর উপর বিচার পূর্ব্বক আদেশ প্রচার হউক। রাণীজী মৃদু হাসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চস্বরে কহিলেন—আপনার সাক্ষী আছে? উত্তর হইল। তিন অভিযোগের একটী আপনার সম্মুখেই কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অভিযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই দেখুন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ একটী জীর্ণ মলিন বস্ত্রের পুটলী রাণীর সিংহাসনের পার্শ্বে রক্ষা করিলেন; সহচরী গ্রন্থি খুলিয়া দিল, সকলে বিস্মিত হইল; কতকগুলি কদর্য্য অর্দ্ধভর্জ্জিত অর্দ্ধভক্ষিত ক্ষুদকণা। তাহার পর পুনরপি দ্বারকেশ্বর কহিলেন, এই প্রতিবাদী সত্যবাদী, জিজ্ঞাসা করুন ইনি আমাকে সখা বলিয়া রাজসভামধ্যে আহ্বান করিয়াছেন কি না? এবং সর্ব্বত্রই সখা বলিয়া ডাকেন কি না? তমসা কহিল, কিগো প্রতিবাদী ঠাকুর! একথা সত্য না মিথ্যা? কি উত্তর দেও, সুদামের উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক ভয়ে বিস্ময়ে জড়িভূত হইয়া কম্পিতদেহে রাণীজীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সহচরী কহিল—বুঝিলাম তোমার উত্তর নাই। তুমি প্রকৃত দোষী, রাণীর আদেশ অতঃপর শুন।

তমসা বলিল এই অভিযোগের বিচারফল শুন। এই ব্রাহ্মণকে এই দণ্ডেই আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আনিয়া বসাইয়া বাতাস কর। ইহার যেরূপ গুরুতর অপরাধ তাহার দণ্ডই এই। তমসা নিজে তখন সংযত হইয়া বসিল। শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—হাঁ আমি তুষ্ট হইলাম। ঠিক বিচার হইয়াছে। সহচরী রণচণ্ডীমূর্ত্তিতে আসিয়া সুদামের কর ধারণ করিল। ব্রাহ্মণ স্থির হইয়া রহিলেন। রাণীজী কহিলেন-কি সহচরী, অপরাধী নড়িতেছেন না; আচ্ছা উহার "কর্ণধারণ" কর। আদেশ শুনিয়া সুদামের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, স্তম্ভিত হইয়া আরও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন একি ব্যাপার? আমি সুদাম;

ইনি যুবতী ; তাহাতে ইনি রাণী,আমি দরিদ্র,কিরূপে ইহার দক্ষিণপার্শ্বে বসিব ? এ যে সভ্যতা ভদ্রতা এবং শিষ্টাচারের সম্পূর্ণ বিরোধী আদেশ ! ইনি কি অনার্য্য রাণী ? আর্য্যমহিলা এরূপ আদেশ করিতে পারেন না। যাহারা সভ্যতা শিষ্টাচারকে অনাবশ্যক বলিয়া বোধ করে, তাহারাই এরূপ আদেশ করে। এই রাণী কি অনার্য্য কামিনী ! তবে শ্রীকৃষ্ণই বা এরূপ অনার্য্য নারীকে অভিবাদন করিলেন কিরূপে ? বুঝিলাম না ; এখন কি করি ? হায় ! হতভাগিনী তমসা, তখনি বলিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইব না, দূর হইতে তাঁহার নবনীরদকান্তি ধ্যান করিব। কৃষ্ণের স্বরূপ হওয়া অপেক্ষা কৃষ্ণনামসুধা পানেই অধিক তৃপ্তি। আমার তা হইল না। প্রত্যক্ষের নিকট পরোক্ষের পরাভব অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু আমার ন্যায় জীবের প্রত্যক্ষের চাইতে পরোক্ষই প্রকৃষ্ট। যাহারা ভক্তি প্রীতির কোমল মধুরতাকে তিক্ত বোধ করিয়া কেবল শুষ্ক জ্ঞানের আশ্রয়ে সারূপ্য সাযোজ্যকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেন, তাঁহারাই চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে দূরে রাখিয়া সোঽহং" জ্ঞানে না জানি কি মধুরতাই লাভ করেন। চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া সুখের নহে কি ? কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনামে প্রাণ অধিক আকৃষ্ট হইলে তৃপ্তি অধিকতর আইসে। সুদামের চিন্তাবেশ প্রশমিত হইতে না হইতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—সহচরী, তোমাকে ইহার কর্ণধারণ করিতে হইবে না, আমি ব্রাহ্মণকে রাণীজীর পার্শ্বে বসাইতেছি।

তখন সহচরী একখানা পট্টবস্ত্রের দ্বারা সুদামের গৌরবপু আবৃত করিয়া দিল। দেবীর নিকট হাড়িকাঠে ছাগ বন্ধনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সুদামকে তমসার দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া উপস্থিত করিলেন। ছাগ যেমন বলির সময় ভ্যা ভ্যা, মা মা করিতে থাকে, সুদামও তদ্রূপ, হা কৃষ্ণ—বাল্যে স্কন্ধে করিয়া অবন্তী দেশে সান্দীপনি ঋষির পাঠশালায় লইতাম, তাহারি ভাল প্রতিদান দিলে, ভাই ! সহচরী শ্বেত চামর ব্যজন করিতে লাগিল। অন্যান্য পুর-মহিলাগণ উলুধ্বনি করিতে লাগিল, প্রতিহারী শুভ্র লাজরাশি ছড়াইতে লাগিল। একজন ঋত্বিক ব্রাহ্মণ আসিয়া "স্বস্তি" মন্ত্র পড়িতে লাগিল। বাহিরে বাদ্য, আর ভিতরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বীর সাত্যকি উচ্চকণ্ঠে "জয় রাজা সুদামকি জয়" বলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্বর্ণছত্র ধারণ করিলেন। তখন যাদবশ্রেষ্ঠ সাত্যকি আবার কহিলেন—সাধক ! কেবল ভক্তিপ্রেমের আকর্ষণে ভগবদারাধনাই শিখিয়াছ। কিন্তু তাঁহার লীলা খেলার বিন্দুমাত্র তত্ত্ব বিচার জাননা ও বুঝনা। হৃদ্পদ্মে শ্রীগুরুর পূর্ণমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত হইলে যে মাধুর্য্য ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তাহার তত্ত্ব তো বেদ, উপনিষদে পাও নাই। গীতা, চণ্ডী ভাগবত, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারতেও পড় নাই। আজ দিব্য দৃষ্টির বাহ্য দৃশ্যে চাহিয়া দেখ ; আর শাস্ত্রসংস্কৃত বুদ্ধিকে সংসারের দিকে শ্রীগুরুর বাহ্য বিরাট মূর্ত্তিতে ডুবাইয়া দিয়া দেখ ; তোমার সাধনার [illegible], ভক্তির সুধা, বিশ্বাসের পারিজাত, প্রেমের অচিন্ত্যনীয় নিরবচ্ছিন্ন সুখ মূর্ত্তি-[illegible] [illegible] তোমাকে এই সোপানেই মুক্তি দিবেন।

এই যে কামিনী তোমার বাম পার্শ্বে রাণী-মূর্ত্তিতে উপবিষ্টা, ইনি তোমারি ধর্ম্মপত্নী তমসাদেবী। এই রাজপুরী তোমারি জন্য নির্ম্মিত। বিপ্র! বহু জন্মজন্মান্তর সাধনা করিয়াছিলেন, তাই আজ ভক্তিপ্রাপ্তি এক স্থানে পাইলে, স্ত্রী পুরুষে অনন্ত সুখের অধিকারী হইলে। কালচক্রে এদৃশ্য অন্তর্হিত হইবে। এই ক্রিয়ার পতনও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তোমার এই অকৃত্রিম কীর্ত্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকর প্রদীপ্ত রহিল। এখন যাও বিপ্র! পদ্মপত্রের জলের ন্যায় প্রাপ্তির মাঝে ডুবিয়া ভক্তির অনাবিল আশ্রয়ে পরাভক্তি লাভের উপায় দেখ গিয়া।

অতঃপর তোমরা স্ত্রী পুরুষ যুক্ত করে বল!

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

তোমার ভক্তি আর তমসার প্রাপ্তি, দুইই পূর্ণ হইল। ব্রাহ্মণের ভগবৎ নিষ্ঠা, আর ব্রাহ্মণীর পাতিব্রত্য মূলক প্রাপ্তিস্পৃহ, দুই পূর্ণ বিভিন্ন ক্রিয়া আজ শ্রীহরির ইচ্ছায় এই স্থানে এই ভাবে পূর্ণ হইল। ভক্তি ও প্রাপ্তি দুই ক্রিয়া পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও উদ্যম, অধ্যবসায়, বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি এবং সাধনায় এই ভাবে পাওয়া কিছু কঠিন নহে। তুমিই তাহার জলন্ত প্রমাণ।

শ্রীমোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ।

ব্রজরাণী।

(১)

বাঁচাতে কৃষ্ণের প্রাণ　　রাখিতে যশোদা-মান
　অসম সাহসে রাধা বুকখানি বাঁধিল।
তারপর ধীরে ধীরে　　সুনীল যমুনানীরে
　দুরু দুরু হিয়া বালা কুম্ভ ল'য়ে চলিল॥

(২)

শতছিদ্র কুম্ভ তার　　ভাবিতেছে বারবার
　কেমনে সে কুম্ভে বারি ভরি ল'য়ে আনিবে।
নয়নে অশ্রুর ধার　　ঝরিতেছে অনিবার
　কিরূপে ব্রজের পুরে সতীমান রহিবে॥

(৩)

যতবার তোলে জল ছিদ্র দিয়া অবিরল
চক্ষুজল সাথে মিশে যমুনায় পড়িছে।
ঊর্দ্ধ পানে মুখ ক'রে কর দুটি জোড় ক'রে
মানিনী শ্রীরাধা আজি প্রাণ ভ'রে ডাকিছে॥

(৪)

কোথা হে দয়াল হরি! উর চিতপীঠপরি
কর কৃপা বাঁচে যাহে তব দাসী সেবিকা।
বাঁচাও দাসীর মান রাখ তার দাসী নাম
অসাধ্য হইবে সাধ্য দিলে ভক্তিকণিকা॥

(৫]

'প্রেমের বাঁধনে বাঁধা কোথায় আমার রাধা'
বলিয়া শ্রীহরি আসি দাঁড়াইয়া সকাশে।
রাখিতে রাধার মান শ্রীহরি তখনি যান
অলক্ষ্যে পশিলা গিয়া ভক্তচিত্ত-আকাশে॥

(৬)

রাধার প্রেমের বলে কলস ভরিল জলে
ছিদ্র কুম্ভ পূর্ণ হল অঘটন ঘটিল।
কৃষ্ণ প্রাণ ফিরে পেল যশোদা ছুটিয়া এল
'ব্রজরাণী' ব'লে তারে কোলে তুলে লইল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

REGISTERED No. C—679

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, ফাল্গুন। } ষষ্ঠ সংখ্যা।

ব্যাধি-রহস্য।

(৩)

দেহযন্ত্রের নির্ম্মাণ।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা জীবাত্মা বা দেহের যন্ত্রীর স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং, এইবার সেই যন্ত্রী যে যন্ত্রের আরোহী এবং যে যন্ত্রের অবস্থা বিশেষ তাহার গমনাগমনের পথ বাধাশূন্য বা বাধাযুক্ত করে, সেই যন্ত্রের গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবৎপ্রাণীর দেহই তাহাদের স্ব স্ব আন্তরিক শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসংখ্য সংস্কারসম্বলিত জীব জন্মকাল উপস্থিত হইলেই স্বভাববশে ফুটিয়া উঠে এবং তাহার ফলে তাহার শক্তিগুলি সমসাময়িকভাবে ক্রিয়াশালী হইয়া চারিদিক হইতে আপনাপন ক্রিয়াপ্রকাশ-যোগ্য যন্ত্র নির্ম্মাণার্থ উপাদান আকর্ষণ করিতে থাকে। সেই আকর্ষণের ফলে এক এক শক্তির সহিত বিভিন্নরূপ উপাদান সংযুক্ত হইলে উপাদানগুলির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া

আরম্ভ হয় এবং তাদৃশ ক্রিয়ার ফলেই সেই সেই শক্তির ভৌতিক দেহযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া পড়ে। অতঃপর শক্তিগুলি স্ব স্ব নির্ম্মিত যন্ত্রের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া তাহাদের পুষ্টিসাধনপূর্ব্বক নিজ নিজ ক্রিয়া সাধন করে। এইরূপে যে বিভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহাদেরই সমষ্টির নাম দেহ।

এ যন্ত্রনির্ম্মাণ-রহস্য অতীব জটিল বলিয়া এস্থলে আমরা একটী স্থূল দৃষ্টান্তের অবতারণা করিব। সকলেই জানেন প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষ আমের আঁঠি হইতেই জন্মিয়া থাকে। এই আঁঠির মধ্যে আম্র বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, মুকুল ও ফলের বীজশক্তি বা সংস্কার থাকে। ইহার মধ্যে যদি কোন আঁঠির মধ্যে এই সব বীজশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই আঁঠি হইতে আর কোন বৃক্ষই জন্মে না। আবার যদি তাহার মধ্যে মাত্র মুকুল বা ফলের সংস্কারের অভাব ঘটে, তবে তজ্জাত বৃক্ষ মুকুল বা ফলহীন দৃষ্ট হয়। এইরূপ জীবাত্মার যাবৎ সংস্কারের অভাব হইলে তাহার পুনর্জ্জন্মই হয় না এবং সংস্কারবিশেষের অভাব হইলে তাঁহার নির্ম্মিত দেহ মধ্যে সেই লুপ্ত সংস্কারজাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এইজন্যই জন্মকালে কোন কোন জীবের অঙ্গহানি দৃষ্ট হয়। এইরূপ জীবাত্মার মধ্যে মন, বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের ভিন্নতা অনুসারে জীবের বিভিন্ন মতিগতি ঘটিয়া থাকে। আমরা যথাস্থানে এই গুরুতর বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জীবাত্মার শক্তিসমষ্টি তিন জাতিতে বিভক্ত। সুতরাং এই তিন জাতীয় ব্যষ্টিশক্তির ক্রিয়া পৃথগ্‌ভাবে বুঝিতে পারিলে, শক্তিসমষ্টির ক্রিয়ার সম্যক জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব এইবার আমরা জীবের সেই জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ নামক ত্রিশক্তির ক্রিয়ার একটা মোটামুটী বিবরণ প্রদান করিব।

পোষণ শক্তি।—শরীরের নির্ম্মাণ, অস্তিত্ব রক্ষা ও পুষ্টিসাধন জন্য যত প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎ সমস্তই পোষণশক্তির ক্রিয়া বা জীবনক্রিয়া বলিয়া পরিচিত। এই শক্তি হইতে ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা, মলযন্ত্র, মূত্রযন্ত্র, রক্তগ্রাহিনী যাবৎ পেশী, কণ্ঠ-প্রদেশের পেশী প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে ঐ শক্তি এই সকল দেহযন্ত্রের অবলম্বনে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামকপঞ্চপ্রাণের ক্রিয়াসাধন করিয়া দেহের অস্তিত্ব রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করে। এই পোষণ সংস্কারের ক্রিয়ার ফলেই ভূতপদার্থ হইতে দেহ-নির্ম্মাণোপযোগী উপাদানগুলি সংগৃহীত হইয়া অনুরূপ-শক্তির সহিত মিলিত হয় এবং তাহাদের একত্র সমাবেশের ফলে:মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া উল্লিখিত ফুস্‌ফুসাদি যন্ত্র গঠিত হইয়া থাকে। পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, পোষণশক্তির অন্তর্গত এই সকল বিভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মাণক্ষমা শক্তিগুলি এক জাতীয় হইলেও একই প্রকৃতির নহে। কারণ, যে শক্তির ক্রিয়ার ফলে ফুসফুস নির্ম্মিত হয়, সেই শক্তির ক্রিয়ার ফলে যকৃৎযন্ত্র নির্ম্মিত হয় না।

পোষণ-শক্তির ক্রিয়ার আর একটী বিশিষ্টতা এই যে, ইহা কেবল দেহের যন্ত্রগুলির

নির্ম্মাণ ও তদ্বারা জীবন ক্রিয়ার সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত নহে। অধিকন্তু ইহা অন্য দুই শক্তির অর্থাৎ জ্ঞান ও পরিচালন শক্তির ক্রিয়াসাধনেরও সহায়তা করে। কারণ, ইহা চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানযন্ত্র এবং বাকৃপাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির গঠনোপযোগী যাবৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেয়। এইজন্য বেদশাস্ত্রে পোষণশক্তিকে পরন্তরী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্ঞানশক্তি ও পরিচালনশক্তি কেবল আভ্যন্তরী মাত্র। কারণ, ইহারা মাত্র নিজ নিজ ক্রিয়াযন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে এবং এই কার্য্যেও এতদুভয়শক্তি পোষণশক্তির প্রদত্ত উপাদান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

পরিচালনশক্তি। এই শক্তির মধ্যে বাক্, পাণি, পায়ু, পদ ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিবার সংস্কার আছে। এই শক্তি বা সংস্কার যেমন যেমন ফুটিয়া উঠে, তেমন তেমন ঐ ইন্দ্রিয়গুলির গঠন আরম্ভ হয়। ঐ সকল ইন্দ্রিয় বা দেহযন্ত্র গঠিত হইলে প্রত্যেক শক্তি নিজ নিজ গঠিত যন্ত্রের আলম্বনে বিবিধ ক্রিয়া সাধন করে। উল্লিখিত ৫টী স্থূলশক্তির শাখা প্রশাখাও অসংখ্য এবং সেই সকল শাখাশক্তিও ক্রমে নিজ নিজ ক্রিয়াদ্বারা নিজ নিজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করে। দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা, কাম, ক্রোধ, ভোগেচ্ছা, সাহস, অভিমান প্রভৃতির সংস্কার এই পরিচালনসংস্কারেরই অন্তর্গত এবং এই সকল বৃত্তির ক্রিয়াসাধন জন্য পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, পূর্ব্বোক্ত পোষণশক্তিই এই সকল যন্ত্রনির্ম্মাণের উপযোগী উপাদান প্রদান করিয়া থাকে।

জ্ঞানশক্তি। চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় নির্ম্মাণ করিবার শক্তিগুলি এই শক্তির অন্তর্গত। যেমন যেমন ইহার এক একটী শক্তি ফুটিয়া উঠে, তেমন তেমন চক্ষুকর্ণাদি পৃথক পৃথক জ্ঞানযন্ত্র নির্ম্মিত হয়। বলা বাহুল্য, এই শক্তিপঞ্চক জ্ঞানশক্তির স্থূল বিভাগমাত্র। কারণ তাহাদের শাখা প্রশাখাস্বরূপ আরও অসংখ্য শক্তি জ্ঞানশক্তির অঙ্গপুষ্ট করিয়া থাকে। বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতি বৃত্তিগুলি এই শক্তিরই অন্তর্গত এবং তাহাদের প্রত্যেকের যথা শক্তি কালে বিকসিত হইয়া নিজ নিজ যন্ত্র গঠন করে। এই শক্তি—গুলিও সেই পোষণশক্তির প্রদত্ত উপাদান দ্বারা নিজ নিজ ভৌতিক দেহ গঠন করিতে সমর্থ হয়।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, উদ্ভিদ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণিদেহ উল্লিখিত ত্রিশক্তির ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হইলেও প্রত্যেক প্রাণিদেহে সেই শক্তিত্রয়ের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কারণ, উদ্ভিদের মধ্যে কেবল পোষণশক্তি সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীলা, কিন্তু তন্মধ্যে অন্য দুই শক্তি লীন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। তাই তাহারা ভূচর, খেচর বা জলচর প্রাণীর ন্যায় চলাচল করিতে এবং মনুষ্যাদি প্রাণীর ন্যায় জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিতে একরূপ অক্ষম। অবশ্য উদ্ভিজ্জগণ যে একেবারে অচল ও জ্ঞানহীন তাহাও বলা যায় না।। কারণ, তাহারা যে ক্ষীণভাবে নড়িতে চড়িতে এবং ক্ষীণ জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিতে পারে, তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রমাণ করিতে সক্ষম। আমাদের শাস্ত্রেও স্মরণাতীতকাল

হইতে উদ্ভিদের এইরূপ শক্তি থাকার কথা লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে। তবে আর্য্য ঋষিগণ তাহা প্রমাণ করিবার উপযোগী কোন সূক্ষ্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। এক্ষণে বঙ্গের কৃতিসন্তান বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিজ্ঞানবলে এইরূপ যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে উদ্ভিদের পরিচালন ও জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে থাকায় ডাক্তার বসু জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা যখন কেবল মনুষ্যের ব্যাধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন আমরা যেরূপে ত্রিশক্তি দ্বারা মানবদেহ নির্ম্মিত হয়, তাহারই আলোচনা করিব। মানবদেহের নির্ম্মাণকার্য্য অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহার নির্ম্মাণরহস্য অতীব জটিল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে বাস্তবিক পক্ষে ইহা তেমন জটিল নহে। একখানি ইষ্টকের উপর আর একখানি রক্ষা করিয়া যেমন ক্রমে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, তেমনই একটী ভৌতিক পরমাণুর সহিত আর একটী পরমাণু গ্রথিত হইয়া মনুষ্যদেহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মৌলিক উপাদানসংখ্যা বিভিন্ন মতে বিভিন্ন হইলেও আমরা ইহার সংখ্যা মাত্র পাঁচটীই ধরিয়া লইব এবং ইহাদের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূত পদার্থেরই পরস্পর বিনিময় ও মিশ্রণ Permutation and combination হইয়া যেরূপ জীবদেহ মাত্রেরই নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

বিভিন্ন শস্যের বীজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে উপযুক্ত মৃত্তিকা, সার ও জলাদির সংযোগে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ জীবশক্তিও পুনর্জ্জন্মকাল উপস্থিত হইলে ১মতঃ পিতৃদেহে ও পরে রেতঃ—রূপে পিতৃদেহ হইতে মাতৃদেহে প্রবিষ্ট হয়। এই রেতঃ মাতার জরায়ু মধ্যে জলৌকার ন্যায় সংযুক্ত হইলে সেই শুক্রমধ্যস্থ সংস্কার স্ফুরিত হইতে থাকে। এই স্ফুরণের সময় সংস্কারের ক্রিয়া বশতঃ শুক্রীয় অণু সমূহের মধ্যে একপ্রকার সমালোড়ন উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে বিশেষ বিশেষ অণুসকল বিশেষ বিশেষ সংস্কারের আকাঙ্ক্ষামত তাহাতে সংযুক্ত হইলে সেই সংস্কার বা শক্তির ক্রিয়াপরিচালনোপযোগী ভৌতিক দেহ গঠিত হয়। পরে যখন শুক্রীয় অণুমধ্যে শক্তির অনুরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী উপাদানের অভাব ঘটে, তখন শক্তিগুলি মাতৃদেহের রস ও রুধির হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপনাপন ক্রিয়ার যোগ্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করে। ১মতঃ একপ্রকার শক্তিদ্বারা নরদেহের মস্তিষ্ক গঠিত হইলে মানবের সংস্কার তাহার আধেয় হইয়া অবস্থান করে। পরে মস্তিষ্কবাসী জ্ঞানসংস্কার চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পরিচালনশক্তি বাকপাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পোষণশক্তি প্রাণ, অপানাদি পঞ্চপ্রাণের ক্রিয়ার যোগ্য যন্ত্রগুলি নির্ম্মাণ করে। বলা বাহুল্য, এই সকল যন্ত্রসমষ্টির নামই মানবদেহ।

জীবাত্মা যতদিন মাতৃদেহে অবস্থান করেন, ততদিন তাঁহার শক্তিগুলি মাতৃদেহের রস রুধিরাদি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করে, কিন্তু তিনি মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইলে তাঁহার দেহনির্ম্মাণ ও পোষণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিবার ভার অনেক পরিমাণে তাঁহার

নিজের উপরেই ন্যস্ত হয়। এই দুগ্ধপোষ্য শিশু তখন মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধরস পান করে এবং সেই পানীয় বস্তু হইতে তাহার দেহ পোষণোপযোগী উপাদান সংগৃহীত হয়; অপিচ, পার্থিব পঞ্চভূত ও তাহার দেহনির্ম্মাণযোগ্য উপাদান দান করে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দেহ চর্ব্ব্য, চূষ্যাদি চতুর্ব্বিধ আহার্য্য ও পানীয় বস্তু ক্রমে তাহার পাচকাগ্নির সাহায্যে পরিপাক হইয়া রসাদি সপ্তধাতুতে পরিণত হয় এবং তাহার ফলেই দেহের যাবৎ ক্ষয়ের পূরণ হইয়া দেহের বর্দ্ধন হইতে থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ক্ষিতি, অপ তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূত হইতেই স্থূলদেহ নির্ম্মিত হয়। সুতরাং, মনুষ্যের চর্ব্ব্য, চোষ্যাদি আহার্য্য ও পানীয় বস্তু যে উল্লিখিত পঞ্চভূত পদার্থ হইতে পৃথক্ নহে, এক্ষণে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। শ্রুতিও বলেন,—অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ রেতো দেবাঃ, দেবানাং রেতো বর্ষং, বর্ষস্য রেতঃ ওষধয়ঃ, ওষধীনাং রেতোঽন্নং, অন্নস্য রেতো রেতো, রেত সো রেতঃ প্রজাঃ, প্রজানাং রেতো হৃদয়ং, হৃদয়স্য রেতো মনঃ, মনসঃ রেতো বাক্ ইত্যাদি। ইহার স্থূল অর্থ এই যে, বর্ষণ বারির সারভূত পদার্থ হইতেছে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জ হইতে অন্ন অর্থাৎ খাদ্যবস্তু, খাদ্যের সার শুক্র এবং শুক্ররূপ বীজ হইতেই প্রাণীর শরীর। শরীরের সারভূত সৃষ্টি মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের সারভূত সৃষ্টি—অন্তঃকরণ এবং সেই অন্তঃকরণ হইতেই কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রত্যেক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে, যাবৎ প্রাণিদেহই পাঞ্চভৌতিক। জল, মাটি, তাপ, বায়ু ও আকাশ নামক ভূতের সাহায্য পাইয়া উদ্ভিদের বীজ বা সংস্কার বিকশিত হয় এবং এই বিকাশ অবস্থাই উদ্ভিজ্জের দেহ। পরে এই উদ্ভিজ্জ হইতেই কি কীটপতঙ্গ কি পশুপক্ষী, কি মনুষ্য সকলের দেহই নির্ম্মিত হয়। কোন প্রাণীই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পঞ্চভূত গ্রহণ করে না, কিন্তু সকলেই তাহা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, কেবল উদ্ভিজ্জেরাই ভূতপদার্থ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজ দেহের যোগ্য উপাদান গ্রহণ করে। মৎস্য, ছাগ, প্রভৃতি জন্তু সেই উদ্ভিজ্জ ভোজন করে এবং মনুষ্য এই সকল জন্তুর মাংস ভোজন ও দুগ্ধপান করিয়া নিজ নিজ দেহ পুষ্ট করে। অতএব, দেখা যায় কার্য্যতঃ পঞ্চভূত হইতেই যাবৎ জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

অতঃপর আমরা মনুষ্যের প্রধান প্রধান আহার্য্য ও পানীয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কারণ এই গুলি হইতেই মানবদেহের প্রয়োজনীয় যাবৎ উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল পদার্থ চারি জাতিতে বিভক্ত যথা, ১ শালিজাতীয়, ২ আমিষ জাতীয়, ৩ স্নেহজাতীয় এবং ৪ রসজাতীয়। আমরা নিম্নে এই চারিজাতীয় আহার্য্য ও পানীয় বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিলাম।

১ম শালিজাতীয় খাদ্য বলিলে চাউল, গম, যব প্রভৃতি শস্যই বুঝায়। এই সকল শস্য হইতে দেহের প্রয়োজনীয় শালিজাতীয় উপাদান খাঁটি হইল বলিয়াই বুঝিতে হইবে। [illegible] এই সকল খাদ্যের সহযোগে দেহমধ্যে ক্লেশ, ব্যাধিজনক উপাদান প্রবিষ্ট হইল না। [illegible]

বুঝিতে হইবে। কিন্তু এখন কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এক চাউল ব্যতীত চিনি, আটা, ময়দা ছাতু, দাইল প্রভৃতি এবং পালিজাতীয় খাদ্যসহ মানব প্রভৃত ব্যাধিজনক পদার্থ উদরসাৎ করিতে বাধ্য হইতেছে। কারণ আজকাল দ্রব্যের মহার্ঘতা প্রযুক্ত ব্যবসাদারগণ আটা, ময়দা, ছাতু প্রভৃতির সহিত যে, কত ছাই ভস্ম মিশ্রিত করিতেছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। এক চিনি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই বেশ জানা যায় যে, ইহা গো, শূকর, মুর্গী প্রভৃতি জন্তুর দেহজাত রক্তদ্বারা শোধন করা হইয়া থাকে। গবাদি জন্তুর রক্ত হিন্দু মাত্রেরই অস্পৃশ্য হইলেও এখন এই প্রকার চিনি সহস্র মধ্যে ৯৯৯ জন হিন্দু কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হিন্দুমাত্রেরই পাচকাগ্নি এই জাতীয় রক্ত পরিপাক করিতে অনভ্যস্ত। কাজেই ঘটনাচক্রে উল্লিখিত চিনি হিন্দুর উদরস্থ হইয়া তাঁহার পাচকাগ্নির শক্তির পরিচালনের বাধা অর্থাৎ ব্যাধি উপস্থিত করে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বলেন যে, অগ্নিমান্দ্যই যাবৎ ব্যাধির মূল। সুতরাং গো-রক্তাদি অখাদ্য ভোজনে যে, হিন্দুর বিবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

২য়তঃ আমিষ জাতীয় খাদ্য বলিলে সাধারণতঃ মৎস্য ও মাংসই বুঝাইয়া থাকে। একদিন এদেশের পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতি জলাশয়ের জল বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া তজ্জাত মৎস্য বিষাক্ত হইত না। কিন্তু এখন সেই জল, বিশেষতঃ মলমূত্রাদি দ্বারা নিত্য বিষধর্ম্মপ্রাপ্ত জলাশয়-জাত মৎস্য বিষাক্ত বলিয়া আজকাল মৎস্যভোজী মাত্রেই বহুল পরিমাণ বিষ উদরস্থ করিয়া থাকে। নদীনালাদি জলাশয় গুলিও এখন মজিয়া যাওয়ায় তৎসমুদয়ের জলও বহুবিধ জঞ্জাল ও গলিত জীবদেহ দ্বারা দূষিত। সুতরাং তজ্জাত মৎস্য ভোজনও নিরাপদ নহে। এই রূপে জানা যায় যে, মাংসভোজন দ্বারাও মনুষ্য এখন যথেষ্ট বিষপদার্থ উদরসাৎ করেন। এখনকার অনেক হিন্দু যেমন হিন্দুশাস্ত্রমতে বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাজ্য অনেক পদার্থ উদরসাৎ করিয়া কৃতার্থ হন, তেমনই এখনকার ছাগ মেষাদি পশুও বিষ্ঠাদি অস্পৃশ্য ও অখাদ্য পদার্থ ভোজন করিতে ভাল বাসে। সুতরাং এখনকার ছাগ মেষাদির মাংস ভোজন দ্বারাও মনুষ্য অনেক পরিমাণে বিষপদার্থ উদরস্থ করিয়া থাকেন।

হিন্দুশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনকার বিজ্ঞানপাঠে জানা যায় যে, আমিষ পদার্থ দ্বারা বহুবিধ রোগের বীজ আমাদের দেহে প্রবেশ করে। তাই এখন শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের ও অনেক জ্ঞানী লোক নিরামিষাশী হইতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদ্দর্শনেও আর্য্যদের দেশের অনেক নিরামিষভোজী বংশের সন্তান ও এখন মৎস্যমাংসাশী হইয়া নিজ নিজ বংশ উজ্জ্বল করিতেছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শুধুই ইহাই নহে, এখন আবার মাংসের প্রকারও অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের শাক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ দুই চারি মাস অন্তর কচিৎ ২।১ দিন মাংস ভোজন করিতে সমর্থ হইতেন। কারণ তাঁহারা পূর্ব্বে বলির মাংস ব্যতীত বৃথা মাংস ভোজন করিতেন না; কিন্তু এখন সেই বলির মাংস ছাড়িয়া, বৃথা মাংসেরও, বিশেষতঃ কসাইয়ের মাংসেরও, আদরের সীমা নাই। শুধু

কি তাই, এখন শাক্তমাত্রেই, এমন কি অনেক বৈষ্ণব বংশীয় লোকও বিবিধ অখাদ্য পশু ও পক্ষীর মাংস ভোজন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন। কলিকাতা প্রভৃতি সহরের কসাইগণ ও পক্বমাংসবিক্রেতারা এ-সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় দান করিয়া থাকে, তাহা অনেকেই বিশেষ অবগত আছেন। সুতরাং আমাদের উক্তির সত্যতা নিরূপণ জন্য অধিক বিস্তার করা বাহুল্যমাত্র। যাহা হউক, আমিষ পদার্থ সহ যে, এখন বিবিধ দারুণ বিষ মানবদেহে স্থান পাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

৩য়তঃ। স্নেহজাতীয় পদার্থ বলিলে তৈল, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি পদার্থকেই লক্ষ্য করা হয়। সর্ষপতৈল, নারিকেলতৈল, ঘৃত প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য স্নেহপদার্থগুলি যে, আজকাল কিরূপ বিষাক্ত ভাবে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। একপ্রকার তৈলবৎ খনিজ বিষাক্তপদার্থ সর্ষপাদি তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পশ্চিমাঞ্চলের বেরি বেরি নামক রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে নিযুক্ত হইয়া উল্লিখিত খনিজতৈলের ভেজাল ধরিতে সমর্থ হন। আর এখনকার সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহার্য্য বাজারের ঘৃতের ভেজালের তো কথাই নাই। কারণ, ইহা যে গো, শূকর, সর্প, শবদেহ প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত চর্ব্বিদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা শুধু জনসাধারণ কেন, সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতিকামী গভর্ণমেণ্টও বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং স্নেহজাতীয় পদার্থ দ্বারা মানবদেহে যে প্রতিনিয়ত কি পরিমাণ বিষপ্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উপরে যে তিন জাতীয় উপাদানের কথা বলা হইল, সে গুলি দেহের কঠিন উপাদান সংগ্রহেই সহায়তা করে; কিন্তু দেহের মূল উপাদান রক্তের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, একটী নরদেহের রক্ত সহস্র অংশে বিভক্ত হইল, তাহার ৭৭৯ অংশই জল এবং অবশিষ্ট ২২১ ভাগ উল্লিখিত তিন জাতীয় পদার্থ হইতে গৃহীত, অতএব জলই যে দেহের প্রধানতম উপাদান, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পদার্থ বিদ্যা (Science) পাঠে জানা যায় যে, দুইভাগ জলযান (Hydrogen ও একভাগ অম্লজান (oxigen) একত্র মিলিত হইয়া খাঁটি জল উৎপন্ন করে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ জল প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। কারণ, জল ভূপৃষ্ঠের সংস্রবে আসিয়া নানা জাতীয় পদার্থের গুণ প্রাপ্ত হয়। আমাদের পোষণ বা প্রাণশক্তির ক্রিয়ার ফলে, আমাদের দেহ হইতে বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম, ক্লেদ, কাস, কর্ণমল, চক্ষুর পিচুটি, মুখের লাল এবং দেহের মল মিশ্রিত তৈল প্রভৃতি যে সকল পদার্থ নির্গত হয়, তৎসমুদয়ই বিষপদার্থ; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, এখন আমাদের পানীয় ও অন্নব্যঞ্জনের জন্য যে জল ব্যবহৃত হয়, তাহা এইরূপ মল পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত। তবে আমরা যে এই বিষাক্ত জল ব্যবহার করিয়াও সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি না, তাহা কেবল আমাদের অভ্যাসেরই মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু যাঁহারা আজীবন বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারা যদি দুর্ঘটনাচক্রে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জল ব্যবহার করিতে

বাধ্য হন, তাহা হইলে তাঁহারা শীঘ্রই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের কাপালিক নামক একজাতীয় লোক মলমূত্র ভোজন করিয়াও যে জীবিত থাকে, তাহা তাহাদের অভ্যাসেরই মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছু নহে। অভ্যাসের গুণে যে বিষও হজম হইতে পারে তাহার অন্য প্রমাণও যথেষ্ট রহিয়াছে। কারণ, দেখা যায় একজন লোক দৈনিক এক কি দেড় ভরী অহিফেন সেবন করিয়াও বেশ সুস্থ থাকে; অথচ যে কখনও এই বিষ সেবন করা অভ্যাস করে নাই সে মাত্র চারি আনা ওজনের আফিং খাইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অভ্যাসের গুণে কোন বিষ হজম হইলেও তাহার বিষ ক্রিয়া একেবারে নষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে পূর্ণমাত্রায় অহিফেন সেবীর দেহের রক্ত এতদূর বিষাক্ত যে বিষধর সর্পও তাহাকে দংশন করিয়া মুমুর্ষু হয়; অথচ তাদৃশ বিষাক্ত রক্তদ্বারা সেই অহিফেন সেবীর কোনই অনিষ্ট হয় না। এরূপ আমরা বিষাক্ত জল পরিপাক করিতে অভ্যস্ত হইলেও আমরা তাহার বিষক্রিয়া হইতে নিস্তার পাই না। তাই দেখা যায় যে, বঙ্গবাসী আমরা অনেক সময়ই দলে দলে বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি।

বাঙ্গালার পল্লীগুলির জলাশয় সমূহ যে আজকাল কি পরিমাণে বিষপদার্থ দ্বারা দূষিত হইয়াছে ও হইতেছে, আমরা এস্থলে তাহারই একটা চিত্র অঙ্কন করিব। ১মতঃ কেবল একটী পানীয় জলের পুষ্করিণীর অবস্থাই চিন্তা করা যাউক। সকলেই অবগত আছেন যে, পল্লীর লোক জলাশয়ে মূত্রত্যাগ করে। অতএব যদি কোন জলাশয়ে প্রতিদিন ৪০ জন লোকও মূত্রত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ত্যক্তমূত্রের পরিমাণ দৈনিক অন্ততঃ দশসের হইবে। অতএব প্রতিমাসে তাহার পরিমাণ ৬০ পশুরি বা নেহাৎপক্ষে সাত মণ। কাজেই এক বৎসরে তাহার পরিমাণ ৮৪ মণ ও ৫০ বৎসরে ৪২০০ মণ। গত প্রায় ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া আর কেহ কোন পুষ্করিণীর খনন বা পঙ্কোদ্ধার করেন না বলিয়াই আমরা এস্থলে সেই ৫০ বৎসরেরই একটা মোটামুটি হিসাব দিতেছি।

আবার অন্য বিষও পল্লীর জলাশয়ে কি পরিমাণে মিশ্রিত হয়, তাহাও একবার চিন্তা করুন। পল্লীর অধিকাংশ লোকই পুষ্করিণীতে জলশৌচ করে, এবং এই শৌচকারীর সংখ্যা দৈনিক ৫০ জন হইবে। এই শৌচক্রিয়ার ফলে প্রতিজনের ত্যক্ত মলের পরিমাণ অন্ততঃ এক কাঁচ্চাও হইবে, এবং তাহার ফলে একটী জলাশয়ে দৈনিক অন্ততঃ তিন পোয়া হিসাবেও বিষ্ঠা মিশ্রিত হইল। প্রতিমাসে তাহার পরিমাণ অর্দ্ধমণ ও বৎসরে ছয় মণ হইল। কাজেই ৫০ বৎসরে তাহার পরিমাণ ৩০০ মণ দাঁড়ায়। এতদ্ব্যতীত লোকে পুষ্করিণীর তীরে মলত্যাগ করে, এবং বর্ষার জলে সেই মল ধৌত হইয়া জলাশয়েই পতিত হয়। কাজেই পল্লীর জলাশয়গুলি যে মলমূত্র দ্বারা কিরূপ দূষিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অন্য পক্ষে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অবগাহনমাত্রে জলেও পানীয় জল বড় কম দূষিত হয় না। প্রতি লোমকূপে। আবদ্ধ মলরাশি, শুষ্ক ঘর্ম্ম, কর্ণমল, চক্ষুর পিঁচুটি, মুখের লালা প্রভৃতি দ্বারা জল অত্যন্ত দূষিত হয়। কারণ—প্রত্যেক জলাশয়ে এরূপ অবগাহনকারীর সংখ্যা বড় কম নহে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় দেহজ বিষাংশ কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া কর্দ্দম রূপে পুষ্করিণীর তলদেশে জমিয়া থাকে। এই জাতীয় বিষরাশির উপরিস্থ বর্ষার নূতন জলও বিষাক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ—এক জালা জলের তলদেশে কিয়ৎ পরিমাণ চিরতার কাঠি বা এক কাঁচ্চা পরিমাণ কুইনাইন দিলে যেমন তাহার সমস্ত জল তিক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই কর্দ্দমরূপী বিষের উপরিস্থ নূতন জলও বিষাক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। অনেকেই অবগত আছেন যে, মনুষ্যের মল মূত্রও এখন প্রায় সাররূপে ব্যবহৃত হয়। তাই দেখা যায়, জলাশয়ের কর্দ্দমও সাররূপে ব্যবহার করা হয়। এই কর্দ্দম মৃত্তিকার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাহার স্বাভাবিক গুণ নষ্ট হয় না।

উপরে যে চারিজাতীয় খাদ্য ও পানীয়ের কথা বলা হইল—তাহাই আমাদের চর্ব্ব্য, চুষ্য লেহ্য ও পেয় নামক চতুর্ব্বিধ অন্নের সাধক ; এবং তাহাই আমাদের দেহের রস, রক্তাদি যাবৎ উপাদানের মূলীভূত কারণ। তাই সুশ্রুত বলেন,—পক্বাশয় মধ্যস্থং পিত্তং চতুর্ব্বিধং অন্নপানং পচতি, বিরেচয়তি চ রস দোষ মূত্র পুরীষানি। অর্থাৎ পক্বাশয় মধ্যস্থ পাচকাগ্নি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় নামক খাদ্য ও পানীয় বস্তুকে পরিপাক করে, এবং তাহা বিশ্লিষ্ট করিয়া রস, বায়ু পিত্ত ও কফনামক দোষত্রয়, মূত্র ও বিষ্ঠা এই চারিভাগে বিভক্ত করে। মূত্র ও পুরীষ শরীর হইতে নির্গত হইলে, অবশিষ্ট রস ও দোষত্রয় শরীর রক্ষার জন্য অবশিষ্ট থাকে। দেহ মধ্যে এই চতুর্ব্বিধ পদাথ ভিন্ন আর কোনও পৃথক বস্তু নাই। তবে আর যাহা আছে তাহা ইহাদেরই রূপান্তর মাত্র। সুশ্রুতও বলেন,—নর্ত্তেদেহ কফাদস্তি ন পিত্তাৎ ন চ মারুতাৎ। শোণিতাদপিবা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে। অর্থাৎ কফ, পিত্ত ও বায়ু এবং শোণিত ভিন্ন দেহে আর কোন পদার্থ নাই ; এবং দেহ এই সকল বস্তু দ্বারাই ধৃত হইয়া আছে। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, শোণিত রসেরই পরবর্ত্তী অবস্থা। এই রস হইতে শুধু শোণিত কেন, মাংসাদি অন্য ধাতুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই আয়ুর্ব্বেদকার বলেন,—

রসাদ্রক্তং ততোমাসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জতঃ শুক্র সম্ভবঃ॥

অর্থাৎ—রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। অতএব বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং রসাদি সাতটী ধাতুই হইল শরীরের যাবৎ উপাদান ; এবং ইহারা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনুষ্য দেহও যে পঞ্চভূতাত্মক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

আবার দেখা যায় যে, দেহের সৃষ্টি, পালন ও রক্ষা ব্যাপারেও উল্লিখিত বায়ু, পিত্ত ও কফের একাধিপত্য বিদ্যমান। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, ইহাদেরই ক্রিয়ায়

ফলে প্রথমতঃ খাদ্য ও পানীয় পদার্থ হইতে এক প্রকার রস জন্মে, এবং পরে সেই রস হইতেই রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক দেহের ধাতুগুলি উৎপন্ন হয়। ইক্ষুরস পাক করিলে যেমন তাহা হইতে ক্রমে গুড়, চিনি ও মিছরি প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ ভুক্ত ও পীত বস্তুর রস হইতে ক্রমে রক্তাদি ৬টী ধাতু প্রস্তুত হয়। আবার কোন বস্তুর পাকক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইলে, যেমন পাচক, জল ও অগ্নির আবশ্যক হয়; তদ্রূপ ভুক্ত ও পীতবস্তুর পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য বায়ু পাচকের, কফ জলের এবং পিত্ত অগ্নির কার্য্য সমাধা করে। শুধু প্রাণিদেহে কেন সমগ্র জগতের দেহেই চিরদিন এইরূপ পাকক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই আয়ুর্ব্বেদকার বলেন,—

বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥

অর্থাৎ চন্দ্র যেমন রসদান দ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করিতেছে, সূর্য্য যেমন সেই রস আকর্ষণ করিয়া তাহার শুষ্কতা সম্পাদন করিতেছে, এবং বায়ুর সাহায্যে যেমন এই আদানপ্রদান কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত এবং কফ ও জীবদেহ মধ্যে ক্রিয়া করিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

মরুৎ, অগ্নি, জল, ক্ষিতি ও আকাশ নামক পঞ্চভূত উল্লিখিতরূপে দেহস্থ হইলে, ক্ষিতি ও আকাশ জীবদেহের কোন অবস্থান্তর ঘটাইতে পারে না; কিন্তু অবশিষ্ট মরুৎ, অগ্নি ও জল বিবিধ কারণবশতঃ দেহের বিকার উপস্থিত করিতে সমর্থ হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই মরুৎ, অগ্নি ও জলকেই যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফ নামে অভিহিত করা হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতাবশতঃ মিথ্যা আহার ও বিহারে রত হইলেই এই দোষত্রয়ের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে দেহী তাহার দেহরূপ যন্ত্রে স্বাধীনভাবে নিজশক্তি সম্যক পরিচালন করিতে সমর্থ হয় না। দেহীর এইরূপ বাধা প্রাপ্তির নামই ব্যাধি।

আর এক কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত খাদ্য ও পানীয় বস্তু খাঁটি হইলেও তাহারা যে একবারে বিষপদার্থশূন্য হয়, তাহা নহে। কারণ এরূপ বস্তুও বিষাংশ ও অমৃতাংশ দ্বারা গঠিত। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রত্যেক খাদ্য ও পানীয় বস্তুর পরিপাকান্তে তাহার অমৃতাংশ রস রক্তাদিরূপে শরীরে গৃহীত, এবং বিষাংশ মল মূত্রাদি রূপে দেহ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গলার যাবতীয় খাদ্য ও পানীয় বস্তু উল্লিখিত রূপ খাঁটি হওয়া দূরে থাকুক, তৎসমুদয় ভেজাল বিষে জর্জ্জরিত। কাজেই তাহা হইতে অমৃতাংশ খুব কমই পাওয়া যায়, এবং যে সামান্য অমৃতাংশ বিপুল বিষমিশ্রিত খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা বাছিয়া লওয়া জীবাত্মার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য। কাজেই এখন উদর পূরণ পূর্ব্বক পান ভোজন করিয়াও দেহের ক্ষয়পূরণোপযোগী অমৃতাংশ মিলে না। ফলে দেখা যায় জীবাত্মা দেহস্থ বিষরাশির ভৌতিক শক্তিকে পরাজয় করিয়া নিজশক্তি পরিচালন করিতে বাধা প্রাপ্ত হন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। অবশ্য জীবাত্মার দুর্ব্বলতার

আরও অনেক কারণ আছে এবং যথাস্থানে আমরা তৎসম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—"দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে" অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, ও কফ নামক দোষত্রয়ের সাম্যভাব আরোগ্যের এবং বৈষম্যভাব রোগের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল আমাদের সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিষপদার্থমিশ্রিত বলিয়া সর্ব্বদাই ঐ ত্রিদোষের বৈষম্য উপস্থিত করিতেছে, এবং তাহার ফলে এখন এ দেশের লোক প্রায়ই নানাপ্রকার ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত দৃষ্ট হইতেছে।

আলোচ্য বায়ু পিত্তাদির সাম্য ও বৈষম্য অবস্থার প্রকৃত রহস্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও বেশ প্রমাণিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন বায়ুর গুণ হইতেছে রুক্ষ, শীত, লঘু, সূক্ষ্ম, বিশদ, খর প্রভৃতি। তাই এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন করিলেই বায়ুর আধিক্য ঘটে। যেমন রুক্ষগুণ বিশিষ্ট ছোলার দাইল খাইলেই বায়ুর বৃদ্ধি হয়। অন্য পক্ষে—নূতন চাউলের অন্ন গুরু বলিয়া তৎভোজনে বায়ুর অল্পতা ঘটে। এইরূপ পিত্ত এবং কফেরও ৭টী করিয়া গুণ আছে এবং সেই গুণের অনুকূল বা প্রতিকূল গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহারে তাহাদের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্য অর্থাৎ সঞ্চয় হইলে সহজেই তাহা ধরা যায়। কারণ বায়ুর সঞ্চয় হইলে রুক্ষ দ্রব্যে বিদ্বেষ, স্নিগ্ধ দ্রব্যে স্পৃহা, শীতল স্পর্শে অনিচ্ছা, উষ্ণ স্পর্শে ইচ্ছা, এইরূপ বায়ু বর্দ্ধক গুণে বিদ্বেষ এবং বায়ুনাশকগুণে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। এইরূপ পিত্তের সঞ্চয় হইলে, গরম বস্তুর প্রতি অনিচ্ছা এবং শীতল বস্তুর প্রতি ইচ্ছা দৃষ্ট হয় এবং কফের সঞ্চয়ে স্নিগ্ধ ও শীতল বস্তুর প্রতি বিরাগ এবং রুক্ষ ও গরম বস্তুর প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বিষপদার্থ নানা প্রকার, সুতরাং বাক্যের দ্বারা তাহার কোন সীমান্ত নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে সাধারণতঃ বিষপদার্থ বলিলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, যাহা যাহার পাচকাগ্নি পরিপাক করিতে অনভ্যস্ত, তাহাই তাহার পক্ষে বিষবৎ ক্রিয়া করে। এবং এই বিষক্রিয়ার ফলে বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের কোন একটীর বা দুইটীর বা তিনটীরই বৈষম্য উপস্থিত হয়। এই বৈষম্য বিচার করিয়াই রোগের নিদান স্থির করা হয়। শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পাচকাগ্নি, বিশেষ বিশেষ সংস্কার সহ সেই জীবদেহে আশ্রয় লাভ করে। এবং এই সংস্কার বা শক্তি যে জাতীয়, পাচকাগ্নি মাত্র সেই জাতীয় খাদ্য ও পানীয়ই পরিপাক করিতে পারে, কিন্তু সেই সংস্কার বিরুদ্ধ কোন বস্তুই সেই জীব হজম করিতে পারে না। অতএব জাতিবিশেষের পক্ষে পরম সুখাদ্য ও পুষ্টিকর হইলেও তাহা সেই জীবের পক্ষে বিষতুল্য। তাই গো শূকরাদির মাংস হিন্দুর পক্ষে আনুষঙ্গিক বিষ বিশেষ। এমন কি পাচকাগ্নির জন্মলব্ধ সংস্কারের কোন অংশ নষ্ট হইলেও সেই নষ্টসংস্কারের অনুকূল খাদ্যও আর হজম না হইয়া বিষতুল্য হয়। তাই

দেখা যায় যে, [illegible]রোগগ্রস্ত যে কোন জাতীয় রোগীর নিকট আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ঘৃতও বিষবৎ ক্রিয়া করে।

অতএব মদ্যমুত্রাদি ও ভেজাল মিশ্রিত সাক্ষাৎ বিষস্বরূপ খাদ্য ও পানীয় যে, মনুষ্যের ব্যাধিজনক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কারণ খাদ্য ও পানীয় বস্তুর বিষাংশের ভৌতিক শক্তি বায়ু পিত্তাদির স্বাভাবিক শক্তির গতিরোধ করে এবং তাহার ফলে তাহাদের বৈষম্য ঘটিয়া বিষম ব্যাধি সৃষ্ট হয়। বায়ু পিত্ত ও কফ দেহরূপ যন্ত্রের মিল Harmony রক্ষা করে, সুতরাং তহাদের ক্রিয়ার গতি রুদ্ধ হইলে যে, দেহযন্ত্রের মিল নষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহাই হইল দেহযন্ত্রের নির্ম্মাণ এবং বিকৃতি রহস্য। অতঃপর আমরা দেহীর শক্তিময় দেহের বিকৃতি ও দৌর্ব্বল্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রী—পাইকর
বীরভূম

মধ্যদেশী রাঢ়ীয় বা মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সম্বন্ধনির্ণয়কার কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থের বিষয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং নানা কিংবদন্তি অবলম্বন করিয়া "মধ্যশ্রেণী" নামের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহার উক্তি-গুলির মধ্যে পূর্ব্বাপর বিরোধ আসিয়া খড়িয়াছে, তাঁহার দুইটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি

(১) "যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গলার মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করেন, তৎকালে ঐ প্রদেশে অর্থাৎ মেদিনীপুর প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে অসমর্থ হওয়ায় এবং বিদেশীয়েরাও ঐ প্রদেশে আসিতে না পারায়, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়গণের এক প্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণীবন্ধন শৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয় এবং সর্ব্বত্র বৈদিকানুষ্ঠান প্রচলিত থাকে এবং সকলেই বৈদিকব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। এই সময়ে যাঁহারা শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত তেজস্বী, বিদ্বান্ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরম মান্য পাইয়াছিলেন। কালক্রমে এদেশে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের প্রবল প্রতাপতপন অস্তমিত হইল, সর্ব্বদ্বারী বিবাহরূপ তদীয় কীর্ত্তি-কোকনদ মাত্র রহিয়াছে [illegible]।" মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে লোকে অনেক [illegible] [illegible] [illegible]।"

(২) বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সিংহভূম, বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, বরাহভূম, শিখরভূম প্রভৃতির আধুনিক বৈদিকগণ বিশুদ্ধ বৈদিক বংশসম্ভূত নহেন। ইঁহারা সাতশতী ও রাঢ়ীয় বিমিশ্র মধ্যশ্রেণী ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর গণ্যমান্য বৈদিককুলেও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের সংস্রব দেখা যায়। এমন কি অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ মুকুটরায় তিন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করেন, মুকুট রায়ের রাঢ়ীয় পত্নীসম্ভূত সন্তানগণই এক্ষণে পাশ্চাত্য বৈদিককুলে বিরাজিত।

সম্বন্ধনির্ণয় ৩য় সংস্করণ ২৮৩ পৃষ্ঠা।

প্রথম উদ্ধৃতাংশে দেখা যাইতেছে রাঢ়ীয় ও মহারাষ্ট্রীয় শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদানে মধ্য-শ্রেণীর উৎপত্তি। তাহা হইলে ১৭৪১ ও ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এক্ষণে মধ্যশ্রেণীর বয়স ১৭৬ বা ১৭৭ বৎসর হয়; কিন্তু ইহা অসম্ভব, কারণ, উক্ত সংখ্যক বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা এখনকার লোকের নিকট যে বেশী পুরাতন তাহা প্রতীয়মান হয় না। সিরাজুদ্দৌলা ও লর্ডক্লাইভের সময়ের ঘটনা ও শোভাসিংহের সময়ের ঘটনা এখনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। যদি বর্গীর হাঙ্গামার সময় মধ্যশ্রেণী সমাজ সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে ইহার সময়, নায়ক ও কারণ সমস্তই বঙ্গের ইতিহাসে স্থান পাইত, অথবা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও উক্ত সমাজে কোন্ বংশ মহারাষ্ট্রীয় বংশসম্ভূত তাহা নির্ণীত থাকিত। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ যে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে সৃষ্ট হয় নাই, তাহা ধ্রুবসত্য।

সম্বন্ধনির্ণয়কারের ঐ উক্তি অবলম্বন করিয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রজাপতি নামক মাসিক পত্রিকায় নদীয়া জয়দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "রাঢ়ীয় পঞ্চব্রাহ্মণ-পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"কিন্তু আমাদের মতে যদি মহারাষ্ট্রীয়, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, উত্তর বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেণীয়, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণ একসূত্রে এক সমাজে বিবাহাদি কার্য্যদ্বারা আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে আজ ব্রাহ্মণের নিন্দা অর্থাৎ অমুক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভাল, অমুক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মন্দ, অমুক শ্রেণীর অন্ন গ্রহণ করিব না, অমুক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাকশালায় গেলে অন্নব্যঞ্জনাদি ফেলিয়া দিতে হয়, এসব কথা শুনিতে হইত না। যে ব্রাহ্মণ সত্বগুণাবলম্বী, শান্ত, দান্ত, তপস্বী, সন্তুষ্টচিত্ত, অন্তর্বাহ্য শৌচ-সম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সরলান্তঃকরণ, ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তিমান্ এবং পরমার্থতত্বজ্ঞানসম্পন্ন তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ষট্‌কর্ম্মশালী, অধীত বিদ্যার অধ্যাপনা, অনধিত বিদ্যার অধ্যয়ন, যজ্ঞ সম্পাদন জন্য নিজে যজমান হওয়া, অন্যের যজ্ঞসিদ্ধি বিষয়ে যাজকতা কার্য্য স্বীকার, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই কয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ও বৃত্তি; এবং আপৎকালে ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপদুদ্ধার হইলে পুনঃ তাঁহাকে স্বকীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে, নচেৎ পতিত হইবেন। ক্ষত্রিয়বৃত্তির অভাবে বৈশ্যবৃত্তিও করিবার বিধি আছে; কিন্তু তাহারও সীমা নির্দ্ধারণ আছে। কোন কালেই ব্রাহ্মণের

প্রবৃত্তি অবলম্বনীয় নহে। উল্লিখিত গুণ সকল যাঁহার আছে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য।"

দ্বিতীয় উদ্ধৃতাংশে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাঢ়ীয় ও সাতশতীর মিশ্রণে মধ্যশ্রেণী। সুতরাং গ্রন্থকার যে ইহার প্রকৃত তথ্য জানিতেন না, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আরও তাঁহার লক্ষণ স্বীকার করিলে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সকলেই মধ্যশ্রেণীয়, কারণ সকলেরই সপ্তশতী সংস্রব ঘটিয়াছে। সম্বন্ধ নির্ণয়কারের নিজের বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি সপ্তশতীগণের গাঁই উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;—

"কেহ কেহ বলেন কোমটী ও কল্যাণী এবং করলা নামে আরও দুইটী গাঁই ছিল, এই দুইটী গাঁই ধরিলে সপ্তশতীগণের ৪২টী গাঁই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের সংখ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গাঁই সংখ্যার বিশেষ ঐক্য হয়। এখন দেখ, কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা স্বভাবে আছেন। বচনানুসারে দেখাযায়, উত্তর-কালে ঐ চত্বারিংশৎ কুলের মধ্যে যত সন্তান জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সদ্‌গুণসম্পন্ন বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের সমাজের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ইহারা আপনাদিগের মধ্যে উঠাইয়া লয়েন। প্রথমাবস্থায় ৭ জনমাত্র পরিগৃহীত হন। তন্মধ্যে পাঁচজন বারেন্দ্রবংশের ও দুইজন রাঢ়ীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। অবশেষে দুই চারিটী কুল ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিককুলে মিশিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত সাতশতীর বিবরণের শ্লোকের সংখ্যা দেখ মিল হইবে। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-গণ নিজ নিজ গুণানুসারে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই নিয়মানুসারে সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক বিনয়াদি সদ্‌গুণপ্রভাবে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও বৈদিক-কুলে ক্রমশঃ মিলিত হইয়াছেন"।

সম্বন্ধ নির্ণয়, ৩য়, সংস্করণ ২৮৭ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, সম্বন্ধ নির্ণয়কার "মধ্যশ্রেণী" নামের কারণ জানিতেন না, সুতরাং নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইয়াছেন। মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের কোনও কুলগ্রন্থ আছে কিনা, তাহা তাহায় অনুসন্ধান করা উচিত ছিল; কিন্তু, তাহা তিনি করেন নাই, সুতরাং ভ্রমে পড়িয়াছেন। তত্ত্বার্ণবপাঠে জানা যায় মধ্যদেশনিবাসী বলিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ৪০ জন ব্রাহ্মণ মধ্যশ্রেণী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন রাঢ়ে ও বারেন্দ্রে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের কিছুদিন অবস্থিতি করিবার পর, অথচ বল্লালসেনের রাজত্বকালের পূর্ব্বে মধ্যদেশ বা কান্যকুব্জপ্রদেশ হইতে কতক গুলি ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করেন, ইহাঁরাই মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ। ইহারা তাম্রশাসনে "মধ্যদেশ বিনির্গত" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আদিশূরের কালনিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ "মানসীতে" এই ব্রাহ্মণগণের বিবরণ লিখিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহাঁদিগকে "মধ্য-শ্রেণীয়" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার উক্ত এই ;—

"নবাবিষ্কৃত (কিন্তু এযাবৎ অপ্রকাশিত) বিজয়সেনের তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে * * * * * * * কান্যকুব্জ রাজ্য বা মধ্যদেশ হইতে তখন যে পঞ্চ গোত্রের মধ্যে অন্ততঃ দুইটী গোত্রের—বাৎস্য ও সাবর্ণ গোত্রের ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ —সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া যায়। বিজয়সেনের তাম্রশাসনের প্রতিগ্রহকর্ত্তা বাৎস্যগোত্রীয় এবং তাঁহার প্রপিতামহ "মধ্যদেশ বিনির্গত" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভোজবর্ম্মণের বেলাব-লিপির প্রতিগ্রহকর্ত্তা সাবর্ণ গোত্রীয় ছিলেন এবং তাঁহার প্রপিতামহও "মধ্যদেশ বিনির্গত" বলিয়া কথিত হইয়াছেন।"

এই মধ্যদেশ বিনির্গত ব্রাহ্মণেরা যে মধ্যশ্রেণীয় হইতে পারেন না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কুলরমা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

শ্রীহর্ষান্বয়সম্ভূতো বেদগর্ভ ইতি স্মৃতঃ।
চত্বারস্তস্য সঞ্জাতাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥
জনকো দিবাসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বর স্তথা।
দিবাসিংহো মধ্যদেশী রাঢ়ীয়া জনকাদয়ঃ॥

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীহর্ষের বংশে বেদগর্ভ (ইনি আদিপুরুষ বেদগর্ভ নহেন) জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বেদগর্ভ যে রাঢ়ীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দিবাসিংহ মধ্যদেশী এবং জনক প্রভৃতি আর তিন পুত্র রাঢ়ীয়। এস্থলে দিবাসিংহকে মধ্যদেশী বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই, কারণ তিনি তৎপূর্ব্বে রাঢ়ীয় আখ্যায় সুপরিচিত হইয়াছেন। আরও তাঁহার অন্য তিন ভ্রাতা রাঢ়ীয় হইলেন এবং তিনি মধ্যদেশী হইলেন, ইহার অর্থ কি? কুলরমার আর কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে। তাহা এই,—

বেদগর্ভস্ততো জাত স্তস্মাদ্ বিষ্ণুরুদারধীঃ।
তস্মাচ্চরণি শর্ম্মা চ ততোঽভূৎ কোলনামকঃ॥
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধুরন্ধরো দাক্ষিণাত্যো রাঢ়ীয়ো ধীরসংজ্ঞকঃ॥
কাশ্যপস্তু মহাদেবঃ সাবর্ণঃ প্রথিতো ভৃগুঃ।
তে দ্বে মিত্রে মধ্যদেশে জগ্মতুঃ স্বেচ্ছয়া স্বয়ম্॥

এই উদ্ধৃতাংশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেদগর্ভের (ইনি আদিপুরুষ) বংশে কোল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র হয়, ধীর ও ধুরন্ধর। তন্মধ্যে ধুরন্ধর দাক্ষিণাত্য ও ধীর রাঢ়ীয়। আরও কাশ্যপ গোত্রজ মহাদেব ও সাবর্ণ গোত্রজ ভৃগু মধ্যদেশে গিয়াছিলেন। এখানে রাঢ়, মধ্যদেশ ও দাক্ষিণাত্য এই তিনটী প্রদেশের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহার সহিত তন্ত্রার্ণবের "রাঢ়োড্রয়োর্মধ্যদেশে চক্রুস্তে বসতিং দ্বিজাঃ" এই বাক্য মিলাইলে মধ্যদেশ শব্দের অর্থ বুঝিতে আর বাকি থাকে না। সুতরাং, যাঁহাদিগকে মধ্যদেশ বিনির্গত

বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী হইতে পারেন না। ইঁহারা যদি প্রাগুক্ত মধ্যদেশ বিনির্গত হইতেন, তাহা হইলে ইঁহাদিগের রাঢ়ীয় গাঁই হইত না; কিন্তু মধ্যদেশীয় রাঢ়ীয়গণের মুখোটী, বন্দ্যঘটী, চট্ট, গাঙ্গুলী, কাঞ্জিলাল ও পুতিতুণ্ড এই ছয় গাঁই কুলীনবংশ ও ঘোষাল প্রভৃতি অপর ১৬ গাঁই সিদ্ধশ্রোত্রিয় বংশ, এই বাইশ গাঁই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রেণীর প্রায় সকলেই এই বাইশ গাঁইয়ের অন্তর্ভূত। অবশিষ্ট কতিপয় সপ্তশতী আছেন। পূর্ব্বে রাঢ়ীয় সমাজে যেমন কুলীনে ও শ্রোত্রিয়ে পরিবর্ত্ত হইত, ইহাদের মধ্যে অদ্যাপি তাহাই চলিতেছে। গুণবান্ বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যে সমলঙ্কৃত শ্রোত্রিয়কে কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করিয়া কুলীন বংশীয়গণ আদান প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তত্ত্বার্ণবকার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত মধ্যদেশী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সমাজের ও পরিচয়ের সম্পূর্ণ মিল আছে, অতএব উহাই গ্রাহ্য।

হোসেন সা ও দেবীবর।

অনন্তর রাজা কংসনারায়ণ পরলোকগমন করিলে তদীয়পুত্র যত্ন রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং যবনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন পুনর্ব্বার যবনগণের উপদ্রব বাড়িয়া উঠিল। তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ও কুলগ্রন্থ সমূহ আনিয়া ভস্মসাৎ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণগণ তখন অতিষ্ঠ হইয়া গৌড় পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং এই দুর্দ্দিনে বহুতর ব্রাহ্মণ জাতি, ধর্ম্ম ও কুলভ্রষ্ট হইলেন। অনন্তর ১৪০০ শাকে অর্থাৎ (১৪৭৮ খৃঃ) হোসেন সা নামক জনৈক যবনবংশীয় ভূপতি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মপ্রিয় ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনানুসারে বন্দ্যজ দেবীবরকে কুলাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেবীবর কুলাচার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু কুলগ্রন্থসমূহ ও বংশাবলী কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন না। অথচ এদিকে বংশগত কৌলীন্যের ফলে কুলীনগণের বহুদোষস্পর্শ ঘটিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে কামরূপে গমন করিয়া তিনপক্ষ কাল একাগ্রচিত্ত হইয়া কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করিলেন।

তত্ত্বার্ণবে যথা ;—

ততঃ প্রসন্না সা দেবী বিপ্রাণাং কুলবন্ধনে।
দেবীবরে বরং প্রাদাৎ ত্রিকালজ্ঞো ভবেতি চ॥
কুলাচার্য্যগণৈঃ সাকং সংমন্ত্র্য বিবিধং পুনঃ।
দোষাণাং তারতম্যঞ্চ কুলীনানাং দ্বিজন্মনাম্॥
দেবীবরপ্রসাদেন বিশেষেণাবলোক্য চ।
দ্বিখবেদেন্দুমে শাকে মেলবন্ধং চকার সঃ॥
একত্র কুলদোষাণাং বহূনাঞ্চৈব মেলনাৎ।
বন্দ্যদেবীবরেণৈব মেল ইত্যুচ্যতে তদা॥

অর্থাৎ পরে কামাখ্যাদেবী প্রসন্না হইয়া দেবীবরকে বর দিয়া বলিলেন, তুমি ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধন বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ হও। পরে কুলাচার্য্যগণের সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া দেবীর বরপ্রভাবে কুলীন ব্রাহ্মণগণের দোষের তারতম্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃঃ) মেলবন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন। যদ্যপি দেবীবর বহুকুলদোষের একত্র মেলন করিলেন বলিয়া মেলবন্ধনের "মেল" সংজ্ঞা হইল।

দেবীবর ও গঙ্গাধর।

দেবীবর ঘটক যখন (১৪৮২ অথবা ১৪৮৩ খৃঃ) মেলবন্ধনের জন্য মধ্যদেশে আগমন করেন, মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণের তাৎকালিক নেতা গঙ্গাধর ভট্ট মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুক্তিযুক্ত বিচারের দ্বারা স্বশ্রেণীয়গণের শুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমরা বিশুদ্ধই আছি, আমাদের আর মেলবন্ধনের আবশ্যকতা নাই, ইহাতে আমাদের ন্যূনতা প্রকাশ পাইবে। আপনি ত্রিকালজ্ঞ হইয়া কি জন্য ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন?" এই বলিয়া তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কুলতত্ত্বার্ণবকার লিখিয়াছেন,—

মেলবন্ধবিধানেচ্ছুঃ প্রত্যাখ্যাতো মহামনাঃ।
দেবীবরস্তদা তেষাং মুখৈর্মধ্যনিবাসিনাম্॥
শুদ্ধানাং নো মেলবন্ধো বিফলো ন্যূনতাপ্রদঃ।
ত্রিকালজ্ঞেন ভবতা কিমর্থমনুভূয়তে?

এইরূপে গঙ্গাধর বিনীতভাবে আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলে, দেবীবর তাঁহার মত অবলম্বিত হইল না দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া গঙ্গাধরের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। গঙ্গাধরও বিনা অপরাধে অভিশাপগ্রস্ত হওয়ায় তিনিও দেবীবরকে প্রত্যভিশাপ প্রদান করেন। উক্ত বিস্তৃত ঘটনাটী এইরূপ যথা,—

মহাত্মা দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রায় সমগ্র বঙ্গভূমির রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেলবন্ধন করতঃ বাঙ্গলার প্রান্তসীমা মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় "ভেমুয়া" গ্রামনিবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মেলবন্ধন কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ উক্ত গ্রামে এক মহতী সভা আহূত করেন, ঐ সভায় ভেমুয়ার নিকটবর্ত্তী পিগুরুই গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত নৃসিংহবংশজাত গঙ্গাধর ভট্ট মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সমবেত সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে মেলবন্ধনে ভবিষ্যতে বিবিধ অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া, দেবীবরের মেলবন্ধন কার্য্যের অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, "মেলবন্ধন প্রচলিত হইলে ভবিষ্যতে বিবাহবিষয়ে নানা বিভ্রাট ঘটিতে পারে"। এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ও দেবীবর স্বমতস্থাপনোদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য স্থানের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা পূজা এবং অর্থ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত না হওয়ায় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত

হইয়া মহাত্মা গঙ্গাধরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন গঙ্গাধর বলিলেন, “শুন দেবীবর, তুমি বংশজ, তোমাদের অন্নগ্রহণে আমাদের কুলমর্য্যাদা নষ্ট হয় এবং পাপ স্পর্শে; বিশেষতঃ তুমি আমাদের অপেক্ষা বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যেও শ্রেষ্ঠ নহ; অতএব তোমার কথায় আমরা চলিতে পারি না। তুমি যাহা বলিবে ও করিবে আমরা তাহাতে বাধ্য নহি, কারণ, তুমি আমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহ, আমরা অন্যান্য কুলীন পুত্রদিগের মত তোমার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় খেলা করিব না; বরং আমরা যাহা বলিব তাহা সমাজের গ্রাহ্য হইবে।” ইহাতে দেবীবর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাধর ও অন্যান্য কুলীন সন্তানগণকে “নিষ্কুল হও” বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, যথা—

ক্রোধে বলে দেবীবর কুল গেলরে গঙ্গাধর।

তখন গঙ্গাধর বিনাপরাধে অভিশাপগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার মুখ হইতেও সহসা এই বজ্রবাণী নির্গত হইল, যথা—

রোষে বলে গঙ্গাধর নির্ব্বংশ দেবীবর।

আরও ওরে ওরে দেবীবর তোর কুল পরিপাটী।
শাঁশ নাই বস্ত নাই ছোবড়া আর আঁঠী॥

বস্তুতঃই দেবীবরের মেলবন্ধনের অসারতা দেখিয়া মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি যে সমস্ত দোষের মিল দেখিয়া মেলবন্ধন করিতে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, বহুপূর্ব্ব হইতে রাঢ়ীয়গণের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মধ্যদেশী রাঢ়ীয়গণ মধ্যদেশে আসিয়া বাস করায় উক্ত দোষসমূহ ইহাদিগের সমাজে প্রবেশ করে নাই। অনন্তর দেবীবর ঘটক ভগ্নমনোরথ হইয়া মধ্যদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তদবধি উক্ত প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ অমেলী হইয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতেছেন। এই কার্য্যে গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে মেল বন্ধনের বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় সমাজ যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই বিদিত আছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার দশম বার্ষিক কার্য্য বিবরণী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে।

“রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মেলবন্ধনের অপকারিতা সম্বন্ধে সামাজিকগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনাদিতে যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যদ্যপি সামাজিক মতামত সংগ্রহ করিয়া রাঢ়ীয় সমাজের পক্ষ হইতে পুস্তকাদিতে প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং বারেন্দ্র সমাজের কুলীনগণের কলিকাতা, পাবনা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে করণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই করণে বিভিন্ন সমাজের শতাধিক কুলীনব্রাহ্মণ যোগদান করিয়া স্বসমাজে শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ বিবাহের যে একটা প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতঃপর বারেন্দ্রশ্রেণীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের

মধ্যে কোন প্রকার পঠীবন্ধনের (মেলবন্ধনের বিভীষিকা থাকিবে না।" ব্রাহ্মণ সমাজ, ভাদ্র সন ১৩৪৩ সাল, ৬১৭ পৃষ্ঠা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বংশগত কৌলীন্য ও মেলবন্ধনের ফলে রাঢ়ীয় সমাজে নানা বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা রাঢ়ীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দ নানাদিক দিয়া দেখিতে পাইতেছেন। সুখের বিষয় এক্ষণে তাঁহারা যাহাতে সমাজে শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ বিবাহের প্রবর্ত্তন হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

নিবেদন।*

আমরা যাঁহাদের অনুশাসনে অনুশাসিত, আদর্শে অনুপ্রাণিত, আশীর্ব্বাদে সঞ্জীবিত হইয়া আজিও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতেছি -সেই জ্ঞানোজ্জ্বলবুদ্ধি মহা ঋষিগণের বংশধর আমরা ভবিষ্যতেও কখন সে স্বাতন্ত্র্য হারাইব না। আমরা কি ছিলাম কি হইয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি বলিয়াই আজ আমাদের প্রাণে আকুলতা, চিত্তে দৃঢ়তা দেখা গিয়াছে। সরস্বতী-তীরে যাঁরা ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিতেন, ভাগীরথী তীরে যজ্ঞাগ্নির হোমশিখায় যজুর্ম্মন্ত্রে আহুতি দিতেন, যমুনাতীরে সামসঙ্গীতের উদাত্ত স্বরে সকল দিক প্লাবিত করিতেন—আমরা তাঁদেরই বংশধর। উদীয়মান সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া যাঁরা বৈদিকছন্দে সূর্য্যোপস্থান পাঠ করিতেন, দেবভাষায় নিবদ্ধ শ্রীভগবানের স্তোত্রাবলি পান করিতেন, বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস, যৌবনে নিষ্কাম সংসার কর্ত্তব্যপালন, বার্দ্ধক্যে বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া যাঁরা শ্রীভগবৎপদে আত্মসমর্পণ করিতেন—আমরা তাঁদেরই সন্তান! আমরা কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারি না।

এক্ষণে আমরা কি উপায়ে সেই ঋষির বংশধররূপে মাথা তুলিতে পারি, কি সাধনা করিলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়া দাঁড়াইতে পারি, তাহারই পরামর্শের জন্য আজ আমরা এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি। এই স্থান হইতে একটী নবীন উদ্দীপনা, নূতন অনুপ্রেরণা, স্বম-হিম-প্রতিষ্ঠ ধর্ম্মভাব লইয়া জীবন গড়িব বলিয়া আসিয়াছি।

গুরুগৃহে সে ব্রহ্মচর্য্য নাই সত্য, কিন্তু আমরা স্বগৃহে থাকিয়া, অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে বাস করিয়া, ছাত্রাবাসে অবস্থিতি করিয়াও কি কতকটা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে

* ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন জন্য ইহা লিখিত হইয়াছিল। লেখক—

পারি না? ভিক্ষাচর্য্যা, শুশ্রূষা, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যাকার্য্য ও অগ্নিকর্ম্মের মধ্যে আমরা ভিক্ষাচর্য্যা ব্যতীত অপরগুলির অনুষ্ঠান কি করিতে পারি না? স্বাধ্যায় বেদাধ্যয়ন। বাল্যে আমাদের অন্ততঃ বেদাধ্যয়নের জন্য চারিদণ্ড সময় ক্ষেপ করা কি অসম্ভব? প্রত্যহ ২ দণ্ড মাত্র কাল সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া যাওয়া কি আমাদের অসাধ্য? যে সবিতার ও বরেণ্য পরম দেবতার তেজ—যাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করিতেছে—তাহার আরাধনা করা কি আমাদের কষ্টকর? প্রাত্যহিক পাপক্ষয়ের জন্য, সত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত শ্রীভগবানের আরাধনা কি সুখের, তৃপ্তির ও শান্তির নহে?

যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বংপুণন্তু মামাপো অসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণে আমাদের পাপের সহিত পাপময়ী বাসনা অবশ্যই ক্ষয় পাইবে; শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ যথাবিধি সদাচার পালন করিয়া যাইলে নিশ্চয়ই আমাদের দেহ সুদৃঢ় ইন্দ্রিয় সংযত, অন্তঃকরণ নির্ম্মল, প্রাণ সত্বময় হইবে, ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই।

পশ্চিমযামে শয্যাত্যাগ, উষায় ভ্রমণ, নদীতীরে প্রভাতীবায়ুসেবনের সঙ্গে বৈদিক সুস্বর ছন্দে প্রাতঃসন্ধ্যা করায় আনন্দ হয় কি না সকলে দেখিয়াছেন কি? পুষ্পোদ্যানে প্রবেশে, সুগন্ধি কুসুম চয়নে রাত্রের ঔদাস্য, দেহের মালিন্য, নাসিকার জড়তার অবসানের সঙ্গে বিমল স্বাস্থ্যসুখ ও শান্তি হয় কি না সকলে পরীক্ষা করিয়াছেন কি? প্রাতঃ সূর্য্য দর্শনে সর্ব্ববিধ রোগ বীজাণু, সকলপ্রকার কালুষ্য দূর হয় কিনা সকলে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কি? জলশৌচ না করিলে প্রস্রাব শেষেরফলে মেহরোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে এই পরীক্ষিত সত্য না মানিয়া পারেন কি?

পূজা ও জপের সময়ে বাহিরের অশান্ত চঞ্চল তড়িতের সংঘর্ষ ফলে ভিতরের তড়িত শান্ত স্থির হইতে পারে না, আর তাহা না হইলেও মানসিক চাঞ্চল্য নাশ ও একাগ্রতা শক্তি বৃদ্ধি পায় না, তাই কুশাসন, পশমাসন বা মৃগচর্ম্মাসন আসনরূপে পাতিয়া লইতে হয়। দেহের জ্যোতিঃ নির্ম্মলবৎ প্রতীত হইলে, বাস্তবিক দেহনির্ম্মল, পশ্চাৎ চিত্তও নির্ম্মল হইতে পারে, তৎকালীন পবিত্রতার উদয় হইলে সাময়িক সত্বগুণের বৃদ্ধি দেখা যাইতে পারে, তজ্জন্য কৌষেয় বাস পরিয়া সন্ধ্যাপূজাদি করিলেই ভাল হয়। দৈহিক বাহ্যচেষ্টা নিবৃত্তি ব্যতীত চিত্তে একাগ্রতা ও ভাবশুদ্ধি জন্মিতে পারে না, ধূপধূনার ও পুষ্প চন্দনের গন্ধের সঙ্গে সর্ব্ববাদ্যময়ীঘণ্টার রোগনাশক শক্তিসমন্বিত শঙ্খের ধ্বনির সঙ্গে না হইলে রজোগুণাবলম্বী আমাদের মন বসে না।

বিল্ব ও তুলসীদলের প্রশংসা আজ আমরা শুনিতে পাইলাম, পশ্চিম ও উত্তর শিয়রে শয়নে মস্তিষ্ক রস রক্তাদিপূর্ণ, প্রদাহী, সুতরাং পীড়িতাবস্থ হইতে পারে, এই সে দিন আমরা ইহা জানিতে পারিলাম; পাপীর স্পৃষ্ট অন্নে, বসিবার আসনে, পাপীর পাপহৃদয়ের অবিকল ছায়াপাত দেখা যায়—আজ তাহা প্রমাণিত হইতে চলিল। আর কতকাল পূর্ব্বে আমাদের

আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই সকল নিষেধ করিয়া গিয়াছেন—ভাবিলে তাঁহাদের চরণপদ্মে বারম্বার লুটাইয়া পড়িতে কাহার না ইচ্ছা হয়? একাদশী, অমাবস্যায় গুরুভোজন নিষিদ্ধ, সময়ে সময়ে উপবাস স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনুষ্ঠেয়, এক সময়ে শয়ন ভোজন যে উপকারী—তাহা আজ কালি পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত পরামর্শ দিয়া থাকেন। কতকাল পূর্ব্বে ব্যবস্থাপিত এই সকল বিধিনিষেধের আলোচনা করিলে তাঁহাদের কল্যাণময়ী ইচ্ছার আভাস পাইয়া কাহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় না ভরিয়া উঠে?

এক্ষণে আমাদিগকে যদি প্রকৃত আর্য্য-ঋষির বংশধর, প্রকৃত সংস্কারপূত ব্রাহ্মণ হইতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যগুলি যথাসম্ভব শাস্ত্রের আদেশে করিতে হইবে, অতীতের আর্য্যজ্ঞানোজ্জ্বল সেই ব্রাহ্মণগণের পদচিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচীনের প্রতি আমার এই প্রীতি অবসন্নতার লক্ষণ বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু উহাই আমার অসাড় নির্জীব জীবনে আশার অরুণালোক দেখাইয়া দিবে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সজাগ করিয়া তুলিবে, জগতের নশ্বর অসার দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে অবিনশ্বর নিত্য বস্তুর প্রাপ্তির আকুলতা জন্মাইয়া দিবে। বেদ, উপনিষৎ, সংহিতা, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্রাদি শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া মহাজননির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই আমরা আবার সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণের পবিত্র পদের অধিকার পাইব।

যাহার দ্বারা আমরা শাসিত হই, যাহা আমাদের ইহপরকালের কল্যাণপথপ্রদর্শক, যাহা আমাদের একাধারে পালক, শাসক ও রক্ষক—সেই শাস্ত্রের নিয়ম মানা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? শাস্ত্রের সার্ব্বভৌমিক ও সাম্প্রদায়িক এই দুইটি ভাবই আমাদের অবলম্বনীয়। সামান্য ভাবই সার্ব্বভৌমিক, বিশেষভাবই সাম্প্রদায়িক। এই সাম্প্রদায়িক বিশেষ ভাব দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে সম্প্রদায়বিশেষের অধিকতর উপকারক বলিয়া অনেক সময়ে সাম্প্রদায়িক ভাবই বিশেষ উপযোগী। শাস্ত্রের মর্ম্ম যেখানে অজ্ঞাত, সন্দিগ্ধ ও নানা সত্যবাদে আচ্ছন্ন হওয়াও বিপ্রতিপন্ন, সেখানে আচার দ্বারাই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লইতে হয়; শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ও প্রাণিহিতকর না হইলে মহাজনপরম্পরায় আচরিত হইত না। শাস্ত্রই বলেন—আচাররূপ বৃক্ষের ধর্ম্ম মূল, ধনসম্পত্তি শাখা, কাম পুষ্প, মুক্তি বা স্বর্গাদি ফল।

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এবচ"।

সামান্য দিক দিয়া শাস্ত্র, বিশেষ দিক দিয়া শাস্ত্র, কখন শাস্ত্র কখন আচার। আচার যদি আমাদের দোষে কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারক না দেখা যায়, তাহাতে আচারের দোষ নহে। অযথাভাবে অনুষ্ঠিত ভাল জিনিষও মন্দ ফল প্রসব করে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা-রূপা নদী ক্রমেই মজিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, যাহাতে সেই নদীটী বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নদী মজিয়া গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ, দেশের সমূহ ক্ষতি। অতএব সংস্কার আবশ্যক।

সংস্কার কি? সংস্কার শুদ্ধি। দেহ ও চিত্তের শুদ্ধিই সংস্কার। যে কর্ম্ম দ্বারা, অথবা যে কর্ম্মজন্য অতীন্দ্রিয় ভাবনা দ্বারা ঐ শুদ্ধি সাধিত হইবে, তাহার নামও সংস্কার। প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় দশ সংস্কার যথাবিধি হওয়া আবশ্যক। কারণ এই দশবিধ সংস্কারব্যতীত ব্রাহ্মণশিশু ব্রাহ্মণ হইবে না। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈ র্দ্বিজ উচ্যতে" ব্রাহ্মণবংশজ শিশুকেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার দিতে হইবে, তাই জন্মগত ব্রাহ্মণ্যই অগ্রে স্বীকৃত হইয়াছে। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" শূদ্রবৎ।

দশ সংস্কার যথাবিধি হইলে পর, যদি ব্রাহ্মণবালক ব্রাহ্মণ না হয়, তবে অন্য উপায় চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম যাহাতে শাস্ত্রীয় দশসংস্কার যথার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই দেখিতে হইবে। উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতের অভাব, বিশুদ্ধ মন্ত্র-উচ্চারণের প্রণালী না জানা, শাস্ত্রীয় কর্ম্মে তাদৃশ শ্রদ্ধাবিশ্বাসের অসদ্ভাব, শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত শিক্ষার অত্যধিক প্রসার এবং তাহার আদর—এই সকল আমাদের প্রতিবন্ধক। কিন্তু শাস্ত্রীয় দশ সংস্কারতত্ত্ব যদি সাধারণকে ভালরূপ বুঝান যায়, তবে ঐ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিতে পারে।

গর্ভাধান ও সংস্কার।—বড় গলা করিয়া আমরা বিশ্বের সম্মুখে বলিতে পারি এরূপ সংস্কার কোন জাতিরই নাই। পাশববৃত্তি চরিতার্থ করা, কামের সেবা করা এক জিনিষ, আর বৈদিক মন্ত্র দ্বারা চঞ্চল পাশব ভাবান্বিত কামোন্মত্ত অবস্থাকে স্থৈর্য্য, ধর্ম্মরক্ষা ও ভগবৎ প্রেরণা দ্বারা সংস্কাররূপে পরিণত করা আর এক জিনিষ। মৃত্যুসময়ের সুদৃঢ় ভাবনা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অপেক্ষা যেমন বলবতী, গর্ভাধানকালীন সুমনোবৃত্তিও পূর্ব্বমনোবৃত্তির অপেক্ষা তদ্রূপ বলবতী; কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যবৃন্দের কোলাহলের মধ্যেই গীতার উদ্ভব এই ভারতেই সম্ভব হইয়াছিল। তারপর সন্তান যাহাতে পুরুষোচিত সংস্কারবিশিষ্ট হয়, গর্ভপাতশঙ্কা বিদূরিত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য ঋষিগণ পুংসবন-সংস্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ
পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব ত্বম্ পুমাননুজায়তাম্।

তারপর সীমন্তোন্নয়ন। পতিপুত্রবতী রমণীগণ গর্ভবতী বধূকে বেদীর উপর আরোহণ করাইয়া স্নানাদি মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করাইবেন।

"ত্বং বীরপ্রসবা ভূয়াঃ ত্বং জীবৎবৎসা ভব
ভবতী জীবৎপতিকা ভবতু।"

সীমন্তের উন্নয়ন করায় গর্ভবতী নারী আর কোন সংস্কার করিবে না, উজ্জ্বল বেশভূষা করিবে না, অলঙ্কারাদিও অঙ্গে দিবে না। পতির লালসাবৃত্তি উদ্রিক্ত যাহাতে না হয়, সেই মত থাকিবে। কি সুন্দর ব্যবস্থা!

তারপর জাতকর্ম্ম সংস্কার। পুত্র জন্মিলে বৃথা আমোদ না করিয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম্মকার্য্যরূপ

আমোদ করিতে ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। প্রথম সন্তানের আয়ুঃ প্রার্থনা করিয়া তারপর ধারণাবতী মেধার প্রার্থনা করা হইয়াছে। ধনসম্পত্তি না চাহিয়া "সন্তান মেধাবী হউক"—এই আকাঙ্ক্ষা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সদ্যোজাত শিশুর পিষ্টব্রীহি, যব চূর্ণ ও স্বর্ণ ঘৃষ্ট ঘৃত ও মধু দ্বারা জিহ্বা মার্জ্জন করার নিয়ম কি সুন্দর! আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়গণ বলেন "ইহা দ্বারা বায়ুদোষের দমন হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, এবং রক্তের ঊর্দ্ধ গতিত্ব দোষ নিবারিত হয়। মধু দ্বারা মুখে লালার সঞ্চার, কফ দোষের বিনাশ ঘটে। সদ্যোজাত সন্তানের পক্ষে ঊর্দ্ধগামী শোণিত, কফাধিক্য ও অন্ত্রাভ্যন্তরে সঞ্চিত কৃষ্ণ মলের সঞ্চার সদ্যঃপ্রাণনাশক। এই গুলির নিবারণ করার জন্য স্বর্ণ ঘৃষ্ট ঘৃত ও মধু জিহ্বাতে মার্জ্জন করাই উচিত।

দশ দিনের মধ্যে শিশুদের মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক, এই কারণে একাদশ দিনে নামকরণ ব্যবস্থা। নাম হইলে শিশু আত্মীয়রূপে গণ্য হয়। শতরাত্রি কাটিয়া না যাইলে শিশুর মৃত্যুভয় দূর হয় না, এজন্য শত রাত্রি অন্তেও নামকরণ ব্যবস্থা।

তার পর চূড়াকরণ সংস্কার। বংশপরম্পরাগত আচারক্রমে প্রথম বর্ষে, তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ বিহিত। চূড়াকরণে গর্ভজাত অপবিত্র কেশরাশির মুণ্ডন করিতে হয়। ঐ কেশ অশুদ্ধ, অপকারী ও কুশ্রী। বাবাঠাকুরের কাছে, সিদ্ধেশ্বরীতলায়, কিম্বা পঞ্চাননতলায় চুল দেওয়ার নিয়ম আছে বলিয়া তবুও চূড়াকরণের আংশিক উদ্দেশ্য কোন প্রকারে সাধিত করা হয়।

এই আটটী সংস্কার গর্ভোপঘাতদোষ বিদূরিত করিয়া সন্তানকে পবিত্র করে। বীজ, গর্ভসমুদ্ভব ও অপর বিধ দোষের শান্তি না হইলে সন্তানের সম্যক্ শুদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। এই প্রকারে শুদ্ধি হইলে তৎপরে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, তাহা কখনই নিষ্ফল হয় না।

চিত্রকর স্থূলভাবে একটী ছবি আঁকে, পরে অঙ্গেপ্রত্যঙ্গে ধীরে ধীরে তুলিকা চালনা করে, পশ্চাৎ রঙ্ ফুটাইয়া থাকে। সংস্কারকার্য্যও যদি পর্য্যায়ক্রমে সম্পাদন করা যায়, তবে সন্তান যে সম্পূর্ণতা লাভ করিবেই, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি।

আজিকালি গর্ভাধান অনেক ক্ষেত্রে উঠিয়া যাইতেছে। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও জাতকর্ম্ম সচরাচর দেখা যায় না। নামকরণ ত শুনিই না। অন্নপ্রাশনও আবার অনেকে উপনয়নের সময়েই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চূড়াকরণ যথাসময়ে কদাচিৎ হইতে শুনা যায় মাত্র।

এক্ষণে উপনয়ন ও বিবাহ এই দুইটী সংস্কারই উঠিয়া যায় নাই, উঠিবারও নহে। উপনয়ন না হইলে আজি আমরা ব্রাহ্মণ বলিতেই পারিতাম না। দণ্ডীঘরে উপবীত ব্রাহ্মণবালককে দেখিলে কাহার মনে হয় যে, সেই একদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া যেখানে সেখানে নানা কুখাদ্য খাইয়া বেড়াইবে?

উপনীত বালক যাহাতে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে, তৎপ্রতি কয়জনের পিতামাতা লক্ষ্য করেন?

আমাদের এই শাস্ত্রীয় দশসংস্কার যাহাতে যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য যত্ন লওয়াই অগ্রে আবশ্যক। পশ্চাৎ অন্যবিধ সংস্কারের আলোচনা। উপনয়নের পর গুরুগৃহে পাঠাইবার এক্ষণে রীতি নাই, কিন্তু যাহাতে তখন হইতে বালক ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, যথাসময়ে সন্ধ্যাহ্নিক করে, শাস্ত্রীয় আচার পালন করে, অখাদ্য কুখাদ্য না খাইয়া বেড়ায়, ব্রাহ্মণের মত থাকে—তাহার চেষ্টা দূরে থাক, আমরা প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকি। দুই একটী বিধি এক বৎসর পর্য্যন্ত পালন করিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া আমরা মনে করি। কেন? মাত্র এক বৎসরের পরে তবে উপবীতের পরিত্যাগের ব্যবস্থা করিলেই ত হয়? উপনয়নের দিনই সমাবর্ত্তন করিয়া লওয়া এক্ষণে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মচর্য্যের অন্যতম অঙ্গ। মাত্র এই একটা অঙ্গই এক্ষণে পালিত হয় না, অসময়ে তরুণ বয়স্ক বালকগণের ইন্দ্রিয় অসংযম যে ব্রহ্মহত্যা-পাতকতুল্য, তাহা বুঝাইবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করা, যত্ন লওয়া পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের পক্ষে উচিত বলিয়া অনেকের ধারণা নাই। সর্ব্বনাশের পথ হইতে ফিরাইবার প্রকৃষ্ট উপায়টী আজি অবজ্ঞাতই হইয়া আছে। আমরা চক্ষু থাকিতেও সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখি না। সুরুচির দোহাই দিয়া লজ্জার দৌর্ব্বল্যের অজুহাত দেখাইয়া তাহাদিগের দৈহিক মানসিক অবনতির দিকে লক্ষ্যই করি না।

তারপর বিবাহ সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। এই বিবাহ সংস্কারে কয়েকটী দোষ আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি উদ্ধার করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ আছে কিনা, ব্রাহ্মণ্য আচার প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, কন্যা ধর্ম্মপরায়ণা কিনা, বর আস্তিক কিনা, ঐ উভয়ের মিলন সঙ্গত কিনা, পাত্র পাত্রীর মিলনে শাস্ত্রীয় কোন প্রকার বাধা জন্মে কি না—এ সকল দেখা কেহই আবশ্যক মনে করেন না। কন্যা সুন্দরী হইলে, আশানুরূপ ব্যয় করিলেই সে কন্যার আদর অপরিহার্য্য। পাত্রের লেখাপড়া ও কিছু ধনসম্পত্তি থাকিলে আর অন্য কিছুই দেখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। বংশের দোষগুণ সন্তানে সংক্রমিত হয়, সেজন্য উক্ত দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য করা কি আমাদের সর্ব্বথা উচিত নহে? এই দশবিধ সংস্কার যথাবিধি সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণকুমার যথার্থ ব্রাহ্মণ হইবে—এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ সকলেই একমত।

নাজপ্তঃ সিদ্ধ্যতে মন্ত্র আহুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
নানিষ্টো যচ্ছতে কামান্ তস্মাৎ ত্রিতয়মর্চয়েৎ॥

পূর্ব্বে যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান মধ্যে পরিগণিত ছিল। আজিকালি সামান্য মাত্র হোম করিয়া আমরা সেই একরূপ যজ্ঞের কার্য্য সমাধা করি। হোমাগ্নিতে বিশুদ্ধ গব্যঘৃত মন্ত্রসাহায্যে আহুতি দিতে হয়। এই হোমের অনলশিখা যেখানে জ্বলে,

সেস্থান বিশুদ্ধ, পবিত্র, সুগন্ধ ও সত্ত্বময় হইয়া উঠে। দূষিত বাষ্প, কলুষিত দুষ্ট বাতাস, রোগের বীজাণু নষ্ট করিতে এমন মহৌষধ আর নাই। হৌম্যহবির্গন্ধে ক্ষুধার বৃদ্ধি, শারীর ধাতুর সমীকরণ, সত্ত্বগুণের উপচয়, আর রসের সমন্বয় ঘটে। হোমের ভস্ম চক্ষুতে দিলে চক্ষুরোগ জন্মে না, ললাটে দিলে দেহ স্নিগ্ধ ও পবিত্র থাকে, গ্রন্থিতে মর্দ্দন করিলে বাতের আক্রমণের ভয় থাকে না। কালেভদ্রে দীক্ষাগ্রহণের দিন কিম্বা বৎসরে দুই একবার উক্ত হোমতিলক লোকে ললাটে দিয়া থাকে মাত্র। নিত্য হোম এক্ষণে কে করেন? করিবার ইচ্ছা থাকিলে কি বাঙ্গলায় করিবার মত শক্তি কোথায়ও নাই? অগ্নিগৃহ—এক্ষণে বঙ্গদেশে দৃষ্টই হয় না। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ত নাইই।

নিত্য হোম অন্ততঃ বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে দুই এক ব্যক্তিকেও যদি করিতে দেখা যায়, তাহা হইলেও প্রাণে আশ্বাস জাগে। তপস্যা শুনিয়াছি ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। সে তপস্যা মুনিঋষিরাই করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কয়েকবার গায়ত্রীজপ কিম্বা ১০৮বার বীজমন্ত্র জপ করিয়া সেই তপস্যার কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি।

জপই কলিতে এক প্রকার তপস্যা। কিন্তু শৈশবকাল হইতে নিয়মিতভাবে সত্ত্বগুণের উন্নতি করিব, একাগ্রতাশক্তি বৃদ্ধি করিব—এই ইচ্ছায় কয়জন জপসাধনা করিয়া থাকেন?* চক্ষু, কর্ণ ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য বিষয়ে যাহাতে কিছু সময়ের জন্যও যাইতে না পারে, যাহাতে উপাস্যদেবতার পদে স্থির থাকিতে পারে, তাহার জন্য কয়জন সত্যকারের চেষ্টা করেন। বালকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইবার জন্য যে কঠোর সাধনা নিয়মিত করিয়া যায়, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও কি কেহ জপে মন বসিবার জন্য বা জপ করিবার জন্য সময়ক্ষেপ করেন? জপে সুখ শান্তি কিরূপ—যাঁহারা জপ না করিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝাইব-কিরূপে?

অনুষ্ঠান ও ভাব—এই দুইটী উপায় ধরিয়া আমাদিগকে উঠিতে হইবে। শাস্ত্র কথার নিরন্তর আলোচনায়, আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদি অধ্যয়নে, ধার্ম্মিক সাধুগণের সঙ্গলাভে, শাস্ত্রাদিষ্ট বিধিনিষেধের পালনে আমাদিগকে উঠিতে হইবে, বেদান্ত বাক্য বিচারের ফলে, প্রাণায়ামাদি-যোগের অভ্যাসে, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের অশান্ত ইন্দ্রিয় ও চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিতে হইবে। ক্ষমা, সত্যকথন, সংযমিতা, সারল্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরই গুণ। ক্রোধ করিব না, ক্রোধের দোষ কি—ক্ষমা করিব, ক্ষমার গুণ কি—ইহার আলোচনা করিলে ক্রোধ দমিত হইবে, ক্ষমাগুণ দেখা দিবেই। ক্রোধ এবং কামের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারিব? সকল পাপের নিদান কাম, ক্রোধ মনুষ্য মাত্রেরই শত্রু। বিশেষ জগতের শিক্ষক, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক ব্রাহ্মণেরা যদি কাম ক্রোধ দ্বারা পরিচালিত হন, তবে শিক্ষা দিবে কে?

* "শান্তির শান্তিলাভ" প্রবন্ধে (কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) ব্রাহ্মণ-সমাজে বুঝাইয়াছি।

তার পর, বিলাসিতার ঝঁাক জমক যেরূপ সারা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইতে ব্রাহ্মণগণ যদি দূরে না থাকেন, তবে উদ্ধারের আশা কোথায়? লোকে বিলাসিতা, ঝঁাক-জমকের মুখে নিন্দা করেন মাত্র, কার্য্যতঃ পোষকতা করিয়া থাকেন। জনকয়েক মাত্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এখনও সেই বিলাসিতা ও ঝঁাক জমকের পরিপন্থী আছেন, তাহা দেখিতেও সুখ। অসংযম চারিদিকে তাণ্ডব নৃত্যে বিরাজমান।

বিশেষ এক্ষণে যাঁহারা দেশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, তাহাদেরই বিলাসিতা ঝঁাক-জমক-অসংযম অত্যন্ত অধিক। দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তি সেই আদর্শে ছুটিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। দেশের মধ্যে যাঁহারা প্রধান হইবেন, দেশের যাঁহারা শিক্ষক হইবার দাবী করিবেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ দরিদ্রের মতই বাস করিতে হইবে, সেই চালেই তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে। পূর্ব্বে দেশের অবিসংবাদী নেতৃত্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হস্তেই ছিল। আর আজ যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের জীবিকানির্ব্বাহ বিনা আয়াসে হইত, বিলাসিতা ঝঁাকজমকের অযথা প্রশ্রয় এবং আদর না দেখা যাইত, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারাই দেশের অবি-সংবাদী নেতা হইতেন। এখনও যদি দেশের লোকে বুঝেন, বুঝিয়া নিজের একটু স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আবার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পূর্ব্বের মত সহনীয় আপন অকাঙ্ক্ষা রাখিয়া দেশের নেতা ও রক্ষক হইতে পারেন।

শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রাচীন প্রীতি থাকিলে সকলই হইবে। শ্রদ্ধা বিশ্বাস জন্মিলে, তবেত সাধনায় মতি জন্মিবে? সাধনার সিদ্ধি আছেই, এক জন্মে না হউক, দুই তিন জন্মেও সাধনা নিশ্চয়ই একদিন সিদ্ধিরূপে পরিণত হইবে। অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মা ব্যক্তির বিনাশ অপরিহার্য্য, তাই ভগবানেরই উক্তি।

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।"

শ্রীরামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মণসভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ!

ব্রাহ্মণসমিতির বিষয় কিছু বলিতে গেলেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের দিকে স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণসমাজের উন্নতিকল্পে এই ব্রাহ্মণসভার উৎপত্তি, সেই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। এক্ষণে ব্রাহ্মণ কেবল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মান্বিত নহেন। তিনি দেবমন্দিরে পূজা করিতেছেন, বাজারে দোকানে বিক্রয় করিতেছেন, লোকালয়ে ডাক্তারী করিতেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছেন, অফিসে কেরাণীগিরী করিতেছেন, আদালতে জজিয়তি, ব্যারিষ্টারী, ওকালতী ও মোক্তারী করিতেছেন এবং বিদ্যালয়ে বেতনভুক্ হইয়া শিক্ষকতা করিতেছেন। ফলে, প্রায় সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তিনিও এক্ষণে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। কতকগুলি ব্রাহ্মণ বিশেষ সম্মান ও যশের সহিত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; অপর কতকগুলি দুর্নীতি ও অধর্ম্মের আশ্রয়ে জীবিকা উপার্জ্জনে যত্নপর হওয়ায় স্বজাতির উপর জনসাধারণের অবজ্ঞা আনয়ন করিতেছেন, ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহা যে কালের দুর্দ্দমনীয় প্রভাব, তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে। এখন এরূপকাল পড়িয়াছে যে, জীবিকার অনুরোধে সকলকে সকল কর্ম্মই করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তাহা এক্ষণে অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে বিহিত কর্ম্ম বলিয়া একপ্রকার স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। আহার, বিহার, পোষাক, পরিচ্ছদ সর্ব্বত্রই ঘোর ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে পরিচ্ছদ দেখিলে ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারা যাইত, এক্ষণে পরিচ্ছদ আর ব্রাহ্মণের পরিচায়ক নহে, ব্রাহ্মণকে তাঁহার জীবিকার অনুরোধে বিচিত্র পোষাক পরিধান করিতে হইতেছে। পরিচ্ছদের সহিত যে ভোগবিলাসস্পৃহার একেবারেই যোগ নাই, তাহাও বলা যায় না। অপরাপর জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণও বিলক্ষণ বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। একদিন এমন ছিল, যখন ব্রাহ্মণের সুদিন ছিল। সেই সকল দিনও ব্রাহ্মণের তাৎকালিক কৃতিত্ব স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া কেহ কেহ আধুনিক ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু "কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে। কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে।" বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া যাহা চক্ষের সম্মুখে দিবারাত্রি ঘটিতেছে, তাহার অপলাপ করিয়া গৌরব গান করিলে, সে গৌরব ক্ষণিক অস্তিত্বলাভ করিলেও উহা স্থায়ী হইতে পারে না। ভালই হোক, মন্দই হোক, অনুকূলেই হউক, প্রতিকূলেই হউক, যশস্করই হউক, অখ্যাতিকরই হউক, যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া

লইতেই হইবে। অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া যিনি তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান্ হন, তিনি সুখী পুরুষ, তিনিই বিচক্ষণ ব্যক্তি।

রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমেই রোগের নিদান নির্ণয়ে যত্নবান্ হন। যদি রোগের যথাযথ কারণ নির্ণীত হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিহিত ঔষধ-প্রয়োগে রোগী আরোগ্যলাভ করেন; নতুবা শত ঔষধ সেবনেও রোগর উপশম হয় না, অনেক স্থলে উপকার অপেক্ষা অপকারের অধিক সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সমাজের ঈদৃশ অবস্থা হইবার তিনটী প্রধান কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয়:—

(১) জীবিকার অভাব। (২) বিজাতীয় শিক্ষা। (৩) বিজাতীয় সংস্রব। প্রথমতঃ জীবিকার অভাব। পূর্ব্বকালে ভূস্বামিগণ ব্রাহ্মণগণকে ভূ-সম্পত্তি দান করিতেন, তাহার উপস্বত্বে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিতেন, এবং ধ্যান ধারণাদি তপশ্চর্য্যার ফলে বিবিধ অলৌকিক সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া জীবজগতের কল্যাণের জন্য বিশিষ্ট অধিকারী দেখিয়া উহা শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রচার করিতেন। ইহারই ফলস্বরূপ আমরা বিবিধ আর্য্যশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ সেকালে স্বার্থপর ছিলেন, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা তাৎকালিক অবস্থা ও ইতিহাস ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই। ব্রাহ্মণ সকল বিদ্যার গুরু ছিলেন, তিনি দ্বিজাতির মধ্যে অধিকারী দেখিয়া ব্রহ্মবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা দান করিতেন। তিনি সকলের গুরু হইলেও নিজে নিস্পৃহ ছিলেন। সহরের কোলাহলের মধ্যে বাস করিতেন না। যেখানে নদী প্রবাহিতা ও ফলমূল সুলভ, এইরূপ বনভূমি মনোনীত করিয়া তথায় পরিজনবর্গের সহিত বাস করিতেন, এবং দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া প্রশান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। রাজাকে কোন বিশেষ বিষয়ে উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইলে কখন ২ রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। কখন ২ রাজা কার্য্যানুরোধে গুরু বা পুরোহিতদিগকে আহ্বান করিতেন। শাস্ত্রে তাৎকালিক ব্রাহ্মণের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়—আহার, বিহার, পরিচ্ছদ কিছুতেই তাঁহার বিলাসিতা ছিলনা। সুতরাং ঈদৃশ ব্রাহ্মণের আধুনিক অর্থে স্বার্থপর হইবার কোন কারণই বিদ্যমান ছিলনা। তাঁহার যাহা কিছু সমাজের উপর আধিপত্য, তাহা জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের জন্য। সমাজে সকলেই ব্রাহ্মণের চরিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করিত, তাঁহার নিকট অবনত হইত। ব্রাহ্মণ যে ঈদৃশ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, জীবিকাবিষয়ে নিশ্চিন্ততাই তাহার মূল। কালক্রমে তাঁহার সেই নিশ্চিন্তভাব রহিল না, দশাবিপর্য্যয় ঘটিল, জীবিকার নিমিত্ত তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইল, তাঁহার জপ গেল, তপ গেল, ধ্যান গেল, ধারণা গেল,—সুতরাং সে সম্মান গেল, সে প্রতিপত্তি গেল। তাঁহাকে 'হা অন্ন, হা অন্ন' বলিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হইল। ইহা তাঁহার বর্ত্তমান দুর্গতির অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়তঃ বিজাতীয় শিক্ষা। মনে রাখিতে হইবে যে সকল ব্রাহ্মণছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার গণ্ডীর ভিতর অসিয়া পড়েন নাই, যাঁহারা জাতীয়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন, জীবিকার অভাবে তাঁহারা খাটি ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাঁহারা যখন জীবিকার অভাবে বৃত্তির জন্য ধনীর দ্বারস্থ হইয়াছেন, ধনমদান্ধ ব্যক্তি তাঁহার অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া তাঁহাকে লোভপরবশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার অবস্থায় সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। এইরূপ জীবিকার অভাবে ব্রাহ্মণকে কালক্রমে অসৎপথে পড়িয়া দুর্দশাপন্ন ও চরিত্রভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে, কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণকুমার পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিতেছেন, সেই শিক্ষার ফলেই ব্রাহ্মণ্য হারাইতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের দোষ নাই, কেননা আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উপকারিতা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং যাঁহাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উপর আস্থা আছে ও যাঁহারা ব্রাহ্মণবর্ণোচিত জীবন যাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের জীবিকার অভাব; আর যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে জীবিকা উপার্জ্জনে সমর্থ, তাঁহাদের স্বধর্ম্মে অনাস্থা; এই উভয় কারণে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের উপকারিতা কি তাহা বালককাল হইতে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। জাতিভেদটা জাতীয় উন্নতির ঘোর প্রতিকূল বলিয়া কতকগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোক দেশে বর্ত্তমান সময়ে মহা-কোলাহল উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মত কতদূর যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণপ্রদ তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। যে কোন সভ্য মনুষ্যসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে চারি প্রকার লোক বর্ত্তমান আছে। কতকগুলি লোক ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, কতকগুলি দেশ রক্ষায় নিযুক্ত, অপর কতকগুলি ব্যবসায় বাণিজ্যে নিরত ও অন্য কতকগুলি শ্রমজীবী। প্রথমোক্ত লোকগুলি ধর্ম্মোপদেষ্টা, দ্বিতীয়োক্ত লোকগুলি জনসমাজকে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা দেশরক্ষক ও সমাজপ্রতিপালক, তৃতীয়োক্ত লোকগুলি জাতীয় ধনসঞ্চয়ের সহায়, এবং চতুর্থোক্ত লোকগুলি কায়িক শ্রমের দ্বারা শস্যের উৎপাদক ও সাধারণতঃ শ্রমসাধ্য কর্ম্মের সম্পাদক। এই যে চারি প্রকার লোক মনুষ্যসমাজে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা কি আকস্মিক ঘটনা? ইহার মূলে কি কোন স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমান নাই? মনুষ্যপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বভাবের নিয়ম এই যে, যাঁহার যেরূপ মনের প্রবৃত্তি, বাহিরে তাঁহার কার্য্যও তাদৃশী, অতএব পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ লোকের স্ব স্ব মানুষিক প্রবৃত্তি হইতেই বাহিরের কার্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই শ্রীভগবৎবাক্য এই গভীর সত্যই প্রকাশ করিতেছে। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃকৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" এই শ্রুতিও এই মূল সত্য ঘোষণা করিয়াছেন। এই শাস্ত্রবাক্য সকল সমগ্র মানবসমাজকে লক্ষ্য করিয়া উদ্বোধিত হইয়াছে, কেবল হিন্দুসমাজকে লক্ষ্য করিয়া নহে।

যদি তাহাই হয়, তবে ইয়ুরোপাদি পাশ্চাত্য সমাজ হইতে ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রভেদ কি প্রভেদ এই যে, তাহাতে চতুর্ব্বিধ উপাদান থাকিলেও উহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ সুগঠিত বর্ণে বিভক্ত হয় নাই। আমাদের সমাজ স্মরণাতীত কালে যে অবস্থার ভিতর দিয়া, যে পরীক্ষার ভিতর দিয়া আসিয়াছে, পাশ্চাত্য খৃষ্টীয়াদি সমাজ বর্ত্তমান সময়ে সেই পরীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক, আমরা হিন্দু-জাতি, পাশ্চাত্যগণের নিকট প্রাকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র অবনত মস্তকে শিক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি, তাঁহাদিগকে আমাদের শিক্ষকের আসনে বসাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদের নিকট বালক। আমরা বহু প্রাচীন সভ্যজাতি। আমরা যখন প্রথম সভ্যতার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া ছিলাম, তখন পাশ্চাত অনেক জাতির জন্ম হয় নাই। যে সকল জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁহারাও নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিলেন। সুতরাং হিন্দুসমাজ আর্য্য ঋষিগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়া আসিয়া যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বহুযুগব্যাপিনী অভিজ্ঞতার ফল। এক সময় এমন ছিল, যখন চাতুর্ব্বর্ণ্য অনুলোমবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাৎকালিক ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানা যায়, তখন প্রতিলোম-বিবাহ অশ্রদ্ধেয় হইয়া আসিয়াছে, ঋষিগণ তাহার বিষময় ফল দেখিয়া তাহার অনুমোদন করিতেছেন না। পরে অনুলোমবিবাহের প্রথা বহুদিন চলিয়াছিল। কিন্তু তাহাও ঋষি-গণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হইল দেখিয়া তাঁহারা তাহা প্রতিষেধ করিয়া দিলেন। সুতরাং স্ব স্ব বর্ণে ও অবান্তর বর্ণে বিবাহ পরমমঙ্গলপ্রদ, ইহা পরীক্ষা করিয়া ঋষিগণ বর্ত্তমান বংশগত বর্ণধর্ম্মকেই সমাজবিজ্ঞানের চরম ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ঋষিগণ কি উদ্দেশ্যে এই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন? তপোবন হইতে গম্ভীর স্বরে যে বাণী সমুত্থিত হইয়াছিল, এখনও তাহা ভারতের গগনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই প্রতিধ্বনি, সেই উত্তর এই—"এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গি যোঽস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ॥ হে গার্গি এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া যে এই লোক হইতে প্রয়াণ করিল, তাহার অবস্থা শোচনীয়। সুতরাং তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বর্ণানুসারে ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা হইলে শীঘ্র আত্মোন্নতি হইবার সম্ভাবনা; এবং ফলেও-তাহাই ঘটিয়াছিল। হিন্দুসমাজ অভূতপূর্ব্ব উন্নতিলাভ করিয়াছিল। হিন্দু সমাজের এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে নিহিত, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় নিয়তপ্রবহমানা এই আকাঙ্ক্ষার স্রোতস্বতীর সন্ধান যিনি না পাইয়াছেন, তিনি হিন্দুসমাজকে চিনিতে পারেন নাই; হিন্দুসমাজ বহুকাল পরীক্ষা করিয়া যাহা উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূল বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহারা হিন্দুসমাজকে পুনরায় সেই অবস্থায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা একটু মনোনিবেশ করিলে বুঝিতে পারিবেন, পাশ্চাত্য সমাজ এখনও সমাজবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে গঠিত হয় নাই।

এখন এই সর্ব্বপ্রথম তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে গগন-মণ্ডল মুখরিত হইতেছে। পাশ্চাত্য মনীষিগণও তাঁহাদের বর্ত্তমান সমাজস্থিত বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন, সমাজকে কিভাবে গঠিত করিলে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইবে, এই সমস্যার মীমাংসায় নিযুক্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াও যাঁহারা আমাদের সমাজকে তাঁহাদের মত অবস্থায় লইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহারা সমাজতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী ও সমাজের শত্রু, সন্দেহ নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, তাহা আমি উক্ত সমাজের লোক বলিয়া এইরূপ বাড়াইয়া বলিলাম কেহ মনে করিতে পারেন। অতএব পাশ্চাত্য নিরপেক্ষ পণ্ডিত কি বলিতেছেন শুনুন—

"I am persuaded that it is simply and solely due to the distribution of the people into castes that India did not lapse into a state of barbarism, and that she preserved and perfected the arts and sciences of civilization while most other nations of this earth remained in the state of barbarism."

অর্থাৎ আমার এইরূপ প্রতীতি হইতেছে যে, যখন পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ জাতি অসভ্য অবস্থায় রহিয়া গিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষ যে অসভ্যাবস্থায় নিমগ্ন না হইয়া তত্রত্য শিল্পকলা ও সভ্যতার উপযোগী বিবিধ বিজ্ঞানের চরমোন্নতি সাধনপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ভারতীয় সমাজ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল।

আর একজন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন যে —"Indian civilization is the blossom snd fruit of the caste system" "the Supreme law of life itself."

অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিভাগের পুষ্প ও ফলস্বরূপ। ইহাকে এমন কি জীব-জগতের চরম বিধান বলিলেও হয়।

এই চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের আর একদল সমালোচক আছেন; তাঁহারা বলেন বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ মানিতে গেলে দেশের উন্নতি করা যায় না, উহা দেশের উন্নতিসাধনের প্রতিকূল। এই মতটী সুচিন্তিত বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা অবহিতচিত্তে মনুষ্যপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যে সকল লোক জগতের উন্নতি কর, মানব সমাজের উন্নতি কর বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারা কাজে বড় কমই করিতেছেন। অধিকাংশ উন্নতির কল্পনা বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা কোন দল বা সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়া কোন মঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমশঃ সাফল্য-লাভ করিতেছেন। বিশ্বজনীন প্রেম, সার্ব্বভৌম উন্নতির কল্পনা সাধারণ লোকের নিকট মরীচিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন; সেখানে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা একটা কৃত্রিম দল গঠন করিয়া তাহার নেতা বা মুখপত্র

হইয়া সেই দলের স্বার্থসাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। লিবারল দল, কনসার-ভেটিভ দল, সোসিয়ালিষ্টদল, ন্যাশানালিষ্ট দল, মাইনারের দল, রেলকর্ম্মচারীর দল ইত্যাদি অসংখ্য দল তাহার নিদর্শন। এক্ষণে তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা করুন। বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের দল বা সম্প্রদায় গঠন করিতে হইতেছে, আমাদের কিন্তু উহা আজন্মসিদ্ধ। হিন্দু কোন না কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জাতি সভাসমিতির ফল নহে, স্মরণাতীত কাল হইতে সংস্কারের ফল। সেই জাতির প্রতি তাঁহার যেমন অকৃত্রিম আত্মীয়তা বোধ আছে, তেমন আর কোন কৃত্রিম সম্প্রদায়ের প্রতি নাই। অতএব হিন্দু সমাজে যত ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, প্রত্যেক জাতির বিচক্ষণ সামাজিকগণ যদি স্ব স্ব জাতির উন্নতিকল্পে অর্থাৎ স্ব স্ব জাতিকে জ্ঞানে ও চরিত্রে মহীয়ান করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কত অল্প সময়ের মধ্যে, কত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সমগ্র হিন্দুসমাজ জ্ঞানে ও চরিত্রে সমুন্নত হইয়া উঠে। কোন মহান্ কার্য্যকে বহুভাগে বিভক্ত করিলে উহা সহজসাধ্য হইয়া উঠে, ইহাই শ্রমবিভাগপ্রণালীর চিরন্তন বিধি। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ দেশের উন্নতি সাধনের পক্ষে অনুকূল। যাঁহারা ইহাকে দেশের অলীক উন্নতির অজুহাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহেন, তাহাদিগকে আমি কিছু বলিতে চাহি না। Sir. John Woodroffe মহোদয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই শুনাইতে চাই। তিনি বলিয়াছেন ;—"of what value is any gift when to obtain it you must cease to be yourselves" "were I an Indian, I should never surrender my soul to any" অর্থাৎ সে দানের এমন কি মূল্য যাহা গ্রহণ করিতে গিয়া তুমি তোমাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে ? আমি যদি ভারতবর্ষের লোক হইতাম, কখনও কাহারও নিকট আত্মসমর্পণ করিতাম না।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব, হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না।

এতক্ষণ আমি চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজের বহু গুণের কথা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে একটী মহৎ দোষের কথা উল্লেখ করিব, উক্ত দোষটী পরিহার না করিলে, সমাজ উন্নতির পথে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। সেটি জাতিসকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা। কালক্রমে এই দোষ আসিয়া প্রবেশ করায় হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া ইহাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে থাকুক, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু বিদ্বেষ বা ঘৃণার লেশমাত্র থাকিলে উহা সমগ্র সমাজের অকল্যাণকর হইবে, সন্দেহ নাই। সহাধ্যায়ি-গণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, তাহাতে প্রত্যেকেই অপর অপেক্ষা জ্ঞানে ও চরিত্রে সমধিক উন্নত হইতে চেষ্টা করে। সেইরূপ প্রত্যেক জাতিই যদি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া আপন আপন জ্ঞান ও চরিত্রকে উজ্জ্বলতর, পবিত্রতর করিতে চেষ্টা করে, তাহা

হইলে সমগ্র সমাজের অপূর্ব্ব শ্রী সংসাধিত হয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিলাম, তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে; সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের চাকচিক্যে মোহিত হয়, এবং মোহান্ধ হইয়া কাচের পরিবর্ত্তে কাঞ্চন বিনিময় করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হয় না। অতএব বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার ইহা দ্বিতীয় কারণ।

তৃতীয়তঃ বিজাতীয় সংস্রব। যে সকল হিন্দুসন্তান পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া ইয়ুরোপাদি পাশ্চাত্য দেশে যাইতেছেন, অথবা কার্য্যানুরোধে পাশ্চাত্যগণের সহিত মিশিতেছেন, তাঁহারা জাতীয় আহার পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় রীতি অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা এক টেবিলে বসিয়া বিজাতীয় খাদ্য প্রফুল্লচিত্তে ভক্ষণ করিতেছেন। কেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এরূপ আহার-পদ্ধতি অনুমোদন করেন নাই, তাহা অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া মনে করিতেছেন। ইহার ফলে দেশের দোকানের চা-ভোজীদিগের ও হোটেলের সর্ব্বভুক্‌দিগের মধ্যে যক্ষ্মা প্রভৃতি কতকগুলি উৎকট সংক্রামক রোগ দ্রুতবেগে দেহে বিস্তারলাভ করিতেছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, চা'র দোকানে ও বিজাতীয় হোটেলে উচ্ছিষ্ট ভোজনের কি বিষময় ফল হইতেছে। গোময়োপলিপ্ত স্থানে পৃথক পৃথক পাতা পাতিয়া আহার করা হিন্দুসমাজের চিরন্তন রীতি; উহাতে উচ্ছিষ্ট ভোজনের সম্ভাবনা থাকে না, এবং গোময় যে সংক্রামকতা নাশক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপে বিজাতীয় সম্পর্কে নানা-বিধ বিজাতীয় ভাব ও রীতি আসিয়া হিন্দুসমাজের মহানিষ্ট সাধন করিতেছে। পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন না করিয়াও নিজের জাতীয়তা ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াও যে পাশ্চাত্যগণের সহিত কার্য্যানুরোধে মিশিতে পারা যায়, স্বর্গীয় ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় তাহার প্রকৃষ্টউদাহরণ।

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়া এই কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। (১) চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজই সামাজিক বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। (২) চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ ভগ্ন করিলে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব লোপ পাইবে ও যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফলকে উপেক্ষা করা হইবে। (৩) চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথা উন্নতি সাধনেরও সমধিক অনুকূল, প্রতিকূল নহে। এই সকল সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া স্বীকৃত হইলে, প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব উন্নতিকল্পে সম্যক্ উপায় অবলম্বনীয়, ইহা সুতরাং স্বীকার করিতেই হয়। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণজাতির উন্নতিকল্পে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা তজ্জাতীয়গণের অবশ্য বিধেয় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে কর্ম্মক্ষেত্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া লইলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের জ্ঞান ও ব্রাহ্মণ্য চরিত্রের উন্নতিকল্পে মেদিনীপুর প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসভা স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য, কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? নিম্নলিখিত তিনটী উপায় অবলম্বন করিলে কথঞ্চিৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

(১) যে সকল ব্রাহ্মণবালকের জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান আছে, তাঁহারা প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া কোন এক বা একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। (২) যাঁহাদের তাদৃশ সংস্থান নাই, তাঁহারা বর্ত্তমান রীতি অবলম্বন করিয়া স্কুল কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভে যত্নবান্ হউন, কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতে থাকুন। তাহাতে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইবে এবং ব্রাহ্মণ্যও অক্ষুন্ন থাকিবে। (৩) যাঁহাাদর পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধি শিক্ষা যথাযথরূপে লাভ করিবার সুযোগ নাই, তাহারা ব্যাকরণ ও সামান্য সাহিত্য পাঠ করিয়া যথাশাস্ত্র বিশুদ্ধভাবে পৌরোহিত্য অবলম্বন পূর্ব্বক দশকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন। যাঁহারা এই পৌরোহিত্য অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদিগকে কি লৌকিক, কি বৈদিক সমস্ত মন্ত্রগুলির যথাযথ অর্থ ও উচ্চারণ শিক্ষা করিতে হইবে। এই জ্ঞানের অভাবে বর্ত্তমান সময়ে পুরোহিতগণ যজমানের নিকট অশ্রদ্ধেয় হইতেছেন। এই ত্রিবিধ উপায় নির্দ্ধারিত হইল বটে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। ইহাই মূল সমস্যা। যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, শেষে অর্থের সমস্যা আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। সুতরাং ব্রাহ্মণসভা যদি এই মূল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন, তবেই ইহার অস্তিত্ব সার্থক হয়; নতুবা ইহা কথার কথা মাত্র; ইহা কেবল বচনেই পর্য্যবসিত হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে অর্থাগম হইতে পারে। প্রথমতঃ সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে চাঁদা সংগ্রহ হইতেই অর্থাগম হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদি সম্ভব হয়, মেদিনীপুর ব্রাহ্মণ সভাকে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার শাখাসভায় পরিণত করিয়া বঙ্গীয় সভা হইতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা বিধেয়। তৃতীয়তঃ বিবাহাদি ক্রিয়াকাণ্ড হইতে সভার জন্য কিছু কিছু বিদায় গ্রহণ করা ও তদুপলক্ষে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্বস্ত চরিত্রবান এক একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর উক্ত বিদায়গ্রহণ ও কেন্দ্রসভায় তাহ প্রেরণেরব্যবস্থা করা বিধেয়। চতুর্থ যাহারা কাব্য ভিন্ন ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, যথাসম্ভব তাঁহাদের কলিকাতায় বা অন্য কোন টোলে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ অর্থের সুসার হইবে। পঞ্চমতঃ যাঁহারা কলেজে বি, এ, পড়িতে চান, অথচ দরিদ্র, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। যাঁহারা সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহে অক্ষম, সভা হইতে তাঁহাদিগের নিমিত্ত আংশিক সাহায্য করা, আর যাঁহারা একান্ত অক্ষম, সাধ্যানুসারে এরূপ যে কয়জনের সাহায্য করা সম্ভব হয়, সভার তদ্বিষয়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ছাত্র যে অঞ্চল হইতে আসিবেন, সেই অঞ্চলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও অপর বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা বিধেয়। ষষ্ঠতঃ সভা কি করিতেছেন ইহা সাধারণের গোচর করা সভার একান্ত কর্ত্তব্য হইবে। ইহাতে সাধারণের সহানুভূতি সভার দিকে আকৃষ্ট হইবে। মধ্যে মধ্যে যদি মেদিনীপুরের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এক একটী সভা আহূত হয়, এবং সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী আলোচিত হয়, তাহা হইলে অনেকেই এই সভার সভ্য হইয়া সাহায্য

করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রসভা হইতে সুললিত প্রবন্ধ সেই অঞ্চলের কোন শ্রদ্ধের ব্রাহ্মণকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে তিনি সহজেই সভা আহ্বান করিয়া উহা পাঠ করিতে পারেন, এ ং পাঠান্তে আলোচ্য বিষয়ে সকলে তর্ক বিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। তাহাতে ক্রমে ক্রমে লোকের সভার প্রতি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সপ্তমতঃ, সাধারণ সভার অধিবেশন কেবল কলিকাতায় না হইয়া মধ্যে মধ্যে সুবিধা বুঝিয়া মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণপ্রধান কোন কোন গণ্ড গ্রামে হউক, এবং এই উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সুবক্তা ও গণ্যমান্য অধ্যাপক আনাইয়া বক্তৃতা ও আলোচনা করা হউক। আমার বিশ্বাস এরূপ অধিবেশন হইলে আমরা প্রকৃত দুই চারিটী সভার সাহায্যকারী সভ্য পাইতে পারিব। তাঁহাদের চেষ্টায় সভার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

অতঃপর ছাত্র, নির্ব্বাচনের প্রণালী বিষয়ে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। মধ্যপরীক্ষার ফল বাহির হইলে ব্যাকরণ, কাব্য ভিন্ন বিষয়ে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে সভা একজন দুইজন বা যে কয়জন ছাত্রের ভার লইতে পারিবেন, সেই কয়জনের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিবেন। পরে যোগ্য পাত্রে সাহায্য করিতে সচেষ্ট হইবেন। সেইরূপ মেদিনীপুরকলেজ হইতে যত ব্রাহ্মণ ছাত্র আই-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাত্র-নির্ব্বাচন করিয়া সভা তাঁহাদের সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। বর্ত্তমান অবস্থায় সভা যদি একটী ছাত্রকে টোলে ও একটী ছাত্রকে কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহাও করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সভার ক্ষীণ শক্তিতে যতটুকু করা সম্ভব হয়, সভাকে প্রাণপণে ততটুকু করিতেই হইবে। আমার বিশ্বাস, সভা অকপটভাবে যদি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব সভার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন, সভার এই ক্ষীণশক্তি কালে মহাশক্তিতে পরিণত হইবে।

সমবেত ব্রাহ্মণগণ! কার্য্যের গুরুত্বও স্ব স্ব শক্তির ক্ষীণতা মনে করিয়া আপনারা অনেকে হয় ত হতাশ হইতেছেন, এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাহা একান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি সকলে স্বজাতির উন্নতিকল্পে কৃতসঙ্কল্প হন, সেজন্য প্রত্যেকে অকপটভাবে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেব স্বয়ং আপনাদের সাহায্য করিবেন। অগ্রে মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা, পরে বাহিরের কার্য্য। পিপাসাতুর ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলের সন্ধান না পায়, ততক্ষণ সে ইতস্ততঃ জলের অনুসন্ধান করিবেই করিবে, কেহ তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। স্বজাতির উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করা একটা অলীক পরার্থপর চেষ্টা মনে করিবেন না। ইহাতে আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। উদর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বল্প আখ্যায়িকা আপনাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক অঙ্গের অবহেলায় সকল অঙ্গই শুষ্ক হইয়া মরিবে। জাতি অবয়বী সমগ্র দেহ, এই দেহের কোন অঙ্গে রোগের আক্রমণ হইলে, নিঃসন্দেহ সমগ্র দেহকে রুগ্ন ও ক্ষীণ করিয়া তুলিবে। যদি প্রবল ক্ষত একটী অঙ্গুলিকে আশ্রয় করে, উহা অনেক সময় সমগ্র শরীরকে ক্ষত-

দুষ্ট করিয়া মৃত্যুর পথে আনয়ন করে। সমাজদেহ অবিকল তদ্রূপ। সমাজে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের যোগ রহিয়াছে। কতকগুলি সম্বন্ধ কল্পোপ-ধারকরূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কতগুলি স্বরূপযোগ্য হইয়া আছে মাত্র, যে কোন সময়ে তাহা ঘনিষ্ঠতার আকার ধারণ করিতে পারে। অতএব ব্রাহ্মণ-সমাজকে জ্ঞানে ও চরিত্রে সমুজ্জ্বল করিতে না পারিলে আমরা কেহই উন্নতি করিতে পারিব না।

মহাশয়গণ! আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধে বলিতেছি, আপনারা নিরাশভাব পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যে উৎসাহিত হউন, নিশ্চয়ই আপনারা সফলকাম হইবেন। একটী সত্য ঘটনা আপনাদিগকে বলিতেছি, ইহা উপন্যাস নহে। একব্যক্তির মাতা মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, বাবা তুমি আমার একটী আদেশ পালন করিবে। এই গ্রামে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হয়, তুমি একটী জলাশয় খনন করিবে। মাতার মৃত্যু হইলে পুত্র মাতার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান্ হইল; কিন্তু একান্ত দারিদ্র্যহেতু জলাশয় খনন করাই-বার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া নিজেই একটী কোদাল ও একটী ঝুড়ি সংগ্রহ করিয়া জলাশয় খননে প্রবৃত্ত হইল। অবশ্য গ্রামবাসী সকলেই তাহার এই মূর্খতা দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিল। সেব্যক্তি নিরস্ত হইবার নহে, সে দিনের পর দিন সেইরূপই করিতে লাগিল। পরে তাহার এই সাধুসংকল্পের কথা এক ভূস্বামীর কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি নিজব্যয়ে এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইয়া দিলেন। অতএব সাধুকার্য্যের সহায় ভগবান্ তাহাতে অণু-মাত্র সন্দেহ নাই। আপনাদিগের আর অধিক কি বলিব, একটী প্রাচীন মহাজনবাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি—

আরভ্য তেন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈ
রারভ্য বিঘ্নবিহিতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানা
আরব্ধমুত্তমগুণা ন পুনস্ত্যজন্তি॥

যাহারা ক্ষুদ্রচেতা, তাহারা বিঘ্নের ভয়ে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, যাহারা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দৃঢ়চিত্ত, তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু বিঘ্ন আসিয়া বাধা প্রদান করিলে বিরত হইয়া পড়েন, কিন্তু যাহারা উত্তমগুণবিশিষ্ট, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন আসিয়া বাধা প্রদান করিলেও তথাপি আরব্ধকার্য্য পরিত্যাগ করেন না।

প্রার্থনা করি শ্রীব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণসমাজের কল্যাণ বিধান করুন, তাঁহার করুণাধারা অভিবৃষ্ট হউক, আপনাদিগের সাধুসঙ্কল্প তাঁহার কৃপায় জয়যুক্ত হউক।

শ্রীকুমুদবান্ধব বিদ্যারত্ন।

নবদ্বীপসমাজসম্মিলিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভাপরিগৃহীত ১৮৪০ শকাব্দীয় উপাধি ও পূর্ব্ব-পরীক্ষার ফল, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র, অধ্যাপক ও পরীক্ষকগণের নাম ও বৃত্তির পরিমাণ।

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	বিভাগ
শ্রীধ্রুবকান্ত মিশ্র	৬৲	শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ	সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা	জ্যোতিষ উপাধি	২য়
শ্রীশান্ত ঝা	০	শ্রীউপাধ্যায় ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্	ঐ	২য়
শ্রীসোমেশ্বর চৌধুরী	৮৲	শ্রীযোগী ঝা কাব্যতীর্থ	ঐ	কাব্য উপাধি	১ম
শ্রীঅতুলাক্ষ চক্রবর্ত্তী	০	শ্রীরাজকুমার কাব্যবেদতীর্থ	বীণাপাণি চতুষ্পাঠী কৈকালা, হুগলী	ঐ	২য়
শ্রীরামকৃষ্ণ ঝা	০	শ্রীযোগী ঝা কাব্যতীর্থ	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয় মেছুয়াবাজারষ্ট্রীট্	ঐ	২য়
শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়	৮৲	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যস্মৃতিতীর্থ	জেলেটোলা সিমলা	সংক্ষিপ্তসার উপাধি	১ম
শ্রীকপিলদেব মিশ্র	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র শাস্ত্রী	সাঙ্গবেদ বিদ্যালয় ব্রাহ্মণ সভা	সিদ্ধান্তকৌমুদী উপাধি	২য়
শ্রী[illegible]বান্ধব আচার্য্য	৫৲	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	কিশোরপুর, মেদিনীপুর	জ্যোতিষ পূর্ব্ব	১ম
শ্রীউমাকান্ত ঝা (খ)	০	শ্রীউপাধ্যায় ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়, মেছুয়াবাজারষ্ট্রীট্	ঐ	২য়
শ্রীরঘুনন্দন ঝা	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীজনার্দ্দন ঝা „	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীচন্দ্রশেখর মিশ্র „	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীআদিনাথ ঝা „	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীজিরেখন ঝা	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	বিভাগ
শ্রীসতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীশ্রীনাথ স্মৃতিরত্ন	কিশোরপুর, মেদিনীপুর	জ্যোতিষ পূর্ব্ব	২য়
শ্রীরামেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৫৲	শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ	বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা, কলিকাতা	কাব্যপূর্ব্ব	১ম
শ্রীগিরীশচন্দ্র উথাশনী	০	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদ কাব্যতীর্থ	বৈদিকাশ্রম, অশ্বত্থতলা মেদিনীপুর	ঐ	২য়
শ্রীতারকনাথ মিশ্র	০	শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	তোটানালা মেদিনীপুর	ঐ	২য়
শ্রীমণীন্দ্রনাথ আচার্য্য	০	শ্রীতারকনাথ কবিরত্ন	বাঘাতটা মেদিনীপুর	ঐ	২য়
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পাহাড়ী	৫৲	শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	তোটানালা, মেদিনীপুর	সংক্ষিপ্তসার পূর্ব্ব	১ম
শ্রীবনমালী দাস	৫৲	ঐ	ঐ	ঐ	১ম
শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য	৪৲	ঐ	ঐ	ঐ	১ম
শ্রীরজনীকান্ত কর	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীতারকনাথ কবিরত্ন	বাঘাতটা মেদিনীপুর	ঐ	২য়
শ্রীলক্ষ্মীনাথ মিশ্র	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র শাস্ত্রী	সাঙ্গ বেদ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণ-সভা	সিদ্ধান্ত কৌমুদী পূর্ব্ব	২য়
শ্রীরামাধীন ঝা	০	শ্রীযোগী ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়, মেছুয়াবাজারষ্ট্রীট্	ঐ	২য়
শ্রীচক্রধর শর্ম্মা	০	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীসারদাদত্ত মিশ্র	০	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র শাস্ত্রী	সাঙ্গ বেদবিদ্যালয় ব্রাহ্মণ-সভা	ঐ	২য়
শ্রীসর্ব্বনারায়ণ ঝা	০	শ্রীযোগী ঝা	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়, মেছুয়াবাজারষ্ট্রীট্	ঐ	২য়

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	বিভাগ
শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	তোটানালা, মেদিনীপুর	সারস্বত পূর্ব্ব	২য়
শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীনীলকণ্ঠ বাচস্পতি	বাণী চতুষ্পাঠী, কাখুরিয়া বাড়ী	মুগ্ধবোধ পূর্ব্ব	২য়
শ্রীঅমূল্যধন ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ	সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা	ঐ	২য়
শ্রীকালিদাস শাণ্ডিল্য	৫৲	শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ	বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা, কলিকাতা	কলাপ পূর্ব্ব	১ম
শ্রীকালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ	বাণীচতুষ্পাঠী কাখুরিয়া বাড়ী	স্মৃতিপূর্ব্ব	২য়
শ্রীঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৲	শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	রুক্মিণীটোল, ঈশ্বরপুর, মেদিনীপুর	কর্ম্মকাণ্ডপূর্ব্ব	১ম
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীমহেন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য বিশারদ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ অধিকারী	০	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ	বৈদিকাশ্রম, অশ্বত্থতলা	পুরাণপূর্ব্ব	২য়
শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাহাড়ী	০	শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	তোটানালা মেদিনীপুর,	ঐ	২য়
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	ঈশ্বরপুর, রুক্মিণীটোল মেদিনীপুর	ঐ	২য়
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীরমানাথ বিদ্যাভূষণ	ঈশ্বরপুর, রুক্মিণীটোল মেদিনীপুর	সাংখ্যপূর্ব্ব	২য়
শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য্য	০	শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	রুক্মিণীটোল ঈশ্বরপুর, মেদিনীপুর	মীমাংসাপূর্ব্ব	২য়

অধ্যাপক বৃত্তি	বৃত্তি
(উপাধি পরীক্ষায়)	
শ্রীযোগী ঝা	১২৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যস্মৃতিতীর্থ	৮৲
শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ	৬৲
শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্রশাস্ত্রী	৬৲
শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ	১৫৲
(পূর্ব্ব পরীক্ষায়)	
শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	১০৲
শ্রীউপাধ্যায় ঝা	৮৲
শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	৭৲
শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ	৬৲
শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ	৫৲
শ্রীতারকনাথ কবিরত্ন	৫৲
(পরীক্ষক বৃত্তি)	
শ্রীবহুবল্লভ শাস্ত্রী	২৲
শ্রীচন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন	২৲
শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমণি	২৲
শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ	২৲
শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	২৲
শ্রীআশুতোষ শিরোরত্ন	২৲
শ্রীদ্বারকানাথ ন্যায়শাস্ত্রী	৩৲
শ্রীদুর্গাসুন্দর কৃত্তিরত্ন	২৲
শ্রীরামপদ জ্যোতিঃশাস্ত্রী	[illegible]

পরীক্ষক	বৃত্তি
শ্রীজগদীশ স্মৃতিতীর্থ	২৲
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	২৲
শ্রীরমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ	২৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	২৲
শ্রীযামিনীনাথ তর্কবাগীশ	২৲
শ্রীবিশ্বনাথ তর্কভূষণ	২৲
শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ	২
শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	৩
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি	৩৲
শ্রীকৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ	২৲
শ্রীজগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ	৫৲
শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৩৲
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র	৩৲
শ্রীশিতিকণ্ঠ বাচস্পতি	৩৲
শ্রীশশিভূষণ শিরোমণি	২৲
শ্রীসারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ	২৲
শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ	২৲
শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ	২৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী	২৲
শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ	২৲
শ্রীঅন্নদাচরণ মীমাংসাতীর্থ	২৲
শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ	২৲
শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ	২৲
শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ	২৲

সংবাদ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার অন্যতম সম্পাদক মান্যবর কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিনিধিরূপে এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত প্যাটেলমহোদয়ের প্রবর্ত্তিত অসবর্ণ-বিবাহ বিলের প্রতিবাদ জন্য আহূত সাধারণ হিন্দুসভার সম্পাদকরূপে ইংরাজীভাষায় লিখিত যে আবেদন পত্রে হিন্দুসাধারণের স্বাক্ষর প্রার্থনা করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ—

মহামহিমমহিমান্বিত মহামান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত

ফ্রেডারিক জন নেপিয়ার থিসিজার,

ব্যারণ চেম্‌স্‌ফোর্ড,

পি, সি; জি এম্‌, এস্‌ আই; জি, সি, এম্‌, সি;

জি, এম্‌, আই, ই; জি, বি, ই;

ভাইস্‌রয় ও ভারত সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনারেল

মহোদয় সমীপেষু—

হিন্দু-সমাজভুক্ত নিম্নস্বাক্ষরকারিগণের বিনীত

আবেদন পত্র দ্বারা

সবহুমান নিবেদন এই যে—

হিন্দুসমাজে প্রচলিত আচার ব্যবহার বা শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহ বৈধ হইবে, এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় ভি, জে-প্যাটেল মহাশয় হিন্দু-বিবাহ-সম্বন্ধীয় আইনের যে একটী পাণ্ডুলিপি (বিল) উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে আবেদনকারিগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছেন।

উপরিউক্ত বিলে যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মূল নীতির প্রতিকূল ও হিন্দুজাতির সংস্কার বিরুদ্ধ এবং তদ্দ্বারা সমগ্র হিন্দুজাতির সামাজিক ভিত্তি সমূলে উৎখাদিত হইবে।

অসবর্ণ-বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা নিষিদ্ধ; যদি ইহা বৈধ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের চিরসমাদৃত সনাতন সামাজিক প্রথার প্রতিকূলাচরণ এবং হিন্দুর চির-প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিনাশ-সাধন করা হইবে।

বিবাহ হিন্দুসমাজের ধর্ম্মঘটিত সংস্কার ও পবিত্র শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত; ইহা আদৌ পার্থিব বন্ধন নহে, উপরন্তু অতি পবিত্র ও আধ্যাত্মিক বন্ধন। হিন্দু মহিলারা বিবাহদ্বারা কেবলমাত্র পতির আহার বিহার এবং শয্যাসঙ্গিনী বলিয়াই পরিগণিত নহেন, তাঁহারা পতির আধ্যাত্মিক জীবনের সহায় ও তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান সহচারিণী, এবং এই নিমিত্তই তাঁহারা সহধর্ম্মিণী বলিয়া পরিজ্ঞাতা।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর কেবলমাত্র বৈধ বংশধর কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইলেই পরলোকগত আত্মার সদ্গতি হয়; এই শ্রাদ্ধ যথাশাস্ত্র বিবাহিত সমবর্ণ-দম্পতীর সন্তান ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে আত্মার সদ্গতি হয় না। হিন্দুসমাজের সকল শ্রেণীতেই প্রকৃত শ্রাদ্ধাধিকারই উত্তরাধিকার নিরূপণের মূল উপাদান, কিন্তু প্রস্তাবিত বিধি আইনানুমোদিত হইলে হিন্দুর বিবাহ ও দায়ভাগ বিধির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে।

হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ একান্নবর্ত্তী-পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে; সুতরাং অসবর্ণবিবাহ-প্রসূত সন্তানগণ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, হিন্দুর গৃহে সামাজিক ব্যাপার ও কৌলিক দেবার্চ্চনা ইত্যাদি লইয়া বিষম গোলযোগের কারণ সৃষ্ট হইবে এবং এই ব্যপদেশে কলহ হইয়া শান্তিভঙ্গ হওয়াও বিচিত্র নহে। আবার বহুতর দেবালয় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সেবাইতগণ উত্তরাধিকারসূত্রে সেবাধিকার লাভ করেন; এইরূপ স্থলে অসবর্ণ-বিবাহ আইনানুমোদিত হইলে, ঐ বিবাহের সন্তানগণও ঐ সকল দেবালয় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সেবাধিকার গ্রহণ করিবে; দেবালয় প্রভৃতিতে এইরূপ ব্যক্তির দ্বারা সেবা বা পৌরোহিত্য কার্য্যাদি সাধিত হইলে, তাহা হিন্দুজনসাধারণের অত্যন্ত ক্রোধের কারণ হইবে এবং তাহাতে সাধারণ শান্তিভঙ্গ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

অসবর্ণবিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য কোনরূপ আইনের আবশ্যকতা বা প্রয়োজনীয়তা হিন্দু-জনসাধারণ আদৌ উপলব্ধি করেন না; এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের একবিংশ আইন ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় আইন বিধিবদ্ধ থাকায়, যাহারা ভিন্ন বর্ণে বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যও এইরূপ আইনের প্রয়োজন নাই।

পরলোকগতা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে মহতী ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে তদীয়া কর্ম্মচারিবৃন্দের প্রতি এই মর্ম্মে আদেশ ছিল যে কোনও কর্ম্মচারী কোনও প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, কেহ তাহা করিলে, তাহা তাঁহার নিতান্ত অসন্তোষের কারণ হইবে। পুনরায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড এই ঘোষণার সমর্থন করিয়া উহাকে আরও সুদৃঢ় করেন। এই সকল ঘোষণার ফলে হিন্দুসমাজ বহুদিন যাবৎ স্বীয় সামাজিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সুখে, শান্তিতে ও নিরাপদে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলমহাশয়ের "হিন্দু (অসবর্ণ) বিবাহ বৈধীকরণ বিল" বিধিবদ্ধ হইলে পরলোকগত সম্রাট ও মহারাণীর পূর্ব্বোক্ত আশ্বাসবাণীর সাক্ষাৎ প্রতিকূলাচরণ করা হইবে, এবং ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ না করা সম্বন্ধে যে নীতি এতদিন অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা হইবে।

অতএব নিম্নস্বাক্ষরকারী বিনীত আবেদনকারিগণের সানুনয় প্রার্থনা এই যে:—

(১) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিলের প্রসঙ্গ যাহাতে আর অধিক অগ্রসর না হইতে পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয় এবং (২) হিন্দু-

সমাজকর্ত্তৃক সুস্পষ্ট ও সমবেতভাবে প্রার্থিত না হইলে, হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্মবিশ্বাসগঠিত কোনও আইনের প্রসঙ্গ ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভাসমূহে ভবিষ্যতে উপস্থাপিত না হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।

এইরূপ দয়া ও অনুকম্পা প্রকাশিত হইলে আবেদনকারিগণ কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল (ভগবৎ সমীপে) মহোদয়ের শুভকামনা করিবেন।

শ্রীরামেশ্বর সিংহ, দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর। শ্রীগিরিজানাথ রায়, দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর। শ্রীক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, নদীয়ার মহারাজ বাহাদুর। শ্রীগুরু মহাদেব আশ্রম সাহী, হাতুয়ার মহারাজ বাহাদুর। শ্রীশশিশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুরের রাজাবাহাদুর। শ্রীবনবিহারি কাপুর, রাজাবাহাদুর। শ্রীপ্রমথভূষণ দেব রায়, নলডাঙ্গার রাজাবাহাদুর। শ্রীগোপাললাল রায়, তাজহাটের রাজা বাহাদুর। শ্রীশ্রীনাথ রায়, ভাগ্যকুলের রাজা। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, শোভাবাজারের রাজা শ্রীজগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছার রাজা। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, চাঁচলের রাজা। শ্রীমণীলাল সিংহ রায়, চকদীঘির রাজা। শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, মহারাজ বাহাদুর। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুর। শ্রীজগদীন্দ্রনাথ রায়, নাটোরের মহারাজ বাহাদুর। শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সুসঙ্গের মহারাজ বাহাদুর। শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, লালগোলার রাজাবাহাদুর। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, নশীপুরের রাজাবাহাদুর। শ্রীযতিপ্রসাদ গর্গ, মহিষাদলের রাজাবাহাদুর। শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার রাজা। শ্রীনরেন্দ্রলাল খাঁ, নাড়াজোলের রাজা। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রায়, রামগোপালপুরের রাজা। শ্রীকিশোরীলাল গোস্বামী, শ্রীরামপুরের রাজা। শ্রীহৃষীকেশ লাহা, রাজা। শ্রীসত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, হেতমপুরের রাজা। শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায়। শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায়। শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায়। শ্রীসদাশিব মিশ্র, মহামহোপাধ্যায়। শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায়। শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়। শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়। শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রাথমিক শিক্ষা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় প্রস্তাব করেন যে বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের অনুকরণে বঙ্গদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা উন্মুক্ত স্থানে প্রবর্ত্তিত হউক। প্রস্তাবটী মূল্যবান, সন্দেহ নাই। স্বল্পপরিসর বদ্ধ পাঠশালায় বহুক্ষণ অবস্থান শিশুদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। তবে বিহার ও উড়িষ্যার জল বায়ু বঙ্গদেশের জলবায়ু অপেক্ষা প্রায়শঃ শুষ্ক ও উৎকৃষ্ট এবং তথায় স্বভাবপরিষ্কৃত ভূমির অসদ্ভাব নাই বলিয়া

উন্মুক্ত স্থানে পাঠশালাস্থাপনের সুবিধা আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে, এক পশ্চিম রাঢ়ের কতক স্থান ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ স্থানই আর্দ্র, বনাকীর্ণ বা পচা ডোবায় পূর্ণ। এইরূপ স্থলে উন্মুক্ত স্থানে পাঠশালাস্থাপন শিশুদিগের স্বাস্থ্যোপযোগী কি না বিবেচ্য; তবে এই ব্যবস্থার আর একটা দিক্ শুভ বলিয়া বোধ হয়। এই যে বাঙ্গালীর পল্লীসমাজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে আজ নির্জীব, অবিশুদ্ধপানীয় জল, আওতাযুক্ত বদ্ধ জলাভূমি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। পাঠশালার খাতিরে এঁধো পুকুরের পঙ্কোদ্ধার ও তাহার চারি পাশের বন জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে, পাটপচা জলের দুর্গন্ধ বাতাসের পরিবর্ত্তে নির্ম্মল বায়ু ভোগ করিবার সুবিধা পাইলে, প্রতি গ্রামে অন্ততঃ খানিকটা মুক্ত পরিষ্কৃত ভূমি থাকিলে, পল্লীবাসী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। বস্তুতঃ অনেক পল্লীগ্রামে বাহিরে বেড়াইবার বা বসিবার উপযুক্ত ফাকা জায়গা পাওয়া দুষ্কর। প্রাথমিক শিক্ষার অনুরোধে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে দেশের মঙ্গল।

এই প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশুহৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার বীজ উপ্ত হয় সে দিকে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকিলে পরিণামে সমাজে শান্তির আশাও করা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

নিবেদন—গত মাঘ' ফাল্গুন সংখ্যা ব্রাহ্মণসমাজ-পত্রিকা প্রকাশে এইবার অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে। তাহার কারণ—আমাদের প্রেসের কর্ম্মচারিগণ ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাক্রান্ত হইয়া এক মাসের অধিককাল শয্যাগত ছিল। সেই সময় ঐ রোগের এত প্রাদুর্ভাব যে নূতন ঠিকালোক নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালানও দুরূহ হইয়া উঠে। উপস্থিত ভগবদিচ্ছায় তাহারা আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় কার্য্যারম্ভ করিয়াছে। আমরা আশা করি এখন হইতে পূর্ব্বনিয়মে পত্রিকা প্রকাশে সমর্থ হইব। অনুগ্রাহক গ্রাহকগণ দৈববিড়ম্বনায় এই বিলম্বজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

ব্রাঃ সঃ সঃ

হাওড়া-সহরে

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।

দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন ও প্রদর্শনী।

আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, হাওড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক একটী প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যানুরাগী সুধী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই সম্মিলনে যোগদান করেন, সহায় হন—ইহাই প্রার্থনা। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রথমে প্রবন্ধের বিষয়টি আমাদিগকে জানাইবেন, এবং সত্বর প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিবরণ সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য-সামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র দ্বারা আপনাপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী

সম্পাদক অভ্যর্থনা সমিতি।

পদক পুরস্কার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে

পদক প্রবন্ধের বিষয়

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

(২) ঠাকুরদাস দত্ত-সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

(৩) [illegible] সুবর্ণপদক—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।

(৪) রামগোপাল-রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য-সমালোচনা।

(৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

(৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্যপদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎ-সংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

পুরস্কার।

(৭) রাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারত-বর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

(৮) শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্র সভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির
২৪৩।১ অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীরায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক,
[illegible] কলিকাতা।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

কলিকাতা—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ-সভা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ---সপ্তম সংখ্যা।

চৈত্র।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৫ সাল।

চৈত্র সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

REGISTERED No. C—675

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪০ শক, ১৩২৫ সাল, চৈত্র। } সপ্তম সংখ্যা।

কর্ম্ম-সমাপ্তি।

আমার—

যে কাজ সাধিতে এ মর-জগতে
পাঠিয়ে দিয়েছ হে দেব তুমি,
বিনা সংজ্ঞান, অসৎ অজ্ঞান
পারিব কি তাহা সাধিতে আমি?
আমরা সকল ক্ষীণ হীন-বল,
আমরা যে তব সাকার-অংশ
তুমি হে সবার হেতু, নিরাকার
আমরা তোমার কার্য্য বংশ।
বাসনার বলে অবিদ্যা-আঁচলে
আমরা রয়েছি চির আবদ্ধ,
অপূর্ণ আমরা, পূর্ণতা ছাড়া
কেমনে কর্ম্ম সাধি আরব্ধ?
'তুমি' 'আমি' বোধ পাইলে নিরোধ
হয়ে এক হ'য়ে যাব হে যবে,
না রবে তখন কর্ম্ম কখন
চিরতরে কর্ম্ম সমাপ্তি হবে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

ঈশ্বরের সাকারবাদ।

শিষ্য—ঈশ্বর কেমন?

গুরু—তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ নির্গুণ।

শিষ্য—"তিনি" সাকারবোধক সর্ব্বনাম। ঈশ্বর শব্দও সাকারবোধক। যাহার আকার আছে, তাহার বিকারও আছে, গুণও আছে, বিশেষণও আছে। তবে ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ হয় কি প্রকারে?

গুরু—তিনি—

সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্ মনসগোচরং

তাঁহার আকারও নাই, বিকারও নাই, কিন্তু সত্তা আছে। তিনি মন বাক্যের অতীত হইলেও তাঁহার সত্তা বোধার্থে তাঁহাতে সাকারবোধক শব্দ প্রযোজ্য।

শিষ্য—যাহা বাক্যমনের অগোচর তাহার সত্তা স্বীকার করি কেন?

গুরু—তিনি—

অসৎ ত্রিলোকী সগুণং

নশ্বর জগতের মূলদেশে সৎস্বরূপে তিনি বিদ্যমান আছেন; তাঁহা হইতেই নশ্বর জগতের বিকাশ। ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে বিলীন হইলেও কূটস্থ ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন। তাঁহা হইতেই জগতের পুনর্ব্বিকাশ হয়; সুতরাং তিনি মনোবাক্যের অগোচর হইলেও তাঁহার সত্তা অস্বীকার করা যায় না। নির্ব্বিশেষ হইলেও তাঁহাকে বিশেষণ বিশেষ দ্বারা বিশেষিত করিতে হয়।

শিষ্য—নিরাকার ঈশ্বর হইতে সাকার জগতের বিকাশ কি অসম্ভব নয়?

গুরু—সাকার জগৎ বিভাজ্য। জাগতিক যে কোন পদার্থ বিভাগ করিতে করিতে অবশেষে অদৃশ্য ও নিরাকারে পরিণত হয়। ইহাতেই বোঝা যায় যে নিরাকারই সাকারের আদ্যবস্থা। সাকার বিভাজ্য, নিরাকার অবিভাজ্য। এই অবিভাজ্য নিরাকারই ঈশ্বর। নিরাকার হইতেই সাকারের উদ্ভব।

শিষ্য—ভগবৎ সত্তা নিশ্চিতরূপে জানিবার কোন উপায় আছে কি?

গুরু—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল, কলিতে নাই। ঈশ্বর জ্ঞানগম্য। সমাধিযোগে তাঁহাকে জানা যাইতে পারিত।

সমাধিযোগৈ স্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদর্শিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্ব্বিকল্পৈর্দেহাত্ম ধ্যানবর্জ্জিতৈঃ॥

শিষ্য—সমাধিযোগ ও জ্ঞান কাহাকে বলে? এবং কলিতে তাহা না হইবার কারণ কি?

গুরু—বিষয়ভ্রান্ত মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক কেবলমাত্র ঈশ্বরে সংস্থাপনের নাম সমাধি। সমাধির পরিপাকাবস্থার নাম জ্ঞান। কলিতে বিষয়ের অত্যাসক্তি হেতু লোক সকল পাপানুষ্ঠায়ী হওয়ায় সমাধিতে অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য পরমপবিত্র ভগবৎ-জ্যোতিঃ অত্যুজ্জ্বলভাবে হৃদ্দেশে অবস্থিত থাকিয়াও তাহা লোকের চিত্তফলকে প্রতিফলিত হয় না।

শিষ্য—সমাধি ভিন্ন ভগবানকে জানিবার কি অন্য উপায় নাই?

গুরু—আরো উপায় আছে, তাহাও যোগ নামে কথিত—

রাজযোগঃ সমাধিশ্চ একাত্মা সাধ্যসাধনং।
তন্মনঃ সহজাবস্থা সর্ব্বে চৈকাত্মবাচকাঃ॥

শিষ্য—যোগ কাহাকে বলে?

গুরু—চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ—

যোগ শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ

মনের পাঁচ অবস্থা ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, সমাধি।

ক্ষিপ্ত—মনের স্বাভাবিক চঞ্চল অবস্থা। এই অবস্থায় মন অতৃপ্ত তৃষ্ণাতাড়নায় নিরত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করে। মূঢ়—ভ্রম বা মোহাবস্থা, এ অবস্থায় মন মিথ্যাকে সত্য মনে করে, নশ্বর জীবন, ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক বৈভব নিত্যজ্ঞানে তদাসক্ত হয়।

বিক্ষিপ্ত—বিষয় বিশেষে নিবেশ।

একাগ্র—মনকে বিষয়বিচ্যুত ও বিশুদ্ধ করিয়া অনন্যভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বরে সংস্থাপন।

সমাধি—একাগ্রতার পরিপাক ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃতি। কলিতে ১ম ২য় ৩য় অবস্থা সাধ্য, ৪র্থ ৫ম অবস্থা অসাধ্য। যাহারা একাগ্র ও সমাধির চেষ্টা করে, তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া কপটাচারে লোকের ভ্রমোৎপাদনে প্রয়াস পায়।

শিষ্য—যাহাতে আমরা অনধিকারী, তাহা শুনিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর যদি মনোবাক্যের অগোচর, তবে কি তিনি একেবারেই ধ্যানধারণার অতীত?

গুরু—না। তিনি স্বরূপাবস্থায় ধ্যানধারণার অতীত হইলেও তটস্থাবস্থায় জ্ঞাতব্য।

যতো বা বিশ্বং সম্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥

তটস্থভাবে তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কারিণী শক্তি অবলম্বনে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়; কিন্তু পরাপ্রকৃতির সহিত মিলিত হইলে সক্রিয় ও সগুণ। তদবস্থায় ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে তিনি জগৎস্রষ্টা। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার ইচ্ছায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য—নিরাকারের কি ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পারে?

গুরু—ঐশ্বরিক ভাব মনুষ্যবুদ্ধির অনায়ত্ত, তন্নিমিত্ত আমরা নিরাকারের ইচ্ছাশক্তি বুঝিতে পারি না বটে; কিন্তু আকারাশ্রিত নিরাকারের ইচ্ছাশক্তি বুঝিতে পারি। যেমন আমি তুমি নিরাকার, কিন্তু আকারাশ্রিত। তুমি আমি যতক্ষণ আকারাশ্রিত, ততক্ষণ ইচ্ছাশক্তিযুক্ত; নিরাকারাবস্থায় সে শক্তি থাকে কি না, জানি না। তথাপিও মনে হয় যেন থাকে। তজ্জন্য আমরা বিচ্যুতদেহ পিতৃলোকের পূজা করিয়া থাকি।

পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং
বিমুক্তিদা যে ন ভিসংহিতেষু॥

শিষ্য—ইহাও ত নিরাকারের উপাসনা নয়? মূর্ত্তিবিশেষ কল্পনা করিয়াই তো পূজা?

গুরু—যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি মূর্ত্তি থাকিতে পারে? মূর্ত্তি ভৌতিক পদার্থ, তাহা লইয়া কেহ পরলোক গমন করিতে পারে না। তথাপিও নিরাকার আমাদিগের ধ্যানধারণার অতীত বলিয়া আমরা পরলোকগত নিরাকারে ও আকার কল্পনা করি। নিরাকার ঈশ্বরেরও সেই প্রকার রূপকল্পনা না করিলে উপাসনা করা যায় না। যাহারা কোন ক্রমেই রূপকল্পনা করিতে চায় না, তাহারাও প্রকারান্তরে রূপ কল্পনা করে, যেমন—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

শিষ্য—পিতৃপুরুষগণ আমাদিগের ন্যায়ই আকারবিশিষ্ট ছিলেন। এখন তাঁহারা বিদেহ হইলেও আমরা তাঁহাদের সেই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু ঈশ্বরের যে জ্ঞানময় মূর্ত্তির কথা বলিলেন, তাহা তো ধারণায় আসে না।

গুরু—তুমি তোমার মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে বটে; কিন্তু অনেকে তাহা চান না। ব্রহ্মজ্ঞানী প্রকাশ করিয়া নিরীশ্বরবাদী হয়; যাহা ধ্যানধারণার অতীত; তদ্ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া কিছুকাল 'নাই নাই আছে আছে' ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে ঘোর অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে। এইরূপ নিরাকারবাদ বর্ত্তমানে ভগবদ্বিশ্বাসের ঘোর অপচয় সংঘটন করিয়া সংসারে পাপের প্রাবল্য সংস্থাপন করিয়াছে। লোকসকল অনুচিত বিষয়াসক্ত, পরমার্থকে অসার কল্পনা মনে করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অর্থানুরাগী; যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার পক্ষে সেই ভাবেই ঈশ্বরের আ ধনা করা উচিত। কলিতে সাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রশস্ত; নিরাকারবাদ নিরীশ্বরবাদের প্রকার ভেদ মাত্র।

শিষ্য। ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহাকে সাকারভাবে চিন্তা করিব কি প্রকারে ?

গুরু। তুমি আমি নিরাকার হইয়াও যেমন সাকারাশ্রিতভাব চিন্তানীয় ; ঈশ্বরও তেমনই নিরাকার হইয়াও সাকার, তিনি সরূপ, তিনি বিশ্বরূপ। সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাও সকলই তাঁহারই রূপ। তিনি নিত্যচৈতন্যরূপে সর্ব্বঘটে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে স্বরূপ-ভাবে চিন্তা করা যাইবে না কেন ? তিনি সর্ব্বঘটে নিয়ত চৈতন্যময়ভাবে বিরাজমান থাকিয়া সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়া তিনি আবার সাক্ষীস্বরূপ, তজ্জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে,—

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ, দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রি চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তং॥

ঈশ্বর সর্ব্ব ঘটে বিরাজমান থাকিয়া সকলই দেখিতেছেন, সকলই বুঝিতেছেন, যে যেখানে যে অবস্থায় যাহাই করুক না কেন, তাহার কিছুই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের অবিদিত নাই। তিনি সকলেরই অন্তরাত্মা, সকলেরই বহিরাত্মা।

শিষ্য—আমাদিগের মন ছোট, তাহাতে ওরূপ অনন্তবিস্তৃত বিশ্বরূপের ধারণ অসম্ভব।

গুরু—মন স্থিতিস্থাপক পদার্থ। উহা যেমন সংকীর্ণ, চেষ্টা করিলে তেমনিই বিস্তৃতও হইতে পারে। যাহারা তাদৃশ চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়া মনকে বিশ্বরূপ ধারণেরউপযোগী করিতে পারে, তাহারা 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' দেখিতে পায়। বৈষম্যময়জগৎ সম্বন্ধে অভেদ ব্রহ্মরূপ ধারণ করে ; কিন্তু সেই

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

ভাব বড়ই দুর্লভ, কলিতে তাহা হইতে পারে না। এখন যাহারা 'সোঽহং জ্ঞানী' তাহা-দিগকে ভণ্ড বলিয়া জানিও, ভগবদুপাসকগণমধ্যে তাহারা গণ্য নহে। তাহারা নিকৃষ্ট ও নিন্দিত।

শিষ্য—সংসরে উপাসক নানাপ্রকার। কেহ নিভৃতে, কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অরণ্যে, কেহ লোকালয়ে,কেহ সমাজে,কেহ মস্‌জিদে,কেহ গির্জ্জায় উপাসনা করে; কেহ বা বৃক্ষপ্রস্তর-খণ্ড মূর্ত্তিবিশেষের পূজা করে। কেহ পূজার্থে মদ খায়, কেহ সংযম করে, কেহ উপবাসী থাকে, কেহবা খাদ্যাদির বিপুল আয়োজন করে, কেহ গগনভেদী উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করে, কেহ বা মনে মনে ভগবানের নাম জপ করে। কেহ ফুল দুর্ব্বাদল, বিল্বপত্রাদি দ্বারা পূজা করে, কেহ বা কাঠির মাথায় জবাফুল দিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে, কেহ বা তুলসীতলায় গড়াগড়ি দেয়। ফলতঃ ঈশ্বরের আরাধনাপ্রণালী অসংখ্যপ্রকার। ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ ?

গুরু—ভগবৎ আরাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নাই। যে যেরূপ ভাবে পূজা করে, বাস্তবিক ভগবদুদ্দেশে কৃত হইলে তাহার সকলই শ্রেষ্ঠ, সকলই ভগবানে পৌছে। ভগবান নানারূপ,

তিনি সর্ব্বরূপ, যে তাঁহাকে যেরূপভাবে দেখিতে চায়, তিনি ঠিক সেইরূপ। যে তাঁহাকে যে প্রকারে পূজা করিতে ভালবাসে, তিনিও তাহার সেইরূপ পূজা বিশুদ্ধ ও প্রীতিকর বলিয়া গ্রহণ করেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থঃ সর্ব্বশঃ॥

স্বরূপ ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু নিরাকারের ভজন-পূজন কিছুই নাই; আকারবিশেষের আশ্রয়ে তাঁহার ধ্যান পূজা করিতে হয়। তিনি সর্ব্বঘটেই পরিব্যাপ্ত আছেন, সুতরাং যে তাঁহাকে যেরূপে চিন্তা করে, তিনি সেইরূপেই তাহার পূজা গ্রহণ করেন।

শিষ্য—যাহারা রূপ কল্পনা করে না?

গুরু—তাহারা পূজাও করে না।

শিষ্য কেবল হিন্দুই মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করে; মুসলমান খৃষ্টান, ব্রাহ্ম ইহারা কি ঈশ্বরের পূজা করে না?

গুরু—তাহারাও মূর্ত্তি কল্পনা করে। মুখে বলে ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু চিন্তা করে সাকার। ব্রহ্মই বল, আল্লাই বল, আর গড্ই বল, যাহাই বলনা কেন, বিশেষণ মাত্রই আকারজ্ঞাপক। যে ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি "হে ঈশ্বর" বলিলে একটা মূর্ত্তি লক্ষ্য করা হয় কি না?

শিষ্য—যদি সকলেই মূর্ত্তিপূজক, তবে তাহারা হিন্দুকে জড়োপাসক বলিয়া উপহাস করে কেন?

গুরু—উহা তাহাদিগের কপটতা, দুর্ব্বুদ্ধি বা ভ্রম। মূর্ত্তিপূজায় দোষারোপ ভগবদ্বিশ্বাসের ক্ষীণতা প্রকাশক।

শিষ্য—তাহাদিগের মধ্যেই কি বিশুদ্ধ ঈশ্বরবিশ্বাসী নাই?

গুরু—থাকিবেনা কেন, তাহাদিগের মধ্যেও প্রকৃত ভাগবৎ আছে। যাহারা প্রকৃত ভাগবৎ, তাহারা মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করেনা, বরং ঈশ্বরারাধনার পক্ষে মূর্ত্তিপূজাই প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করে। যাহারা ঈশ্বর মানে, তাহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং, আমি যে মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের পূজা করিতেছি, ঈশ্বর যে তাহাতেও আছেন, কোন ঈশ্বরবিশ্বাসীই তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। যে তাহা বিশ্বাস করে না, সুতরাং আমার ইষ্টমূর্ত্তিকে পুতুল বা জড়পদার্থ বলিয়া মনে করে, সে ভণ্ড; ঈশ্বরে তাহার বিশ্বাস নাই। বাহ্যিক ধার্ম্মিকের ভাবে লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া যায়, অন্তর্য্যামী ভগবান বাহ্যিক আড়ম্বরে ভোলেন না। যে তোমাকে পৌত্তলিক বা জড়োপাসক বলিবে, নিশ্চয় জানিও তাহার কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস নাই। সে নাস্তিক, সে ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করে না, সে নিজে যে ধর্ম্মাবলম্বী, সে ধর্ম্মেও তাহার আস্থা নাই।

শিষ্য—আমার ধর্ম্মে তাহার আস্থা না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজ ধর্ম্মেও যে তাহার বিশ্বাস নাই, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব?

গুরু—যে মনে করে আমার ইষ্টমূর্ত্তিতে ঈশ্বর নাই, সে ঈশ্বরের বিশ্বসর্বব্যাপিত্বে অনাস্থা-বান্। প্রত্যেক ধর্মের সারতত্বে চৈতন্যময় ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব মুক্তকণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত। তাহা বিশ্বাস করে না, সে তাহার নিজ ধর্ম্মও বিশ্বাস করে না।

শিষ্য—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহাকে সৃষ্টি করিবার আমাদিগের কি অধিকার?

গুরু—আমরা তাঁহাকে সৃষ্টি করি না, তাঁহারই অংশবিশেষের পূজা করি মাত্র। তুমি যাহাকে ভালবাস, তুমি তাহাকে তোমার মনের মতন করিয়া সুসজ্জিত কর। মূর্ত্তি গঠনও তাই। ঈশ্বর বিশ্বরূপ, সর্ব্বরূপ। জড়জগৎ তাঁহারই অঙ্গবিশেষ। এই অঙ্গসমূহের সংযোজন বিশ্লেষণদ্বারা যে মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহা বাস্তবিক গঠন নহে, সাজান মাত্র। আমাদিগের সাজানর অধিকার আছে, গঠনের অধিকার নাই। গঠনের উপাদানও আমা-দিগের নাই। সর্ব্বময় ঈশ্বরের অঙ্গবিশেষ লইয়া মনঃপূতভাবে সুসজ্জিত করি মাত্র। মূর্ত্তি-রচনা জড়োপাসনা নহে। উহাই প্রকৃত ভগবদারাধনা।

শিষ্য—যাহারা নিরাকার ভজে, তাহারা এরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে না কেন?

গুরু—সে তাহাদের ভ্রম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিরাকার ভজনার বিষয় নহে, কেহ নিরাকার ভজনাও করে না। যদি সাকারই ভজিতে হয়, তবে তাহা মনোজ্ঞ করাই উচিত। যাঁহাকে ভালবাসিব, যাঁহাকে পূজা করিব, তাঁহাকে মনোভিরাম করা এবং যাহাতে ক্রমে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাতে মিলিতে পারি, তদুপায়ই করা উচিত। তাঁহাকে চিরকাল অন্তরালে ও অদৃশ্যাবস্থায় রাখা প্রকৃত প্রেমিক বা ভক্তের কর্ম্ম নহে। তাহারাও উপাসনাচ্ছলে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশেষ কল্পনা করে বটে; কিন্তু কি মূর্ত্তি যে কল্পনা করিল, তাহা তাহারা দেখেও না, অনুভবও করিতে পারে না। তাহাদের কল্পিত ঈশ্বর চিরকাল অদৃশ্যভাবে অন্তরালে লুকাইয়া থাকেন। তাহারা যতই সাধ্য সাধনা করুক না কেন, কোন ক্রমেই তাহারা তাহাদিগের সেই ইষ্টঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না, তাঁহাকে দেখিতেও পায় না, তাঁহার সঙ্গসুখও অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং সংশয়শূন্য হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণ ভরিয়া ভক্তিও করিতে পারে না। আমাদের ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, আমরা তাঁহাকে দেখি, তাঁহার নিকটস্থ হই, তাঁহাকে স্পর্শ করি; সংশয়শূন্যান্তঃকরণে প্রাণভরিয়া তাঁহাকে ভালবাসি, পূজা ও ভক্তি করি। ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা যতই গাঢ় হয়, ঈশ্বর ততই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন, পরে জড়মূর্ত্তিতে জীবন্ত ঈশ্বর বিকাশ পাইয়া দুঃখলেশপরিশূন্য পরম সুখ প্রদান করেন। এই নিমিত্ত হিন্দুর মধ্যে যেমন নিরেট ধার্ম্মিক দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে তেমন দেখা যায় না। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ীর মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদিগের কতক পরিমাণে ভগবদ্বিশ্বাস দেখা যায় বটে; কিন্তু অশিক্ষিত ও নিম্ন শ্রেণীর প্রায় সকলেই একেবারে ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত। হিন্দুর মধ্যে যাহারা নিতান্ত নীচবর্ণ, তাহারাও ভগবদ্বিশ্বাসে বঞ্চিত নহে।

শিষ্য। মূর্ত্তিপূজাই যদি ভগবদ্বিশ্বাস ও ভক্তি সুদৃঢ় করিবার কারণ, তবে হিন্দু সন্তানগণ মধ্যেও ধর্ম্মের এত অপচয় ঘটিল কেন?

গুরু। কুসংসর্গে ও কুশিক্ষায়। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু মন তাহার ভিত্তি, যাহার চিত্ত যত স্বচ্ছ, ভগবদ্ভাব তাহাতে তৎপরিমাণে বিকশিত। যাহার চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল, সে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে বিরাজমান দেখে, যাহার চিত্ত ততদূর নির্ম্মল না হইলেও কতক স্বচ্ছ, সে শাস্ত্র-কথিত মূর্ত্তিবিশেষে ভগবৎসত্তা অনুভব করে, এবং ভক্তিবিশ্বাসের পরিপাকে তাঁহাতে জীবন্ত ভাব দেখিতে পায়। চিরদিন হিন্দুর সেইভাব ছিল, কাজেই তাহাদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যাইত। দুরদৃষ্টবশে এখন বিষয়প্রেমিক জাতি আমাদিগের শিক্ষাদাতা, উপদেষ্টা ও আদর্শ। তাঁহাদিগের বিষয়তৃষ্ণামলিন হৃদয়ে ইষ্টমূর্ত্তিতে ঈশ্বরবিশ্বাস স্থান পায় না। তাঁহাদিগের মলিন চক্ষে উহা পুতুল বা জড় পদার্থ। আমরাও তদুপদেশ এবং তদাদর্শে তদ্ভাবাপন্ন। আমরাও এখন দেবমূর্ত্তিগুলিকে নির্জ্জীব জড় বলিয়া মনে করি, কাজেই মূর্ত্তিপূজার উপকারিতা ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারি না। আমরাও যেমন উহা জড় বলিয়া মনে করি, উহাও তেমনিই জড়তাবাপন্ন প্রতীয়মান হইয়া ধর্ম্মমূল বিছিন্ন করিয়া ফেলে।

শিষ্য—আপনি বলিলেন মূর্ত্তিপূজক তাহার ইষ্টমূর্ত্তি যথাসাধ্য মনোজ্ঞভাবে সুসজ্জিত করিয়া পূজা করে; অথবা হিন্দুর অধিকাংশ দেবমূর্ত্তিই দেখিতে কুৎসিৎ। কেঁহ বা শিলা-খণ্ড পূজা করিতেছে, কেহবা একখানা বৃক্ষ শাখা ভূমিতে পুতিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে ভজিতেছে, কেহ বা একখানা কাঠিতে জবাফুল দিয়া তৎপার্শ্বে নৃত্যগীত করিতেছে। জগন্নাথের হস্ত নাই। বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণামূর্ত্তিও চিত্তাকর্ষক নহে, উলঙ্গ কালীমূর্ত্তি উলঙ্গ শিব বক্ষে দণ্ডায়মানা; গৃহে গৃহে শিবলিঙ্গের অশ্লীল দৃশ্য, ইহা দেখিয়া কোন্ সাহসে বলিব হিন্দুর দেবমূর্ত্তিগুলি পরমসুন্দর?

গুরু—উহা ধর্ম্মনিষ্ঠার পরীক্ষা। ভক্তি বা ভালবাসা বাহ্যসৌন্দর্য্যের অপেক্ষা করে না। বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে—অনেকে গৃহে পরমা সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী উপেক্ষা করিয়া কুৎসিতা বারবনিতাসংস্রবে ঘৃণিত রোগাক্রান্ত হইয়া জীবন অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। কেহ বিষয়-সম্পদের জন্ত ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করে, আবার কেহবা রাজবিভব তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পরি-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। তোমার ভক্তি নাই, বিশ্বাস বিষয়ানুগত, রুচি সাধারণ বুদ্ধিগঠিত, তোমারার চক্ষে যোনিলিঙ্গের সমাবেশ হেতু শিবলিঙ্গ অশ্লীল ও অপবিত্র, কিন্তু যাহার মনে ভক্তি আছে, বিশ্বাস স্বধর্ম্মানুগত—রুচি ঐশ্বরিক ভাবগঠিত, সে দেখে উহা পরম সুন্দর—পরম পবিত্র; ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের অফুরন্ত উৎস; তৎতস্ত কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ।" মার্কণ্ডেয় সম্মুখে শিবলিঙ্গসংস্থাপনপূর্ব্বক একান্তমনে ভক্তিভাবে আরাধনা করিতেছিলেন, অন্তকাল উপস্থিতজন্ত যম ভয়ঙ্কর বেগে উপস্থিত, তদ্দর্শনে মার্কণ্ডেয় সভয়ে শিবলিঙ্গ জড়িয়া ধরিলেন, অমনি লিঙ্গস্থিত শিব নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যমকে অপসারিত করিয়া ভক্তকে অভয় দান করিলেন।

পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রেমপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্নেহময়ী মাতাকে-শোক সাগরে ভাসাইয়া, ভক্তবৃন্দের সরল প্রাণে ব্যাথা দিয়া, কি যেন কি অভৌতিক সৌন্দর্য্যপ্রলোভনে সংযমাবলম্বী চৈতন্য ভৌতিক বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া চিরবাঞ্ছিত ভুবনমোহন মূর্ত্তি দর্শনলালসায় নীলাচলে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরদ্বারে উপস্থিত। ভক্তবৎসল ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি জগন্নাথের হস্তবিহীন-কদাকার বিগ্রহে বিকাশ পাইল, তদ্দর্শনে চৈতন্যদেব জীবনসার্থক মনে করিলেন; এবং ইহকাল পরকাল ভুলিয়া সেই রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন; চিরবাঞ্ছিত প্রিয়সম্মিলনে আত্মহারা হইলেন, এবং ভগবদাবেশে অবশাঙ্গাবস্থায় মৃতবৎ মন্দিরদ্বারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তি ভগবানের মূর্ত্তিগত ভৌতিক রূপ দেখে না, দেখিতেও চায় না। সে সেইমূর্ত্তিতে অভৌতিক পরমানন্দময় যে মূর্ত্তি দর্শন করে, অবিশ্বাসী অভক্ত তাহা মনেও কল্পনা করিতে পারে না।

ঈশ্বর রূপের সার, তিনি সর্ব্বরূপ। যে তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিতে চায়, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই দেখা দেন। বিশ্বাসী ভক্ত যে কোন মূর্ত্তিতে দিব্যচক্ষে তাঁহার মনোভিরাম দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করে; অনাস্থাবান্ অভক্ত তাহা দেখিতে পায় না, সে তাহার ভৌতিক চক্ষে দেববিগ্রহের ভৌতিক রূপমাত্র প্রত্যক্ষ করে। তজ্জন্য আস্থাবান্ ভক্ত যে মূর্ত্তিদর্শনে ইহকাল পরকাল ভুলিয়া তৎসমীপে আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, অনাস্থাবান্ অভক্ত তাহা পাগলের পাগলামী বোধে নিন্দার্হ মনে করে। কুশিক্ষায় ও কুসংসর্গে আমরা এখন ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসে বঞ্চিত। জ্ঞানবিশুদ্ধ দিব্যচক্ষের অভাবহেতু ভৌতিক বুদ্ধিতে দেববিগ্রহের রূপবিচারে প্রবৃত্ত; কাজেই আমাদিগের চক্ষে দেববিগ্রহসমূহ সৌন্দর্য্য-বিহীন, কুৎসিত বা অশ্লীল জড়ময় বলিয়া প্রতিভাত।

এখন আমরা ভগবদ্বিশ্বাসে বঞ্চিত হইয়া বিষয়নিষ্ঠ, ঈশ্বরাপেক্ষা বিষয়কেই প্রিয়তর জ্ঞান করি। দেবমূর্ত্তিসমূহের অন্তর্নিহিত অভৌতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি না, কাজেই উহা মনোজ্ঞ বলিয়াও মনে হয় না। এ নিমিত্ত ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, মন ভগবচ্চিন্তায় বিমুখ হইয়া বিষয়ান্তরাভিমুখে বিক্ষিপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল।

বাহ্যপূজা।

আর্য্যশাস্ত্র সনাতন শাস্ত্র, এই শাস্ত্রের বীজ একমাত্র বেদ। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বেদগান করেন। সেই বেদই আর্য্যশাস্ত্রের একমাত্র অবলম্বন। ঐ অবলম্বন ব্যতীত পরমপদ যে মুক্তি, তাহা লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই।

অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবোধই দেহের কারণ। তন্নিবারণের উপদেশ বেদ ভিন্ন অন্যত্রে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত অপর দুই কাণ্ডের বিশিষ্টরূপ প্রকাশ নাই। সেইজন্য বেদের সহিত পুরাণতন্ত্রাদির যে বিভিন্নতা থাকা উপলব্ধি হয়, বস্তুতঃ উহা ভ্রান্তিমাত্র। পুরাণ, স্মৃতি, আগম ও তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রই বেদসম্ভূত। বেদ হইতে উৎপত্তি এবং বেদেরই ক্রমবিকাশ। শাস্ত্রাদিতে পরস্পর বিরোধ বা বিপরীত বিধান দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহার হেতু ঐ বেদ ব্যতীত অন্য নহে। গুণভেদে অধিকার ভেদ। অধিকারভেদে বিপরীত বা বিপর্য্যয় বিধানের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, বেদ যাহা উপদেশ বা অনুজ্ঞা করিয়াছেন, পুরাণ, তন্ত্র, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রনিচয় তদাচরণের উপায় করিয়াছেন।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (বেদ)

পুরাণ ও তন্ত্র তাহার উপায়বিধান করিয়াছেন মাত্র। এক তন্ত্রে শিবনির্ম্মাল্যধারণ নিষেধ, অশৌচকালে এবং দ্বাদশ্যাদি তিথিতে সন্ধ্যা বন্দনের নিষেধ, বিল্বপত্রের বৃন্ত-সহিত পূজা করিতে নিষেধ, এবং তন্ত্রান্তরে ঐ সকল বৈধ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পরস্পর-বিরোধী সকল মতই সত্য। সিদ্ধপুরুষেরা যেভাবে এবং যে প্রণালীতে যেদিক দিয়া অগ্রসর হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই ভাব, সেই প্রণালী, সেই দিক অনুসরণ করিয়া নরনারীর হিতার্থ স্ব স্ব সাধন-প্রণালীর উপদেশ তন্ত্রাদিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল তন্ত্র মনুষ্যমুখবিনির্গত হইলেও তাহার কর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত ঐ সকল সিদ্ধপুরুষগণ নহেন। কারণ, সিদ্ধপুরুষগণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা (নিয়ন্তা) ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নহেন। সেইজন্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্ব শাস্ত্রই ঈশ্বর-প্রণীত। বিশেষতঃ সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে সিদ্ধপুরুষেরাই শিব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েন।

"জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥"

শিবের কটাক্ষপাতে কন্দর্পের দেহ ভস্ম হয়। ইহার তাৎপর্য্য, কাম দমন ব্যতীত যোগী হইবার উপায় নাই, এই তত্ত্বোপদেশ।

সিদ্ধপুরুষেরা যখন কামজয়ী এবং অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হয়েন, তখনই তাঁহারা শিবসংজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং শিবনামে তন্ত্রাদি প্রচার করেন। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন সাধন-

প্রণালীর দ্বারা সিদ্ধিলাভের উপদেশ তন্ত্রাদিতে শিবনামে প্রকাশ হইয়াছে। আর পরমেশ্বরের মায়ারূপ যে শক্তি, তিনিই পার্ব্বতী নামে বাচ্য হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত বক্তা ও শ্রোত্রী যে হর ও পার্ব্বতী, তাঁহারা দেবদেবীরূপ দম্পতী নহেন। তবে যে শাস্ত্র পার্ব্বতীকে পরমব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তি বলিয়াছেন, এবং তাঁহার উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি পৃথক্ নহে, মহামায়ার উপাসনা পরমপুরুষেরই উপাসনা।

কালক্রমে নরনারীর দুরদৃষ্টহেতু অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধপুরুষের অনুকরণে শিবসংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অনেক তন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। এক পণ্ডিত খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে তিব্বতে যাইয়া তন্ত্রাদি প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে আরও অনেকে নেপাল, ভোট ও চীনদেশে যাইয়া অনেক তন্ত্র প্রচার করেন। বৌদ্ধসাহিত্যের অনেক লেখক বৌদ্ধগ্রন্থ, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি, স্তবাদি এবং তন্ত্রমতের বহুগ্রন্থ প্রচার করেন। সিদ্ধাচার্য্য লুই, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বাঙ্গলার বিক্রমণিপুরের রাজা কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে মন্ত্রযান নামে এক মত ছিল। ঐ মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান এই চারিটী মত লইয়া ঐ মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা তন্ত্রমত গঠন করেন, এবং তন্ত্রমতের অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন। পালরাজাদিগের সময়েও অনেক তন্ত্রগ্রন্থ প্রচার হয়। শুভাকর গুপ্ত ও প্রজ্ঞাকর গুপ্ত কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রচার করেন। বুদ্ধদেব যখন বজ্রসত্ত্ব হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি ডাকিনীর প্রশ্নে যে উত্তর দেন, তাহাই বৌদ্ধতন্ত্র। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতিও দুই এক খানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রচার করেন। চন্দ্রগোমিন আচার্য্য কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রচার করেন। রত্নাকরশান্তি বিক্রমশীল বিহারের একজন বড় পণ্ডিত। পুণ্ডরীক ইঁহার অপর নাম। পুণ্ডরীক যে তন্ত্রগ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। জ্ঞানবজ্র দুই এক খানি তন্ত্র প্রচার করেন। তদ্ব্যতীত বহুল চীনাচারতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রচার হইয়াছে। ফলতঃ বেদ, পুরাণ, আগম, তন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রই একতানে একস্বরে বাহ্য পূজার বিধান করিয়াছেন। এ বিধানে শাস্ত্রবিরোধ নাই। পরমেশ্বর যে কেবল ভিতরেই (অন্তরেই) আছেন, বাহিরে নাই, ইহা নহে। তিনি অন্তরেও বাহিরে, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। তিনি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ে, তদ্রূপ বাহিরেও। তাঁহার সত্ত্বারহিত স্থান নাই। সুতরাং যে কোন প্রতিমাতে, ঘটে, পটে, জলে, স্থলে, অনলে, যে কোন স্থানে গন্ধপুষ্পাদি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে, নৈবেদ্যাদি তাঁহার শ্রীমুখে প্রদান করিতেছি মনে করিয়া তাঁহার পূজাসেবা করি, তাহাতে পরমেশ্বরেই পূজা সেবা অর্চ্চনা হয়, সন্দেহ নাই। এই পূজার সেই জন্ত শাস্ত্রবিধি উপাস্য দেবতার ধ্যান ও পূজা প্রথমতঃ নিজ হৃদয়ে করিতে হইবে, তৎপর তাঁহাকে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া ঈড়া নাম্নী নাড়ীপথে বহির্নির্গত করিয়া সম্মুখস্থিত সিংহাসনে উপবেশন করাইলাম, এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। পাদ্য, অর্ঘ্য,

গন্ধ, পুষ্প, ধুপ দীপ, নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পুনর্ব্বার সংহারমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া সেইপথে উপাস্য দেবতাকে লইয়া যাইতে হইবে, এবং স্বস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। এই ভাবের পূজা অর্চ্চনাতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়; সুষুম্নাপথ পরিষ্কার ও ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হয়।

অদৃশ্যবস্তুর ধারণায় মন নিতান্ত অশক্ত। চঞ্চল এবং অবিশুদ্ধমনে তত্ত্বজ্ঞান উদ্রিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির অব্যবহিত কারণ। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, পূজা, জপ, যজ্ঞ, হোম, প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়, এবং নির্ব্বাতদীপতুল্য স্থির হয়। মনোমালিন্য সম্যকরূপে পরিষ্কৃত হইলে, শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হইলে, নৈষ্ঠিকী ভক্তি উদিত হয়। ঐ নৈষ্ঠিকীভক্তি সহকারে ধ্যেয় মূর্ত্তির জলে, স্থলে, চিত্রে, এবং মৃত্তিকাতে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে অধিকারী বিশেষের ধ্যানার্চ্চনার উপযোগী হয়। ভিন্ন২ নাম, রূপ ও উপাধির উদ্দেশে যে পূজা, তাহা একেরই পূজা। যজ্ঞ অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি দ্বারা আত্মার তৃপ্তি জন্মে, সুতরাং আত্মারূপী ভগবানের প্রীতি হয়। উপাস্যদেবের পূজা আত্মবৎ করিবার শাস্ত্রোপদেশ। অভীষ্টদেবের মূর্ত্তিতে সম্যকরূপে চিত্তস্থির হয়। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত ঐ মূর্ত্তিতেও চিত্তের আকর্ষণ সম্ভবে না এবং ভাব ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঐ মূর্ত্তির ধ্যানপরায়ণ হওয়া যোগের উচ্চাধিকার ব্যতীত প্রথমাধি-কারে সম্ভব হয় না। ধ্যানবর্জ্জিত কাল ব্যর্থ ব্যয় না হয়, এই অভিপ্রায়ে ভাগবৎকথাশ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন দ্বারা অতিবাহিত হয়, পরমকরুণাময় নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী পরমেশ্বরের তাহাই শাস্ত্রীয় বিধান। সেই বিধানের পুষ্ট্যর্থে শ্রীভগবানের বিবিধ নাম, রূপ ও উপাধিতে স্থান-বিশেষে মনুষ্যের ন্যায় রম্য প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়াদি করার, এবং স্থানান্তরে যাতায়াত জন্য বাহনাদি থাকার বর্ণনা শাস্ত্রে প্রকটিত আছে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের গমনাগমন জন্য পশুপক্ষ্যাদি বাহন থাকা, এবং স্ত্রীপুত্রপরিবেষ্টিত হইয়া সংসার করায় শাস্ত্রোক্তি স্বরূপাখ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে নহে। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল পূজাপ্রকরণ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবার বিধান, ইহাই শাস্ত্রসমাধান।

পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই স্থিতি। একসূত্রে মুক্তাবলী গ্রথিত থাকার ন্যায় এই প্রপঞ্চ জগৎ তাহাতেই স্থিতি।

আত্মা বা ইদমেক মেধাগ্রতাপসীৎ।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

মৃন্ময় প্রতিমার পূজা মৃত্তিকাদি জড়াংশের নহে। প্রতিমাস্থ চিৎ (চিন্ময়) শক্তির পূজা। পিতামাতা গুরুজনের চৈতন্যাভাব হইলে, যে পুত্রকন্যা তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিত, সেই পুত্র কন্যা সেই পরমারাধ্য পিতামাতার দেহ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করে। প্রতিমাপূজা জড়পূজা নহে, জড়োপলক্ষে স্বরূপের পূজা। চিৎ (চিন্ময়) শক্তির পূজা। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানে জীবমাত্রেই অসমর্থ। শ্রুতি এইহেতু ঈশ্বরের রূপবিশেষের উপাসনায় সংসারাবদ্ধ জীবগণের

মুক্তির উপায়ও বিধান করিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্মে চিত্তস্থাপন দ্বারা নির্গুণতা লাভ হয়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা না করিয়া একবারে নির্গুণ উপাসনা দ্বারা কেহ কখনও মুক্তিগতি লাভ করিতে পারেন নাই। মুক্তিসাধনপক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ পথ। ইহা ভিন্ন অন্য সরলপথ আর নাই, একথা শ্রুতি স্মৃতি বারম্বার বলিয়াছেন। ষোড়শোপচারে পূজার মন্ত্র প্রণিধান করিলে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞান ও ভক্তির উদ্দীপনার জন্যই মন্ত্রের অবতারণা। প্রাণ ভরিয়া মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পূজা করিলে ঐ পূজা হইতে জ্ঞানও ভক্তিলাভ হয়। জ্ঞান-ভক্তির উৎকর্ষ সংসাধন হইলে, মুক্তি যে করতলগত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের অভ্যাসাধিক্যে এবং পূজায় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে, স্তবাদি পাঠে, গীতা এবং চণ্ডীপাঠে ভক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং প্রাণের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ পরিস্ফুট হইতে থাকে। যেমন দীপদর্শনে জ্যোতির ভাব, ভূষণ-দর্শনে শোভার ভাব, পুষ্পদর্শনে পবিত্রতার ভাব মনে উদয় হয়; সেইরূপ ভাবময় মন্ত্রোচ্চারণে ভগবদ্‌ভাবে প্রাণ বিভোর হয়; তখন নশ্বরজ্ঞান স্থিররূপে অন্তরে প্রতিভাত হয়, এবং সত্যব্রহ্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিভাসিত হয়। জ্ঞান উদ্ভাসিত হইলে পাপ-পুণ্যের ও কর্ম্মবন্ধনের তিরোভাব হয়। তখনই জীব জীবন্মুক্ত। শরীর পরিত্যক্ত হইলে উপাধির নাশ হয়। তখন কেবল একমাত্র সৎপদার্থই থাকে। তখন আর কিছুই স্বতন্ত্র থাকে না। ভূমানন্দ বিরাজিত হইয়া চির সুখময় হয়। শোক-দুঃখ থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন সুখ মাত্রই তদানিন্তন অবস্থা। ইহাই নির্ব্বাণমুক্তি। এইজন্যই সকল শাস্ত্র একবাক্যে প্রতিমাপূজার, সগুণ উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরমব্রহ্মই মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ ব্রহ্ম হন। "সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ।" নির্গুণব্রহ্ম লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মে ভেদ নাই।

"সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্।"

(ভাগবত)

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বা মানবের জীবন-বিজ্ঞান।

যুগে যুগে—পৃথিবীর সকল দেশে ঘোরতর অশান্তির মধ্য দিয়া, যুগান্তরকরণে সমর্থ কর্ম্মবীরের আবির্ভাবে দেশের উন্নতি আরম্ভ হয়, বিজ্ঞান, রসায়ন দর্শনাদি শাস্ত্রের উন্নতি হয়, নীতিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। অশান্তির অভিনয়ের পরই সৌম্য এবং নৈতিকভাবের আবির্ভাব হয়। ইউরোপের ফরাশিজাতির অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান যুগের রুশিয়ার ইতিহাস এই নীতির সাক্ষ্যদান করিতেছে। কিন্তু হিন্দুর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা! কোন দেশের বা কোন জাতির ঐতিহাসিক তথ্যের পুনরভিনয়ে হিন্দুর দেশ বা হিন্দুজাতি উপকৃত হইবে না,—হইতেও পারে না।

কারণ, হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্রের তন্তুতে সংগঠিত, ঋষিগণের আজীবন সাধনলব্ধ ফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু আজ প্রতীচ্যের দৃষ্টিবিদগ্ধ রূপজ মোহে বিচলিত, আপনার জীবনসূত্রকে উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্যজাতিসমূহের উন্নতির ইতিহাসের প্রতি চাহিতে চাহিতে পাশ্চাত্যের সাধনার অনুচিকীর্ষু হইয়াছে। ফল কিন্তু তাহার বিষময়। যে উষ্ণপ্রধান দেশে নামাবলীই ব্রাহ্মণের গাত্রাবরণ, উষ্ণীষই শিরোভূষণ, পূজোপকরণপুষ্প-চন্দন-পূর্ণ ফুলের সাজি যে করে পুরুষানুক্রমে শোভা বিস্তার করিয়াছে, যে মুখে অনুক্ষণ হরির মধুময় নাম উচ্চারিত হইয়াছে, আজ পাশ্চাত্য রূপজমোহে অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মণসন্তানের বক্ষের চন্দন মুছিয়া সভ্য-শিল্পবিনোদী বহুমূল্য কোটে অঙ্গ ঢাকিলে,—নামাবলী দূরে ফেলিলে,—উষ্ণীষ ছাড়িয়া হ্যাটদ্বারা মস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিতে চাহিলে, ফুলের সাজি ছাড়িয়া চাবুক ধরিতে শিখিলে, হরিনাম ছাড়িয়া "হুর্‌রো" বলিলে, চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ সাবানে ধৌত করিয়া ফ্রান্সের "ইউ-ডি—কলোন" মাখিলে, বিধাতার বিধানে ব্রাহ্মণসন্তানের তাহা সহিবে না।

তবে বলিতে পার, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে উন্নতির পথে চলিতে হইবে। সে কথা সত্য, সন্দেহ নাই, তবে সেটা হিন্দুশাস্ত্রের চক্ষুঃ দিয়া দেখিয়া যদি বুঝা যায় তাহা যথার্থই উন্নতির পরিচায়ক, তবেই অবশ্য তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর গৌরব "গুরুদাস" ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া কি ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে অপরধর্ম্মীর সঙ্গে বসিয়া জাতীয়তা হারাইয়াছিলেন? শাস্ত্রকে ত্যাগ করিয়াছিলেন? ফুলের সাজি ছাড়িয়া পেন্ ধরিয়া যে লোকের দণ্ড মুণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন, গাড়ীজুড়ী চড়িয়া রাজাজ্ঞা মানিয়া রাজপরিচ্ছদে অঙ্গ সাজাইয়াছিলেন, তাহারও পশ্চাতে শাস্ত্রাজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। সেইরূপে অগ্রে শাস্ত্রকে মাথায় রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে হিন্দুর উন্নতির দিন অতি সন্নিহিত হইবে।

হিন্দুজাতি আজ শাস্ত্রালোচনাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ষড়ঙ্গ বেদের একাঙ্গ—চক্ষুঃস্বরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করিতে চাহিতেছে। হিন্দুগণের সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা

ব্রাহ্মণগণের দোষ এসম্বন্ধে অধিক। তাঁহারা স্বহস্ত হইতে ইহার আলোচনার ভার ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিদের হস্তে প্রদান করায় এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যমনিয়মাদি-ত্যাগী এবং লোভী হইয়া সাধারণকে শাস্ত্রের সাহায্যে প্রবঞ্চনা করিতে থাকায়, ক্রমেই সাধারণের এই শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়িতেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র, যাহা বেদাঙ্গ,—তাহা লোভের তৃপ্তির জন্য ঋষিগণের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং যত্নে সংরক্ষিত হয় নাই। পঞ্জিকার দিন, ক্ষণ, তিথি, মুহূর্ত্তাদির উপর হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, শ্রাদ্ধশান্তির অনুষ্ঠান নির্ভর করে। শিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু বুঝিতেছে, পঞ্জিকার মতানৈক্যে বা দোষে তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে মনঃক্ষোভ ঘটিতেছে। সাধারণে বুঝিতেছে, পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিষের সারবত্তা নিখুঁতগণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তাহারই সাহায্য না পাইলে যখন আমাদের পঞ্জিকার গ্রহণ গণনা হয় না, তখন হিন্দুর জ্যোতিষ কিছুই নহে। আরও অনেক কারণ আছে, সকলগুলির আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে, এজন্য জ্যোতিষ সংক্রান্ত একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

সে যাহা হউক, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমরা এক্ষণে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

নব্য সম্প্রদায়ের এই শাস্ত্রের প্রতি ঘৃণার আর একটী কারণ এই যে, তাঁহাদের মতে—"মুনিগণ প্রণীত ফলিত জ্যোতিষ মানবকে সাধনাত্যাগে প্রবৃত্তি দেয়,—ভাগ্যফলের দাসত্বে তাহাকে শৃঙ্খলিত করে"। আর একটী কারণ এই যে 'নির্জীব জড়পিণ্ড—এই সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি মানবের কিরূপে ভালমন্দ ফলাফল বিজ্ঞাপিত বা সূচিত করিতে পারে? তাহাদের সামর্থ্য কোথা হইতে আসিবে?

আমরা প্রথমোক্ত বিষয়টী লইয়া প্রথমে আলোচনা করিব। আমাদের মনে হয় যে, যদিও ফলিত জ্যোতিষ ভাগ্যফলে অনেকটা বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, সেই সঙ্গে,—পাঠকগণ এই শাস্ত্র-আলোচনার ফলে দেখিতে পাইবেন যে,—সেই ভাগ্যফলের সূত্রটী পাঠকেরই স্ব-কর ধৃত। পাঠক যেরূপে,—যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে,—সেই সূত্রের আকর্ষণ বিকর্ষণে ভাগ্যচক্রকে পরিচালনা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, তাহা সাধক পাঠকের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভবপর হইবে না।

আমরা ভাগ্য-চক্রে জন্ম হইতেই একবারে সম্পূর্ণরূপে শৃঙ্খলিত নহি, তবে একবারে স্বাধীনও নহি। মানব, অজ্ঞান-তন্তু-বিনির্ম্মিত মায়ার শৃঙ্খলে ভাগ্য-চক্রের সহিত শৃঙ্খলিত। জ্ঞানবিকাশের সহিত,—সাধনার বলে,—সেই শৃঙ্খলসংলগ্ন ভাগ্য-চক্রকে আমাদের উন্নতি বা অবনতির পথে পরিচালন করিবার শক্তি আমাদের সম্পূর্ণরূপই আছে। অপূর্ণ জ্ঞান—অজ্ঞানতা—মায়াই আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। জন্ম হইতে যদি আমরা মায়ার আচ্ছন্ন না থাকিতাম,—অপর কথায়, জন্ম হইতে যদি আমাদের ভূত—ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের জ্ঞান থাকিত, তবে ভাগ্যচক্র আমাদিগকে এরূপ বিঘূর্ণিত ও ত্রাসিত করিতে কখনই সমর্থ হইত না। যতই আমাদের জ্ঞান-সূর্য্য কিরণমালা বিস্তার করিতে থাকিবেন, ততই আমাদের

জড়তা বিগলিত হইতে থাকিবে; এবং সেই পরিমাণে আমরা আমাদিগের ভাগ্য-চক্র স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব। "ফলিত-জ্যোতিষকে" যদি আমরা "মানবের জীবন-বিজ্ঞান" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে, তাহা পাঠে প্রত্যেক মানবের জীবন-রহস্য অনেক পরিমাণে আমরা অবগত হইতে পারি।

প্রত্যেক মানবের একটী পার্থিব দেহ আছে; আর একটী জ্যোতির্ম্ময় দেহ এই পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পঞ্চকোষের কথা লইয়া আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে, যে, পঞ্চকোষের বহিঃস্থিত কোষ দুইটীই অন্নময় কোষ—এই পার্থিব দেহ; এবং প্রাণময় কোষই ঐ তথাকথিত জ্যোতির্ম্ময় দেহ। বিশ্বচক্র, সুদর্শনচক্র বা রাশি-চক্র হইতে জ্যোতির্ম্ময় কিরণসম্পাতে মানবের ঐ প্রাণময় কোষ বা জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রভাবান্বিত হয়।

ঋষিগণনির্দ্দিষ্ট যোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। আর এই জ্যোতিষশাস্ত্র অনুধাবনে সমর্থ হইলে, সাধকের পক্ষে—সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্য দিয়া মানবের জীবন-বিজ্ঞান জ্ঞান, ফলে ঈশ্বরে ভক্তিলাভ হয়, এবং ভগবানের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। ইহা আমাদিগের কল্পিত বাক্য নহে,—শাস্ত্রের বিধি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়।

আর্য্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে ভূত ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে এই মহান্ বিশ্ব বিরচিত, তাঁহাদের শেষ সৃষ্টিপ্রকরণে পাঁচটী তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, এবং আকাশ। পাশ্চাত্যমতে এই আকাশেরই ইংরাজী প্রতিশব্দ "ঈথার", এই আকাশ বিশ্বের প্রধান উপাদান। তাহা হইতে পরবর্ত্তী উপাদান, ক্রমোৎপন্ন চারিটী, যথা পৃথ্বী, জল, অগ্নি এবং বায়ু। পারস্যোপসাগরপ্রান্তের প্রাচীন সভ্য জাতি কালডিয়ার পণ্ডিতেরাও এই চারিটী উপাদান লইয়া জ্যোতিষ বা মানব জীবন-রহস্যের তথ্যনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রাচীনতম জাতি ঈজিপ্টের জ্যোতিষীরাও এই চারিটি তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের মতে মূলতঃ আকাশতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত বায়ুতত্ত্ব, তাহা হইতে উৎপন্ন তেজস্তত্ত্ব, তদুৎপন্ন জলতত্ত্ব এবং তাহা হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব উৎপন্ন।

এ বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে প্রণিধান সহকারে কয়েকটী সূত্র উপলব্ধি করিতে হইবে। আগামী বারে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী।

ত্রয়ীশক্তি।

মানবদেহে তিন প্রকার শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, যথা—কায়িক (Physical), মানসিক (Intellectual) ও আধ্যাত্মিক (Spiritual)। কায়িক শক্তির উন্নতিসাধনদ্বারা মানুষ সুস্থ ও বলবান হইতে পারে, এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার শারীরিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। মানসিক শক্তির উন্নতিসাধনদ্বারা পার্থিববিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় ও তদ্দ্বারা নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের উপায় করা যায় ও ব্যাবহারিক জগতে মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যায়। আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলনে আধ্যাত্মিকজগতের অনুভূতি হয়। ক্রীড়া, ব্যায়াম ইত্যাদি দ্বারা শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়; দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়; বৈরাগ্য ও চিত্তের একাগ্রতাসাধনদ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ লাভ করা যায়। এই তিন শক্তিরই উৎকর্ষ লাভ করিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত; কারণ, এই তিন প্রকার শক্তিই মনুষ্যগণ নিজ নিজ প্রয়োজন ও সুখ-প্রাপ্তির জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটী শক্তির উৎকর্ষপ্রাপ্তির একটী সীমা আছে, তাহার বাহিরে আর যাওয়া যায় না। ব্যায়াম প্রভৃতি দ্বারা যতই বল সঞ্চয় কর না কেন, বুকের উপর দিয়া মোটরগাড়ী চালাওনা কেন, কিন্তু অঙ্গুলীর চাপে একটী পর্ব্বত কখন উল্টাইয়া দিতে পারিবে না। মানুষের মানসিক শক্তির উন্নতির ও একটা সীমা আছে। এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিয়া বিমানমার্গে উড্ডীয়মান হইলেও এমন যন্ত্র কখনও নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, যাহা দ্বারা সূর্য্য অথবা নক্ষত্রমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইতে পারা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষের সীমা নাই; উহা দ্বারা মানুষকে সেই অসীম শক্তির সহিত মিলাইয়া দিয়া মোক্ষের (absolute bliss) পথে লইয়া যায়।

বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত দৈহিক উন্নতির উপযুক্ত সময়। যৌবনকাল হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত মানসিক শক্তির উন্নতিলাভের প্রধান সময়। প্রৌঢ়াবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষলাভের প্রকৃষ্ট সময়। বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যের এই তিন শক্তিরই কিছু কিছু উন্নতি সাধন করিতে ও এই তিনের মধ্যে, যে বয়সের যেটা বিশেষ উপযোগী, সেইটীর বিশেষভাবে উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে তিনটী আশ্রমের বিধি আছে, যথা, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে শারীরিক ও মানসিক শক্তির, গার্হস্থ্য আশ্রমে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির, বানপ্রস্থ-আশ্রমে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতিসাধন করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক শক্তির চরম উন্নতি লাভ করিলে চিত্তের একাগ্রতা সাধন হয় ও তদ্দ্বারা সমাধিস্থ হওয়া যায়। ঐ সমাধিস্থ অবস্থাটী কি, তাহা ভগবদ্গীতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা দ্বারা সকল প্রকার যোগেরই শেষফল ও উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা:—

"ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়"—২য় অধ্যায় ৭২ শ্লোক

"অপুনরাবৃত্তিপ্রাপ্তি হয়"—৫।১৭

"ব্রহ্ম নির্ব্বাণ হয়"—৫।২৪।২৬

"ব্রহ্মেঅবস্থিতি হয়"—৬।৩১

"ব্রহ্মকে সকল ভূতে অবস্থিতও সকল ভূতকে ব্রহ্মে অবস্থিত দৃষ্ট হয়"—৬।২৯

"ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ সর্ব্বোত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়"—৬।২৭

"ব্রহ্মভূত হইলে সমাধিরূপ উত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়"—৬।২৬

"নির্ব্বাণবিধায়ক ভগবদ্রূপে অবস্থান হয়"—৬।১৫

"ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়"—৭।৩০

"ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়"—৭।২২

"ব্রহ্মেই গমন করা যায়"—৯।২৫

"ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়"—৯।৩৪

"ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়"—১১।৫৫

"অব্যয়পদ লাভ হয়"—১৫।৫

"ব্রহ্মই হয়"—১৩।৩০

"ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়"—১৪।২৬

"ব্রহ্মই হয়"—১৮।৫৩

"ব্রহ্মেই প্রবেশ করে"—১৮।৫৫

ভগবদ্গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে অষ্টাদশপ্রকার যোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সকল যোগেরই শেষফল উপরে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে বুঝা যায় যে মোক্ষ, নির্ব্বাণ, সমাধি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, সর্ব্বোত্তম সুখ একই জিনিষ, (Synonymous terms) এবং উহাই প্রাপ্তি জীবের একমাত্র লক্ষ্য। এই সমাধি বা মোক্ষ, বা সর্ব্বোত্তম সুখলাভের একমাত্র উপায় বৈরাগ্য ও চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করা। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, অভ্যাসযোগ, ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এই চারিটী যোগ চিত্তের একগ্রতা লাভ করিবার প্রধান সহায় এবং ইহাই ভগবদ্গীতার সার উপদেশ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।
সাগরিকা, পুরী।

আচার-বৈচিত্র্য।

হিন্দুধর্ম্মসম্মত আচার হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য পালনীয়। অনাচারী হিন্দু হিন্দু নামের যোগ্য নহে। আচারের সহিত ধর্ম্মের নিত্যসম্বন্ধ, কদাচারী বা অনাচারী ব্যক্তি ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন, এইরূপ কথাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। আচারও ধর্ম্মের একটী অন্যতম স্তর। কিন্তু দেশভেদে এই আচারের এত প্রকার বিভিন্নতা লক্ষিত হয় যে, তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং স্বতঃই মনে হয় যে এইরূপ আচার-বৈচিত্র্যের মধ্যে কোন্‌টী সত্য এবং কোন্‌টী মিথ্যা, কোন্‌টী গ্রহণীয়, কোন্‌টীই বা বর্জ্জনীয়।

আমাদের দেশের মধ্যেই এই আচারের পার্থক্য আছে,—কোথাও মুসলমানের স্পৃষ্ট দুধ ব্যবহার করা অনাচার, কোথাও তাহাতে কোন দোষ হয় না। কোথাও বালকপুত্রকন্যাসহ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ একই পাত্রে ভোজন করিতেছেন, তাহাতে দোষ হয় না। কোথাও আহারনিরতঃ ব্রাহ্মণকে ঐরূপ বালকবালিকারা স্পর্শ করিলেই তাঁহার আহার নষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ পুত্রকন্যাসহ ভোজন করেন, দেখিয়াছি তিনি নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত, ইংরাজী শিক্ষার আঁচও তাঁহার গায়ে লাগে নাই। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন "কুমারীকন্যাকে পূজা করিতে পারি, আর সঙ্গে বসাইয়া খাওয়াইতে পারি না? আমরা ইহাতে কোন দোষ দেখি না।" কোথাও ব্রাহ্মণ-বিধবাগণ একাদশীর দিনে ফলমূল, দুধ, দৈ প্রভৃতি ভোজন করিয়া ব্রতপালন করেন। কোথাও অতি বালিকাবিধবাকে একাদশীর দিনে জলবিন্দু পর্য্যন্ত প্রদান করা মহাপাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। কোথাও পলাণ্ডু, রসুন প্রভৃতি ভোজনে ব্রাহ্মণের কোন কদাচার হয় না, কোথাও ঐসব দ্রব্য স্পর্শ করিলেও ব্রাহ্মণকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়। কোথাও জলসিক্ত চিপিটক অন্নের ন্যায় পরিগণিত, কোথাও তাহা ফলাহার তুল্য; তাহা আহার করিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় অন্নাহার করিলে একাদিত্যে দ্বিভোজনদোষদুষ্ট হন না। কোথাও লুচি, জিলিপি প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই 'সকড়ি,' আবার কোথাও যতক্ষণ উহা কলার পাতে না পড়ে বা বাঁশের চাঙ্গারিতে না উঠে, ততক্ষণ উহা সকড়ি নহে, আবার বেতের ধামায় রাখিলে উহা সকড়ি হয় না। নিম্নশ্রেণীর চণ্ডালাদি হিন্দু অথবা মুসলমান কর্ত্তৃক প্রস্তুত চিপিটক অনেক স্থানে নির্ব্বিবাদে ব্যবহৃত হয়, কোথাও উহা অস্পৃশ্য। এইরূপ নানাপ্রকারের আচারভেদ আমাদের দেশেই নানাস্থানে প্রচলিত আছে।

এই পশ্চিম প্রদেশে আসিয়া আরও নানাপ্রকার আচারভেদ লক্ষ্য করিতেছি। এখানে ব্রাহ্মণের বিধবারা আমাদের দেশের মত কোন আচারই পালন করে না। তাহারা পেড়ে সাড়ীও পরিধান করে, অলঙ্কারাদিও ধারণ করে, পান সুর্ত্তিও খায়, দুবেলা তিনবেলা যাহা হয় পেট ভরিয়া ভাত অথবা রুটি আহারও করে। একাদশীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বিধবারা তো আমিষেও বিরক্তা নহে।

ব্রাহ্মণগণও প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ করেন না। পৈতা কাণে দেন বটে, পায়খানাতে যাইতে কোর্ত্তা পিরিহান আদি পরিয়াই যান, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করার কোনই আবশ্যকতা অনুভব করেন না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ হয় শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত-মুখ, অথবা শ্মশ্রুগুম্ফধারী। সগুম্ফ শ্মশ্রুহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেশে দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু এখানে তাহাই খুব বেশী প্রচলিত। শিখাধারণ এখানে সকল জাতির মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত, ইংরাজিশিক্ষিত উচ্চউপাধিপ্রাপ্ত এবং উচ্চপদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণেরও মস্তক শিখাশূন্য নহে। আমাদের দেশে শিখা একরূপ নির্ব্বাসিত, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকটও তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত অনেক সময় কেশাচ্ছাদনে গুপ্ত।

সিদ্ধ চাউল ব্যবহার এখানে অতি হেয় বলিয়া পরিগণিত, অনেক দোকানদার পর্য্যন্ত স্নান করিবার পর তাহা স্পর্শ করে না। আমাদের দেশে বিধবা এবং বিশেষ বিশেষ নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ব্যতীত সিদ্ধ চাউলেরই অধিক প্রচলন।

হালুইকরের দোকানের ময়দা, চিনি, ঘৃতাদিযুক্ত ভর্জ্জিত মিষ্ট দ্রব্য ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই আহার করেন না। চাউলের গুঁড়ার সংস্রব তো বিষবৎ পরিত্যাজ্য, পেঁড়া, বরফি আদি ক্ষীর ও চিনির পাকে প্রস্তুত মিঠাই ফলাহারী মিঠাই নামে খ্যাত, তাহাই ব্রাহ্মণগণের গ্রাহ্য হয়।

ভাত রুটি প্রভৃতি সবই অন্নপর্য্যায়ভুক্ত। একাদশী প্রভৃতি পর্ব্বের উপবাসের সময় আমরা রুটি, লুচি, হালুয়া আদি অনায়াসে ব্যবহার করি। এখানে নিম্নবর্ণের হিন্দু পর্য্যন্তও তাহা করেনা, তাহারা ফল, মূল, কন্দ প্রভৃতি কাঁচা বা সিদ্ধ আহার করে, পানিফলের পালোও খায়।

আমাদের দেশে মুসলমান কোন ঘরে প্রবেশ করিলেই তত্রস্থ জলাদি পর্য্যন্ত অপেয় হইয়া পড়ে, কিন্তু এদেশে তাহাতে দোষ হয় না, মুসলমান না ছুঁইলেই হইল। একই আসনে হিন্দু ও মুসলমান উপবিষ্ট আছেন। হিন্দুর জলপানের প্রয়োজন হইলে আসন ছাড়িয়া আলাহিদা হইয়া পান করিবে। অথবা মুসলমানটিই আসন ছাড়িয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইবে, তাহ হইলেই হইল। মুসলমানের স্পৃষ্ট জিনিসই ত্যাজ্য; কিন্তু মুসলমানের গৃহপ্রবেশেই জল মিষ্টাদি জিনিস নষ্ট হয় না। তবে কোন সাধারণ স্থানে জলযোগের আয়োজনে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক তাঁবুর ব্যবস্থাই করিতে দেখিয়াছি।

পংক্তিভোজনে অন্যজাতির সহিত উন্মুক্ত আকাশতলেও এক পংক্তিতে খাইবার প্রথা নাই। বিধর্ম্মীর পংক্তি একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। একই পংক্তিতে মধ্যে কিছু ব্যবধান রাখিয়াও বসিবার যো নাই; উন্মুক্ত আকাশতলে পূর্ব্ব পংক্তিতে খৃষ্টান, উত্তর পংক্তিতে মুসলমান, দক্ষিণ পংক্তিতে হিন্দু বসিয়া খাইতে পারে।

বিবাহ, উপনয়ন, শবদাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যেও আমাদের দেশের সহিত যথেষ্ট

পার্থক্য আছে। এ সব তো শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদির সাহায্যেই কৃত হয়; কিন্তু তথাপি তাহাদের ক্রম, নিয়মাদির অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

এদেশে যে ব্যক্তি শবের মুখাগ্নি করিবে, তাহাকে অশৌচ কালপর্য্যন্ত কোথাও বাহির হওয়া নিষিদ্ধ, নবোপনীত ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাকে এক ঘরের মধ্যেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আবদ্ধ থাকিতে হয়। আত্মীয় স্বজনবিয়োগেও মস্তকাদি মুণ্ডন এদেশে প্রচলিত। আমাদের দেশে কেবল মহাগুরু নিপাতেই মস্তক মুণ্ডন করা হয়। অন্য সময় কেবল নখ শ্মশ্রু মোচনেই পর্য্যাপ্ত হয়, কদাচিৎ গুম্ফ মুণ্ডনও দেখা যায়। কন্যা ঋতুমতী না হইলে সাধারণতঃ দ্বিরাগমন হয় না। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহেই থাকে, এবং তাহার সহিত স্বামীর সাক্ষাৎ হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকেনা। রজস্বলা হইবার পর দ্বিরাগমন বা 'গহনা' হয়।

এদেশের নিম্ন বর্ণের মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিধবাপত্নীর উপর দেবরের পূর্ণ অধিকার বর্ত্তমান। স্বামীর মৃত্যুর পর একটা নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, ভ্রাতৃজায়া দেবরের হাত হইতে 'সেঁদুর' পরিয়া তাহার অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকে; তাহা সমাজকর্ত্তৃক অনুমোদিত। বিধবা যদি দেবর সত্ত্বেও তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেই সে দূষণীয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় দেবর আর পৃথক বিবাহ না করিয়া দাদার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। বুঝিবা সে মৃত্যুকে নিকটে আনিবার জন্য দেবতার স্থানে পূজাদিও চড়াইয়া থাকে। যখন এই রূপই সমাজানুমোদিত ব্যবস্থা, তখন জ্যেষ্ঠ জীবিত থাকা কালেও যে দেবর সময় সময় ভ্রাতৃজায়ার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত থাকে, তাহাও বোধ হয় না। সেটাও সমাজের চক্ষে বিশেষ দোষের বলিয়া ধরা হয় না।

এখানে আমার একটী বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বাঙ্গালী বন্ধুর কন্যাটী ১৪।১৫ বৎসর বয়সে বিধবার সাজ পরিতে বাধ্য হইলে, পাড়ার অনেক হিন্দুস্থানী রমণী তাহাকে ও তাহার মাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিল "রোয়ো মৎ, দেওরতো হ্যায়, তব ক্যা" (কেঁদোনা, দেবরতো আছে, তবে ভাবনা কি?)

এদেশে উচ্চবর্ণের মধ্যেও 'পাক্কি' খানাতে, অর্থাৎ পুরি, তরকারী, মৎস্য প্রভৃতিতে স্পর্শদোষ নাই, তাহা যে কেহ প্রস্তুত করিয়া দিলেই খাইতে পারা যায়, এবং তাহা পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়াও খাওয়া চলে। কিন্তু "কাচ্চি" অর্থাৎ ভাত, রুটি এবং ডাইলেই যত স্পর্শদোষ, উহা স্বজাতি বা স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্যের হাতে খাওয়া চলিবে না। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তো সে ধরাবাঁধা আরও বেশী। কায়স্থাদির মধ্যেও সেটা বড় কম নহে। তার পর এই কাঁচা খাদ্য আহার করিবার সময় পরিচ্ছদাদি খুলিয়া খাওয়াই বিধি।

পাকা আহার্য্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া পরিবেশন করা যাইতে পারে; কিন্তু কাঁচার সম্বন্ধে তাহা হইবার যো নাই, সেই চৌকার মধ্যে বসিয়াই তাহা আহার করিতে হইবে। এই চৌকা রন্ধনশালার মধ্যে উনুনের চতুষ্পার্শ্বেবেষ্টিত একটী গণ্ডী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পাচক একবার এই চৌকাতে পাক করিতে উপবিষ্ট হইলে, পাক এবং আহার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে তথায় থাকিতে হইবে; চৌকা ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। অথচ আমাদের দেশে ভাত, ডাল আদি সর্ব্বদাই অন্যত্র লইয়াই পরিবেশন করা হয়, নিষ্ঠাবান হিন্দুগণও তাহাতে আপত্তি করেন না। গৃহিণীরাও রান্না করিতে করিতে পঞ্চাশ বার এঘর ওঘর করেন, তাতেও কোন দোষ ধরা হয় না। এদেশে খেজুরের রস এবং গুড় ব্রাহ্মণাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাল ফলও অনেক ব্রাহ্মণাদি আহার করেন না। কারণ, খেজুর এবং তাল হইতে তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুরের গুড়তো এদেশে প্রস্তুত করাই হয় না, উহার রস কেবল তাড়ির জন্যই বিক্রীত হয়। অথচ আমাদের দেশে পণ্ডিতবর্গও অবাধে খেজুর গুড়, তালের পিঠা ব্যবহার করিতেছেন। যদিও পূজাদি কার্য্যে খেজুর গুড় ব্যবহৃত হয় না, তবে খেজুরগুড়ের পায়সও দেবতার ভোগে নিবেদিত হইতে দেখিয়াছি।

লবণ ও চিনি এক সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়া এদেশের আচার বিরুদ্ধ। দধির সঙ্গে লবণ ও চিনি মিশাইয়া ইহারা আহার করেন না। আমি একবার এক জলযোগের উৎসবে আমাদের দেশের প্রথামত বাতাবি লেবু ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ ও চিনি মিশাইয়া রাখিয়াছিলাম; তাহার ফলে উহা পণ্ডিতমহাশয়েরা গ্রহণই করিলেন না, ভৃত্যবর্গকে দিতে হইল। পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এবং পাঞ্জাব প্রদেশে নাকি এরূপ প্রথা আছে যে, খাদ্যদ্রব্য একখানি লাঠীর মাথায় বাঁধিয়া দিয়া সেই লাঠীর অপর দিক যদি কোন নিম্নশ্রেণীর অনাচরণীয় ভৃত্যের হস্তে দেওয়া যায়, এবং সে যদি ঐ ভাবেই ঐ খাদ্যদ্রব্য লইয়া অন্যকে প্রদান করে, তবে তাহাতে স্পর্শদোষ ঘটে না; সে ভৃত্য মুসলমান হইলেও ক্ষতি নাই। এস্থলে লাঠির মধ্য দিয়া স্পর্শদোষ দ্রব্য পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

এদেশে একই মৃৎপাত্রে একাধিকবার রন্ধন করিয়া খাওয়া গর্হণীয়, প্রত্যহ দুবেলা ধাতব রন্ধন পাত্র মার্জ্জনা করা চাই। আমাদের দেশে একই ভাতের হাড়ি, ডাইলের হাড়ি, মাছের কড়াই প্রভৃতি কতদিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

এই সব আচার-বৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ইহাদের কোন্‌গুলি শাস্ত্রসঙ্গত, আর কোন্‌গুলি সেরূপ নহে। যে দেশের যে আচার-ব্যবহার, সে দেশের লোকেরা তাহাকেই ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রচার করেন; এবং ভিন্নদেশীয়গণের আচারের নিন্দা করেন, অথচ সকলেই সেই এক সনাতন ধর্ম্মেরই উপাসক। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সকলেরই পূজ্য, এবং তাহাদের বিধান অনুসারে সকলেরই ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়মিত।

এটা বড় সহজ সমস্যা বলিয়া বোধ হয় না। একজন বঙ্গদেশীয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত একজন পশ্চিমাঞ্চলের নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতের সঙ্গে একত্রাবস্থান করিলে উভয়েই উভয়ের আচারব্যবহার দেখিয়া অনেকটা বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

সকলেই আমরা সনাতনধর্ম্মাবলম্বী, সকলেই হিন্দু বলিয়া আমাদের পরিচয় দিই; অথচ আচারের মধ্যে এবং বেদবিহিত ধর্ম্মক্রিয়া প্রভৃতিতে পর্য্যন্ত এত ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য কেন?

এ সমস্তার সমাধান করা আবশ্যক। যদি বলেন দেশভেদে আচারের ভেদ হয়, তাহা হইলে এই সব আচার আমাদের মনগড়া মাত্র, বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির সম্মত নহে; আর তাহাই যদি না হয়, তবে তাহা যদি কেহ উল্লঙ্ঘন করে, তাহাতেই বা সে দোষী হইবে কেন? আর যদি তাহাকে দোষী করা যায়, তবে সে স্বীয় সমাজের নিকট দোষী, কি ধর্ম্মের নিকট দোষী?

ধর্ম্মের নিকট দোষী বলিলে তো প্রত্যেক প্রদেশের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী হিন্দুধর্ম্ম, বেহারী হিন্দুধর্ম্ম, উৎকলের হিন্দুধর্ম্ম, এলাহাবাদি অথবা বারাণসীর হিন্দুধর্ম্ম, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টি হিন্দুধর্ম্ম ইত্যাদি। তাহাতে আচারানুযায়ী ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়, ধর্ম্মাপেক্ষা আচারের প্রাধান্য ঘটে। কিন্তু বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র এরূপ সাম্প্রদায়িক নহে, তাহা হিন্দুমাত্রেরই সম্পত্তি। তারপর বাঙ্গালী যদি পাঞ্জাবে বাস করিতে থাকেন, এবং তিনি যদি সেই দেশীয় আচারেরই অনুষ্ঠান করেন, বঙ্গীয় আচার বর্জ্জন করেন, তবে কি তাঁহাকে দোষী করা যাইবে? অনেকদিন হইতে এই বিষয় এবং এইরূপ আরও কয়েকটী বিষয় মনে মনে আলোচনা করিয়া এই সব বিতর্ক আমার মনে উদিত হইয়াছে, এগুলি কুতর্ক নহে, সমস্যা। 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার মুখপত্র, বড় বড় পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষিত, এবং তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শে পরিচালিত; এই জন্যে দীনভাবে জিজ্ঞাসু হইয়া এই প্রবন্ধ তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম। পূজ্যপাদ ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এবং তৎসদৃশ অন্যান্য শাস্ত্রোপদেষ্টা অধ্যাপক নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মণ-সমাজের স্তম্ভে আমার এই আকাঙ্ক্ষা সমাধান করিয়া দিলে তাঁহাদের চরণে কৃতজ্ঞ থাকিব। সেরূপ করিলে আমার ন্যায় আরও অনেকের ভ্রম নিরসন হইবে, সন্দেহ নাই। আশা করি আমার প্রার্থনা বিফল হইবে না। ইতি

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী,
গোরক্ষপুর।

অসবর্ণা বিবাহের বিরুদ্ধে বৈদিকমত।

ইতঃপূর্ব্বে দেশের অনেক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণ অসবর্ণা-বিবাহের বিরুদ্ধে মহর্ষি মনু প্রভৃতি বিরচিত সংহিতা এবং পরবর্ত্তী পুরাণ ও নিবন্ধগ্রন্থ হইতে বচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই উক্ত সংহিতাসমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। ইহাতে নব্যশিক্ষিতগণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে সংহিতা ও তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতে অসবর্ণা-বিবাহ হিন্দুসমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বৈদিকযুগে ঐরূপ বিবাহ খুবই প্রচলিত ছিল এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই বেদানুমত ছিল। নতুবা পণ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে বৈদিক প্রমাণ অবশ্যই প্রদর্শন করিতেন। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এক্ষণেই বা ঐরূপ বেদানুমোদিত বিবাহপদ্ধতি নিষিদ্ধ হইবার হেতু কি? এবং উহার পুনঃপ্রচলনেই বা দোষ কি? সনাতন ধর্ম্মের মূলভিত্তিই যখন বেদ এবং সেই বেদে যখন অসবর্ণা-বিবাহের বিরুদ্ধে কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, তখন ঐরূপ বিবাহবিধির প্রচলন হইবার পক্ষে আপত্তি কি হইতে পারে? ইহার উত্তর পরে দিতেছি। এক্ষণে দেখাইব অসবর্ণা-বিবাহ সংহিতাযুগের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে কি ভাবে প্রচলিত ছিল এবং গৃহ্যাদি শাস্ত্রেই বা কি আকারে বর্ণিত আছে। মহর্ষি মনু সর্ব্বজ্ঞানময় এবং তাঁহার শাস্ত্রে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে একথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা মনুসংহিতার বিধিনিষেধ হইতেই পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিককালের বিধিনিষেধের পূর্ণ পরিচয় পাইয়া থাকেন, এবং উক্ত সংহিতাতেই প্রাচীন বৈদিক যুগের হিন্দু সমাজের প্রতিকৃতিও দেখিতে সমর্থ হন। কেননা মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া নহে, পরন্তু সম্পূর্ণরূপেই বেদ হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু যে সকল নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস নাকরিয়া যুগের পর যুগের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন গড়নের অর্থাৎ একটা Progresive iveolution এর ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত দেখিবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদের জন্য অদ্য আমার এই প্রয়াস। অদ্য দেখাইব যে আমরা প্রাচীনতম গৃহ্যাদিশাস্ত্রে ও বেদাঙ্গাদিতে অসবর্ণ-বিবাহের যে পরিচয় পাই, মনু ও অন্যান্য মহর্ষিগণের সংহিতায় তাহা অপেক্ষা নূতন কিছুরই অবতারণা করা হয় নাই। পরন্তু উক্ত সংহিতা পূর্ব্ববর্ত্তিগৃহ্যাদি শাস্ত্রের ছায়া মাত্র বা রূপান্তর, বিষয়গত বিশেষ পার্থক্য নাই। মনুসংহিতায় অসবর্ণা বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হই যে, যদিও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় নিজ অপেক্ষা অনুলোম ক্রমে হীনজাতীয় কন্যার সহিত বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপনের পর সবর্ণাভার্য্যা গ্রহণের বিধিই অবশ্য পালনীয় ছিল, তবে কামপ্রবৃত্তিবশবর্ত্তী হইয়া অসবর্ণা-বিবাহ করিতে পারেন। এবং অসবর্ণার মধ্যে শূদ্রকন্যার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধই ছিল। (মনু ৩য় অধ্যায় ৩, ১২, ১৪ ইত্যাদি শ্লোক) আর বিবাহের প্রধান অঙ্গ যে বেদবিহিত

পাণিগ্রহণসংস্কার তাহা সবর্ণা কন্যা পক্ষেই উপদিষ্ট হইয়াছে। আর প্রতিলোমবিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

এক্ষণে গৃহ্যাদি শাস্ত্র হইতে দেখাইব মনুর ঐ মত পারস্কর, বৌধায়ন, অশ্বলায়ন প্রভৃতি বৈদিক যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকগণের মতেরই সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী। পারস্করাচার্য্যের গৃহ্যসূত্র বিবাহবিষয়ক সূত্র, যথা —"তিস্রো ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুপূর্ব্বেণ। ৮। দ্বে রাজন্যস্য ।৯। একা বৈশ্যস্য ।১০। সর্ব্বেষাং শূদ্রামপ্যেকে মন্ত্রবর্জ্জম ।১১। (পারস্কর গৃহ্য ১ম কাণ্ড চতুর্থী কাণ্ডিকা)। অর্থাৎ পারস্করের মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই তিন জাতীয়কন্যা বিবাহ্যা। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা বিবাহ্যা। বৈশ্যের পক্ষে কেবল বৈশ্যাই বিবাহ্যা। সূত্রে "বর্ণানুপূর্ব্বেণ" এই কথা বলায় ব্যুৎক্রম, অর্থাৎ প্রতিলোমবিবাহ যে নিষিদ্ধ, তাহাই বুঝাইতেছে। ভাষ্যকার শ্রীহরিহর পণ্ডিতের ইহাই মত। শূদ্রার সহিত দ্বিজাতির বিবাহ পারস্করের নিজের মত নহে। তিনি বলিয়াছেন "কাহারও কাহারও মতে দ্বিজাতিগণ শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন; তবে ঐ বিবাহে মন্ত্র পঠিত হইবে না।" আচার্য্য পারস্কর স্পষ্ট করিয়া "শূদ্রামপ্যেকে" (অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন শূদ্রা দ্বিজগণের বিবাহ্যা) এই কথা বলায়, ইহা যে তাঁহার নিজের মত নহে, ইহাই প্রতীত হইতেছে। ভাষ্যকার শ্রীহরিহর পণ্ডিত বলিতেছেন—"দ্বিজগণ কর্ত্তৃক শূদ্রাবিবাহ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কেন না ধর্ম্মকার্য্যে শূদ্রার অধিকার নাই। কেন অধিকার নাই? ইহার উত্তরে তিনি নিরুক্তকার যাস্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—"রামা রমণায় উপেয়তে, ন ধর্ম্মায় কৃষ্ণজাতীয়েতি নিরুক্তকারযাস্কাচার্য্যাঃ" অর্থাৎ কৃষ্ণজাতীয়া বা শূদ্রা রমণী কামপ্রবৃত্তিবশতঃ উপভোগার্থ বিবাহিত হইতে পারে, ধর্ম্মার্থ নহে। নিরুক্ত বেদাঙ্গসমূহের একতম; এবং যাস্কাচার্য্য যে বৈদিক যুগের লোক, একথা নব্যশিক্ষিতগণও স্বীকার করেন। সুতরাং, দ্বিজকর্ত্তৃক শূদ্রাপরিণয়সম্বন্ধে যে মত প্রদর্শিত হইল, তাহা বেদসম্মত, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শূদ্রার সহিত বিবাহ যে কেবল উপভোগার্থই হইতে পারে ধর্ম্মার্থ নহে, যাস্কের এই বচন দেখিয়াও রণে ভঙ্গ না দিয়া বিরুদ্ধবাদিগণ যদি ঐই গর্হিত বিবাহের সমর্থন করিবার জন্য বেদের প্রমাণান্তর সংগ্রহ করিতে উদ্যত হন, তবে তাঁহাদের সেই বৃথা প্রয়াস তাঁহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিবে, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে—

"দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ন ধর্ম্মার্থে ভবেৎক্বচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা॥

ইত্যাদি সংহিতাকারগণের বচনের সহিত বহুপ্রাচীন গৃহ্যসূত্র ও যাস্কাচার্য্যের মত মিলাইয়া দেখুন—হিন্দুসমাজ বৈদিক যুগ হইতে সূত্রযুগের মধ্য দিয়া সংহিতাযুগপর্য্যন্ত শত সহস্র বৎসরের মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তনের (progressive movement) বশবর্ত্তী হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কি না? পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে আমরা দেখিতেছি সৃষ্টির

প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ বেদরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অচল অটল ও অপরিবর্ত্তিতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্রেও গার্হস্থ্যাশ্রমপ্রবেশ দ্বিজগণের পক্ষে 'সজাতা' অর্থাৎ সবর্ণা 'নগ্নিকা' অর্থাৎ অনাগতার্ত্তবা (যাহার ঋতু হয় নাই) এমন কন্যার সহিত বিবাহই বিহিত হইয়াছে।

আবার ঔরস পুত্রের লক্ষণ মহর্ষি বৌধায়ন বিরচিত গৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাই—

"সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিতমৌরসং বিদ্যাৎ।"

অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে বিবাহিত সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন নিজ বীর্য্যজাত পুত্রকে ঔরস পুত্র জানিবে। বৌধায়নের এই সূত্রের সহিত বিষ্ণুর—"সমানবর্ণাসু সবর্ণাঃ পুত্রা ভবন্তি।" এবং যাজ্ঞবল্ক্যের -"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ, বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ। পুনশ্চ "ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজঃ" ইত্যাদি বচনসমূহের ঐক্য সহজেই দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন সন্তানে দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ সঙ্গত না হওয়ায় সাঙ্কর্য্য দোষ আসিয়া পড়ে। এই কারণেই বৌধায়নমহর্ষির মতেও সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত ও বিহিত। অসবর্ণাবিবাহ বৌধায়ন উল্লেখ করিলেও তাহা গর্হিত, কেননা ঐ বিবাহজাত পুত্রে ঔরসপুত্রের লক্ষণ যায় না। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল পুত্রলাভ—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনম্।" সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি না করিয়া যে অসবর্ণাবিবাহ করে, তাহা অবশ্যই গর্হিত। বৌধায়নের ঔরসপুত্রের লক্ষণ হইতেই আমরা যুক্তিবলে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

তাহার পর যদিও বা কামাদি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঐরূপ গর্হিত বিবাহের দু'একটী প্রাচীন দৃষ্টান্ত অনাদি হিন্দুসমাজের বিশাল অঙ্গে কলঙ্করূপে সংঘটিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু কলিকালে বিশেষরূপে মহাত্মগণ জনহিতার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক ঐরূপ বিবাহপ্রথার নিষেধ বা উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺হৃষীকেশ শাস্ত্রিমহাশয় সম্পাদিত উদ্বাহতত্ত্বে-(বঙ্গবাসী সংস্করণ ৩৬ —৩৮) দেখিতে পাইবেন—(হেমাদ্রি ও পরাশর ভাষ্যধৃত আদিত্যপুরাণের বচন—

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।

* * * *

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।

নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।

এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন—যথা—

দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।

* * * *

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহু র্মনীষিণঃ।

এক্ষণে বিরুদ্ধবাদিগণ বলিতে পারেন যে, কলিকালে ঐ অসবর্ণাবিবাহের নিষেধক পুরাণের বচন ত উদ্ধৃত করিলেন—বেদের বচন কোথায় ? —সুতরাং ঐ নিষেধ আমরা মানিব কেন ? (নমু এতেষাং কর্ম্মণাং কলৌ নিষেধকো বেদো নাস্তি তৎ কথমেতানি কলৌ নিষিদ্ধানি ?) ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যে "সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবস্তবেৎ।" অর্থাৎ সাধু বা মহাত্মগণ মিলিত হইয়া ব্যবস্থাপূর্ব্বক লোকহিতার্থ যে নিয়ম নিবদ্ধ করেন, তাহা বেদের মতই প্রমাণ। এইজন্তই পরবর্ত্তি নিবন্ধকারগণও অবনত মস্তকে ঐ সকল আচরণ কলিকালে নিষিদ্ধ বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। এবং রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে অশৌচবিচারে অসবর্ণা-বিবাহ কলিতে নিষিদ্ধ বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় অশৌচের বিচার পর্য্যন্ত করেন নাই—যথা —

"কলৌ অসবর্ণবিবাহনিষেধাৎ সর্ব্ববর্ণসন্নিপাতাশৌচং নাভিহিতম্। (পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শুদ্ধিতত্ত্ব বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ১৯০) ।

যখন বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের নিয়ন্তা রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ অসবর্ণবিবাহ কলিকালে নিষিদ্ধ বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় অশৌচাদিরও উল্লেখ করেন নাই, তখন তাঁহাদের শাসিত সমাজের অধিবাসী হইয়া তাঁহাদের গৌরব লঙ্ঘনকরতঃ একটা নিষিদ্ধ, গর্হিত ও পরিত্যক্ত আচারের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করা কি আমাদের পক্ষে মৃত্যুকে সাদরে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহার করালকবলে আত্মসমর্পণের উদ্যোগ নহে ?

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।

বাজে খরচ।

"পূর্ব্বপুরুষের কাজটা লোপ ক'রে দিবি গোপাল ?"

"কি করব মা ! পেরে উঠ্‌ছি না, দেখ্‌তেইত পাচ্ছ টাকায় পাঁচসের চাউল। দিন কাল বুঝে চল্‌তে হবে ত ?

শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে আষাঢ় মাসের রথ দ্বিতীয়া তিথিতে মাতা ও পুত্রে কথোপকথন হইতেছিল। বাঙ্গালার কোন কোন পরিবারের প্রাচীন প্রথা এই যে, রথ দ্বিতীয়া তিথিতে দুর্গাপ্রতিমার বাঁশের কাঠামো খিলান দিতে হয়। তার পর কুম্ভকারই হউক, বা আচার্য্য ঠাকুরই হউন ধীরে সুস্থে নিজেদের কাজ করিতে থাকেন। বৃদ্ধা মাতা উপযুক্ত সন্তানকে প্রাচীন একটা ধর্ম্মোৎসবের অনুষ্ঠানে বিমুখ দেখিয়া দুঃখে কষ্টে নিজের হৃদয়গত তীব্র বেদনা সন্তানের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

"তাই ব'লে কি তুই পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন প্রথাটা একেবারে লোপ করে দিতে চাস? টাকার পাঁচসের চাউল বটে, কিন্তু মা লক্ষ্মীর প্রসাদে উপার্জ্জনওতো তোর কম নয়? ঠাকুরদের আমলে টাকা টাকা চালের মণ ছিল, তাঁরা ত পাঁচ সাত টাকার বেশী একমাসে উপায় করতে পারেন নি? তবু তাঁরা বছরের পর একবার মাকে ঘরে এনে শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। আর তুই এখন মার কৃপায় যা কিছু পাস্, তাতে ত কিছুরই অকুলান হবেনা গোপাল"?

"টাকা পয়সা আসছে বটে মা, কিন্তু দিন দিন ত খরচও বাড়ছে? চাকরটা ঠাকুরটা আছে, ছেলে পিলের লেখাপড়ার যোগান দিতে হয়, মেয়ের বয়স হচ্ছে, তার জন্যেও ত টাকা সঞ্চয় চাই? তা ছাড়া আজ এফণ্ডে, কাল ও ফণ্ডে মাসে মাসে চাঁদা দেওয়া, কাপড়, জামা, গাড়ীভাড়া, ট্রামভাড়া এই সমস্ত ব্যয়ভূষণেই সব খরচ হয়ে যায়; হাতে পয়সা থাকে কই?

"ইচ্ছা থাকলে বাপ্ এরই মাঝ থেকে মায়ের জন্য আলাদা একটা খরচ বাঁচিয়ে রাখা যায়। মনের বল থাকলে সৎকর্ম্মের পয়সায় অপর কেহ ভাগী হ'তে পারে না। কত দিক দিয়ে ত কত পয়সা অনর্থক খরচ হয়ে যাচ্ছে, ভাবতেও পারিস্‌নি কি করে সে সব পয়সা খরচ হয়ে গেল। বৈদ্যের ঘরে জন্মে' আমরাই যদি বৎসরান্তে মায়ের পায়ে দুটো ফুল বেলপাতা দিতে না চাই, লোকে তবে কি বলবে আমাদিগকে?—আর লোকের কথার ভয়েই বা তোকে পূজা কর্ত্তে হবে কেন? এ যে ধর্ম্মের কাজ, ঠাকুরদেবতার কাজ, এ কাজ যে হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য গোপাল?

সময় দাও মা, বুঝে নিই" এই কথা বলিয়া মা ও ছেলে যার যার কাজে চলিয়া গেলেন। সে দিন রথদ্বিতীয়া উপলক্ষে আফিস, কাছারী সব বন্ধ। গোপালবাবু মধ্যাহ্নভোজনের পর নিজকক্ষে শয্যাতল আশ্রয় করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শতদল! মা বলছেন এবারও পূজার আয়োজন করতে, কি বল তুমি?"

"আমি এতে কি বলবো বল। প্রায় বার বছর যাবৎ এসংসারে এসেছি, তখন তুমি কলেজে পড়ছ। বছর বছরই পূজা হচ্ছে দেখতে পাই; কিন্তু ওতে লাভ হয় কি? কতকগুলো টাকা খরচ বৈত নয়?

"টাকা খরচ হয় বটে শতদল, কিন্তু ওতে একটা আনন্দও যে নাই, তেমন কথা বল্লে কিছুতেই তা স্বীকার করিব না। বার মাস কাজ ক'রে ক'রে এক ঘেয়ে মনটার মাঝে একটু আনন্দের সঞ্চার না হ'লে এই রক্তমাংসের শরীর টিকিবে কেন? ছয়দিন উপর্য্যুপরি খাটুনী খেটে সপ্তাহে একটা রবিবার আসে, তাতেও আমরা শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেবার সময় পাই। তারপর বৎসরান্তে শরতের সুষমা দিক্ আলোকিত করে, ঘরে ঘরে আনন্দের রোল প্রবাহিত করে, মা যখন নীলাকাশভরা শুভ্র জ্যোৎস্না নিয়ে বঙ্গের ঘরে ঘরে পদার্পণ করেন —শিশুর হৃদয়ে আনন্দের লহরী খেলে যায়, যুবকের মনে ভবিষ্যতের সুখ-পিপাসা দ্বিগুণ বেড়ে উঠে, বৃদ্ধের প্রাণে অতীতের একটা সুদূর সুখস্মৃতি কি যেন কি নূতনত্ব জাগাইয়া দিয়া যায়।

পুরাতনের মাঝে নূতনের ক্রীড়া বড়ই সুন্দর! এরই নাম বুঝি বোধন, এরই নাম বুঝি জাগরণ!

"ঈস্, মস্ত একটা কবির মত যে কি মাথামুণ্ডু বকতে আরম্ভ করলে? তা তোমার সবই মানায়! তামাসার অন্ত নাই, কত কথাই না তুমি কইতে পার! এই না শুদিন বল্লে এত পরিশ্রম ক'রে টাকা রোজগার করছি, কিন্তু কৈ হাতে ত কিছুই থাকেনা? সব টাকা যেন কোন দিক দিয়ে কোথায় চলে যায়?' তাই বলছি এখন থেকে দুচার বছর কিছু টাকা হাতে করলে হয় না? মেয়েটারও বয়স হচ্ছে। ওসব বাজে খরচ দু একটা বরং নাই করলে?"

(২)

৮ পূজার ছুটি চলিয়া গিয়াছে। এবার আর পাঁচপাখুরিয়ার সেনবাড়ীতে মা দশভুজার আগমন হয় নাই। এমন কি উকীল গোপালচন্দ্র সেন মহাশয় পূজার ছুটিতে নিজের পৈতৃক ভবনেও পদার্পণ করেন নাই। পাড়ার ছেলে মেয়েগুলি পূজা আসছে, পূজা আসছে বলিয়া পাগল হইয়াছিল। গ্রামেরমাঝে মোটে একঘরে পূজা হইত। যখন তাহারা পূজার কয়েক দিন আগে শুনিতে পাইল যে এবৎসর সেনবাড়ীতে পূজা হবে না, তখন তাহাদের মুখের হাসি মুখেই মিশিয়া গেল। কেহ কেহ রোজ একবার আসিয়া যেন বাড়ীতে ঘুরিয়া যাইত, মায়ের মূর্ত্তি তৈয়ার হইতেছে কি না দেখিবার জন্য। কিন্তু হায় চণ্ডীমণ্ডপ খা খা করিতেছে, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। রথ দ্বিতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্রমাসের কৃষ্ণানবমী পর্য্যন্তও যখন প্রতিমানির্ম্মাণের সূত্রপাত হইল না, তখন গ্রামের সকলেই ইহা নিশ্চয় নির্দ্ধারণ করিল যে, এবৎসর হইতে সেনবাড়ীর পূজা বন্ধ হইল। ছেলেদের নূতন পোষাকে সজ্জা করিয়া দলে দলে পূজাবাড়ীতে সম্মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দমিয়া গেল। মার প্রসাদ পাইয়া যে সমস্ত দীনদুঃখী পূজার তিন দিন পরিতোষ লাভ করিত, এবার তাহারা ম্লানবদনে স্ব স্ব গৃহকোণেই ক্ষুদ কুড়োতে উদরজ্বালা নিবারণ করিল। সেনবাড়ীর ভাগ্যে এই বৎসর আর দরিদ্রের অন্তরোত্থিত অনাবিল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল না।

তারপরও একবৎসর চলিয়া গিয়াছে। মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। "দেখদেখি বাবা, গেল বচ্ছর ইচ্ছা করে বার্ষিক পূজাটা কল্লিনে; কতলোকে কত কথা বলছে। যত হ'ক হিন্দু ত? চিরদিন যেই কাজ দেখে এসেছি, সেই কাজটা তোর আমলে লোপ হ'য়ে গেল? আর আমিই বা কতদিন বাঁচব? আমি বেঁচে থেকে শ্বশুরের মানসী ক্রিয়াটা পণ্ড হ'ল দেখে গেলুম, এও তুই চিন্তা ক'রলি না? সারা পৌষ মাসটা তুই নিজেই না কি কষ্টটা ভোগ ক'রলি? বুড়ো বয়সে তোর শরীরে ব্যারাম দেখলে আমার মনটা কেমন করে উঠে। এখন তোদিগকে রেখে আমি ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচি। যাক্ তবু ভাগ্যি যে, প্রাণে বেঁচে উঠেছিস্। এত পরিশ্রম আর এখন করিস্‌নি গোপাল, শরীরটার দিকে চাইতে হবে ত?"

"না মা, এখন তেমন কিছুই পরিশ্রম করিনা। কাছারীর বেলায় নিজের কাজ ছাড়া এখন আর বাজেকাজে পরিশ্রম করিনা। সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া, বইলেখা, পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠান, সব বন্ধ করেছি। যাক্ কয়েকটা দিন শরীরটা শোধ্‌রাক্।"

"তাই ভাল, তাই বল্। আমার শ্বশুর ঠাকুরছিলেন কিন্তু খাটী পুরুষ, সারা দিন খাট্‌তেন, তবু তার শরীরে অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পেতনা। হাল, গোয়ালের গরু বাছুরগুলিকে তিনি প্রাণের সহিত যত্ন করতেন, চাকর গুলোকে সর্ব্বদা শাসনের উপর রাখ্‌তেন। মাঠে মাঠে গিয়ে দেখ্‌তেন চাকররা কে কি কর্‌ছে। তাঁর এতেই ছিল আনন্দ, এতেই ছিল সুখ। আশু ধান্য ও হৈমন্তিক ধান্যের সোণার ছড়া নিয়ে মা লক্ষ্মী বৎসরের মাঝে দু'বার আমাদের গৃহে আসতেন। পায়সে, পিষ্টকে তোদিগকে পেট ভরিয়ে খাইয়ে আমরাও সুখে শান্তিতে দিনগুলি কাটিয়ে দিয়েছি। যদিও আমরা মাঝে মাঝে জ্বরে, পেটের পীড়ায় দু' চার দিন ব্যারামের যন্ত্রণা অনুভব করেছি, তোর ঠাকুর দাদা কিন্তু রোগ কাকে বলে, তা কখনও জানেন নি। শরীরটাও ছিল তাঁর কতই পুষ্ট! দেখেছিস্‌ত তুই, কি রকম লম্বা চওড়া জোয়ান ছিলেন তিনি!"

"হাঁ মা, ঠাকুর দাদার কথা আমার এখনও বেশ মনে আছে। তাঁরা ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। চাকরী নকরী করতে হ'তনা, ভাবনা চিন্তার দায় ছিলনা। গোলার ভাতে পেট ভরে খেয়ে তাঁরা গ্রাম্য সুখ ভোগ করে গেছেন। এখন আমরা এক বেলা কাছারীতে না গেলে পয়সা পাওয়ার জোটি নেই। খাওয়া দাওয়ার সময় নেই, শুধু কাজ; জমি জমা সবই আছে সত্য, কিন্তু তাতে ত আর কুলায় না? একবার মনে করেছিলুম্ কোন কাজই করবনা, নিজের তালুকদারী পর্য্যবেক্ষণ করেই কাল কাটাব। তারপর সহরবাসের প্রলোভনে আকৃষ্ট হ'য়ে বাপ দাদার সঞ্চিত টাকাগুলিতে হাত দিলুম, বাড়ী খরিদ করে স্বাধীন ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করলুম। ভেবে ছিলুম ওকালতী করে কতকটা নিজের ইচ্ছার উপর চল্‌তে পারব, কিন্তু কৈ তা ত হ'য়ে উঠ্‌ছেনা?"

"যা বলিস্ গোপাল! সহরে বাস করলেও গ্রাম্যলক্ষ্মীকে একেবারে অনাদর করতে নাই। বহির্জগৎ হ'তে প্রকৃতি দু হাত ভরিয়ে খাদ্য সঞ্চয় করে বলেই, সহরের লোক বেঁচে আছে। স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া দেখতে গেলেও গ্রামবাসীরাই উন্নত। সহরবাসীদেরও উচিত বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার গ্রাম্য মুক্ত বাতাস উপভোগ করা। তোরা যার ঘরে জন্মেছিস, তিনিও অনেকটা পিতৃগুণ পেয়েছিলেন। যদিও দেখতে শুনতে তেমন বলিষ্ট গঠন পাননি, তবু খাটতে পারতেন খুব। দেখছিস্‌ত মরবার আগেও তিনি পূজার সময় কত লোককে স্বহস্তে পরিবেশন করে খাইয়েছেন? হায়, ভগবতীর প্রতি তাঁর কতই না ভক্তি ছিল।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই "বাবা আমায় একটা বারাণসী সাড়ী দেবে" বলিয়া গোপাল বাবুর দশমবর্ষীয়া বালিকা সুহাসিনী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত

নাতিনীর আগমনে ঠানদিদি ছেলের কাছে বেশীক্ষণ নিজের মনোবাথ। জানাইতে না পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তখন গোপাল বাবু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কেন রে, বারাণসী সাড়ী কি তোর নেই? ঐ যে গেল বছর তোকে একটা সাড়ী কিনে দিয়েছি, ওটাকে কি সাড়ী বলে?"

"ওটা বাবা পার্শি সাড়ী, তার আবার রংটা ভাল নয়, মেটেমেটে রং। ওটা বাক্সে আছে। ঘোষদের অমলাকে আজ তার বাবা সোয়া শ টাকার একটা বারাণসী সাড়ী কিনে দিয়েছেন। দেখ্‌তে যদি বাবা সাড়ীটা, কেমন সুন্দর চক্‌চকে।"

এমন সময় কক্ষের ভিতর শতদলের বিকাশ হইল। বঙ্কিম ভঙ্গিমায় গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি বলিলেন "দাওনা কিনে একখানা সাড়ী; সোয়া শ টাকা বৈত নয়? এতই দিয়েছ, আর একটা সাড়ী দিতে পারবে না? সুহাস আমাদের বড় মেয়ে, বড় আদরের। বিয়ে হ'য়ে গেলে ত সে আর এমনি তোমার কাছে কাপড়ের দাবি করবে না? বরং একটু বড় দেখে কিনিও, যাতে সে অনেকদিন ওটা পরতে পারে। বিয়ে ত একদিন দিতে হবে, তখন বরং আলাদা আর কাপড় না কিনলে।"

"এমনি করেই বুঝি তুমি আমাকে টাকা সঞ্চয় করবার উপদেশ দাও?"

"ওমা আমি বুঝি তোমার সর্ব্বনাশ করবার পরামর্শ দিলুম? আয়লো সুহাস - আমার চুড়ী বন্ধক রেখে তোর সাড়ী কিনে দেবো এখন" এই বলিয়া গোপাল-গৃহিণী সদর্পে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

(৩)

তারপর প্রায় পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গোপালবাবুর আর সে অবস্থা নাই। কন্যার বিবাহে ও অন্যান্য কতিপয় ব্যাপারে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। বহুদিন যাবৎ তাঁহার সংসারে বাজে খরচের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছিল; তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন নাই। গৃহিণী দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুর আচার নিষ্ঠায় অবহেলা করার ফলে সমান ঘরের বৈদ্যগণ তাঁহার কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন নাই। অবশেষে বহু অর্থের বিনিময়ে শিবপুর কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা একটী ছেলের সঙ্গে সুহাসের বিবাহ দেওয়া হয়। ছেলের নগদ (direct) মূল্য একহাজার টাকা, তা ছাড়া অলঙ্কার ও যৌতুকাদিতে (indirect) মূল্য ও(পণ) হাজারের কম নহে। বিবাহের পর দেখা গেল যে গান, বাজনা, খেমটা প্রভৃতির ব্যয় সহকারে এই বিবাহে গোপালবাবুর প্রায় সাড়ে চারিহাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। তবু রক্ষা, তাঁহাকে এই পর্য্যন্ত বাড়ী ও রেহাই দিতে হয় নাই, গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাম্পে অধমর্ণের নামও দস্তখত করিতে হয় নাই। এই ফ্যাশনে দুই তিনটী মেনকা দান করিতে গেলেই ভবিষ্যতে কার কি হইবে কে জানে?

পাঠক! চলুন একবার শ্যামবাজারের স্বনামখ্যাত (notorious) রাধাচরণবাবুর মজলিসটা

গোপনে গোপনে দেখিয়া আসি। রাধাচরণবাবু জাতিতে পোদ্দার। বাঙ্গালার অনেক সহরেই তাঁহার দুই একটী করিয়া ভাটিখানা আছে। এই কারবারে ইনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয়ও করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মেদসঞ্চয় করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ধনী বলিয়াই এখন তাঁর পোদ্দার পদবীটা জনসাধারণের বিস্মৃতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ইনি সম্প্রতি বাবু আখ্যা ধারণ করিয়াছেন।

পৌষ মাস। রাত্রি প্রায় অটটা। রাধাচরণ বাবুর বৈঠকখানায় সারিসারি চেয়ার ও জিচেয়ারে বসিয়া কতকগুলি বাবুবেশপরিহিত ভদ্রলোক নানা রকমের গল্পগুজব করিতেছেন, কেউ কুইন্ মার্কা সিগারেট ও কেউ মোটা আকারের সিগারেটধূমে কক্ষটীকে ধূমায়িত করিয়া তুলিতেছেন। বৈঠকে প্রায় দশ বার জন উপস্থিত; সকলেই যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কাল কাটাইতেছেন। সহসা গোপাল বাবু আসিয়া তাঁহাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। গোপাল বাবুকে দেখিয়াই রাধাচরণ বাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কি গো গোপাল বাবু, তোমার বুঝি আর শ্রীরাধার কুঞ্জ ছেড়ে এই নব-নিকুঞ্জে আস্‌তে মন ধরে না? আমরা সবে পাঁচটা থেকে এখানে বসে আছি! এরই নাম বুঝি সান্ধ্য-সম্মিলন?

'না ভাই, বাড়ীর একটা গোলমালে আসতে কিছু দেরী হয়ে গেল। আজ ক'দিন মার ভারী অসুখ। তাই তিনি পত্রলিখে ইষ্টদেবকে বাসায় আহ্বান করেছেন। তিনি নাকি মার দীক্ষাগুরু, নাম গৌরাঙ্গসুন্দর স্মৃতিরত্ন। বাসায় কেউ আস্‌লে তাকে বিদায় না ক'রে ত আর আসা যায় না।'

"আরে রেখে দাও তোমার গুরু স্মৃতিরত্ন!

এমন কত রত্নই আজ কাল পথে ঘাটে গুরুগিরি ঝাড়ছে। আমোদ ক'রব, ফুর্ত্তি ক'রব, তাতে আবার গুরু টুরু কেন বাবা? ব্যাটারা আবার বলে কিনা আমাদিগকে একঘরে করে রাখবে। আস্পর্দ্ধা দেখ? আমাদের বাবা মুখে যা ভাল লাগছে তাই খাবো, যা মনে ধরছে, তাই করবো। শাস্ত্র টাস্ত্র আবার কোত্থেকে এল? যত সব রুচির বিরুদ্ধে কথা-কওয়া!

"আরে থাম থাম রসিক বাবু, তুমি যে দেখছি কাজের বেলায় অরসিক হ'য়ে পড়লে। ওরে কেষ্টা! আর দুই পেয়ালা চা নিয়ে আয়ত; আর ঐ বোতল দুটা আলমারীর উপর তাকে।—ভাল কথা গোপাল বাবু; ঐ চাঁদার কথাটী—তুমি যা ওদিন বলছিলে। আজই স্বাক্ষর করে যাওনা?

রাধাচরণ বাবুর এই অনুরোধের পর সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "বেশত, বেশত, আমরাও সেই প্রস্তাবই করব মনে করছিলুম। দস্তখৎটা আজই হউক। 'শুভস্য শীঘ্রম্।"

"তা, চাঁদাও ত বড় বেশী নয়, একশ দশ টাকা মাত্র। আমাদের নাম বরং এখনি সই করছি। ইচ্ছা করলে কাল হ্যাে ভিতরই নব টাকার যোগাড় হয়ে যায়। কি বল হে গোপাল? মজলিসের দিনটাও আজই ধার্য্য হ'য়ে যাক্।"

"বাইজীর বায়না কত রাধাচরণ বাবু ? "বায়না বড় বেশী নয়, তবু বাজে খরচ টরচ ত আছে ? (মদ্যপান) অন্ততঃ হাজার দেড়েক টাকার দরকার। ওরে বিস্কুটের নূতন বাক্সটা নিয়ে আয় ত। [মদ্যদান]

তখন রসিকবাবু চাঁদার খাতাখানা সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন। একে একে সেই কাগজে সকলেরই নাম সই হইয়া গেল। কল্যই একশত দশ টাকা লইয়া সকলকে হাজির হইতে হইবে।

(৪)

"বলদেখি শতদল! ছেলেটাকে স্কুল থেকে বের করে দিলে—মাষ্টারব্যাটা, এখন কি করা যায় ? মাইনের টাকা দিতে পারিনি, তাই তাকে স্কুলে যেতে মানা করলে! শুনছি নাকি তার নাম কাটা যাবে!"

"সতীপ্রসন্ন ত ছেলে মন্দ নয়; একটা ফ্রি ট্রি লওয়া যায় না স্কুলে ? হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে একবার আলাপ ক'রে দেখনা ?"

"আলাপ একবার করেছিলুম, শতু! কিন্তু কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করলে না। আমার জীর্ণ শীর্ণ পরিচ্ছদ ও রুক্ষ চেহারা দেখে মাষ্টারগুলো সব মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল। উপহাসের একটা বিকট হাস্য দমকা বাতাসে মিশে আমার মাথার উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে গেল। আর আমি কোন কথা না ব'লে সোজা সুজি চলে এলুম।

"সেক্রেটরীকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে ?"

"জিজ্ঞেস করবো আমার মাথা আর মুণ্ডু। কেউ আর এখন আমার কথায় কাণ দেয় না, শতু! আমি যেন কি ছিলুম, কি হ'য়ে গেছি। রাস্তার লোকগুলি আমায় দেখ্‌লে কুকুর লেলিয়ে দেয়। মক্কেল এখন আমার বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ওকালতীতে পয়সা নেই, কর্জ্জ করলুম, ধার করলুম, বাড়ী বাঁধা দিলুম, একে একে তোমার গয়নাগুলি সব বিক্রী করলুম, তবু আমার ধাঁধা ভাঙ্‌ছে না। এখন ছেলে পিলেগুলোকে বাঁচাই কি করে ? আমার মাথা ঘুরছে, শতু! সতীপ্রসন্নকে একটা কাজ নিতে বল।" এই বলিয়া গোপালবাবু দুর্ব্বল দেহযষ্টিখানা বিছানার উপর পাতিত করিয়া উপাধানে মস্তক রক্ষা করিলেন। গৃহিণী ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

মাসিক পনেরো টাকা বেতনে সতীপ্রসন্ন লোন অফিসে একটা কাজ নিয়াছে। তাহার মনে শুধু চিন্তা—কি উপায়ে সকলের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করবে। ম্যাট্রিকুলেশনের ক্লাস পর্য্যন্তই তাহার বিদ্যার শেষ হইয়াছে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সতীপ্রসন্ন সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিল। অতি কষ্টেও তাহাদের দিন চলে না। পিতার এখন সেই ওকালতী ব্যবসায় নাই। দিন দিন তিনি কুপথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পিতার কীর্ত্তিকলাপ পুত্রের নিকট কিছুই অবিদিত রহিল না।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর রাধাচরণবাবুর বাড়ীতে গোপালবাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

একেতো শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল—তার উপর যকৃতের পীড়ায় তিনি বহুদিন যাবৎ ভুগিতেছেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র সতীপ্রসন্ন কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া পিতাকে গাড়ীতে করিয়া বাড়ী নিয়া আসিল। ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতার দরুণ মস্তিষ্কে রক্তের গতি বন্ধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাতের প্রকোপ। বরফ ও গোলাপজলের প্রয়োগে গোপালবাবুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। ডাক্তারের আটটাকা ভিজিট দিতেই সতীপ্রসন্নের প্রাণান্ত হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাস। খুব গরম পড়িয়াছে। গোপালবাবু রোগযাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, পার্শ্বে শতদল উপবিষ্টা। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গোপালবাবু বলিলেন—"উঃ বড় যাতনা। প্রাণ যায়! মাথাটা ভন্ ভন্ ঘুরছে। ছোট খোকা কোথায়?

"এই যে বাবা আমি এখানে" এই বলিয়া হরিপ্রসন্ন পিতার সম্মুখবর্ত্তী হইল।

গোপাল বাবু দুই হাত উঠাইয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, পারিলেন না। "আয় বাবা আয়, কাছে আয়। একদিন তুই আমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ছিলি। আমি পিশাচ, তোকে সঙ্গে নিয়ে তোর গলার হার ছড়া দিয়ে রাধাচরণ বাবুর ঋণশোধ করলুম।—কাঁদিস না বাপ্! আমি বড় ভীষণ হয়েছিলুম, ডাকাত হয়েছিলুম, কাণ্ডজ্ঞান আমার ছিল না। এখন আমাকে ভয়ানক রোগে আক্রমণ করেছে। শতদল! যেই দিন থেকে মার কথায় কথায় প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছি, সেইদিন অবধি আমার স্কন্ধে গ্রহ চেপে বসেছে। আমি চোখে পথ দেখতে পাইনি, সহধর্ম্মিণী তুমি, তুমিও আমায় পথ দেখিয়ে দাওনি। ভোগ কর, এখন তার প্রতিফল—ভোগ কর। ক্ষণিক সুখের লালসায়, মোহের প্ররোচনায় কত অখাদ্য খেয়েছি, কত কুকাজ করেছি। নির্জ্জীব আমি, ও সমস্ত সহ্য করতে পারব কেন? বাপ দাদা ছিলেন বলবান, কৈ তাঁরাও ত অমন কাজ কখনও করেননি? গুরুদেবের নিন্দা করেছি, হিন্দুর হিন্দুয়ানীতে অবিশ্বাস ক'রে পৈতৃকপূজাটা পর্য্যন্ত তুলে দিয়েছি। মার শ্রাদ্ধটা করতে পারলুম না, তাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কাজ আমা দ্বারা সম্পন্ন হ'লনা। পুত্র রৈল। শৈশবের সেই আনন্দ, সকলের সেই ভালবাসা, আর আমার ভাগ্যে ঘটল না। অনেক বাজে খরচ করেছি, তবু ধর্ম্মের কাজে—পুণ্যের কাজে কখনও মতি যায়নি। মাঝে মাঝে তোমার পরামর্শ চেয়েছি, পাইনি—প্রতিফল ভোগ কর তার,—প্র—তি—ফ—ল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যব্যাকরণ পুরাণতীর্থ।

সাম্প্রদায়িকতা

ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই বা ততোধিক এইরূপ কথা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে কোথাও পাওয়া যায় না। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্‌, সর্ব্বান্তরাত্মা পরমেশ্বর নিখিল জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে একমাত্র বর্ত্তমান। তদ্ব্যতিরেকে স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদে অন্য আর কেহ ঈশ্বর পদবাচ্য আছেন, এরূপ কল্পনা প্রামাণ্য কোনও গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় না। তবে এ সাম্প্রদায়িকতার বিড়ম্বনা কেমন করিয়া ঘটিয়াছে? তুমি কৃষ্ণের আরাধনা কর, বিষ্ণুর আরাধনা কর। তন্মধ্যে কেহ বা মাছ মাংস কিছুই খাওনা, কেহ বা মাছ খাও, মাংস খাওনা, কেহ বা মাংস গরুড়কে নিবেদন করিয়া খাও। আর আমি মা কালীর ভক্ত, দুর্গাপূজা করি, মাছ মাংস ও মাকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাই, তা'র জন্য আমার উপর তুমি অত খড়্গহস্ত কেন? আমি জীবহিংসা করি, আমার দয়াধর্ম্ম নাই বলিয়া আমাকে গালি বর্ষণ কর কেন? তুমি আবার তোমার বিষ্ণু কৃষ্ণকে বড় করিবার জন্য ব্যস্ত। নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা কর, এমন কি এইরূপ তর্কবিতর্কের ফলে অনেকক্ষেত্রে এরূপ সাম্প্রদায়িকতা চিরশত্রুতায় পরিণত হইয়া অনেক জীবনকে অশান্তিময় করিয়া তোলে। এইরূপ ভাবে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্যে নানাপ্রকার পার্থক্য, মালিন্য, কলহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এতই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহার স্থলে এখন আছে কেবল সাম্প্রদায়িকতার দলাদলি ও মারামারি এবং নিজ নিজ পক্ষসমর্থক বাহ্যিক কতকগুলি আচার ব্যবহার। হায় আর্য্যভূমির আর্য্যসন্তানগণ! কোথায় তোমাদের সেই সকল শিক্ষা ও উদার ধর্ম্মনীতি? যতদিন ভারতের সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা থাকিবে, ততদিন উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? তাই আজ ব্রাহ্মণ-সমাজের নিকট করযোড়ে এই দীনহীন ব্রাহ্মণের বিনীত প্রার্থনা যে, সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ উদ্দেশ্যে একটা কিছু উপায় উদ্ভাবন করুন। আমার বিশ্বাস সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত উদ্দেশ্য-প্রচারে তাহার অনর্থকরাংশ বিদূরিত হইবে ও শান্তিরাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

কালী, তারা, দুর্গা, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হিন্দু একই ঈশ্বর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবহার করে, ভিন্ন ভিন্ন কোনও দেবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ওরূপ নাম ও শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভবপর ও নহে। ঐরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামে একই ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করার তাৎপর্য্য আছে এবং তাহার যথেষ্ট সার্থকতাও আছে। সেই অংশে সাম্প্রদায়িকতার ও সার্থকতা আছে। ও সেই লক্ষ্যস্থির রাখিয়া কার্য্য করিলে অনিষ্ট-কর ও অনভিপ্রেত সাম্প্রদায়িকতা আর থাকে না। তবে যদি তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা বল, তবে তাহা অমৃতই প্রসব করে, কলহাদি অশান্তিও ঘটিবার আর অবকাশ থাকেনা। ঈশ্বরের ঐরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম উপাধিভেদ মাত্র। যেমন যে কোনও একজন রামাখ্য ব্যক্তিকে তাহার পুত্র পিতা বলিয়া থাকেন, তাহার স্ত্রী স্বামী বলেন, তাহার ভৃত্য প্রভু

বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহার পিতা পুত্র বলিয়া আহ্বান করেন, এরূপভাবে এক রামের পিতা, স্বামী, প্রভু, পুত্র প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে ব্যক্তি একজন মাত্র, কেবল উপাধিভেদে তাহার ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ধর্ম্ম অথবা ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদত্ত হয়। সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগুণের আকর, সর্ব্বপ্রকার ভাবের বারিধি যে ঈশ্বর—তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কালী, তারা, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, প্রভু প্রভৃতি নামমাত্র দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহে, এরূপভাবে একাধিক ঈশ্বর শাস্ত্র কখনও কল্পনা করেন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগুণাকর, ভাবসমুদ্র, তবে তাঁহার ঐ সকল শক্তি, গুণ বা ভাব সকলের ঐরূপ বিভাগ করার আবশ্যকতা কি হইল, ইহাও জ্ঞাতব্য বিষয়। তিনি না হয় শক্তি, গুণ ও ভাবের সমষ্টি হইলেন, কিন্তু অনন্তকোটী ব্যষ্টিজীব কোন্ ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন, তাহারা প্রত্যেকে তাঁহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি, গুণ ও ভাব লইয়া এক একটী জীব হইয়াছে। যে জীব যেভাবে অনুপ্রাণিত, তাহাকে তদনুকূল ভাব চিন্তা করিতে বলিলে তাহার চিন্তাপ্রবাহ অপ্রতিহতগতি হয়। কিন্তু তাহাকে অন্য ভাব চিন্তা করিতে হইলে, তাহার ক্লেশ বোধ হয় ও তাহা দুঃসাধ্য হয়। যে জীবের মধ্যে মাতৃভাব অধিকতর, সে যদি ভগবানের আরাধনা সন্তান-বুদ্ধিতে করে, তবে অক্লেশে তাহার আরাধনা সিদ্ধ হইবে; সেইজন্য গোপালভাবে সে তাঁহার আরাধনা করিবে। যে ব্যক্তির মধ্যে সন্তানভাব প্রবলতর, সে পিতৃমাতৃভাবে ভগবানের ভজনা করিবে। তন্মধ্যেও পার্থক্য আছে, কোনও সন্তানমধ্যে মাতৃভক্তি প্রবলতর থাকে, কোনও সন্তান মধ্যে পিতৃভক্তির প্রাবল্য থাকে। সুতরাং মাতৃভক্ত পুত্র কালী, তারা, দুর্গা প্রভৃতি ঈশ্বরের মাতৃভাবের উপাসনা করিবে ও পিতৃভক্ত সন্তান ঈশ্বরের পিতৃভাবব্যঞ্জক সদাশিবমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তির হৃদয়ে প্রভুভক্তির বীজ উন্মুখ থাকে, সে ঈশ্বরের প্রভুভাব উদ্দীপক বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসক হইবে। সকল মনুষ্য মধ্যে সকলভাবই কিছু কিছু বর্ত্তমান থাকে, তবে কোনওটী বেশী, কোনওটী কম। যেভাবের আধিক্য থাকে, উপাসনা সুগমকরণার্থে হিন্দুশাস্ত্র ভগবানের ঐ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনার আদেশ দিয়াছেন। মুসলমান বা খ্রীষ্টানগণ মধ্যে প্রতি ব্যক্তিভেদে ঐরূপ উপাসনার পার্থক্য দেখা যায় না, সেইজন্য হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা উদার বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কারণ যে কোনও প্রকৃতি বা ভাবসম্পন্ন জীবেরই উপাসনাপক্ষে কোনও বাধা বা ক্লেশ না হয়, হিন্দু ধর্ম্ম বা হিন্দুশাস্ত্র তাহার উপায় করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোনও ধর্ম্মে তদ্রূপ ব্যবস্থা নাই, কারণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে মুসলমান খৃষ্টানগণ মধ্যেও সকল লোকের ভাব, গুণ বা শক্তিপার্থক্য আছে; সকলকে একভাবে আরাধনা করিতে বলিলে আরাধনার উৎকর্ষ হইতে পারে না। পুনশ্চ কোনও এক ব্যক্তির উপাসনার আরম্ভকালে, তাহার ভাব প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া

তাহার ইষ্টদেবতানির্ব্বাচনের পরে আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে ইষ্টদেবতার প্রতি মূলভাব স্থির রাখিয়া উপচার ও আরাধনার প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কারণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে আরাধনার আধিক্য ও প্রগাঢ়তার সঙ্গে যত তাহার সংকীর্ণতা বিদূরিত হইবে, তত তাহার ভাব, শক্তি ও গুণের সীমা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; ঈশ্বরের সকল ভাব, শক্তি ও গুণই তাহার দৃষ্টিপথে আসিবে। এমন কি সে অবশেষে ঈশ্বরের সহিত একই হইয়া যাইবে। প্রকৃত তত্ত্বকথায় বলিতে গেলে সে স্বয়ং ঈশ্বরই হইয়া যাইবে। তখন ঈশ্বরের উপাধিভেদ তাহার পক্ষে আর থাকিবে না। তবেই দেখ, আমি শক্তিরই আরাধনা করি, আর তুমি বিষ্ণুরই আরাধনা কর ও তৃতীয় একজন সদাশিবেরই আরাধনা করুন, সকলে এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করিয়া থাকে; তবে তোমাতে আমাতে বা অন্যজনে বিরোধ হইবে কেন? তোমার প্রকৃতি-অনুসারে তুমি বিষ্ণুর আরাধনা কর, আমার সংস্কারমতে আমি কালীর আরাধনা করি, আর তাঁহার প্রবৃত্তিমতে তিনি ভোলানাথের ভজনা করেন, কিন্তু সকলেই ত সেই একজনেরই পূজা করি? তুমি প্রভু বলিয়া ডাক, আমি মা বলিয়া ডাকি, তিনি বাবা বলিয়া ডাকেন, ইহাই ত পার্থক্য? তবে এত দ্বন্দ্ব কিসের? কলহ কেন? সামান্য উপচারাদি লইয়া? আমাদের প্রত্যেকের সামান্য সামান্য বিধি নিষেধ লইয়া? উহাও যে আমাদের প্রত্যেকের সুবিধার জন্য ব্যবস্থাপিত আছে? আমার প্রকৃতিঅনুসারে আমি বিশ্বাস করি—ঈশ্বর মাছ মাংস খাইতে ভাল বাসেন, সুতরাং আমি ত তাহা দিবই? তোমার ভাল লাগে না, তুমি দিও না। তোমার দধি দুগ্ধাদি ভাল লাগে, তুমি তাহাই নিজের প্রভুকে নিবেদন কর। মা আমার রক্তচন্দন ভালবাসেন, জবাপুষ্পে তাঁহার প্রীতি, সুতরাং আমি তাহা দিয়াই তাঁহাকে সাজাইব, তোমার তুলসীপত্রে অধিক প্রীতি, তুমি শ্বেত চন্দন মাখাইয়া তাহাই কেন দাওনা? ঈশ্বর তাঁহার এই বিশ্বরাজ্যে যত কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি সমস্তই উপভোগ করেন। সমস্তই ত একজনের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়? সেই জন্যই বুঝি তিনি নানাপ্রকার বৃত্তি দিয়া নানা জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার যে দ্রব্য প্রকৃতির অনুগত, সেই সেই দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা কর, তিনি সমস্তই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তোমার প্রকৃতির অনুগত মাছ মাংস, গোপনে তুমি তাহার রস জিহ্বার দ্বারা গ্রহণ কর; অথবা তুমি তদ্রূপ না করিলেও মাছ মাংস দেখিলে কিন্তু তোমার জিহ্বা সরস হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে তুমি যদি ঠাকুরকে তাহা না দাও, তাহা হইলে কি তাঁহার সহিত বঞ্চনা করা হইল না? তোমার জিহ্বা সরস হওয়া মাত্রে যে তোমার ইষ্টদেবতা তাহার রসাস্বাদ করিয়াছেন, তাহা কি তুমি বোঝ নাই? তোমার যদি সত্যই বিশ্বাস থাকে যে, মাছ মাংস অপবিত্র দ্রব্য, উহা কেবল হিংসা দ্বারাই লাভ হয়, তাহা হইলে কিন্তু তুমি তাহা কদাচ ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিও না। কিন্তু আমি মায়ের তৃপ্তিসাধনজন্য পশুহনন করিয়া যদি তাঁহার ভোগ দি, তবে কি তোমার প্রভুকে তাহা দেওয়া হইল না? ঈশ্বর সম্বন্ধে ওরূপ পার্থক্য বুদ্ধি কর কেন?

সকল উপচারাদি ও উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপই জানিবে। বস্তুতঃ পক্ষে ঈশ্বরের উপাধি-ভেদেই যে সকল উপচারের ও সর্ব্বপ্রকার উপাসনার প্রকার ভেদ হইয়াছে, তাহা কিন্তু প্রকৃত উপাসনাতথ্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। উপাসনাদ্বারা একই জীব ক্রমশঃ, উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইতে থাকে; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রবৃত্তি, ভাব ও শক্তি সকলও উন্নত ও বিশুদ্ধ হইতে থাকে। যেমন যেমন তাহা ঘটিতে থাকে, তেমন তেমন উপচার ও উপাসনার ক্রমও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। তুমি ঈশ্বরের যে কোনও উপাধি তোমার প্রকৃতির অনুকূলমতে উপাসনা করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাক, সেই উপাধি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বভাবসিন্ধু ঈশ্বরেরই, ইহা জানিয়া উপাসনা করিতে থাকিলে তোমার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপচারাদির পরিবর্ত্তন করিতেও তুমি আর কুণ্ঠিত হইবে না। আর আমার সঙ্গে তোমার কলহের কোনও কারণ থাকিবে না। নচেৎ তুমি যদি ভাব যে তোমার বিষ্ণু মালপোয়া, দধি, দুগ্ধ, ছানা ও মাখন উপভোগ করেন, তিনি শুদ্ধসত্ত্বময়। আর আমার কালী, দুর্গা প্রভৃতি মাছমাংস ও রুধির আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তমোময়। তবে আমার বিশ্বাস—তোমার উপাসনা কোনও কালে সিদ্ধ হইবে না। কেবল ছানা, মাখন আহার করেন এমন বিষ্ণু কোথায়? আর কেবল মাছমাংস খান, এমন কালীই বা কোথায়? আমিত দেখিতে পাই না। তুমি বিষ্ণুর আরাধনা কর, সুতরাং তুমি কস্মিন্ কালে মাছ বা মাংস স্পর্শ করিতে পারিবে না, জবাপুষ্প বা বিল্বপত্র হাতে করিতে পারিবেনা, তুলসীর মালা গলায় দিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি ও শ্রাদ্ধশান্তি ছাড়িয়া কেবল খোল করতাল লইয়া নামকীর্ত্তন করিবে ও আমি কালী আরাধনা করি, সুতরাং আমি আর তুলসীতলায় যাইতে পারিব না, আমাকে মাছ মাংস খাইতেই হইবে ইত্যাদি যে ভাবে এখন সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত হইতেছে, তাহা ভ্রান্তিপ্রসূত। বস্তুতঃপক্ষে তুমি বিষ্ণুরই আরাধনা কর, অথবা আমি কালীরই আরাধনা করি, আমাদের উভয়কেই প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং তদনুসারে ক্রমে ক্রমে আমাদের আচার ব্যবহার খাদ্যাখাদ্য অথবা উপচারাদির প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে। আজ আমি ইন্দ্রিয়সকলের দাস হইয়াছি, সুতরাং আমি কালীর আরাধনা করি বা বিষ্ণুরই আরাধনা করি, ভোগের মধ্যদিয়াই আমাকে ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতে হইবে। তারপর যখন আমার ভোগস্পৃহা বিদূরিত হইবে, চিত্ত নির্ম্মল হইবে, নিরোধ অভ্যস্ত হইবে, তখন আমার ইষ্টদেবতা যে কেহ হউন না কেন, তখন ত্যাগের মধ্যদিয়া আমাকে উপাসনা করিতে হইবে। অবশেষে তুমি বৈষ্ণব ও আমি শাক্ত এই পার্থক্য আর কোন অংশে আমাদের মধ্যে থাকিবে না। সুতরাং, খদ্যাখাদ্যের বা উপচারাদির বা অন্যান্য আচার ব্যবহারের পার্থক্য ইষ্টদেবতা ভেদে হয় না, উহা প্রকৃতি-ভেদে একসম্প্রদায়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। ঈশ্বর কি? তিনি উপচার সকল কি ভাবে গ্রহণ করেন? উপাসনা কি জিনিষ? উপাসনার ক্রম কিভাবে গঠিত? এসকল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বুঝিলেই আমার বিশ্বাস সকল সংশয় দূর হইতে পারে। বিষ্ণুর নিকট মাংস নিবেদিত

হইতে পারে এরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে বিরল নহে; তাহার দৃষ্টান্ত আজও অনেক স্থলে বর্ত্তমান। এসকল কথা বোধ হয় যাঁহাদের জ্ঞানের গণ্ডী নিতান্ত প্রাদেশিক, তাঁহারা ভিন্ন অন্যে অস্বীকার করিবেন না। এ প্রসঙ্গে আমার আর একটী কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ হইল। যাঁহারা বলেন পশুবলিদান হিংসাদ্যোতক, বলিদানের প্রকৃত অর্থ তাঁহারা কিরূপ বোঝেন? এবং হিংসা শব্দেরই বা কি অর্থ করেন তাহাও জানিনা। ঈশ্বরপ্রীতির নিমিত্ত পশুবলিদান হিংসামূলক হইতে পারে কি প্রকারে? দাতাকর্ণ অতিথি সৎকার নিমিত্ত যখন স্বীয় পুত্রের মাংস ছেদন করিয়াছিলেন, তখন কি তাহা হিংসা করা হইয়াছিল? দেবপ্রীতির নিমিত্ত যখন দধীচির অস্থি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তখন কি তাহাতে হিংসা করা হইয়াছিল? সকল কার্য্যের মূলে উদ্দেশ্য দ্রষ্টব্য। কার্য্যমাত্র লক্ষ্য করিয়া উহা ভাল কি মন্দ তাহা বলা সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর কোনও জীবের প্রাণ নষ্ট হইলে তাহাতে প্রীতিলাভ করেন না, কারণ তিনি পরমদয়ালু; শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে বলিদানের পশুহননমাত্রে সেই জীবের মুক্তিলাভই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং জীবের প্রাণনাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার মুক্তি হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের তাহাতে অপ্রীতির কি কারণ হইতে পারে? অধিকন্তু ঈশ্বরের প্রীতি অপ্রীতি কিসে হয়? তাঁহার প্রীতি অপ্রীতি কিরূপ, এ সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া যখন দেখা যায় যে, ঈশ্বরই যাবৎ জীবকে সংহার করেন, সেইজন্য মৃত্যু তাঁহার একটী নাম, মাতৃভাবে এই সংহার কার্য্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অদিতিও বলা হইয়া থাকে; তখন ঈশ্বরকে সেইজন্য আর নিষ্ঠুর বলা যাইতে পারে কি? হায়! তিনি যে পরমকারুণিক ও মঙ্গলময়, তাঁহাতে কি কখনও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে? কোন্‌টী মঙ্গল, কোন্‌টী অমঙ্গল, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহাতে অনেক প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকি। মৃত্যু যে জীবের পরমহিতজনক। জীবের যখন নিজকার্য্যকরণ উপযোগী উপাদান এই দেহযন্ত্রে আর না থাকে বা কোনও কারণে নষ্ট হয়, তখন মঙ্গলময় তাহাকে সেই দেহ হইতে অপসৃত করিয়া অন্য দেহে নিক্ষেপ করেন। আর বলিদানে পশুহনন করিলে সে পশুকে তিনি পরমপদে স্থান দেন; সুতরাং তাঁহার নিষ্ঠুর অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অযৌক্তিক। অথবা তখন চণ্ডীর এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিবার প্রলোভন হয়। "চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েঽপি"! তবে কেমন করিয়া বলিদানক্ষেত্রে পশু বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হয়, তাহা বলিতে গেলে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা বারান্তরে বলিবারই অভিপ্রায় রহিল। দেবপ্রীত্যর্থে বলিদানক্ষেত্রে পশুহনন যদি হিংসাজনক হয়, তাহা হইলে আমরা নিজপ্রীত্যর্থে মাছ মাংস অথবা শুধু তাহাই বা বলি কেন, শাক সবজি আদি যাহা কিছু উদরসাৎ করি, অথবা এমন কি তৃষ্ণা নিবারণার্থে জলপান যাহা করি, তাহাতে কি শত সহস্র জীব নাশ করা হয় না? এ তথ্য আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে বোধ হয় আর বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তারপর গোবৎসাদির আহার্য্য দুগ্ধ গোস্তন হইতে

বৎসাদিকে বঞ্চিত করিয়া দোহন করা কি হিংসাজনক নহে? সুতরাং, আমার বিবেচনায় শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শাস্ত্রের আদেশ প্রতিপালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ অধিকার তদনুসারে সদ্‌গুরু ও শাস্ত্রের আদেশমতে প্রত্যেকে স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকিলে দ্বেষ হিংসার অবকাশ থাকিবে না, সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল ফলিবে না, শান্তি পুনঃসংস্থাপিত হইবে। আমার এই প্রবন্ধ হইতে আমি একাকারবাদী, তাহা যেন কেহ মনে করিবার অবকাশ না পান, তজ্জন্য আরও একটী কথা উপসংহারে বলিতে ইচ্ছা হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষেধ আছে যে, এক অধিকারের ব্যক্তি অন্য অধিকারে যেন কখনও না যান, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" গীতার এই শ্লোক উক্তরূপ আদেশই ঘোষণা করে। ধর্ম্ম স্বীয় প্রকৃতির অনুমোদিত হইবে। প্রকৃতির সহিত অনৈক্য হইলে ধর্ম্ম কদাচ সুফল প্রসব করিতে পারে না। আমি তমঃপ্রকৃতিসম্পন্ন, একেবারে যদি সত্ত্বের আশ্রয় লইবার প্রয়াস পাই, কদাচ তাহা সম্ভব হইবে না, ধীরে ধীরে রজের আশ্রয়ে রজোভাবাপন্ন করিয়া ক্রমশঃ সত্ত্ব আশ্রয় করিতে হইবে, তবেই অবশেষে ধর্ম্মাচরণ সফলতা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ঈশ্বর এক হইলেও হিন্দু হিন্দুধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। তন্মধ্যেও আবার উপাস্যের পার্থক্য অনুসারে ধর্ম্মের প্রকারভেদ আছে। অধিকারিভেদে স্ব স্ব এবং স্বীয় প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সহ তাহার ঐরূপ ধর্ম্ম আচরণেরও নানাত্ব দৃষ্ট হয়, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ সাম্প্রদায়িকতা। ইহা ভিন্ন ঈশ্বরের নানাত্ব অথবা নানা দেবদেবীর গুরুত্ব লঘুত্ব অথবা তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্যাদির উপচারভেদ সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সূচিত হয় না। এইরূপ সমস্ত তর্ক বিতর্ক ও মতভেদ ঈশ্বরের একত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেই ভ্রান্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইতি—

শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদ পাঁড়ে।

সংবাদ।

শঙ্কর মঠ এদেশের আধুনিক যুগের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। উৎকলে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এরূপ কীর্ত্তি অনেক আছে, কিন্তু বঙ্গে ইহা নূতন। "বি-এন্ রেলের সাঁতরাগাছি ষ্টেসনের নিকট সম্প্রতি শঙ্করমঠ নামে একটী বৃহৎ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। সাঁতরা গাছিনিবাসী শ্রীচরণদাস শেঠের পুত্র বদান্যবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ শেঠ মহাশয় প্রায় দুইলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অনেক আতুর অনাথ, অনেক সন্ন্যাসী এই মঠে আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে। বিলাস-ব্যসন-প্লাবিত, স্বার্থ-বিষ-জর্জ্জরিত বঙ্গদেশে আজও যে এইরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান হইতেছে, আজও যে পরদুঃখকাতর ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা স্থানে স্থানে বিরাজ করিয়া দরিদ্রের তপ্তাশ্রুমোচনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিতেছেন, তাহা মনে করিলে বাস্তবিকই হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। অর্থ অনেকেরই আছে, কিন্তু কয়জন সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন? জীবমাত্রেই আত্মসুখে রত, কিন্তু যে মানব আত্মসুখের সীমা ছাড়াইয়া পরের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে, মানবসমাজে তাহার স্থান অতি উচ্চে, আর যে ধনী বিলাসিতার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া সৎকার্য্যে তাহা নিয়োজিত করেন, তিনিই ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন। তাই কবিবর হেমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন,—

> "সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন,
> বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন,
> জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
> এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন।
>
> *　　*　　*　　*
>
> বিধাতার বরপুত্র ধনী এ ধরাতে,
> স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে।"

মন্মথবাবুর কীর্ত্তি অতুলনীয়। শুধু "শঙ্কর মঠ" নয়, আশ্রয়হীনের আশ্রয় দানেও তিনি মুক্তহস্ত, অভাব অভিযোগে দান করিয়া আরও কত মহৎ কীর্ত্তি করিয়া তিনি যে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। ভগবান এই পরোপকারপরায়ণ, দরিদ্রের বন্ধু, ধর্ম্ম-প্রাণ যুবককে দীর্ঘজীবী করুন—ইহাই প্রার্থনা।"

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর প গণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষে নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

স্বর্গীয় কুলাচার্য্য সর্ব্বানন্দ মিশ্রের সংগৃহীত কুলতত্ত্বার্ণব নামক কুলগ্রন্থ সানুবাদ মেদিনীপুর প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহারাজ আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের বিবরণ এবং কি করিয়া বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় ও মধ্যদেশী রাঢ়ীয় মধ্যশ্রেণীর বিভাগ সৃষ্ট হইল তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে ইতিহাসের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বলা বাহুল্য গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত সভার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। মূল্য আট আনা মাত্র, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৫।১ নং শোভারাম বসাকের ষ্ট্রীট, বড়বাজার কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক

৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ-সভা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C-675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non-Political Hindu Religious & Social Magazine

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা।

বৈশাখ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।৹ আনা।

সন ১৩২৬ সাল।

বৈশাখ সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

REGISTERED N.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪১ শক, ১৩২৬ সাল, বৈশাখ। } অষ্টম সংখ্যা।

জননীর আশীর্ব্বাদ।

সন্তান-মানস তোষে ধন রত্ন দিয়া
মাতা যবে সৌভাগ্যশালিনী।
তোমার এ জননীর নাহি কোন ধন এবে,
মাতা তব বড়ই দুখিনী॥

(২)

আছে শুধু তোর তরে স্নেহপূর্ণ এ হৃদয়
বুকভরা গভীর বেদনা।
অব্যক্ত প্রগাঢ় দুঃখ সম্বল আমার বৎস,
দুর্বিসহ কঠোর যন্ত্রণা॥

(৩)

তাই সে বেদনারাশি ভীষণ এ দুখভার
আছে যাহা সম্বল আমার,
তোমার ও সুকোমল শিরে দিয়া যাই,
লহ বৎস দুঃখ উপহার॥

(৪)

লইতে মস্তক পাতি কঠিন এ দুখভার
ভীত বৎস হ'ওনা কখন।
দুখের সমান আর ত্রিভুবন মাঝে কেহ
নাহি আছে বন্ধু একজন॥

শ্রী—

ব্যাধি-রহস্য।

যন্ত্রীর বিশেষ বিবরণ।

(৪)

সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সঙ্গীতের উদারা, মুদারা ও তারা নামক তিনটী স্থূল সুরগ্রাম আছে এবং এই প্রত্যেক সুরগ্রামের অন্তর্গত স্বরজ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ নামক সাত সাতটী সুর বিদ্যমান্। শুধু তাহাই নহে, আবার এই সকল সুরের প্রত্যেক দুইটী সুরের মধ্যে শ্রুতি, বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়; যেমন স্বরজ ও ঋষভ এই সুরদ্বয়ের মধ্যে তিন শ্রুতি, ঋষভ ও গান্ধারের মধ্যে দুই শ্রুতি ইত্যাদি। কোন রাগের আলাপ করিতে হইলে গায়ককে পূর্ব্বোক্ত সুরগ্রামত্রয়, প্রত্যেক স্বরগ্রামের ও সেই সুরের মধ্যবর্ত্তী শ্রুতি প্রভৃতি স্থূল ও সূক্ষ্ম সুরের অনুলোম ও বিলোমগতিতে আশ্রয় লইতে হয়, অন্যথায় কোন রাগের প্রকৃত মূর্ত্তিই প্রকাশিত হয় না; এইরূপ যন্ত্রী বা জীবাত্মার প্রকৃত মূর্ত্তি অনুভব করিতে হইলে তাঁহার যাবৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তিগুলির পরিচয় লওয়া আবশ্যক। ইতঃপূর্ব্বে আমরা যন্ত্রীর স্থূলমূর্ত্তির বিবরণী প্রকাশ করিয়াছি। এইবার সঙ্গীতের স্থূল সুরের অন্তর্গত সূক্ষ্ম শ্রুতির ন্যায় যন্ত্রীর স্থূলশক্তির অন্তর্গত যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তি বিদ্যমান্ থাকে, তাহারই বিবরণী প্রকাশ করিব।

ত্রিগুণোপেত চৈতন্যই যে জীবাত্মা ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই ত্রিগুণের নাম সত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তি, রজঃ বা পরিচালনশক্তি এবং তমঃ বা পোষণশক্তি। সঙ্গীতের উদারা, মুদারা ও তারা নামক স্বরগ্রামগুলির মধ্যে যেমন বিভিন্ন সুর ও শ্রুতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান, আলোচ্য জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণশক্তির মধ্যেও তদ্রূপ পাঁচটী করিয়া স্থূলশক্তি ও অসংখ্য প্রকার সূক্ষ্মশক্তি নিহিত রহিয়াছে। যথা—জ্ঞানশক্তির পাঁচটী স্থূলশক্তির নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়, কর্ণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বেন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়, পরিচালনশক্তির অন্তর্গত

স্থূলশক্তির নাম বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থেন্দ্রিয় এবং পোষণশক্তির স্থূলশক্তির নাম প্রাণ, অপান,সমান, ব্যান ও উদান। এতদ্ব্যতীত মন ও বুদ্ধি নামক জীবাত্মার আর যে দুইটী প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে তাহারা সঙ্গীতের রাগের স্থানীয়। বিভিন্ন স্বরগ্রাম, সুর ও শ্রুতির মধ্যে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করিয়া যেমন এক একটী রাগের মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জ্ঞানশক্ত্যাদির স্থূল সূক্ষ্মাদি বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলে মন ও বুদ্ধির বিভিন্ন সংস্কার জন্মিয়া থাকে। অন্য পক্ষে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট রাগের মূর্ত্তির ধারণা করিয়া যেমন বিভিন্ন স্বরগ্রাম, সুর ও শ্রুতির আলাপ করিতে হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মলব্ধ বিভিন্ন মন ও বুদ্ধি অনুসারেই জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ-শক্তির স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তিগুলির ক্রিয়া হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক মনুষ্যই উল্লিখিত জ্ঞানাদি ত্রিশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেই শক্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি একরূপ নহে। কার্য্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের জ্ঞানাদি ত্রিশক্তি এবং সেই শক্তিজাত মন ও বুদ্ধি ভিন্ন প্রকার। ইহার কারণ প্রত্যেক মনুষ্যই বিভিন্ন ক্রিয়ানিরত থাকে বলিয়া তাহাদের সেই ক্রিয়াজাত সংস্কারও বিভিন্ন, এবং এই সংস্কারই যখন ঐ ত্রিশক্তির মূল, তখন প্রত্যেক মনুষ্য যে বিভিন্নরূপ মন ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক্ষণে এই জ্ঞানাদি সাধারণ শক্তির মধ্যে যে কিরূপ বিশেষ বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ জ্ঞানশক্তির বিষয়ই চিন্তা করা যাউক। এই শক্তি দর্শন শ্রবণাদি ৫টী ইন্দ্রিয়-শক্তিতে বিভক্ত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জীবাত্মার প্রত্যেক শক্তির ক্রিয়াসাধন জন্য এক একটী ভৌতিক দেহ গঠিত হয় এবং তজ্জন্যই দর্শনাদি ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রিয়াসাধন জন্য চক্ষু, কর্ণাদি ৫টী ভৌতিক দেহযন্ত্র নিহিত হইয়া থাকে। শুধু মনুষ্য কেন, জগতে গো, গর্দ্দভ ও সারমেয়াদি পশু ও শকুনি, গৃধিনী, কাক প্রভৃতি পক্ষীও এই সকল জ্ঞানযন্ত্র লাভ করিয়া নিজ নিজ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই সকল পশুপক্ষী ও মনুষ্য এই উভয় শ্রেণীর প্রাণীর জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান থাকে। কারণ এই উভয় শ্রেণীর প্রাণীর মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পশু পক্ষ্যাদির মন ও বুদ্ধির সংস্কার অতীব ক্ষীণ, এবং মনুষ্যের মন ও বুদ্ধি প্রায়ই প্রবল সংস্কারবিশিষ্ট। এই মন ও বুদ্ধিই যখন জ্ঞানশক্তির খনি, তখন উল্লিখিত উভয় শ্রেণীর প্রাণীর জ্ঞানশক্তি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই দেখা যায় যে, মনুষ্য যে শক্তিবিশেষের দ্বারা কোন বিষয়ের ভাবনা, চিন্তা ও তর্কবিতর্ক করিতে পারে এবং যদ্দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বিষয়সমূহের প্রত্যুপলব্ধি বা প্রত্যালোচনা করিতে পারে, সেই শক্তির পরিচয় কোন পশুপক্ষীই দিতে পারে না।

শকুনির দৃষ্টিশক্তি, কুকুর ও বিড়ালের ঘ্রাণশক্তি প্রভৃতি স্থূলজ্ঞানশক্তিগুলি সাধারণ মনুষ্যের দর্শন ও ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা বলবতী হইলেও সাধারণ মনুষ্য সেই স্থূল জ্ঞান-শক্তির অন্তর্গত বহুতর সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিতে যে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা দৃষ্টান্ত

দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা যায়। অতএব মনুষ্যের মন ও বুদ্ধি যে পশুপক্ষ্যাদির মন ও বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহা বেশ বুঝা গেল। বলা বাহুল্য এই মন ও বুদ্ধির পার্থক্যই মনুষ্যজাতিকে পশুপক্ষ্যাদি জাতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই পার্থক্য জগতের যাবৎ প্রাণীর জাতিবিভাগ করিয়া দেয়। এক জাতীয় পশুপক্ষী অপেক্ষা যে অন্য জাতীয় পশুপক্ষী নিম্নতর বা উচ্চতর, মন বুদ্ধির পার্থক্যই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। শুধু পশুপক্ষীর জাতি কেন, মনুষ্যের জাতিবিভাগও এই মন ও বুদ্ধির পার্থক্যের ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

উল্লিখিতরূপে ইহাও প্রমাণ করা যায় যে, মনুষ্যের পরিচালন পোষণশক্তি পশুপক্ষ্যাদির পরিচালন ও পোষণশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাই মনুষ্যের বাক্‌পাণ্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যন্ত্র ও প্রাণ, অপানাদি পোষণ যন্ত্রগুলি যেমন সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম, পশুপক্ষ্যাদির সেই সমুদয় যন্ত্র তেমন নহে। কাজেই মনুষ্যের রজঃ বা পরিচালনশক্তি এবং তমঃ বা পোষণশক্তি যেরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্পন্ন করিত পারে, পশু পক্ষীর সেই দুইশক্তি তেমন পারেনা।

অতঃপর মনুষ্যের সত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তির বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। সত্ত্বগুণের উদয় হইলে এক প্রকার অলৌকিক আনন্দময় ভাব অন্তরে অন্তরে অনুভূত হয়। এই আনন্দের মধ্যে কোনরূপ আবিলতা বা জ্বালা নাই। কোন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হইলে এক প্রকার আনন্দ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না, অপিচ সেই আনন্দ কালে বিরক্তিজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু সাত্ত্বিক আনন্দ স্থায়ী বস্তু এবং তাহার স্থায়িত্বে মনের তৃপ্তি যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইলে ইহা অপেক্ষাকৃত সরল হইবে বলিয়া মনে হয়। মনে কর রাম বাগবাজারের রসগোল্লা খাইবার উৎকট লালসা পোষণ করে, এবং সেই রসগোল্লা ইচ্ছামত পাইলে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না; কিন্তু সে যদি দিবারাত্রি সেই রসগোল্লা ভোজন করে তাহা হইলে কিছুদিন পরে তাহার সেই আনন্দ আর পূর্ব্ববৎ থাকিবে না, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত রাম রসগোল্লা ভোজন করিতে বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করিবে। কিন্তু বুভুক্ষিত দরিদ্র অতিথির মুখে একমুষ্টি অন্ন দিতে পারিলে অন্তরে অন্তরে এক প্রকার অলৌকিক আনন্দ হয়। যদি বিশেষ কোন অন্তরায় উপস্থিত না হয়, তবে দিবারাত্রি এইরূপ অন্নদান করিলেও প্রাণের মধ্যে সেই আনন্দ হ্রাস না হইয়া যেন ক্রমেই উথলিয়া উঠে। আরও অন্নদান করিতে পারিলে সেই আনন্দ যেন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং তৎসহ হৃদয় যেন এক অলৌকিক আনন্দরসে ডুবিয়া যায়। কৃপণ, স্বার্থপর ও ভোগপরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণ দয়াশীল লোকই এইরূপ আনন্দ ধারবাহিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় আনন্দের নামই সাত্ত্বিক আনন্দ।

সত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তি অসংখ্য সাত্ত্বিক বৃত্তির সংস্কার মাত্র। প্রত্যেক বৃত্তির সংস্কার বিকশিত হইয়াই মনুষ্যকে অসাধারণ সুখ দান করে; আর মনুষ্য অন্তরে অন্তরে তাহার অনুভব

করিয়া কৃতার্থ হয়। তরল দুগ্ধ আবর্ত্তন করিয়া যেমন ক্ষীর এবং ক্ষীর আবর্ত্তন করিয়া যেমন মেওয়া প্রস্তত হয়, তদ্রূপ অভ্যাস ও ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সত্ত্বকে সংযমে এবং সংযমকে নিরোধে পরিণত করা যায়। এই সত্ত্ব, সংযম ও নিরোধই যাবৎ মনুষ্যধর্ম্মের উপাদান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয়ের স্বভাব এই যে, ইহারা নিয়তঃ পরস্পরকে পরাভব করিয়া একটী অপরের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে, এবং তাহার ফলে আমাদের মনে কখন সাত্ত্বিক, কখন রাজসিক এবং কখন তামসিক ভাব প্রবল হইতেছে। আমি স্থির হইয়া বসিয়া কোন শুভকার্য্যের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছি, কিন্তু পরক্ষণেই সে আনন্দ তিরোহিত হইয়া চিত্তের মধ্যে এক প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। আবার সময়ে সে ভাবও অন্তর্হিত হইয়া চিত্ত জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা হইল যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পার্য্যায়ক্রমে জয় ও পরাজয়। ত্রিগুণের এই স্বাভাবিক জয় পরাজয়ের শক্তি সংযত করিতে পারিলেই সত্ত্ব সংযমে ও সংযম নিরোধে পরিণত হইতে পারে।

দুগ্ধ ও ক্ষীরের মৌলিক উপাদান এক হইলেও ক্ষীর যে দুগ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থা, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য বিষয়। তদ্রূপ সত্ত্ব ও সংযম মূলে এক হইলেও সংযম সত্ত্বেরই একটু বিস্তৃতি অবস্থা। এইরূপে নিরোধ ও সংযমের পরবর্ত্তিনী অবস্থা মাত্র। রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্বকে জয় করিতে উপস্থিত হইলে সত্ত্ব তাহাদিগকে উপসর্গ করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টার ফলে যখন সত্ত্ব আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহা সংযম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যেমন ক্রোধ নামক রাজসিক বৃত্তিটী প্রবল হইয়া অতিথি-সৎকারেচ্ছা নামক সাত্ত্বিক বৃত্তিকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার আক্রমণ ব্যর্থ হইল; এখানে সত্ত্ব সংযমে পরিণত হইল বলিতে হইবে। এইরূপে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবার সাত্ত্বিক বৃত্তিটী অক্ষমতা নামক তামসিক বৃত্তি দ্বারা আক্রান্তা হইয়াও অটল রহিল এবং যথারীতি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সম্পন্ন হইল, সুতরাং এস্থলে সত্ত্ব সংযমে পরিণত হইল। উল্লিখিত রূপে মনে করুন বিবেক নামক সাংযমিক বৃত্তি যথাক্রমে দম্ভ ও মোহ নামক রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতে লাগিল; এরূপ ক্ষেত্রে বিবেক পূর্ব্ববৎ অটল থাকিলে সংযম নিরোধে পরিণত হইয়া থাকে।

আলোচ্য সত্ত্ব, সংযম ও নিরোধ নামক মনুষ্য-ধর্ম্মের তিনটি ব্যূহের মধ্যে মনুষ্য-ধর্ম্মের অসংখ্য সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষ যখন সত্ত্বব্যূহের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তখন তিনি সন্ধ্যা পূজা, যাগ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ায় রত থাকেন, অন্য কথায় ইহাও বলা যায় মানুষ সন্ধ্যা পূজাদি দ্বারা সত্ত্বগুণের পরিচয় দিয়া থাকেন। এই অবস্থায় যোগরূঢ় নাম অপূর্ব্ব। এই সংযম ও নিরোধ ব্যূহের অপর নাম যথাক্রমে আত্মসংস্কার ও বৃত্তি। এই দ্বিবিধ ব্যূহের মধ্যেও অসংখ্য সংস্কার বিদ্যমান্। যথা—চিত্তশুদ্ধি, ঈশ্বর সন্নিধি, তপঃ ইত্যাদি আত্ম-সংস্কারের এবং ধৃতি, ক্ষমাদি বৃত্তিব্যূহের অন্তর্গত। এই স্থলে যাবৎ মনুষ্য ধর্ম্মবৃত্তির উল্লেখ ও আলোচনা করা অসম্ভব। মনু বলিয়াছেন,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচং ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী র্বিদ্যা সত্য মক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

সুতরাং, এস্থলে আমরা মাত্র দশটী বৃত্তিকেই মনুষ্যের ধর্ম্মবৃত্তি বলিয়া ধরিয়া লইব।

দ্বিতীয়তঃ রজোগুণ বা পরিচালন-শক্তির ক্রিয়া উপস্থিত হইলে শরীরে এক প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়। চাঞ্চল্যই ইহার স্বভাব। সুতরাং এই গুণোদয়ের সময় মন কিম্বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই যেন অস্থিরতা প্রকাশ করে। রজোগুণ অনেক প্রকার প্রবৃত্তিতে পরিণত, যথা—দম্ভ, হিংসা, ক্রোধ, কাম, মত্ততা, সম্মানপ্রিয়তা ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ—তমোগুণ বা পোষণ-শক্তির পরিচয় এই যে, ইহা এক প্রকার জড়তা-স্বরূপ। তাই তমোগুণের প্রকাশকালে জ্ঞান ও পরিচালনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া এক প্রকার অবসাদ উপস্থিত হয়। এই গুণ হইতে শোক, প্রমাদ, আলস্য, তন্দ্রা, অবসাদ, বিষাদ, জড়তা, তোষামোদ, ভয়, নীচতা, অপটুতা, চাকুরিপ্রিয়তা, কৃপণতা এবং নাস্তিক্য প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

উপরে যে ত্রিগুণের বিশ্লেষণ করা হইল, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ হইতে মনুষ্যের ধর্ম্ম এবং রজঃ ও তমোগুণ হইতে মনুষ্যের অধর্ম্ম সঞ্জাত হইয়া থাকে। আবার এই গুণত্রয় একটীর পর আর একটী প্রাধান্য লাভ করিতেছে বলিয়া সর্ব্বদাই মনুষ্যের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উদয় হইতেছে। তন্মধ্যে সৌভাগ্যবলে যাঁহার মধ্যে অধিকক্ষণ সত্ত্বের উদয় হইতেছে, তাঁহার অধিকতর ধর্ম্মসংস্কার হইতেছে এবং যিনি দুর্ভাগ্যবশে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্যে অভিভূত, তাঁহার ভাগ্যে কেবল অধর্ম্মেরই সংস্কার পুঞ্জীকৃত হইতেছে। মোটের উপর ত্রিগুণের ক্রিয়ার ফলে সকল মনুষ্যই ন্যূনাধিক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জগতের প্রত্যেক প্রাণীই ত্রিগুণের ক্রিয়ার অধীন হইলেও এক মনুষ্যের মধ্যে এই ত্রিগুণের ক্রিয়া যতটা পরিস্ফুট—অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে তেমন নহে। তাই দেখা যায় যে, মনুষ্যের মধ্যে যাবৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিই অতি স্পষ্টভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। পশুপক্ষ্যাদি নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে ক্রোধ, হিংসাদি রাজসিক এবং ভোগ, জড়তাদি তামসিক বৃত্তি বলবতী হইলেও তাহারা মনুষ্যের ন্যায় এই সকল বৃত্তির ক্রিয়ার পরিচালন করিতে সমর্থ নহে। কারণ, মনুষ্যের মধ্যে এই সকল বৃত্তিপরিচালনের উপযোগী ভৌতিক যন্ত্র যেরূপ সুস্পষ্টভাবে নির্ম্মিত, অন্য জন্তুর মধ্যে তেমন নহে।

এস্থলে আরও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এক মনুষ্যের মধ্যেই যেমন এই ত্রিগুণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে তেমন হয় না। এই মনুষ্য ভাগ্যবলে কখন সত্ত্বপ্রধান হইয়া স্বর্গের দেবতা স্থানীয়, এবং দুর্ভাগ্যবশে কখনও বা রজঃ তমঃপ্রধান হইয়া

নরকের কীটস্বরূপ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এক মনুষ্য-জীবনেই সংস্কারের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্য প্রাণীর মন ও বুদ্ধিশক্তি অতি ক্ষীণ বলিয়া তাহার মধ্যে কোন বিশেষ ক্রিয়া হয় না, কাজেই কোন সংস্কারও জন্মে না; কিন্তু মনুষ্যের মন ও বুদ্ধি সতত ক্রিয়াশীল বলিয়া তাহার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের ক্ষয় ও বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

উল্লিখিত ত্রিগুণের যতগুলি সংস্কার আছে, তৎসমুদায়ই মস্তিষ্ক মধ্যে বীজাবস্থায় অবস্থিত থাকে, এবং সংস্কারের এই বীজাবস্থার নাম প্রকৃতি। পরে বিশেষ বিশেষ সঙ্গ, শিক্ষা ও ক্রিয়ার অনুরূপ বিশেষ বিশেষ সংস্কারগুলি ফুটিতে থাকে। সংস্কারের এই ফুটন্ত অবস্থার নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধির আর একটু বিস্তৃতি হইলে যে অবস্থা ঘটে, তাহার নাম অভিমান। বুদ্ধি ফুটিয়া উঠিলেই অন্তরে অন্তরে আমিত্বের একটা অভিমান হয়। তখনই "আমির" চেতনত্বের অনুভূতি হইয়া আমার দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন যে চেতন, তাহার অভিমান হয়। এই অভিমানের বিস্তৃতি ঘটিলেই সংস্কার ফুটিয়া মনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে মনের কর্তৃত্বানুসারে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের ক্রিয়ার স্থূলমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

প্রকাশ থাকে যে, প্রকৃতি হইতে মন পর্য্যন্ত অবস্থিত সংস্কারগুলির ক্রিয়া মস্তিষ্কের মধ্যেই হইয়া থাকে, এবং পরে তাহা বিকশিত হইয়া নাড়ীপথে সর্ব্বদেহে বিসর্পিত হয়। মনে করুন আমার প্রকৃতি মধ্যে কাশীধামের বিশ্বনাথদর্শনের সংস্কার নিহিত আছে। এরূপ দেবদর্শনের সময় উপস্থিত হইলে সেই সংস্কার ফুটিয়া বুদ্ধিস্তরে উপনীত হইল এবং পরে তাহার একটু বিস্তৃতি হইয়া আমার বিশ্বনাথদর্শনের মন হইবে। পরে মনের কর্ত্তৃত্বে আমার পদেন্দ্রিয় ক্রিয়া করিয়া আমার দেহটাকে বহন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত করিবে। পরে দর্শন-সংস্কার সেই স্নায়ু পথে বিসর্পিত হইয়া চক্ষুর্গোলকে উপনীত হইয়া বিশ্বনাথরূপ বিষয়কে আত্মসাৎ করিবে। ইহাই হইল আমার বিশ্বনাথদর্শন-সংস্কারের বিকাশ ও বিভিন্ন স্তরে গমনাগমনরূপ ক্রিয়া।

আমাদের প্রত্যেক সংস্কার যে তাহার ক্রিয়াসাধন জন্য এক একটী ভৌতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করে এবং সেই যন্ত্রসমষ্টির নামই যে দেহ, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই যন্ত্রসমষ্টির নাম (Nervows System)। জীবাত্মার দেহের বিভিন্ন নাড়ী যে তাঁহার দর্শন, স্পর্শনাদি শক্তিগুলি বহন করিয়া থাকে, শিবগীতায়ও তাহার উল্লেখ আছে। যথা—"নাড়ীভি র্বৃত্তয়ো * * বিলীয়তে।" ৫১ পৃঃ

ত্রিগুণোপেত চৈতন্যই যে জীবাত্মা এবং চৈতন্যসম্বলিত ত্রিগুণের অসংখ্য সংস্কার যে মস্তিষ্কে অবস্থান করে, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত আছেন। এই সংস্কার যে নাড়ীপথে (Nerve) দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করে, তাহা দেহে কেবল সরলরেখার আকারে অবস্থান করে না। এই সকল নাড়ীর সংখ্যা কোটি কোটি এবং তাহারা দেহের মধ্যে কোথাও সরল রেখার ন্যায়, কোথাও কুণ্ডলীকৃত অবস্থায়, কোথাও জমাটভাবে অবস্থিত। অর্থাৎ জিহ্বা, গলনালী,

হৃৎপিণ্ড বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রগুলি ঐ সকল নাড়ীরই গাঁট (knot) বিশেষ। তড়িৎশক্তি যেমন ধাতুর উপর দিয়া চলিয়া যায়, জীবাত্মার শক্তিগুলি তদ্রূপ এই নাড়ীপথে গতায়াত করে। কিন্তু কোন কারণে সেই নাড়ীপথ বিকৃত হইলে জীবাত্মার শক্তি আর পূর্ব্ববৎ গমনাগমন করিতে পারে না। জীবাত্মা এইরূপে যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম ব্যাধি।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আরও প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, জীবাত্মার শক্তিগুলি ভৌতিক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কাজেই অস্বাভাবিক, ইহারা দেহের স্বাভাবিক শক্তি নহে বলিয়া দেহ থাকিলেও থাকে, না থাকিলেও থাকে। দেহের স্বাভাবিক শক্তি হইলে শবদেহেও জীবাত্মার শক্তি ক্রিয়াশীলা থাকিত। দেহের স্বাভাবিক শক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকার। এই স্বাভাবিক শক্তিগুলি জীবাত্মার শক্তির ন্যায় চৈতন্যসম্বলিত নহে, কাজেই তাহারা অণুশক্তি বলিয়া পরিগণিত। যে সকল উপাদান দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহারা সম্মিলিত হইলে একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় ও তাহাতে যে শক্তির প্রভাবে উপাদানগুলি রাসায়নিকভাবে মিলিত হইয়া কোন দেহ যন্ত্রের পুষ্টি করে, তাহা একপ্রকার স্বাভাবিক শক্তি। আবার রসায়ন ক্রিয়ার সময় যে তাপ ও তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই স্বাভাবিক শক্তি। আর এক জাতীয় দেহীর শক্তি মৃত্যুর পর পঞ্চভূতাত্মক দেহকে পঞ্চভূতে বিলীন করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে দেহ বাষ্প অপেক্ষা সূক্ষ্ম আকারে উড়িয়া যাইতে থাকে। ইহাই দেহের ৩য় জাতীয় স্বাভাবিক শক্তি। জীবাত্মার অস্বাভাবিক শক্তি দেহীর ত্রিবিধ স্বাভাবিক শক্তিকে সংযত রাখিয়া যতদিন আপন ক্রিয়া সাধন করিতে পারে, ততদিন তাহা বাধা-ব্যাধিশূন্য, কিন্তু স্বাভাবিক শক্তি তাহার গতি রোধ করিলেই জীবাত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ছন এইরূপ বলা হয়। যেরূপে উপাদানবিভ্রাট জীবাত্মার রাসায়নিক শক্তি কর্ত্তৃক ব্যাহত হয়, যথাস্থানে আমরা তাহা আলোচনা করিব। তবে এক্ষণে ইহাই বলা আবশ্যক যে জীবাত্মার শক্তিগুলি দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জীবাত্মা সেই শক্তিসমষ্টিসহ কর্ম্মানুরূপ লোকে বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়; এবং পুনরায় জন্মকাল উপস্থিত হইলে তাহার প্রকৃতির অনুরূপ জাতীয় জীবদেহে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দেহ ধারণ করে। ইহাই হইল জীবাত্মার বিশেষ বিবরণ।

শ্রী—পাইকর।

চার্ব্বাক দর্শনে ধর্ম্মোপদেশ।

(৩)

অধুনা চার্ব্বাকের আরও দুইটী সূত্রের আলোচনা করিতেছি।

> যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
> কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
> ততশ্চ জীবনোপায়ে ব্রাহ্মণৈর্ব্বিহিত স্ত্বিহ।
> মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্য দ্বিদ্যতে কচিৎ॥

এই সূত্রদ্বয় শ্রবণ করিয়া নাস্তিক চূড়ামণিগণ ব্যাখ্যা করেন যে, মৃত্যুর পর আর সেরূপ কিছুই থাকে না, যাহার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে। যদি বল এই আত্মাই দেহ হইতে বাহির হইয়া পরলোকে যায়, তবে বন্ধুবান্ধবের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেনা কেন?

সুতরাং মৃতব্যক্তিদের প্রেতকার্য্যের বিধানদ্বারা ব্রাহ্মণগণ নিজের একটা জীবিকা করিয়া লইয়াছেন মাত্র, ইহাতে আর কিছুই নাই।

নাস্তিক দলের ব্যাখ্যা শুনিলাম। আমরা কিন্তু অন্যরূপ বুঝিতেছি, আমরা বুঝি যাঁহারা ভাবেন, "দেহত্যাগের পরই মুক্তি হইয়া যায়, মুক্তির জন্য আর কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয় না", "বাসনার উচ্ছেদ না হইলে যে মুক্তি হয় না" একথা যাঁহারা অবগত নহেন, "বাসনার উচ্ছেদের পূর্ব্বপর্য্যন্ত জীবগণকে পুনঃপুনঃ সংসার ক্ষেত্রে যাওয়া আসা করিতে হয়" একথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের প্রবোধার্থ বলা হইতেছে। যদি এই জীবাত্মা, দেহ হইতে বহির্গত হইয়াই, (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনার উচ্ছেদ না করিয়াও) পরং লোকং অর্থাৎ উৎকৃষ্টলোকে (যেখানে গেলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না) যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম, গীতা) পরমধামে চলিয়া যায়, ইহা স্বীকার করিতে হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি—বন্ধুস্নেহসমাকুল হইলে আবার আসেনা কেন? বন্ধুশব্দের অর্থ বন্ধন সাধন বাসনা, (বন্ধ ধাতু উন্ প্রত্যয়ে বন্ধুপদ নিষ্পন্ন) তাহার স্নেহাকর্ষণে আকুল হইয়া জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণপ্রবাহ অনুভব করে। ফলতঃ যাহারা পরমধামে যায়, তথায় যাইবার পূর্ব্বেই তাহাদের কর্ম্মবাসনা নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্যই তাহারা পুনর্ব্বার সংসারে আসে না। মুক্তিলিপ্সু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনা নষ্ট করিবেন, নতুবা বাসনার আকর্ষণে আবার সংসারে আসিতে হইবে। যতদিন বন্ধন সাধন বাসনার আর্দ্রীভাব (স্নেহভাব) থাকিবে, যতদিন তত্ত্বজ্ঞান-মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে বাসনা পরিশুষ্ক না হইবে, যতদিন বাসনা-বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট না হইবে, ততদিন জীবকে বদ্ধভাবে সংসারে ঘুরিতে হইবে, চার্ব্বাক-সূত্র কৌশলে তাহারই বর্ণনা করিয়া মুক্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন।

দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা আমরা এইরূপ করিতেছি—

যতঃ ক্বচিৎ (কুত্র চিৎ প্রদেশে) মৃতানাং অনাৎ (দৃশ্যমান দেহাদিব্যতিরিক্তং লিঙ্গশরীর-মিত্যর্থঃ) বিদ্যতে। ততঃ (কারণাৎ) আকাশে অবলম্বনহীনস্য, ক্ষুৎতৃষ্ণাপীড়িতস্য, বায়ুভূতস্য, মৃতজীবস্য), জীবনোপায়ঃ (পূরক পিণ্ডাদিঃ আদ্যশ্রাদ্ধাদিশ্চ) ব্রাহ্মণৈঃ (ব্রহ্মবিদ্ভি-রপরোক্ষদর্শনৈঃ ঋষিভিরিত্যর্থঃ) বিহিতঃ (উপদিষ্টঃ) ন তু প্রেতকার্য্যাণি, (প্রেতানাং পুনরাবৃত্তিরহিতানাং মুক্তিমাপন্নানাং কার্য্যাণি পারলৌকিকাভ্যুদয়ার্থং করণীয়ানি শ্রাদ্ধাদীনি) বিহিতানি।

যেহেতু কোনও প্রদেশে মৃত ব্যক্তিদের দেহাদি ব্যতিরিক্ত কিছু থাকে, সুতরাং তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নিবারিত হইয়া, সুস্থ ও সবল থাকিবার জন্য ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ নানারূপ ক্রিয়ার বিধান করিয়াছেন, কিন্তু প্রেতের জন্য, অর্থাৎ যাঁহাদের মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না, ফল কথা যাঁহারা মুক্ত হইয়া যান, তাঁহাদের জন্য আর কিছুই করিতে হয় না।

এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে,—মৃত ও প্রেত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্র -ইন—ক্ত প্রেত, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট প্রকারে গমনশীলকেই প্রেত বলে। এই যে গমনের প্রকর্ষ, তাহার অর্থ পুনরাবর্ত্তন না হওয়া; অর্থাৎ যাঁহারা যাইয়া আর আসেন না, তাঁহারাই প্রকৃত প্রেত-পদবাচ্য। প্রেতের আর কিছুই থাকে না; মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। তাঁহা-দের জন্মান্তরসঞ্চারী লিঙ্গশরীরটী ভাঙ্গিয়া যায়, আর তাঁহারা সংসারে ফিরেন না, এই নিমিত্ত শ্রুতি বলেন,—

"ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে"

আর সে আবর্ত্তিত হয় না বা ফিরে না, অতএব তাঁহাদের শ্রদ্ধাদি বিহিত হয় নাই। কিন্তু মৃত পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর থাকে, সেই জীব ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া আকাশে বায়ুরূপে ভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত তাহার জীবন উপায় বিহিত হইয়াছে।

"জীব—বল প্রাণধারণে" জীব ধাতুর অর্থ বলধারণ ও প্রাণধারণ। মৃত্যুর পর পূরক-পিণ্ডাদির সাহায্যে মৃতেরা দেহের সত্তা অনুভব করে, তখনই তাহাদের প্রাণধারণের যোগ্যতা হয়। কিন্তু ভোগের অভাবে তখনও তাহারা অতিশয় দুর্ব্বল থাকে, সেই দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য আদ্যশ্রাদ্ধাদির বিধান হইয়াছে; সুতরাং এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণধারণ ও বলধারণরূপ জীবনের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই বিধানটী যে—সে কেহ করেন নাই, ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, "যাঁহারা অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" সমভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই আপ্ততম মুনি ঋষিগণ এই সকল বিধান করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা অশ্রদ্ধেয়বচন হইতে পারেন না। তাঁহারা মৃতের জীবন উপায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অশ্রদ্ধা করিবে না, ইহাই চার্ব্বক-সূত্রের উপদেশ।

শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে চার্ব্বাক—মত আলোচিত হইল, অধুনা আত্মা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই বিষয়ে চার্ব্বাক সূত্র এই,—

অথ চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ, সএবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয় মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী॥

"একত্র মিলিত মণ্ডবীজাদি দ্রব্যসমূহ" যেমন মাদকতা শক্তি জন্মায়; তেমনি পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু, এই মিলিত ভূত চতুষ্টয় হইতে চৈতন্য (আত্মা) উপজাত হইতেছে। "আমি স্থূল" "আমি কৃশ" ইত্যাদি প্রতীতি হয় বলিয়া, আত্মা ও দেহের অভেদসাধিত হইতেছে; অতএব স্থূলতাদি দেহেই যুক্ত, সুতরাং দেহই আত্মা; অন্য কোনও আত্মা নাই।

যদিও 'আমার দেহ' ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা দেহ ও আত্মার ভেদ সাধন হইতেছে, তথাপি এই জ্ঞান "রাহুর শিরঃ" ইত্যাদি জ্ঞানের ন্যায় ঔপচারিক জ্ঞান মাত্র, অতএব "দেহ ব্যতিরিক্ত কোনও আত্মা নাই" ইহাই নাস্তিকদের সিদ্ধান্ত।

তদনুকূলে তাঁহারা শ্রৌতপ্রমাণও উপস্থাপিত করেন। যথা—

"বিজ্ঞান-ঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়,
তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।"

এই সকল ভূত হইতে বিজ্ঞান-স্বরূপ মেঘ উত্থিত হইয়া, পুনর্ব্বার তাহাতেই বিলীন হইতেছে। মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা থাকে না। এই শ্রুতিও দেহাত্মবাদের পোষকতায় সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, মৃত্যুর পর যে আর কিছুই থাকে না, তাহাও শ্রুতিসম্মত।

আমরা দেখিতেছি, এই চার্ব্বাক-সূত্রগুলির সামান্য একটু অন্বয় পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিলেই, ইহা দ্বারা আত্মবাদবিষয়ে আস্তিক দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ উত্তমরূপ সমর্থিত হইতেছে। সূত্রস্থ "উপজায়তে" এই পদের [illegible] লক্ষণা-সাহায্যে বা "উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে" এই অনুশাসনবলে "প্রকাশতে" করিলেই আর কোনও গোল থাকে না। দুর্গসিংহ 'ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ' বলিয়া "অঙ্কুরো জায়তে বিশেষেণোপলভ্যতে" অর্থ করিয়াছেন, 'অতঃঅঙ্কুরস্য কর্ত্তৃত্বং' সেই জন্যই অঙ্কুর জনি ক্রিয়ার কর্ত্তা হইল—এইরূপ বলিয়াছেন।

জননের পূর্ব্বে অঙ্কুরের কোনও প্রকার বিদ্যমানতা না থাকিলে কর্ত্তৃত্বের উৎপত্তি হয় না, অতএব "জায়তে'র অর্থ যে প্রকাশ পাইতেছে" ইহাই ঠিক।

ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের মতেও ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়গঠিত দেহে সাহায্যেই চৈতন্যের (জ্ঞানের) প্রকাশ হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে আত্মবস্তুতেই জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান গুণপদার্থ, তাহা আত্ম-সমবেত, আত্মা সর্ব্বব্যাপক (বিভু) হইলেও জ্ঞান পদার্থটী যেখানে সেখানে প্রকাশ পায় না, তাঁহাদের নিয়ম।—

আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মনশ্চেন্দ্রিয়েন ইন্দ্রিয়মর্থেন, ততো ভবতি জ্ঞানং।

আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত সংযুক্ত হন, তাহাতেই জ্ঞান জন্মে। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট যে ভৌতিকদেহ তাহাতেই জ্ঞান প্রকাশ পায়। আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও ঘটাদিতে জ্ঞান প্রকাশ পায় না।

স্থূলদেহটী কেহ বলেন পাঞ্চভৌতিক, কেহ বলেন চাতুর্ভৌতিক, কেহ কেহ ঐকভৌতিকও বলিয়া থাকেন।* এই চাতুর্ভৌতিক দেহবাদ অঙ্গীকার করিয়াই চার্ব্বাকসূত্রে "চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্যমুপজায়তে" বলিতেছেন,—তাহার অর্থ ভূতচতুষ্টয়কে (স্থূলদেহকে) নিমিত্ত করিয়া চৈতন্যের প্রকাশ হয়।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনের মতে আত্মাই জ্ঞান পদার্থ, জ্ঞান আত্মার গুণ বা ধর্ম্ম নহে, আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্মক। গুণ ক্রিয়াদি যাবতীয় ধর্ম্ম প্রকৃতির। এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সর্ব্বব্যাপক (বিভু)। তথাপি আত্মা, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াই বিষয় প্রকাশ করেন; আত্মা সর্ব্বব্যাপক বলিয়া, যেখানে সেখানে বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন না। বুদ্ধি অচেতনা (জড়া) আত্ম-প্রতিবিম্বনেই তিনি চেতনায়মানা হন, অর্থাৎ তাঁহাকে চেতনের ন্যায় দেখায়।

বহ্নির সূক্ষ্মকণাসমূহ অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়ায় উজ্জ্বলিত লৌহও যেমন দাহক ও প্রকাশক হয়, তেমনি আত্মপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিও জড়া হইলেও বিষয়প্রকাশে সমর্থা হন। আত্মা বিষয় প্রকাশ করেন বুদ্ধিকে দ্বার করিয়া, অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, সেই বুদ্ধিবস্তু জীবাত্মার একটা অসাধারণ অংশ, জীবাত্মা স্থূলদেহে থাকে,—স্থূলদেহটী ভূতচতুষ্টয়ের দ্বারাই গঠিত, তবেই সাধারণভাবেও বুঝা গেল, সাংখ্যের মতেও চারিভূতের সমবায়ে চৈতন্য প্রকাশ হয়, অতএব

"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে"

এই উক্তি সাংখ্যাদি সিদ্ধান্তেরও সম্পূর্ণ সমর্থক।

মদ্যবীজ দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে সমর্থিত হয়। মদ্যবীজাদি দ্রব্যসমূহ একত্র মিলিত হইলেই মাদকতা শক্তির বিকাশের হেতু হয়, মিলিত হওয়া মাত্রই মাদকতা শক্তি জন্মে এমন নহে, এইরূপ স্বীকার করিলে গুড় তণ্ডুলাদি মদ্যবীজ দ্রব্যসমূহের মিশ্রণ মাত্রই মাদকতা শক্তি আবির্ভূত হইয়া জগতের সকল জীবকে মত্ত করিয়া তুলিত, তাহা ত হয় না।

* পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ। চাতুর্ভৌতিকমিত্যন্যে। একভৌতিকমিত্যপরে॥

সাঙ্খ্যদর্শন।

অতএব বলিতে হইবে যাঁহার অন্তঃকরণে যে পরিমাণে মদশক্তি আছে, এই মিলিত মন্তবীজ ব্যবহারে তাহার সেই শক্তি প্রকাশ পায়, এই পীত মদ্যই তাহার সেই মদশক্তিবিকাশের হেতু হয়। তাহা না হইলে সামান্য মদ্যপানেই একজনের মত্ততা জন্মে, এবং এই মদ্যই প্রভূত পরিমাণে পান করিলেও অপরের মত্ততা প্রকাশ পায় না, এই অনুপপত্তির মীমাংসা কে করিবে? অতএব মদ্যবীজের ন্যায় ভূতচতুষ্টয় মিলিত হইলেই চৈতন্য জন্মে না, প্রকাশও পায় না, কিন্তু এই ভূতচতুষ্টয়গঠিত দেহের সাহায্যে বুদ্ধি-দর্পণে চৈতন্যের প্রতিবিম্বন হয়, তাহাতে বিষয় প্রকাশ হইয়া থাকে।

ভূতচতুষ্টয়ের মিলনেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে, মরণে ব্যভিচার ঘটে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও ভূতচতুষ্টয়গঠিত দেহটী আছে, মরণের অব্যবহিত পরে কিছুক্ষণ মৃতদেহে উষ্মা ও ধনঞ্জয় বায়ু, অবস্থান করে, পার্থিব ও জলীয় ভাগও থাকেই; তাহাতেই বা চেতন (জ্ঞান) প্রকাশ পায়না কেন? মৃত্যুর কথা না হয় ছাড়িয়াদিলাম, মূর্চ্ছাবস্থায় চেতনাহীনতার কারণ কি? ভূতচতুষ্টয় ত পূর্ণরূপেই আছে? সুতরাং ভূতচতুষ্টয়ের মেলনে চৈতন্য জন্মে" এব্যাখ্যা সমীচীন নহে। স্থূলদেহকে দ্বার করিয়া সূক্ষ্মদেহে জ্ঞানের বিকাশ হয়, চার্ব্বাকসূত্রও এই সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন, বুদ্ধিদোষে অজ্ঞগণকর্তৃক বিপরীত অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

দেহাত্মবাদ সমর্থনজন্য নাস্তিকগণ যে "বিজ্ঞানঘন" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই শ্রুতিও আমাদের সিদ্ধান্তই সমর্থন করিতেছে।

ভূতসমূহ হইতে বিজ্ঞান মেঘ উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইতেছে, এ কথার অর্থ কি? বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্টজ্ঞান। পরমাত্মা নির্ব্বিশেষজ্ঞান, এবং ঘটজ্ঞান প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই বিশিষ্টজ্ঞান। বিজ্ঞান (বিশিষ্টজ্ঞান) জন্য পরমাত্মস্বরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান নিত্য। উহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান বা কেবল জ্ঞান।

কথিত বিজ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান ভৌতিক ঘটপটাদি হইতেই জন্মে। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের পর বিষয়ের ছবি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করেন, এবং ইন্দ্রিয় কর্তৃক আলোচিত, অর্থাৎ বিশেষণবিশেষ্যভাবে বিবেচিত হইয়া ঐ ছবি মনের নিকট সমর্পিত হয়, মনদ্বারা সঙ্কল্পিত হইয়া উহা আবার অহঙ্কারসমীপে প্রেরিত হয়, আবার অহঙ্কার কর্তৃক অভিমত হইয়া ঐ ছবি বুদ্ধিতে সমর্পিত হইলেই বুদ্ধি বিষয়াকার ধারণ করেন, এই বিষয়াকার বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিবিম্বিত হইলেই বৈষয়িক জ্ঞান অর্থাৎ ঘটপটাদির জ্ঞান হয়; তবে হইল বিজ্ঞান ভূতসমূহ হইতে উত্থিত হয়, আবার ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় বা পূর্ব্বোক্ত ভূতসমূহকে লক্ষ্য করিয়া লুক্কায়িত হয়। নশ ধাতুর অর্থ অদর্শন, আর বি শব্দের অর্থ বিশেষভাবে। অতএব বিনাশ পায় অর্থে বিশেষভাবে অদৃশ্য হয়। অদৃশ্য হয় বলিলেই বুঝা যায় যে, দেখার অযোগ্যভাবে কোথাও থাকে। আস্তিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বৈষয়িক জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী, উৎপত্তি তৃতীয়ক্ষণে তাহার ধ্বংস হয়। ধ্বংস হইলেও তাহার সংস্কার সূক্ষ্মরূপে (জীবাত্মায়) থাকে

উপযুক্ত কালে সমুচিত উদ্বোধকসহকারে আবার স্মৃতিরূপে পরিণত হয় বা তাহার বিপাকে জাতি আয়ুঃ ভোগ জন্মে; ইহার নামই কর্ম্মবাসনা।

"নপ্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি" এই ভাগের অর্থও এইরূপ অর্থাৎ যাহারা প্রকৃষ্টপ্রকার গত বা মুক্ত, তাহাদের এই জ্ঞানের আর সংজ্ঞা থাকেনা, অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উক্ত জ্ঞানের সংস্কার নষ্ট হইয়া যয়।

অথবা এই শ্রুতির অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে,—এই অর্থে বিজ্ঞানশব্দে বিরুদ্ধজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, মেঘ যেমন প্রকাশশীল সূর্য্যেরও আচ্ছাদক হয়, মিথ্যাজ্ঞান তেমনি সম্যক্ জ্ঞানের তিরোধায়ক হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বিজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞানকে 'ঘন' (মেঘ) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় "ভূতেভ্যঃ" এইপদ চতুর্থ্যন্ত (তদর্থ্যে চতুর্থী), তবেই অর্থ হইল, ভূতসমূহের উৎপত্তির জন্য বিজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান উত্থিত হইয়া আবার ভূতেই সূক্ষ্ম-ভাবে প্রবেশ করে; অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংসারে সংসারী জীবের অন্তঃকরণে ঐ মিথ্যাজ্ঞানই বাসনারূপে থাকে। "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি" মুক্ত পুরুষের আর এই মিথ্যা জ্ঞানের সংজ্ঞা থাকেনা, মুক্তির পূর্ব্বেই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলেই অপবর্গ হয়। ন্যায়সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে—

দুঃখ জন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ।

প্রথম অধ্যায়, ন্যায়সূত্রং।

মিথ্যাজ্ঞান হইতে রাগ দ্বেষাদি দোষ জন্মে, তাহা হইতে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি হইতে জন্ম ও জন্ম হইতে দুঃখ, অতএব মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলেই সংসার চলিয়া গেল। সুতরাং "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি" অপবর্গ অবস্থায় মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার থাকে না।

"অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি" ইত্যাদি সূত্রের অর্থও পূর্ব্বরূপ নহে। "আমি স্থূল, আমি কৃশ" এইরূপ যে জ্ঞান, সেইটী কেবল সামানাধিকরণ্যবশতঃ, অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য ভ্রমে ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ তাহা নহে, বস্তুতঃ কিরূপ তাহা পর চরণে বলা হইতেছে। "দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ" স্থূলতাদিযোগে দেহই হয়, কিন্তু "সএবাত্মা" তিনিই আত্মা, সেই প্রসিদ্ধ নির্গুণ নির্ধর্ম্মক, মুক্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধই আত্মা; এইস্থলে তৎশব্দের প্রক্রান্ত বা অনুভূত অর্থ নহে, প্রসিদ্ধ অর্থে তৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় করিতেছেন "ন চাপরঃ" "অপরঃ বুদ্ধ্যাদিঃ দেহাদির্ব্বা" অপর বুদ্ধি প্রভৃতি বা দেহ প্রভৃতি আত্মা নহে। ফলকথা যিনি "পর" তিনিই আত্মা; অপর কখনই আত্মা নহেন।

"মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও আত্মাকে 'পর' বা পরাৎপর বলা হইয়াছে।

সুতরাং, প্রকৃতি প্রভৃতি জড়বর্গ "অপর," দেহও অপর। "অপর আত্মা নহে" একথা চার্ব্বাকসূত্রে স্পষ্টই বলিতেছেন, —অতএব চার্ব্বাকের মতে "ভূত চতুষ্টয় রচিত দেহই আত্মা, ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করিবে?

চার্ব্বাক আবার যে বলিতেছেন,—

"মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী" "ইহা আমার দেহ এইরূপ উক্তি ঔপচারিক সত্য নহে। ইহা আস্তিকেরও সিদ্ধান্ত, আমার দেহ এই যে আভিমানিক স্বামিত্ব, ইহা বাস্তব্ নহে, কেননা প্রকৃতিতে অভ্যাসবশতঃ আত্মাতে "আমি কর্ত্তা," "আমি ভোক্তা" ইত্যাকার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিগত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব অবিবেকবশতঃ আত্মাতে উপচারিত হয়।

যেমন "অহং ধনী" বলিলে একটা অভিমান ব্যতীত ধনের সহিত অহং পদার্থের অন্য সম্বন্ধ প্রতীত হয় না, তেমনি "আমার দেহ" এইরূপ বলিলেও, দেহের সহিত নিঃসঙ্গ আত্মার কোনও সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় না। অতএব চার্ব্বাক দর্শনের এই উক্তিটীও আস্তিক দর্শনের সম্যক্ অনুকূল। সুতরাং, চার্ব্বাক দেহাত্মবাদী, ঈদৃশ সিদ্ধান্ত ভুল। আমার মনে হয় চার্ব্বাক-সূত্র, "দেহাত্মবাদ" সমর্থন না করিয়া, সাংখ্যাদি দর্শনের যাবতীয় সিদ্ধান্তই সরলভাবে কারিকা-কারে প্রচার করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

প্রতিষ্ঠা।

প্রথম পল্লব।

রাত্রি দ্বিপ্রহর—ধরণী ঝিল্লীরবমুখরিত। গাঢ় অন্ধকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবৃত। মুঙ্গেরের সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কষ্টহারিণীর ঘাটে একখানা পশ্চিম দেশীয় কাচ্ছা নৌকা গঙ্গার নৈশ-তরঙ্গের সহিত নাচিয়া নাচিয়া যেন জাহ্নবীর জলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তাহার মধ্যে একটী বাঙ্গালীবাবু চসমার অভ্যন্তর দিয়া একখানা 'প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী' লইয়া দুই একছত্র পড়িতেছেন,—আর সম্মুখের একটী অর্দ্ধবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে তাহার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন।

ব্রাহ্মণের গাত্র শ্রীগৌর কিশোরের নামের শ্বেত উজ্জ্বল ছাপে সমলঙ্কৃত। কণ্ঠের বিল-ম্বিত উত্তরীয়াংশে কতকগুলি নির্ম্মাল্য বান্ধিতে বান্ধিতে একবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আর অস্পষ্টভাবে "শ্যামসুন্দর" নাম করিয়া 'প্রেমভক্তিতরঙ্গিণীর' ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের এই প্রতপ্ত নিশ্বাসবায়ুতে বিচলিত হইয়া বাবু কহিলেন—

'অত অন্যমনস্কভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন কেন'? ব্রাহ্মণ কিছু অপ্রতিভভাবে কহিলেন—পূর্ব্বেই তো আমি আপনাকে আমার অবস্থা বলিয়াছি। আমি অতি দরিদ্র, সংসার-ব্যয়ভারে ক্লিষ্ট হইয়া বর্ত্তমানে একরূপ নিরুদ্দেশ হইয়াছি। আজ আপনার প্রেম-

ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমার পূর্ব্ব আশ্রমের একটী বালকের কথা, আর শ্যামসুন্দর-বিগ্রহের কথা স্মরণ হইতেছে। না জানি তাহাদের অবস্থা এখন কিভাবে আছে।

উৎসুককণ্ঠে বাবু উত্তর করিলেন—আমিও তো আপনাকে বলিয়াছি আমার আর সংসারে থাকিয়া বিরক্ত হইবার ইচ্ছা নাই। বিষয়বিষে আমি জর্জ্জরিত। একমাত্র কন্যা রাই-কিশোরীকে লইয়া, পূর্ব্বের উপার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থ লইয়া এই নৌকায় জীবনের অবশিষ্ট সময়টী অতীত করিবার জন্য মা সুরধুনীর শীতল ক্রোড়ে ভাসিতেছিলাম, সহসা আপনার ন্যায় মহাভাগবত লোকের আশ্রয়ে সেই অর্দ্ধোদয় গঙ্গাস্নানদিনে যখন আমার চিররুদ্ধ ভক্তির স্রোতঃ শতমুখী হইয়া উঠিল, তখনিই তো সেই দিন হইতে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়াছি। তবে আর চিন্তা কি? যে সময় আমার সংসার-জ্ঞানের অনিত্যতার ধ্বংস করিয়া আমাকে অনন্ত জ্ঞানের মাধুর্য্যপূর্ণ ভক্তিপথের চিরপথিক করিয়া দীক্ষিত করিতে পারিবেন, সেই দিন রাইকিশোরীকে সঙ্গে লইবেন। এই সকল ঐশ্বর্য্য লইয়া দেশে যাইবেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া সাংসারিক সুখে সুখী হইবেন! তবে আর উতলা কেন, গুরুদেব?

বাবু একজন ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী। কাণপুরে ইঁহার প্রকাণ্ড কারবার ছিল। দুষ্ট কর্ম্মচারি-গণের অসাধু ব্যবহারে সরলবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ বাবু কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহিত মোকর্দ্দমা করিয়া "দেউলিয়া" নাম লিখিয়া লইয়াছেন। কাণপুর পরিত্যাগ করিবার পর হইতেই বাবু প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ আকর্ষণে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নৌকায় নৌকায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। ইচ্ছা—যদি প্রকৃত গুরু পান, তাহা হইলে তাঁহার নিকট ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি শিখিয়া, কন্যা এবং ধনরত্ন তাঁহাকে দিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিবেশে শ্রীধাম বৃন্দারণ্যে জীবনের বাকী দিন কয়টী অতীত করেন।

এই আশায় একটী সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সহসা একদিন গুরুর গুরু শ্রীভগবান্ বাবুর দীক্ষাগুরু মিলাইয়া দিলেন। বিগত অর্দ্ধোদয় গঙ্গাস্নান দিনে নৌকা পাইলের সাহায্যে যখন গঙ্গাপার হইতেছিল, সেই সময় বাবু দেখিলেন একজন গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার গোস্বামী গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া "শ্যামসুন্দররূপ মনোহর মুরহর কি মুরতি রে" বলিয়া তারকব্রহ্ম নামগান করিতেছেন। সেই দিন বাবু তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর নৌকায় আনিয়া দীক্ষাগুরুর আসনে বসাইয়াছেন। গোস্বামী গৌরীচরণপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের সেবা, আর পরিবার প্রতিপালন ব্যয়ভার বহন করিবার উদ্দেশ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে মুঙ্গেরে সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কষ্টহারিণীর তটে বসিয়া গান করিতেছিলেন। তথায় এই বাবুর সহিত পরিচিত হইয়াছেন। অদ্য প্রাতে নৌকায় বসিয়া "প্রেমভক্তি-তরঙ্গিণীর" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

অদূরে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কাঁচাসোণা বর্ণনিভ একটী বালিকা তাহার ক্ষুদ্র চম্পকাঙ্গুলিতে উলের সূতা জড়াইয়া অনিমিষ দৃষ্টিতে গঙ্গার লহরীখেলা দেখিতেছে। সহসা একখানা কালমেঘ উঠিয়া বায়ুর ঝাপটাসহ গঙ্গার জলে তুমুল তুফান উঠাইয়া দিল।

বালিকা ভাগীরথীর গর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে পিতার নিকট আসিয়া বলিল, বাবা আর কতদিন আমরা জলের উপর থাকিব ?

বালিকার পিতা উত্তর করিলেন—মা, ওকথা এই গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর। গোস্বামী কহিলেন, বেশী দিন নহে মা, শ্রীহরির কৃপা হইলেই বোধ হয় আর ৪।৫ দিন পরেই স্থলে বাস করিতে পারিবে।

যখন বালিকার সহিত গোস্বামীর আলাপ হইতেছিল, তখন বালিকার পিতা আকাশের নীল মেঘ দেখিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আপনিই বলিয়া উঠিলেন, আহা রূপের কি বাহার—কি জ্যোতিঃ, কি প্রাণদ্রবকারী সৌন্দর্য্য ! এই তো শ্যামসুন্দরের শ্যামরূপ ! মেঘ গর্জ্জন যেন প্রাণারামের মধুর সম্বোধন ! তাই তো, একেই বলে আহ্বান ! ইহা অপেক্ষা নূতন ডাক—খোলা ডাক আর কি ডাকিবেন ! এই সময় গোস্বামী গৌরীচরণ বলিয়া উঠিলেন আর আপনাকে দীর্ঘ দিন সংসারে আবদ্ধ রাখিবার শক্তি মানুষের নাই। আপনার হৃদয়ে আবদ্ধ ভক্তিরেখা অনন্তের অনন্ত সুন্দর জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছে। ধন্য আপনার ভক্তির একমুখ আকর্ষণকে।

ঠিক এই সময় বায়ুর একটা প্রবল বেগ আসিয়া নৌকার গায়ে লাগিল, নৌকা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মেঘের উপর মেঘ, বায়ুর উপর বায়ুর বেগ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া গঙ্গাসলিলকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। স্নিগ্ধশীতলা জাহ্নবী প্রলয়ের রূপ ধরিয়া জগৎ গ্রাস করিতে যেন উদ্যত হইলেন। অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গভীর অন্ধকার আসিয়া ভাগীরথীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ গঙ্গা যেন ঘোর উন্মাদিনী। তখন নৌকায় বাস করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। গৌরীচরণ রাইকিশোরীর হাত ধরিয়া লম্ফ দিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝিগণ ও বাবু তীরে নামিতে গিয়া গঙ্গাজলে পতিত হইলেন। অতি কষ্টে তীরে উঠিয়া গোস্বামীর সহ একটী পাকা বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। এই স্থান হইতেই গোস্বামীর ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

রাত্রির জল ঝড় যখন থামিয়া গেল, তখন রাইকিশোরীর পিতা এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কন্যাকে লইয়া গোস্বামীর হাতে দিয়া কহিলেন—গুরুদেব ! আমার পারত্রিক জীবনের সাহায্যদাতা ! এই আমার গুরুদক্ষিণা, হৃদয় পুত্তলিটিকে আপনার পবিত্র হস্তে দিলাম। আমার এই স্নেহের গলিত স্বর্ণধারা এবং সঞ্চিত অর্থরাশি আপনার পৈতৃক বিগ্রহ শ্যামসুন্দরকে দিলাম, আপনি এই সকল দ্রব্যের ইচ্ছামত ব্যবহার করিবেন। বাবু গৃহ হইতে বাহির হইলেন। একবারমাত্র রাইকিশোরীকে কহিলেন—মা ! এই গুরুদেব অদ্য হইতে তোমার পিতা, আমি চলিলাম, সময়ে দেখা হইলেও হইতে পারে। বালিকা কান্দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। গোস্বামী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—শ্যামসুন্দর এ আবার কি ? সকলি তোমার ইচ্ছা। লীলাময় এ তোমার কি লীলা !

এই সময় আকাশের মেঘ পুনর্ব্বার গাঢ় হইয়া জমাট বান্ধিতে লাগিল। বৈশাখী জ্যোৎস্না তাহাতে কিন্তু একটা সুন্দর রং ফুটাইয়া দিল। গোস্বামী তখন রোরুদ্যমানা বালিকাকে লইয়া শয়ন করিলেন। রাইকিশোরী তখন পিতার শোকে ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গৌরীচরণের কোলে ক্ষুদ্র মস্তকটী রাখিয়া নীরব ক্রন্দনে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। গৌরীচরণ কিছুক্ষণ চিন্তার পর বিস্ময়পুলকমিশ্রিত বৈরাগ্যচিন্তায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রভাত হয় হয় সময় গোস্বামী স্বপ্নে শুনিলেন। "এখন আর কেন? অর্থ ছিল না, তা পেয়েছ? বেশীর ভাগ একটী বালিকা পাইয়াছ? এখন দেশে যাও, অর্থ লইয়া পরিবার পালন, আর আমার সেবা কর—পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রকৃত গৃহস্থ হও" এই স্বপ্নে গোস্বামী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, পুত্র আর পৈতৃক বিগ্রহদর্শনজন্য ব্যাকুল চিত্তে মাঝিগণকে নৌকা বাঙ্গলাদেশাভিমুখে ছাড়িতে আদেশ দিয়া মানসপূজায় উঠিয়া বসিলেন। রাইকিশোরীর অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া একটা মেহাগ্নি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স খুলিয়া গোস্বামী শিহরিয়া উঠিলেন। দরিদ্রের মস্তিষ্ক অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া অবশ হইয়া পড়িল। মাঝিগণ নৌকা বাহিতে লাগিল। বালিকা রাইকিশোরীর ক্ষুদ্র হৃদয় শোকে আর অভিনব চিন্তায় অভিভূত হইল।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চন্দ্র মেঘের অন্তরাল হইতে মাথা তুলিয়া শ্যামাধরণীর মুখে জ্যোৎস্নার জ্যোতিঃ ফুটাইয়া মৃদু মন্দ অনিলে নিজের চিরস্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি দোলাইয়া নীল-আকাশের অনন্ত নীলিমার কোলে নিদ্রা যাইতেছে। শ্যামাধরণী শশিকরে স্নাত হইয়া এক অভিনব মূর্ত্তি ধরিয়াছে দেখিয়া ললিত পত্রকুঞ্জ মাঝে নৈশ সমীরণ প্রবেশ করিতে গিয়া বনজ মল্লিকার গন্ধে ভরপূর হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে সহকার তরুশির হইতে কোকিলের স্বর ছুটিয়া আসিয়া গৌরীচরণের শ্যামসুন্দরের গৃহের প্রাঙ্গণপার্শ্বে মধু ঢালিয়া দিতেছে।

এই সময় বিংশতিবর্ষীয়া ব্রাহ্মণবিধবা হরিদাসী বলিল—রাধাচরণ! ঠাকুর তোমার ভোজ্য লইয়া আহার করিয়াছেন, একথা তুমি কাহাকেও বলিও না; যদি বল তবে আর তিনি তোমার অন্ন গ্রহণ করিবেন না। রাধাচরণের মাতা কৃষ্ণদাসী কহিলেন—একথা প্রকাশ করিলে মুখে রক্ত উঠিবে, বাবা সাবধান। তুমি আমি আর তোমার পিসিমা ছাড়া ইহা যেন অন্য কেহ না শুনিতে পায়।

বালকের চিত্তে এইরূপে ভয় জন্মাইয়া আর নিষেধ করিয়া নারীদ্বয় যখন তাহার শরীরে হাত বুলাইতেছিল, ঠিক সেই সময় হরিদাসী ঠাকুরগৃহের দিকে চাহিয়া একটা আলো দেখিতে পাইল। উঠিয়া নিকটে গিয়া দেখিল গৃহে প্রদীপ নাই বা কোনরূপ আলো নাই, অথচ গৃহখানি পূর্ণ আলোকিত, বিগ্রহের পদের ক্ষুদ্র তুলসীটি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। এমন শীতলস্নিগ্ধ সুন্দর আলো হরিদাসী জীবনে কখনও দেখে নাই। বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—বউ বউ, এদিকে এসো তো?

ঠাকুরঘরে এত আলো এলো কোথা হ'তে? রাধাচরণ আর তাহার জননী ছুটিয়া আসিল। তখন ঠাকুর-গৃহ হইতে একটী গুরুগম্ভীর শব্দ হইল। সেই শব্দের মধ্য হইতে এক সুন্দর কথা বাহির হইল। "আমি অদ্য হইতে তোমাদের চির ক্রীত রহিলাম, তোমরা শীঘ্রই দরিদ্রতার কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। তোমাদের আর একটী নবসঙ্গিনী পর্য্যন্ত জুটিবে।"

এই দৈবভাষার অর্থ কেহ বুঝিল না, তখন ঠাকুরগৃহে আবার ঘোর অন্ধকার হইল। এক খানা মেঘ আসিয়া অষ্টমীর চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল। হরিদাসী বলিল, বউ, এ সকল হরির খেলা, আমরা কাঙ্গাল—তাহাতে জ্ঞানশূন্যা; এ সকল কথার এবং ক্রিয়ার কোন ভাবই বুঝি না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমরা সেবা করিতে আসিয়াছি, সেবা করিব এই মাত্র। রাধাচরণ বলিল ঐ বৃষ্টি আসিল, শ্যামসুন্দর বুঝি ভিজিয়া যাইবেন। বলিতে বলিতে প্রকৃতই বৃষ্টি পড়িল। হরিদাসী রাধাচরণকে লইয়া পূর্ব্বের ভগ্নপ্রায় গৃহ-বারান্দায় দাঁড়াইয়া শ্যামসুন্দরের জীর্ণ গৃহপানে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণদাসী পূর্ব্বের রৌদ্রে দেওয়া গোবরের চাপড়াগুলি কুড়াইয়া ভিজিয়া ভিজিয়া তাহা একত্র করিতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। অতি বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণদাসী তাহা দেখিতে না পারিয়া, অনুমানে বুঝিয়া দুঃখিত চিত্তে ঘরে আসিল। তিনজনে অতিকষ্টে গৃহের এক কোণে অর্দ্ধসিক্তভাবে বসিয়া বসিয়া রাত্রি অতীত করিতে লাগিল। ধারার উপর ধারা পড়িয়া বাতাসের গতিতে অতি প্রবল শীতলতা উপস্থিত করিল। রাত্রিকাল—তাহাতে বৃষ্টি, তাহার উপর বাতাসের ঝাপট, ঘরের মধ্যে থাকিয়া রাধাচরণ, তাহার মা এবং পিসি অতি কষ্টে রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

তাহারা যখন জলে ভিজিয়া পরিধেয় বস্ত্র নিংড়াইবার জন্য গৃহের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, সেই সময় দেখিল, একটী সাহেব তাহাদের নিকটে থাকিয়া একটী ধবলাকার অশ্বের গায়ে হাত দিতেছে। রাত্রির জল ঝড়ে সাহেব বিপন্ন হইয়া এই গরীব গৃহস্থের আশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব রাধাচরণকে লক্ষ্য করিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কহিল—বালক! টুমি আমাকে গর ডিবে? বুদ্ধিমতী হরিদাসী তখন একটী ভগ্নপ্রায় লণ্ঠন লইয়া বাহিরে দাঁড়াইল, সাহেব তখন আলো আঁধারের ভিতর হইতে হরিদাসী আর কৃষ্ণদাসীকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাধাচরণ বিপন্ন অতিথিকে লইয়া একটী ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে গিয়া উপস্থিত হইল, ঘোড়াটিকে তথায় রাখিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিল। সাহেব যেন যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা, রাধাচরণ যাহা বলিতে লাগিল, তাহাই করিতে লাগিল—কৃষ্ণদাসীর ইচ্ছায় সাহেব রাধাচরণসহ সেই গৃহের মধ্যস্থিত একটী বংশমাচার তলে গিয়া বসিল—ঝড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বৃষ্টির জলে পথে সাহেবের পরিচ্ছদ ভিজিয়া গিয়াছিল, দীর্ঘকাল গাত্রসংলগ্ন থাকিয়া তাহা একরূপ শুষ্ক হইয়াছে বটে, কিন্তু শীতে সাহেব কাঁপিতেছে

জানিয়া হরিদাসী একখানি অর্দ্ধপরিষ্কৃত ছিন্ন কাঁথা সাহেবকে দিয়া নিজেরা দুইজনে ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এইভাবে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অতীত হইল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়াছে। বায়ুর বেগ প্রশমিত হইয়াছে, আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে। শত শত নক্ষত্র উঠিয়াছে। প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য থামিয়াছে দেখিয়া সাহেব রাধাচরণের নামটি মাত্র শুনিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। ঘোড়া লইয়া প্রস্থান করিবার সময় দেখিল সম্মুখে কৃষ্ণপ্রস্তরের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ এত জলঝড়ে না ভিজিয়া ঠিক একভাবে মুরলী মুখে ধরিয়া দাঁড়াইয়া যেন হাসিতেছেন। ঠাকুরের গায়ে জল পড়ে নাই দেখিয়া সাহেব একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ঘোড়া লইয়া প্রস্থান করিল।

হরিদাসী আর কৃষ্ণদাসী দুইজনে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। রাধাচরণ ঠাকুরগৃহের বিক্ষিপ্ত খড় লইয়া শুখাইবার জন্য একত্র করিতে লাগিল। উষা রূপসী তখন পূর্ব্বদিক আলো করিয়া কুলবালাদের সহিত খেলা করিতে আসিল দেখিয়া হরিদাসী ফুলের সাজি হাতে করিয়া পাড়ায় ফুল তুলিতে গেল। কৃষ্ণদাসী গৃহের মধ্যস্থ জলরাশি ছেঁচিয়া ছেঁচিয়া রাধাচরণকে বলিল তুমি রাত্রে ঘুমাইতে পার নাই, এখন একটুকু শোও। বালক কিন্তু তাহা শুনিল না, পূর্ব্বের কার্য্যে নিযুক্ত রহিল। খড় কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল মা ওপাড়ার গোলোক মামা বেশ ভাল ঘরামী, তাহাকে ডাকিয়া এই খড় দিয়া ঠাকুরঘর ছাইয়া ফেলি। তাহার মা কহিল, আরে অবোধ, সেকি বিনা পয়সায় তোমার ঠাকুরঘর সারিয়া দিবে? ঠিক এই সময়ে একটী অর্দ্ধবৃদ্ধ নমঃশূদ্র একখানি দা, গুটি কতক বাখারি, গুটিদুই পাকানো দড়ির বাণ্ডিল, আর মাথায় একবোঝা উলুখড় লইয়া শ্যামসুন্দর বিগ্রহের আঙ্গিনার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। রাধাচরণ বলিল গোলোক মামা, তুমি আমার ঠাকুরঘর মেরামত করিতে এসেছ নাকি? উত্তর হইল—হাঁ, না হ'লে ঠাকুর রাখিব কোথায়? তুমি স্নান করিয়া ঠাকুরকে এঘর হইতে অন্য স্থানে রাখ। রাধাচরণ তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর লইয়া পূর্ব্বের সেই জল ঝড়ে বিপর্য্যস্ত চতুঃশালার উত্তরগৃহে রাখিল। গোলকমণ্ডল ঘর সারিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণদাসী কহিল—মণ্ডলদাদা তুমি ঘর সারিয়া তো দিলে, পয়সা দিব কোথা হ'তে? গোলোকমণ্ডল বলিল তাতো তোমার চিন্তা নাই। "হুজুরের হুকুম"। হরিদাসী তখন আসিয়া বলিল—বউ, সেই সাহেবটি মণ্ডলপাড়া হ'তে এখনি যাইতেছে দেখিলাম। গোলেকেমণ্ডল বলিল, তিনি আমাকে ৪৲ টাকা দিয়া তোমাদের ঘরদুয়ারগুলি মেরামত করিয়া দিতে বলেছেন। হ্যাঁগা, তোমরা সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেছিলে নাকি?

হরিদাসী উত্তর করিল তা নাতো কি? চক্ষু টিপিয়া রাধাচরণকে কথা কহিতে নিষেধ করিল। ঘর মেরামত চলিতে লাগিল, রাধাচরণ ঘরামীর সাহায্য করিতে লাগিল, কৃষ্ণদাসী আর হরিদাসী সাহেব কে এবং তাহার করুণহৃদয়ের কথা চিন্তা করিতে করিতে

স্থানান্তরে গেল। এই সময় বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইল। মেঘভাঙ্গা রৌদ্রে বালক পরিশ্রান্ত হইয়া বকুলতলায় গিয়া বসিয়াছে। গোলোকমণ্ডল গৃহের চালে থাকিয়া মাঝে মাঝে তাহার সহিত আলাপ করিতেছে।এই সময় এক মহাবিঘ্ন আসিয়া লোক তিনটীর মহাভীতির সঞ্চার করিল।

একজন আদালতের পিয়ন আর একটী গ্রাম্য চৌকিদার এবং কয়েকটি লোক শ্যামসুন্দরবিগ্রহের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সঙ্গী অপর লোকটী একটুকু দূরে দাঁড়াইল, কিন্তু পিয়াদা কোন কার্য্য করিতেছে না দেখিয়া কিছু বিরক্তিসহ কহিল—এইতো সব দ্রব্য, তুমি ধর না কেন? তখন পিয়াদা আর চৌকিদার প্রশ্নকর্ত্তা মুন্সীমহাশয়ের সহিত রাধাচরণের ঘরের দ্রব্যাদি লইয়া একস্থানে জড় করিতে লাগিল। গৃহ পূর্ব্ব হইতেই দরিদ্রতাজন্য আসবাবশূন্য ছিল। সামান্য সামান্য গৃহস্থালীর দ্রব্যগুলি মুন্সী লইয়া একত্র করিতেছে দেখিয়া রাধাচরণ কহিল, একি মুন্সীমহাশয়, আপনি আমাদের জিনিষপত্র লইতেছেন যে? মুন্সী উত্তর করিল—তোমার সুন্দরী পিসির নিকট তাহা জিজ্ঞাসা কর। রাধাচরণ কিন্তু সব বুঝিয়াছে, তাহার পিতার দেনডিগ্রিতে আজ যে তাহাদের গৃহস্থালীর দ্রব্যগুলি নিলামে বিক্রী হইবে,বালক তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল মুন্সীমহাশয়, আর সব আপনি লইয়া যান; আমার শ্যামসুন্দরের পূজার দ্রব্যগুলি লইবেন না, আমি আর কিছু চাইনে, আমার ঠাকুরের পূজার দ্রব্যগুলি, আর আমার জল খাইবার জন্য এই কাণাভাঙ্গা ঘটীটী রাখিয়া যান।

পাষাণহৃদয় সুদখোর যাদব মুন্সী কহিল, তা নাতো কি? ডিক্রীর দাবী ৬০ টাকা, সর্ব্বসমেৎ খরচাসহ ৮০৷৯০ টাকা আমার পাওনা। এই সমস্ত বিক্রী করিলেও তাই হয় না। আমি এতদিন দয়া করিয়া রেখেছি—আজ আর না। নে রে সব উঠাইয়া নে। একমুষ্টি ক্ষুদ পর্য্যন্ত নিবি, নতুবা খরচা পোশাবে না। কি হে পিয়ন, হাঁ করিয়া দাঁড়িয়ে কি শুনছ? এই ঘরে ওদের ঠাকুর আছে, তার হাতে পায়ে গহনা আছে, তাহাতে প্রায় ১০৷১২ টাকা হতে পারে, নিয়ে এসনা। সুদখোর মহাজনের হৃদয়ে আর আদালতের পিয়াদায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। পিয়াদা বলিল—আমি সুদখোর নই,আবার কসাই বা চাসারও নই। তোমার ডিক্রীজারীর মাল লইতে এসেছি বলিয়া ঠাকুর গৃহ ভাঙ্গিয়া দেবসম্পত্তি লুটিতে আসি নাই? যাহা আনিতে হয়, করিতে হয়, তুমি কর, তুমি আন। আমি এখন সংগ্রাহক জেম্মাদার। তখন মুন্সী কিছুকাল চিন্তা করিয়া তাহার পর নিজেই ঠাকুরের গাত্র হইতে গহনা খুলিল। রাধাচরণ কাঁদিয়া 'হা শ্যামসুন্দর' বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। এই সময় তাহার জননী পুকুরের ঘাট হইতে একটা মাটির পাত্রে সের খানেক চাউল ধুইয়া লইয়া গোলোকমণ্ডল আর রাধাচরণের জন্য অন্ন রান্ধিবার উদ্দেশ্যে আসিতেছিল। উঃ, দুষ্ট হৃদয়হীন কুসীদজীবী মুন্সী তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিল। কামিনী ভয়ে বিস্ময়ে আর লজ্জায় দূরে সরিয়া দাঁড়াইল; তাহার প্রাণে শ্যামসুন্দর, মুখে—"কি হলো কি হলো" শব্দ।

হরিদাসী রূপসী বি.বা, সে মুন্সীর অত্যাচার দেখিয়া বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কান্দিতে ছিল। যখন কৃষ্ণদাসীর হাত হইতে ভিজে চাউলগুলি মুন্সী গ্রহণ করিল, তখন উত্তেজনার আবেগে রূপসী ব্রাহ্মণ কন্যা জনতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। মুন্সীর চক্ষু তখন তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর দিকে পড়িল। তেজোগর্ব্বিতা বাঘিনীরূপা হরিদাসী বলিল দেখ! তোমার অর্থ আমরা ধারী বটে; কিন্তু তাই বলিয়া শ্যামসুন্দরের গহনা তুমি লইতে পার না। দেবসম্পত্তিতে কাহারও অধিকার নাই। তুমি সতীলক্ষ্মীর অঙ্গস্পর্শ করে ক্ষুধাতুর বালকের মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত লইয়াছ। তাতে আমি কিছু বলি নাই; কেননা গৌরীচরণগোস্বামী তোমার নিকট দায়ী, তুমি তাহার পুত্রের মুখের অন্ন পর্য্যন্ত নিতে পার, কিন্তু দেখ্ কুলাঙ্গার! তুই যখন ঠাকুরের সামান্য পিতলের গহনা পর্য্যন্ত লইয়াছিস্, আর সতীর অপমান করেছিস্—তখন তুই ত্রিপক্ষের মধ্যে এর প্রতিফল পাবি—যদি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকি এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া থাকি, তবে এর ভোগ ভুগিতে হবে। রুধিরলোলুপ দৃপ্তা বাঘিনীর ন্যায় তখন কি জানি কি কারণে সে ঠাকুরগৃহের মধ্যে গিয়া বসিল।

যাদবমুন্সী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—ওরে আমার সতী রে "সাতবার খেয়ে"—বাকী অংশ বাহির হইতে না হইতে গর্জ্জিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় হরিদাসী বাহিরে আসিয়া আবার বলিল—যদি দেবতা ব্রাহ্মণ থাকে, জগতের পাপপুণ্যের বিচার হয়, তবে এই কার্য্যের ফল ত্রিপক্ষের মধ্যে তুই নিশ্চয় পাইবি। মুন্সী বলিল—ওরে আমার যাদু, তুমি এসনা—তোমার জন্যই আমার এই কার্য্য। তোমাকে পাইলে ৮০ টাকার ডিক্রি উড়াইয়া ৮০০০ হাজার পর্য্যন্ত দিতে পারি।

এই সময় সহসা মেঘশূন্য আকাশে একটা মহাশব্দ হইল। দিবা দুই প্রহরে সেই শব্দ শুনিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিল। গোলোকমণ্ডল গৃহের ছাদ হইতে দ্রুত নামিল। পিয়াদা আর রাধাচরণ বসিয়া পড়িল। মুন্সীর সঙ্গিগণ স্তম্ভিত হইল। একটা ভীষণ বায়ুর বেগ আসিয়া স্থানটিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল—মুন্সী তখন হরিদাসীর হাত ধরিয়া যেই আকর্ষণ করিবে, অমনি গোলোকমণ্ডল লাফ দিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিল, রাধাচরণ ক্রুদ্ধ শার্দ্দূল-শিশুর ন্যায় গর্জ্জিয়া একখানি বাখারি ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইল। পিয়াদা তখন মুন্সীকে গোলোক মণ্ডলের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। মুন্সী সেই সময় হইতে একটা উৎকট জ্বালা সর্ব্বশরীরময় অনুভব করিতে লাগিল; হিন্দুপিয়ন ভাবিল, না হবে কেন? যিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, তিনিইতো এই শ্যামসুন্দর! ভাবিয়া ভাবিয়া পিয়ন কহিল, মুন্সীমহাশয় যাহা পাইয়াছি ইহাই যথেষ্ট—আসুন চলিয়া যাই, অদ্য আর নহে। মুন্সী অগত্যা সম্মত হইল। কেননা তাহার আর তখন স্থির হইয়া দাঁড়াইবার সাধ্য ছিল না। তাহার সঙ্গিগণ দ্রব্যাদি লইল। পিয়াদা গোলোকমণ্ডলকে সাক্ষ্য করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিল। বালক রাধাচরণ উঠানে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল।

এই সময় বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে—ঠাকুরপূজা হয় নাই, এবং বালক রাধাচরণের জলটুকু পর্য্যন্ত উদরস্থ হয় নাই। কৃষ্ণদাসী আর হরিদাসী ঠাকুরের নিকটে অনবরত মাথা কুটিতেছে, গোলোকমণ্ডল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পরিশেষে রাধাচরণকে কহিল—তুমি এসো আমার সহিত, আমি গরীব লোক, কিন্তু যাদবমুন্সীর ন্যায় ধনী হইতে চাহি না, তোমাকে যাহা দিব তাহা লইয়া আজ তুমি ঠাকুরসেবা করিবে। আমি আজ হইতে তোমার কেনা গোলাম হইলাম। এসো রাধাচরণ, যাই।

এই অত্যাচার দেখিয়া গোলোকমণ্ডলের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে রাধাচরণকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী গেল। গ্রামের অপরাপর কেহ কেহ মুন্সীর ব্যবহারে দুঃখিত, হইয়া পরস্পর এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরিদাসী আর কৃষ্ণদাসী আজ প্রকৃতই রিক্তহস্ত। গৌরীচরণ গৃহত্যাগ করিবার সময় পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর জমীর সামান্য ধান্য সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কোন গতিকে বালকের আর তাহার মাতার চাউল যোগাড় হইত—কেবল হরিদাসীর আর ঠাকুরের আতপ চাউল কিছু সংগ্রহ ছিল না, ভিক্ষা দ্বারা তাহার যোগাড় হইত। গৌরীচরণ পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার জন্য যাদবমুন্সীর নিকটে ৪০ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, সেই ঋণের যন্ত্রণায় আর দরিদ্রতার আক্রমণে দেশ ত্যাগ করিবেন ভাবিতেন; কিন্তু ভগ্নী হরিদাসীর সৌন্দর্য্যে তাহার বাধা দিত, দুরন্ত যাদবমুন্সীকে তাঁহার বড় ভয় ছিল, কিন্তু পরিশেষে শ্যামসুন্দরের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া চলিয়া যান। মানব একেবারে আশ্রয়শূন্য অবলম্বনশূন্য হইলেই জীবের নিত্যসঙ্গী ভগবানের প্রতি সমস্তই নির্ভর করে। শ্রীভগবানে গৃহস্থালী অর্পণ করিয়া গৌরীচরণ দেশ ত্যাগ করিবার পর হইতেই পাপচিত্ত মুন্সী টাকার জন্য যতটা না হউক, হরিদাসীর রূপলালসায় অধিক ব্যস্ত হইয়া নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া পরিশেষে কামিনীদ্বয়কে বিপদে ফেলিয়া অভীষ্ট সাধন করিবে বলিয়া অদ্য এই কাণ্ড করিয়া গেল।

পাপীর পাপচক্রে যে পাপী নিজেই আবদ্ধ হয়, তাহা পাপের আপাতমনোরম দৃশ্যে পাপী বুঝিতে পারে না।

যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল। হরিদাসী আর কৃষ্ণদাসী ঠাকুরসেবার জন্য বড় চিন্তিত হইল। এই আকস্মিক ঘটনায় পূজার শয্যাগুলি পর্য্যন্ত ডিগ্রিদার লইয়া গিয়াছে, ফুলতুলসী অপবিত্র হইয়াছে। ঘরে মাটির হাঁড়ি কলসী ব্যতীত দ্বিতীয় দ্রব্য নাই। পূজার জল কিসে রাখিবে, নৈবেদ্য কিসে করিয়া প্রস্তুত করিবে, আবার তাহার উপকরণ কোথায়? ইত্যাদি চিন্তায় কামিনীদ্বয় চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। ঠাকুরের আবার অভিষেক করিতে হইবে, নতুবা পূজা হইবে না।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের হৃদয় ফাটিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কাজেই ভগবানের স্বর্ণসিংহাসন টলিল। প্রাণের ঠাকুর প্রাণের আহ্বানে দয়া দান করিলেন।

যেমন ডাক অমনি দয়া, যেমন চিন্তা অমনি উপায়। শ্যামসুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেননা তিনি যে জীবের নিজজন। ভক্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অকৈতব ভক্তি দেখিলে তিনি তো চুপ করিয়া থাকিতে পারেননা। কিন্তু জগৎ পরীক্ষার স্থল, তাই এই ঘোর দরিদ্রতার ভীষণ অত্যাচারে তাঁহার পূর্ণ দয়া প্রকাশ হয় নাই। ব্রাহ্মণকামিনী-দ্বয় ঠাকুরসেবা না করিতে পারিয়া কান্দিয়া বুক ভাসাইতেছে।

হরি বল হরি—ঠিক এই সময় রাধাচরণ তিনটী অর্দ্ধপক্ক আম লইয়া আসিয়া ডাকিল—মা! পিসিমা গোলোক মামা এই দিল। বালকের হাতে আম দেখিয়া হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল, কৃষ্ণদাসী বলিল -ঠাকুর ঝি, যার কার্য্য সেই করে, আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া কি করিব?

তখন তীক্ষ্মবুদ্ধিশালিনী হরিদাসী আম তিনটীর অপেক্ষাকৃত ছোটটী রাখিয়া অপর দুইটী রাধাচরণের হাতে দিয়া বাজারে বিক্রয় জন্য যাইতে বলিল। সমস্ত দিন উপবাসী বালক যাইতে বিরক্ত হইল। হরিদাসী বুঝিল বালক ক্ষুধিত ও পিপাসিত। তখন মাটীর একটী কলসী লইয়া স্নান করিয়া আসিল। তাহার মা গুটিকয়েক তুলসী তুলিল। তাহা একখানি কদলীপত্রে রাখিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিল। হরিদাসী রাধাচরণকে স্নান করাইতে করাইতে বলিল -বাবা তুমি ভাবিও না, তোমার শ্যামসুন্দর তোমার সকল কষ্ট দূর করিবেন। ঐ যে জল তোমার মা এনেছেন, উহা ঐ পাত্রেই রাখিয়া তুমি তাহার পূজা * কর। এই আম নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাও—পরে বাজারে গিয়া এই দুইটি বিক্রি ক'রে আন। যাহা পাইবে তাহা দিয়া আমি "হরের মা'র" নিকট হইতে আতপ চাউল আনিব, উহা রান্ধিয়া লইয়া ঠাকুরের ভোগ প্রস্তত করিব।

বালক সম্মত হইয়া স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে ঠাকুরের সম্মুখে বসিল। তাহার পিসিমা পূর্ব্বের ন্যায় স্নানমন্ত্র পড়াইল। এক টুকরা মলিন রঙ্গিণ বস্ত্রে ঠাকুরের গাত্র মুছাইয়া বলিল—পিসিমা কাল যে ধ্যানমন্ত্র বলিয়াছিলে, আজ আবার তাই বল। হরিদাসী মন্ত্র বলিল। রাধাচরণ চন্দনশূন্য তুলসীপত্র জলে সিক্ত করিয়া অঞ্জলি বদ্ধকরতঃ বক্ষের নিকট লইবা মাত্র, পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবার সংজ্ঞাশূন্য হইল, কিছুকাল নিস্পন্দ থাকিয়া বলিল—বল পিসিমা, আবার ধ্যানমন্ত্র বল। আ—এমন রূপ এমন মূর্ত্তি, এমন আলো কখনও দেখি নাই।

অবোধ বালক বুঝিল না যে কাহার মূর্ত্তি কাহার রূপ কিসের আলো! দেখিতে উত্তম, ভাবিতে আনন্দ, এইমাত্র বলিয়াই ধ্যানমন্ত্র পড়াইতে বলিল। হরিদাসী বলিল বাবা ও তুলসী মাথায় দেও, আর একটি লও, পড়াইতেছি; এইরূপে সেদিন গত দিনের ন্যায় পূজা হইল।

---

* স্থাপিত বিগ্রহ ব্রাহ্মণেতর জাতি-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে বিনা অভিষেকে তাহার পূজার বিধি নাই, কিন্তু ভক্তের নিকট ভগবানের পূজা স্বতন্ত্র। তাই অদ্য শ্যামসুন্দরের বিনা অভিষেকে পূজা হইল।

পূজকের ভাবভঙ্গি ক্রিয়াকার্য্য সমস্তই পূর্ব্বদিনের ন্যায় হইল, অভিষেক আর হইল না। ছোট আমটি খোসা ছাড়াইয়া কৃষ্ণদাসী কদলীপত্রে রাখিলে পর, হরিদাসী নিবেদনমন্ত্র পড়াইল।

রাধাচরণ তখন পূর্ব্বদিনের ন্যায় তাহার পিসিমা আর মায়ের সম্মুখে বলিল—খাও ঠাকুর খাও—আজ আর কিছু নহে মাত্র একটী আম।

ঠাকুর তখন বড় বিপন্ন। গত দিন - মুক্ত ভক্তের সম্মুখে মুক্ত আহ্বানে শাকান্ন খাইয়াছিলেন - আজ আম না খাইলে ভক্ত ছাড়িবে না—ভাবিয়া সহসা বাহিরে একটী ভীষণ আলোকের অভিনয় করিলেন। সাংসারিক চিন্তামুগ্ধা ভক্ত কামিনীদ্বয় যেই সেই আলোর দিকে চাহিয়াছেন, অমনি মুরলীবদন মুরলী সরাইয়া পদ্মহস্ত দ্বারা আধপাকা আমের কিছু অংশ আহার করিলেন। বালক একটুকু ক্রোধের একটুকু বিরক্তির একটু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বলিল—সকল খেওনা—আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমার জন্য কিছু রাখ, প্রসাদ দাও —এই কথায় স্ত্রীলোক দুইটী চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল ঠাকুরের মুখে আর হাতে আমের রস লাগিয়াছে, অমনি তাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। রাধাচরণ প্রসাদী আম লইয়া পিসিমা আর মায়ের জন্য কিছু রাখিয়া নিজে কিছু খাইল, তাহার নরজন্ম সার্থক হইল।

মহাপ্রসাদ পাইয়া বালকের শরীরে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যেন শক্তি আসিল, তাহার ক্ষুধা পিপাসা দূর হইল, তখন অপর দুটি আম লইয়া বিক্রয় জন্য বাজারে গেল।

তাহার মা আর পিসিমা সেই স্থানে জপে বসিল। স্থানটি তো পূর্ব্ব হইতেই শ্মশান তুল্য হইয়াছিল। দুরাত্মা মুন্সীর কৃত কার্য্যে দুই চারিটা ভাঙ্গা ঘট আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত ছিল, গৃহের চাল হইতে খড় পড়িয়া বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ স্থানে ভীষণ রৌদ্রে নারীদ্বয় ধ্যানস্তিমিত নেত্রে তন্ময়চিত্ত। সহসা একটী অপরিচিত মূর্ত্তির ছায়া তাহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—কামিনীদ্বয় চিনিয়াও চিনিতে পারিল না, ঠাকুরগৃহ হইতে শব্দ হইল "আসিতেছি—একা নই, সঙ্গে রাইকিশোরী" নারীদ্বয় বুঝিল না কাহার মূর্ত্তি, কে কথা বলিল। মনে মনে এই বিষয় লইয়া ভাবিতে ভাবিতে জপে দৃঢ় হইয়া রহিল। বেলা অবসান হইল।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ।

পৃথিবীতত্ত্বে প্রাচ্য-গবেষণা

পাশ্চাত্য শিক্ষার নবীন আলোকে আমাদের চক্ষু এতই ঝলসিয়া যাইতে বসিয়াছে যে, আমরা আর আমাদের গৃহরত্নগুলি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচর করিতে পারিতেছি না, পরন্তু নানা প্রকার দিগ্‌দিগন্তের ভূয়োদর্শনবলের অভিমান করিয়া বিজ্ঞানচক্ষুঃ মহর্ষিদিগের যুক্তিপ্রমাণাদি অপ্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতেও বিন্দুমাত্র লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করিতেছি না। সে যাহা হউক, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারা পৃথ্বীর গোলত্ব, আকর্ষণশক্তি, গ্রহ নক্ষত্র ও পৃথিবীর অন্যতম গতি, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, এসিয়া সম্বন্ধে এবং পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে আর্য্যজাতির বাস এবং যে কারণে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা দেখানই আমার এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য কতদূর সফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমার বুদ্ধির অবিষয়ীভূত।

আর্য্যশাস্ত্র শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে পৃথিবী কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোলাকার, যথা—

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম-গ্রাম-চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকেশর-গ্রন্থিঃ কেশরপ্রসবৈরিব॥

অর্থাৎ কেশরদ্বারা যেরূপ কদম্বপুষ্পের গ্রন্থি (কদম্বপিণ্ড) বেষ্টিত, তদনুরূপ ভূ-পিণ্ডের সর্ব্বদিকেই গ্রাম, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদনদী, সমুদ্র ইত্যাদি দ্বারা পৃথিবী-পিণ্ড বেষ্টিত, পৃথিবী যদি কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোল না হইয়া পদ্মপত্রের ন্যায় হইত, তাহা হইলে এককালীন সর্ব্বব্যাপী সূর্য্যের উদয়াস্ত পরিদৃশ্য হইত। অতএব পৃথিবী সমতল নহে।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে সূর্য্যের উদয়াস্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে—

লংকাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটীপুর্য্যাম্।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্ রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥

লঙ্কায় যে সময় সূর্য্যের উদয় হয়, সেই সময়ে যমকোটি পুরীতে অর্দ্ধদিন, লঙ্কার অধঃস্থল, সিদ্ধপুরে সূর্য্যের অস্তকাল, এবং রোমদেশে তখন রাত্রি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

ভদ্রাশ্বোপরিগঃ সূর্য্যো ভারতেঽত্রোদয়ং রবেঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালাখ্যে কুরাবস্তমনং তদা॥

অর্থাৎ সূর্য্য যখন ভদ্রাশ্ববর্ষোপরি গমন করেন, তখন ভারতবর্ষে সূর্য্যের মাত্র উদয়কাল আরম্ভ হয়, কেতুমালবর্ষে তখন রাত্রির অর্দ্ধকাল, কুরুবর্ষে সেই সময়ে সূর্য্যের অস্তকাল উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা পৃথিবী গোলাকার ইহা বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে অন্যান্য প্রমাণও দেখা যায়, যথা—

অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবং।
তদ্বৎ খগোলকং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যান্ প্রবোধয়েৎ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও পদার্থদীপিকা।

অর্থাৎ দারুময় ভূগোল ও খগোল প্রস্তুত করিয়া গুরু শিষ্যগণকে উপদেশ দিবেন, বর্ত্তমানে স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে যেরূপ ম্যাপ ইত্যাদি চিত্রোপকরণ দ্বারা ভূগোলখগোল অধ্যাপকগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন, এই প্রকার শিক্ষার প্রচলন যে পূর্ব্বেও ছিল, তাহা উপরি উক্ত প্রাচীন প্রমাণ দেখিলে কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের এই প্রমাণ দিয়াই আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিতেছি না, আমাদের স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রও পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। সকলেরই ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত যে, "যে বস্তুর যেরূপ আকার তাহার ছায়াও তদাকার," সূর্য্যতেজঃ দ্বারা প্রকাশিত চন্দ্রের গ্রহণকালীন চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া (কালভাগ) যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা গোল। ব্রহ্মপুরাণে রাহুর প্রতি যে ব্রহ্মবাক্য আছে, তাহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

পর্ব্বকালে তু সংপ্রাপ্তে চন্দ্রার্কৌ ছাদয়িষ্যসি।
ভূমিচ্ছায়াগতশ্চন্দ্রং চন্দ্রগোঽর্কং কদাচন॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা রাহুকে বলিয়াছিলেন তুমি পর্ব্বকালে অর্থাৎ পূর্ণিমা প্রতিপৎ ও অমাবস্যা প্রতিপৎ সন্ধিতে ভূমিচ্ছায়া গত হইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া হইয়া চন্দ্রকে এবং চন্দ্রগ (রাহু ছায়া) হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিবে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্যতেজঃ দ্বারা প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের গ্রহণকালীন চন্দ্রে যে পৃথিবীর ছায়া (কালভাগ) দৃষ্ট হয়, তাহা গোল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন -

ছাদকো ভাস্করস্যেন্দুরধস্থোঘনবদ্‌ভবেৎ।
ভূচ্ছায়াং প্রমুখশ্চন্দ্রো বিশত্যর্থ ভবেদসৌ॥

সূর্য্যগ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যের অধঃস্থ হইয়া মেঘের ন্যায় সূর্য্যের আচ্ছাদক হন, এবং চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্র ভূচ্ছায়াতে প্রবেশ করেন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবীর ছায়ানিষ্পন্ন হয়, ঐ ছায়া গোল, অতএব পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ কিঞ্চিৎ চাপা। নক্ষত্রকল্পে কথিত হইয়াছে—

"কপিত্থফলবদ্ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং"।

পৃথিবী কদ্‌বেলের ন্যায়, কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর দিক সম অর্থা চাপা, সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে পৃথিবী কদম্বপুষ্পের ন্যায়, নক্ষত্রকল্পে উক্ত হইয়াছে কদবেলের ন্যায়। পাশ্চাত্য পৃথিবীতত্ত্ববিদেরা বলেন কমলানেবুর ন্যায়, অতএব এই মতত্রয়ের আকার বৈষম্য না হওয়ায় বিরোধ হইতে পারে না।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীসূর্য্যেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী।

পরকালের কথা।

ইমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং (ছান্দোগ্যশ্রুতি)।

শিশুগণ জলৌকার মত দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। বর্ত্তমান দেহের উপর মায়া-মমতারূপ আকর্ষণ থাকেনা বলিয়া তাহারা লিঙ্গদেহগ্রহণে অক্ষম হয়। বর্ত্তমান জন্মে কোনরূপ পাপ পুণ্য লইয়া যায় না বলিয়া লিঙ্গদেহে অবস্থিতিকরতঃ নূতন দেহের জন্য অপেক্ষা তাহাদের করিতে হয় না। লিঙ্গদেহগ্রহণ হয় না—কাজেই তাহাদের দাহও নাই, শ্রাদ্ধও নাই। জ্ঞানহীন শিশুদের দাহই কর, আর ভূমিতে প্রোথিতই কর, ফলে কোন তারতম্য নাই শাস্ত্রীয় দাহ নাই।

মৃত শিশু ত্রিবিধ। কোন কোন মহাত্মা মুক্ত হইবার মত সাধনা করিয়া আসিয়া প্রারব্ধাবশেষের ফলরূপে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষয় করেন। কোন কোন ক্ষুদ্র জন্তু পাপিষ্ঠ, উপর্য্যুপরি পাঁচ সাতবার শিশু-অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর একশ্রেণী পাপজন্ম শেষ হইবার পূর্ব্বে—যে সময়ে পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্য থাকে না এমন অবস্থায় অবশেষে ভোগ করিবার জন্য শিশুজন্ম লাভ করে।

সাধারণ ব্যক্তিগণ মৃত্যু হইবামাত্র লিঙ্গদেহ গ্রহণ করে। লিঙ্গদেহ স্থূলদেহের সূক্ষ্মাবস্থা। লিঙ্গদেহ ছায়াময়, বায়বীয় ও অপার্থিব। 'আমার এই প্রকার দেহ ছিল'—ইত্যাকার ধারণা যাহাদের থাকিবে, বর্ত্তমান জন্মে যাহারা নানাপ্রকার পাপপুণ্য করিয়া যাইবে, জাগতিক আধ্যাত্মিক সংস্কার লইয়া যাহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহাদিগকে কিছুদিন নূতন দেহে জন্মান্তর গ্রহণ পর্য্যন্ত লিঙ্গদেহে অবস্থিতি করিতেই হইবে। নূতন দেহলাভ বা জন্মান্তর জীবের অপরিহার্য্য। লিঙ্গদেহে অবস্থিতি জন্মের জন্য অপেক্ষা। তবে এ অপেক্ষাকালে জীবদ্দশাভ্যস্ত মোটামুটী জ্ঞান, সাধারণ সুখদুঃখবোধ, ক্লান্তি, অবসাদ, উৎকণ্ঠা ও আনন্দের অনুভূতি থাকে, এইমাত্র। কৃতকর্ম্মের ফলভোগ লিঙ্গদেহে হয় না, ভোগদেহে হইয়া থাকে।

স্বর্গনরকভোগোপযোগী দেহেরই ভোগদেহ আখ্যা। ভোগদেহ লিঙ্গদেহেরই প্রকারভেদ মাত্র। ভোগদেহ মনোময়। ভোগদেহে ভোগ সংকল্পমূলক, এবং উহা পূর্ব্বকৃত পুণ্যকর্ম্ম জন্য অদৃষ্টলভ্য। কেহ লিঙ্গদেহ হইতেই জন্ম লয়, কেহ বা ভোগদেহে মানস সুখদুঃখ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ অবশেষাত্মক কর্ম্মের অনুসারে মর্ত্ত্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়। "যথা প্রজ্ঞং হি সংভবঃ"।

মুক্ত ব্যক্তিগণ অবশ্য সংসারে গমনাগমন করেন না, তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। ইহলোকে তাঁহাদের সকল কর্ম্মফল, আর তজ্জন্য বাসনার শেষ হয়। "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি"। আর একশ্রেণীর মুক্ত—যাঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করতঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মার সহিত যুক্ত হন।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদং॥

সাধারণ ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহে থাকিয়া মৃতদেহের অনুগমনকরতঃ দাহাদি প্রত্যক্ষ করে। স্থূলদেহ ভস্মীভূত হইলে বা ভূমিতে প্রোথিত হইলে কাজেই সেই দেহের মায়া ছুটিয়া যায়। কেহ কেহ মায়ার টানে প্রিয়জনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাদের তৃপ্তিলাভ হয় না, আকাঙ্ক্ষাও মেটে না, অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে—কাজেই ফিরিয়া যায়। স্থূলচক্ষুর অদৃশ্য বলিয়া প্রিয়জন তাহাকে দেখিতে পায় না, পাইলেও বা কোনরূপে আগমন জানিতে পারিলে আদরের পরিবর্ত্তে গালি দেয়, আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয় পায়—তখন মৃত ব্যক্তির আশাও অগত্যা বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণতঃ জীবেরা আপনাদের ধান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়, "কোথায় দেহ কোথায় দেহ" করিয়া উন্মত্তের মত হয়। নূতন স্থূলদেহগ্রহণের সময় হইলে লিঙ্গদেহে অবস্থিতি অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। সে সময়ে প্রিয়জনের কথা মনেও পড়ে না। ক্ষিপ্ত শৃগালের মত সে অবস্থা কি কষ্টকর! স্থূলদেহগ্রহণের ইচ্ছা বলবতী হইলে ক্রমশঃ লিঙ্গদেহের ছায়াটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইয়া মিলাইয়া যায়।

নানাপ্রকার বিচিত্র কর্ম্মের অনুযায়ী জন্ম সকল সময়ে সুলভ নহে। কর্ম্মার্জ্জিত বিশিষ্ট দেহ অন্বেষণ করিতে, বা সে সুযোগ উপস্থিত হইতে সময় লাগে। জীবেরা মৃত্যুর পরক্ষণেই জন্মে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্থূলদেহের ঝোঁক কাটে না, ছায়া মিলাইয়া যায় না। লিঙ্গদেহে অবস্থিতিকাল সাধারণতঃ এক বৎসর। কম ও বেশী দুইই হইতে পারে।

ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সকৃতে নরঃ।
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যঃ প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥

সপিণ্ডীকরণের পরে (এক বৎসর পরে) দেহী অন্য দেহ গ্রহণ করে, কিম্বা স্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক ভোগ করে।

জন্মান্তরের সময় উপস্থিত হইলে, সেই জীবাত্মা তখন পূর্ব্বদেহের ছায়ামূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অতি সূক্ষ্ম জীবাণুরূপে জলে, স্থলে, বৃক্ষে, প্রান্তরে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। জন্মিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে শস্যসংশ্লেষ লাভকরতঃ পুরুষশরীর আশ্রয় করে। "শস্যসংশ্লেষ স্থাবর-সংশ্লেষ।" স্থাবরে লাগিয়া থাকাই সংশ্লেষ। স্থাবর সংশ্লেষ মাত্র জন্মার্থ। এই সংশ্লেষই জন্মের দ্বার। এ অবস্থায় জীব সংমূর্চ্ছিতবৎ অবস্থিতি করে। সে অবস্থায় শস্যের ছেদনে-ভেদনে তৎস্থ জীবের কোন দুঃখানুভূতি জন্মে না। স্বর্গ নরকভোগের পরও যাহারা মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকেও শস্যসংশ্লেষ লাভ করিতে হয়। শস্যসংশ্লেষ ব্যতীত মানবাদি জীবের জন্ম হয় না। খাদ্যের ভিতর দিয়া, রসরক্তাদির মধ্য দিয়া না আসিলে জন্ম হইবে কি প্রকারে? মাংসাশী জীবও যে সকল জীব ভোজন করে, তাহার মধ্য দিয়া জীবাণু

সকল রসরক্তাদি আকার লাভ করে। মহাপাপের ফলে মধ্যে মধ্যে মহাপাপী বৃক্ষ প্রস্তরাদি যোনিপ্রাপ্ত হয়, তাহার নাম স্থাবর জন্ম।

যোনিমন্যং প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং॥

দেহীরা কর্ম্মগুণে যে কোন শরীরই গ্রহণ করে। কাহারা বা স্থাণু হইয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিনঃ।

* * *

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥ মনুঃ

বৃক্ষাদি ও স্থাবরাদি সকলে বহুবিধ অসৎকর্ম্মগুণে তমোগুণে বেষ্টিত ও আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে, ইহাদিগকে সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয়। "সর্ব্বে ভাবাশ্চেতনাঃ" ভাবপদার্থ মাত্রেই চেতন—ইহা বেদান্তদর্শনের মত।

স্থাবরজন্মে স্থাবরের দেহই জীবের দেহ, স্থাবরের আত্মাই জীবের আত্মা, স্থাবরের মৃত্যুই জীবের মৃত্যু। স্থাবর হইতে জীব উদ্ধার পাইলেই স্থাবর মৃতবৎ হয়। বৃক্ষাদির অভ্যন্তরে যে সুখদুঃখানুভূতি বিদ্যমান, ইহা আমাদের হিন্দু দার্শনিক সকলের একমত। তবে প্রস্তরাদি জন্মেও যে সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে, ভিতরে চৈতন্য আছে—ইহাও উপনিষৎ সংহিতায় স্বীকৃত, বেদান্ত দর্শনে স্পষ্ট প্রতিপাদিত।

"অন্তঃসজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ"

প্রস্তরাদি জন্ম জঘনাতম অবস্থা, বহুকাল বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যজন্ম বহুপুণ্যের ফলে লাভ হয়। মনুষ্যজন্মেই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি। মুক্তি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও দেবত্বলাভ মনুষ্যের আয়ত্ত। মনুষ্য মনে করিলে আপনাকে স্বর্গের ঊর্দ্ধে উঠাইতে পারে, নরকের নিম্নে পাতিত করিতে পারে। পশুজন্ম প্রভৃতিও এক মনুষ্যকৃত পাপের ফলে হইতে পারে।

শারীরজৈঃ পাপদোষৈর্য্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈর্ম্মৃগপক্ষিতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং॥ মনুঃ।

তদ্‌যে ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্, ব্রাহ্মণযোনিং বা * * *
অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসোহ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্, শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা * * *

"রমণীয়চরণাঃ" পুণ্য-কর্ম্মা ব্যক্তি। "কপূয়চরণাঃ" নিন্দিতকর্ম্মা ব্যক্তি।

জীবিতাবস্থায় মানবেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, যে জাতীয় ভোগসুখে ব্যাপৃত রহে, যে প্রকার সংস্কারে বা ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়—লিঙ্গদেহে সেই সকল অনুবর্ত্তন করে। (ভোগদেহে কৃতকর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ স্বর্গনরক বাস ঘটে)। পরলোকে সুখদুঃখ

সংস্কারমূলক। 'সংকল্পমূলা ভোগাঃ' স্থূলদেহের কৃত পাপপুণ্যই ভাবনা বা না বা সংস্কাররূপে জীবের মনে চিত্রিতবৎ রহে। তৎসংস্কারানুযায়ী চিন্তা কার্য্য ও ফল দেখা দেয়; স্থূলদেহে জীব কতকটা স্বাধীন কতকটা বা পরাধীন, জড়যন্ত্রবৎ। প্রারব্ধ কর্ম্মের উপর দেহীর কোন হাত নাই। অফলোন্মুখ পূর্ব্বকৃত সঞ্চিত কর্ম্মের উপর হাত আছে ও নাই, দুইই। আর ক্রিয়মাণ কর্ম্মের উপর স্বাধীনতা অনেকটা থাকে। এজন্মের প্রারব্ধ বা নিয়তি পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়মাণ কর্ম্ম দ্বারাই গঠিত। পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারই এ জন্মে অদৃষ্ট বা দৈবরূপে গণিত। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম—যাহা আমরা এজন্মে করিব—তাহার উপর আমাদের স্বাধীনতা মানিতেই হয়। পূর্ব্বজন্মে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম ছিল, এজন্মেও থাকিবে। লিঙ্গদেহে বা ভোগদেহে জীব জড়যন্ত্রের মত সম্পূর্ণই পরিচালিত। ফণোগ্রাফ্ যন্ত্রে যাদৃশ যাদৃশ স্বর প্রবিষ্ট হয়, বহির্গমন তাদৃশ স্বরেরই হইয়া থাকে। জীবের মনে জীবদ্দশায় যেমন যেমন সংস্কার, যেমন যেমন পাপপুণ্য দৃঢ়বদ্ধ রহিবে, কার্য্যও ফলভোগ সেই মতই হইবে। লিঙ্গদেহের বা ভোগদেহের সুখদুঃখানুভূতি স্বপ্নোপলব্ধিবৎ কেবল মানস। স্বপ্নে একা মনই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সাহায্যে দর্শনাদি ব্যাপার সমাধা করে; পরলোকে (সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমন্বিত মন-প্রাণোপাধিক জীবই এখানে মনঃশব্দ বাচ্য মনও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া দর্শনাদি ফল ভোগাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। লিঙ্গদেহ স্থূলদেহেরই সূক্ষ্ম প্রতিমূর্ত্তি। সূক্ষ্মদেহের ভোগ স্বপ্নের ভোগের মত, স্থূলদেহের ভোগ জাগ্রতের ভোগের মত। অনুভূতি হিসাবে জাগ্রদ্ভোগও স্বপ্নের ভোগের যেমন পার্থক্য নাই, ইহলোক ও পরলোকের সুখদুঃখেরও তদ্রূপ পার্থক্য নাই।

স্থূলদেহের অভ্যাস সূক্ষ্মদেহে প্রবলই থাকে। স্থূলদেহের ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ, লিঙ্গদেহেও অভ্যস্ত সংস্কার বশে সেই ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ সমানই। অন্নজলে সেই ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়। মৃত ব্যক্তির সংস্কার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা সংস্কারমূলক ভোজনপানেই নিবারিত হইবে। সেই সংস্কার দেহী স্বকৃত কর্ম্মগুণে পাইয়া থাকে। যদি না প্রাপ্ত হয়, বাধা থাকে, তবে আমরা যত্ন করিলে সেই ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরীকরণের যদি কোন উপায় করিতে পারি,তাহা করাই কর্ত্তব্য। আমরা ইচ্ছা ও মন্ত্রশক্তির বলে প্রার্থনার মাহাত্ম্যে তাঁহাদের তৃপ্তিজনক সংস্কার জন্মাইতে পারি না কি? সম্মুখে অন্নজল রাখিয়া সেই মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে চলিয়া কি মৃত পিতৃপুরুষের কোন উপকার করিতে পারিনা? শাস্ত্রকারগণ যখন শ্রাদ্ধ তর্পণাদিরূপ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন সেই আদেশানুসারে কার্য্য করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর না হইলে, মৃতব্যক্তির সংস্কারবশতঃ কষ্ট হয়, আবার সে কষ্ট দূর হইলে তৃপ্তিও ঘটে।

স্বর্গনরকভোগ সংস্কারমূলক, তবে তাহা পাপপুণ্যজনিত অদৃষ্টসাধ্য। মানসিক দুঃখভোগই নরকভোগ, মানসিক সুখভোগই স্বর্গভোগ। মানস দুঃখভোগ অপরিচ্ছিন্ন। পরলোকে অসীম যাতনায় জীব যখন নরকভোগ করে, তখন সে

যাতনা সহ্য না করিতে পারিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়ে। স্থূলদেহে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষণকালের জন্য একটী মূর্চ্ছা আইসে, এবং সেই মূর্চ্ছার অন্তরালেই জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ঐ মূর্চ্ছার জন্যই জীব মৃত্যু জানিতে পারে না, কোন লোকই নিজ প্রাণের বহির্গমন লক্ষ্য করিতে পারে না। নরকভোগে অসীম যাতনার ফলে সংস্কারমূলক মূর্চ্ছা আসিয়া অধিকার করে। তৎপরে মূর্চ্ছার অন্তরালে মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গান্তে জাগরণবৎ দেহীর জ্ঞান ফিরিয়া আসে। আবার যাতনা আরব্ধ হয়।

আর স্বর্গভোগও মানসিক, উহাও সংস্কারমূলক মানস।* "মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গঃ" পরলোকে মনঃপ্রীতি ভোগই স্বর্গভোগ। "নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ" (ব্রহ্মপুরাণ) লোকান্তরে মনের কষ্ট ভোগই নরক ভোগ।

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদং॥

স্বর্লোকের বিস্তৃত বিবরণ পদ্মপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, এবং গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে বিবৃত আছে।

পারলোকে সুখ হইবে, এই বিশ্বাসে যাঁহারা পুণ্য করিয়া যান, লোকান্তরে তাহারা সেই ফল ভোগ করেন। পারলৌকিকার্থ পুণ্যের ফল স্বর্গে ভুক্ত হইয়া গেলে ঐহিকার্থাদি অন্য পুণ্যের ফলে দেহী মর্ত্ত্যে উৎকৃষ্ট জন্মলাভ করিয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্ম নিঃশেষে স্বর্গে ভুক্ত হয়; তবে তাহা পারলৌকিকার্থ পুণ্যকর্ম্ম। 'স্বর্গ ভোগ হউক' এ বিশ্বাস না থাকিলেও উপযুক্ত পুণ্যসাধনায় স্বর্গভোগ হইতে পারে। কারণ কেহ যদি জীবিতকালে এমন ভাবের ভোগের আদর্শ কল্পনা করিয়া লইয়া প্রাণত্যাগ করে, আর যদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যায়—তবে সেই আদর্শের অনুযায়ী ফলও ভোগ করিবেই। ভোগের আদর্শ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, স্থূলদেহে মর্ত্ত্যভূমিতে তাহার ভোগ যদি অসম্ভব হয় তবে কাজেই লোকান্তর ব্যতীত কোথায় ভোগ হইবে? অবসাদহীন ভোগ, দুঃখশূন্য সুখপ্রাপ্তি, সঙ্কল্পমাত্র ভোগ্য বস্তুর উপস্থিতি কোথায় মিলিবে? চিরযৌবনা অপ্সরা, নিত্যজ্যোৎস্না, চিরবসন্ত, জরাহীন যৌবন, রোগশূন্য দেহ কোথায় পাওয়া যাইবে? কাজেই মানসিক ভোগ ব্যতীত তাহার সে আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ ত সম্ভব নহে? তৃপ্তি, অতৃপ্তি, আলোক, অন্ধকার, সুখ দুঃখ, যৌবন জরা, এবং শীত গ্রীষ্ম লইয়া মর্ত্ত্যভূমি।

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ফলং তত্রৈব ভুজ্যতে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং রাজন্ ফলভূমিস্বসৌ স্মৃতা।
(অসৌ স্বর্লোকঃ) (পদ্মপুরাণ ভূখণ্ড ৯০ অধ্যায়)

নির্দ্দিষ্ট পুণ্যের ক্ষয় হইলে স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তি স্বর্গ হইতে ছায়ামূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে

* ব্রহ্মপুরাণ।

পতিত হইয়া থাকে। পুণ্যের ক্ষয়ে ভোগদেহের নাশ। বৃষ্টিধারার সহিত কিম্বা বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া উক্ত স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিরা সূক্ষ্ম জীবাণুরূপে শস্যসংশ্লেষঃ প্রাপ্ত হন। সংমূর্চ্ছিতবৎ স্বর্গ হইতে পতিত হন, পর্ব্বত হইতে পতনের মত স্বর্গ হইতে পতনের কালে জ্ঞান থাকে না।

তস্মিন্ যাবৎ সংপাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে—যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমোভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি—ত ইহ ব্রীহি যবা ওষধি বনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু বৈ দুর্নিষ্প্রপতরং যোযো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি (যাবৎ সম্পাতং যাবৎ কর্ম্মানুরূপ) ("তদ্ভুয়ঃ" তদাকার হইয়া থাকে)।

স্বর্গভ্রংশ হইবার পূর্ব্বে দেহীর মনের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। নচেৎ স্বর্গভোগান্তে পৃথিবীতলে পুনরায় আসার মহাকষ্ট এত ভীষণ হইত যে, কেহই আর স্বর্গ চাহিত না। স্বর্গ হইতে পতনের সময়ে স্বর্গ আর ভাল লাগেনা, নিরবচ্ছিন্ন বাহ্য-সুখভোগে অতৃপ্তি আইসে, সে সব আনন্দ তখন একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যশূন্য বলিয়া বোধ হয়, স্বর্গ আর স্বর্গ বলিয়া মনে হয় না! চক্ষুর উপর অপ্সরোগণের পতিপরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহাদের "না সুখ না দুঃখ" পরিচয়স্থাপনা তিক্তাস্বাদ লাগে। স্বর্গের প্রেমহীনা বহুপুরুষোপভুক্তা অপ্সরোগণ অপেক্ষা পৃথিবীর সেই প্রেমময়ী পত্নীর সংসর্গ স্পৃহণীয় বোধ হয়।

নরক ভোগান্তে অল্প পাপের ফলে কেহ প্রস্তরাদি, কেহ বা বৃক্ষাদি, কেহ বা নিকৃষ্ট মনুষ্য-যোনিতে পতিত হয়। কেহ বা একেবারে আর অল্প পাপ না থাকিলে মনুষ্যজন্মই লাভ করে। যে জন্মে পাপের শেষ হইবে, সেই জন্মে নরকে অনুপভুক্ত নয় পাপাবশেষের ফলস্বরূপ কুষ্ঠাদি রোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত পাপাবশেষের ফলস্বরূপে কুষ্ঠাদি রোগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। যে জন্মে উক্ত রোগ ভোগ শেষ হইয়া যায়, বুঝিতে হইবে পূর্ব্বকৃত পাপের শেষ হইল।

কোন কোন মহাপাপী মৃত্যুকালে উৎকট পাপের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই দেহত্যাগ করে। তাহারা যদি সেইক্ষণে কোন গুরুতর দোষ প্রাপ্ত হয়, তবে ভৌতিক যোনি লাভ করে। ভৌতিক যোনি এক প্রকার জন্ম। পাপের আকাঙ্ক্ষা সফল হইলে, সে ভৌতিক যোনি-মুক্তি ঘটে। আবার বহুদিনে সফল হইল না দেখিয়া আপনা হইতেই উক্ত যোনিচ্যুতি ঘটে। অধিক মনঃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক মন্ত্রশক্তি সাহায্যে সাধারণ ব্যক্তিকে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানাদি দ্বারা তাহার ইচ্ছাসত্বে অনিচ্ছাসত্বে ভৌতিক যোনি হইতে অব্যাহতি দিতে পারে। চিকিৎসায় সর্ব্বত্র সুফল ফলে না; তাহা বলিয়া কি লোকে চিকিৎসা করিবে না? লিঙ্গদেহ বা ভোগদেহ, আর ভৌতিক দেহ এক জিনিষ নহে। ভৌতিক যোনি দারুণ কষ্টকর হইয়া থাকে। ভৌতিক যোনিতে যদি কোন পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা জীবদ্দশারই দৃঢ় মনোবাসনার ফল; মৃত্যুকালীন উৎকট আকাঙ্ক্ষার পরিণাম বলিয়া উহা দেহীরই পাপরূপে গণ্য হইবে। উক্ত পাপকার্য্যের ফল অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাইবেই। ভৌতিক যোনির কর্ম্মানুরূপ গতিলাভ।

স্মৃতিশাস্ত্রে মনুষ্যদের পক্ষে আতিবাহিক নামক একটী দেহের কথা উক্ত আছে। এবং উহা দশপিণ্ড দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখও দেখা যায়। ইহা লিঙ্গদেহেরই প্রকার ভেদমাত্র।

তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং।
আতিবাহিক সংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব।
প্রেতপিণ্ডৈ স্তথা দত্তৈ র্দেহমাপ্নোতি ভার্গব॥

যে কয়েক দিন স্থূলদেহের উপর দারুণ ঝোঁক থাকে, (যদিও দাহাদির পর অনেকটা কাটিয়া যায়) দেহী পার্থিব ভাবমালিন্যে আচ্ছন্ন থাকে, তত দিন লিঙ্গদেহোচিত স্বাভাবিক গুণ বা ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়না। উহাই আতিবাহিক দেহ। আকর হইতে মণি যখন উত্তোলিত, তখন তাহার গুণ, শক্তি, কার্য্য কিছুই প্রকাশিত হয় না। পরিষ্কৃত হইলে মণির ঔজ্জ্বল্যাদি গুণ এবং ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়। মণির এই পরিষ্কৃতি—মণির সংস্কার মাত্র। আতিবাহিক দেহের সংস্কার হইলে পর লিঙ্গদেহের বিকাশ হয়।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

"ভাল কেক্ চাই ?"

ভয় নাই! নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর কাগজ "ব্রাহ্মণ-সমাজের" পৃষ্ঠায় উক্ত প্রশ্নবোধক শিরোনাম দেখিয়াই কেহ মনে করিবেন না যে, আমি অতি সাহসবশতঃ আপনাদের মধ্যেই "কেক্" ফিরি করিয়া বেচিবার স্পর্দ্ধা করিতে বসিয়াছি। কিন্তু আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে "কেক্" জিনিসটার অর্থটা বোধ হয় একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। কারণ এখনও আমাদের দেশে এমন অজ্ঞান (!) সেকেলে লোক আছেন, যাঁহারা ঐ জিনিসটার নামের সহিত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বলিতে কি, গত আষাঢ়মাসে যখন সম্পাদক তর্কনিধি ভায়ার নিকট ঐ শিরোনামের প্রবন্ধের কথা বলিয়াছিলাম, তখন তিনি পর্য্যন্ত উহার অর্থ গ্রহণে অশক্ত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন। সুতরাং, সেটা স্পষ্ট করিয়া দেওয়াই ভাল মনে করি। কেক্ কথাটা ইংরাজি। ইহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ "পিষ্টক" বলা যায়। আমাদের দেশে যেমন আসকে, পুলি, পাটিসাপটা, গোকুল বা বকুল প্রভৃতি পিষ্টকের প্রকারভেদ আছে, ইংরাজ-সমাজেও সেইরূপ খৃষ্টমাস কেক্, সুইস্ কেক্, পঞ্চ্কেক ইত্যাদি নানারূপ পিষ্টক প্রচলিত আছে।

ময়দা, সুজি, চিনি, দুধ, ছানা, মাখন এবং ডিম্ব (প্রধানতঃ কুক্কুট ডিম্ব, হংসডিম্ব অনুকরে

ব্যবস্থা) প্রভৃতি ইহার উপাদান। পাকরাজেশ্বর ৺বিপ্রদাসবাবু তাঁহার পাকসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ইহারও কতক কতক প্রস্তুত-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, এই হইল কেকের জন্মকথা। তবে এ কেক্ ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে আনিয়া ফেলিবার স্পর্দ্ধা কেন ?—তাই বলিতেছিলাম যে মাভৈঃ! আমি ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে এ 'কেক' আনিয়া ফেলিতেছি না, কিন্তু কাল নামক যে একটি অদৃশ্য পুরুষ আছেন, তিনিই ফেলিতেছেন। অনেকের ঘরে উহা গিয়াছে, যাঁহাদের ঘরে এখনও যায় নাই, তাঁহাদের ঘরেও যাইতে আর বেশী দেরি নাই, তাই আজ ঐ শিরোনামে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছি, "ভয় নাই" বলিয়াছি; এখন আবার বলিতেছি যে ভয় নাই কেন? ভয় খুবই আছে? একবার যদি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সকলে চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তবে দেখিবেন ভয় আছে কিনা। বহুদিন হইতে আমি পশ্চিমপ্রবাসী। বৎসরে একবার দেশে যাই, কোন কোন বার তাহাও ঘটিয়া উঠে না। দেশে গেলেও কলিকাতাতে বড় বেশী দিন থাকা হয় না। বিগত ফাল্গুন মাসে প্লেগের প্রাদুর্ভাববশতঃ এখান হইতে কলিকাতাতে চলিয়া গিয়াছিলাম, এবং তথায় প্রায় দেড়মাসকাল ছিলাম। একদিন কলিকাতার উত্তরাংশে একটী গলির মধ্য দিয়া আসিতেছি, ইতিমধ্যে পশ্চাতের দিক হইতে শব্দ হইল "চাই ভাল কেক্ চাই।" শুনিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই দিকে তাকাইয়া দেখিলাম একজন ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক শ্যামবর্ণ শ্মশ্রুহীন গুম্ফ শোভিতমুখ যুবক হাতে একটি বাঁশের চাঙ্গারী লইয়া আসিতেছে, চাঙ্গারিটির উপর একখানি সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা। আমি উহার চেহারা দেখিয়া ভাবিলাম যে লোকটা হিন্দু। কারণ, যে সব গৃহ হইতে "ঠাকুর চৈতনচুট্কি নিয়া" বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সব স্থলে "দাড়ী নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা" আহূত হইয়াছে—ইহাই ঠাকুর কবির পুস্তকের কৃপায় জানা ছিল; দাড়ীহীন কলিমদ্দি মিঞা বঙ্গদেশে বড় সুলভ নহে। এজন্য আমি লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কিহে বাপু, কি ফিরি করে বেড়াচ্ছ?" লোকটি বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত করিয়া চাঙ্গারির অভ্যন্তরস্থ পদার্থ দেখাইয়া বলিল "এজ্ঞে, কেক্, বেশ ভাল কেক্। দেখিলাম হস্তনের টেক্কার আকারের মত কতকগুলি কেক্ তাহাতে রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম যেমন চাটুয্যা, বাঁড়ুয্যা আখ্যাধারী ব্যক্তিগণ রুটি বিস্কুট আদি "বিশুদ্ধ হিন্দুমতে" ধোপদস্ত পৈতার বলে প্রস্তুত করিয়া হিন্দুগণের পাঁওরুটী বিস্কুট ভক্ষণের সাধ মিটাইয়া থাকে, এখন কালের উন্নতিসহকারে বুঝি তাহারাই একধাপ উপরে উঠিয়া কেক্ও বিশুদ্ধ হিন্দুমতে প্রস্তুত করিয়া ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছে। আমরা যে সময় কলিকাতাতে পঠদ্দশাতে অবস্থান করিতাম সে সময়ে (২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে) ব্রাহ্মণ রুটিওয়ালারা সাধারণতঃ রুটি বিস্কুটই ফিরি করিয়া বেচিত। কেক্ জিনিসটা মুরগীহাটা ফৌজদারী বালাখানার মোড়ে মুসলমানদের দোকানেই পাওয়া যাইত, সহরের সর্ব্বত্র ফিরি করিতে দেখি নাই, তাই ঐরূপ আমার মনে হইয়াছিল। আমাকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া লোকটা জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, নেবেন কি? জিনিষ

বেশ ভাল, একটু খেয়ে দেখুন না ? লোকটার গলার সঙ্গে একখানা চাদর জড়ান ছিল, তাহার দোদুল্যমান অংশ তাহার বক্ষের অনেকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকাতে তথায় উপ-বীতের সদ্ভাব কি অসদ্ভাব, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছিল না, তাই কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি বামুন না শূদ্র ?" লোকটি যেন একটু বিস্মিত হইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল "আজ্ঞে, আমি হিন্দু নয়, মোছলমান, আমার বাপ দাদা সবাই এই কারবার করে, আমাদের জিনিস খারাপ হবার যো নাই!" আমার তখন বিস্ময়ের মাত্রা অতিরিক্তরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তখন মনে হইল পশ্চিমদেশে দাড়ীহীন মুসলমান অনেক দেখেছি, মুর্গীহাটাতেও দেখা গিয়াছে বটে। সুতরাং দাড়ী না নাড়িতে পারিলেও কালমন্দী মিঞা হইতে বাঙ্গালী মুসলমানেরও এখন কোন বাধা নাই। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম "মুসলমান ? তবে দাড়ী কামান কেন ?" লোকটি হেঁসে বলিল "বাবু বুঝি কল্‌কাতাতে থাকেন না ? তাই!—দাড়ী রাখতেই, হবে তার ত কোন কথা নাই! যার যেমন ইচ্ছে!" আমি বলিলাম হাঁ বাপু, তা বটে! তা বাপু তোমার এই কেক্ কি হিন্দুর ঘরেও বিক্রী হয় ? লোকটি দন্ত-রুচিকৌমুদী বিকাশ করিয়া বলিল -"বিক্রী হয় না ? -খুব হয়, না হলে মিছে বেড়াব কেন ?" এই বলিয়া জোরে হাঁকিল "কেক্, ভাল কেক্ চাই"।

অমনি সম্মুখস্থ বামপার্শ্বের দ্বিতলগৃহের একটী জানালার সম্মুখে একখানি রমণী-মুখকমল বিকশিত হইল, আমাকে দেখিয়া রমণী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া কোমল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "ওগো কেক্‌ওয়ালা, কেক্ ভাল তো ? বাসি নয়তো ?" কেক্‌ওয়ালা বলিল আজ্ঞে মা, ভাল না হ'লে আপনাদেরে দিতে পারি ? রোজতো নিচ্ছেন মা ? কখানা দেবো ? উপর হ'তে মা বলিলেন '৪খানা দে যাও তবে। নীচে ঝি আছে। তুমি দাও, পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি চল।" মা চলিয়া গেলেন। আমি অবাক্ হইয়া তখনও সেই দিকেই তাকাইয়া আছি। "সেলাম বাবু" বলিয়া কেকওয়ালা অভিবাদন করিতেই তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মুরগীর ডিম ওতে আছেনা ?" সে বলিল "আজ্ঞে হাঁ বাবু, তা না হ'লে খেতে তেমন ভাল হয় না যে! সকলে পছন্দ করেন না!" "বটে" বলিয়া আমি নীরব হইলাম। একটি দীর্ঘনিশ্বাস আমার অজ্ঞাতেই বক্ষঃ স্পন্দিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। "কেক-ওয়ালা" তাহা দেখিয়া বলিল "বাবু বুঝি মফস্বলের লোক হবেন। এখানে আমাদের কেক অনেক ঘরেই এখন চলে গেছে। ছেলে মেয়েদের জলখাবার, বাবুদের চা'র সঙ্গে এখন কেক খুব চল্‌তি হয়েছে। এতে আর দুঃখ করেন কেন ?"

আমি বলিলাম "বাপু, তুমিতো মুসলমান, যদি কোন মোছলমানকে শূওরের চর্ব্বি দেওয়া জিনিস খেতে দেখ"—আমার কথা সম্পূর্ণ হইতে না দিয়াই কেকওয়ালা বলিল, "তোবা, তোবা! মোছলমান জান্‌বুঝ্ হয়ে কখন তা খাবে না বাবু, তা খাবে না—জান্:কবুল, তবু না। যে সব মোছলমান বিলেত গেছে তারাও তা খায়নি বাবু! মোছলমান হারামখোর নয়! সে আপনারাই বাবু, মাপ করবেন!"

"কইগো কেক্‌ওলা, কচ্ছো কি? ছেলেরা খাবে কখন?" বলিয়া উপরের মা লক্ষ্মী নীচে হইতে ঝঙ্কার দিলেন এবং রাস্তার দরজার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "এই যাচ্ছি মা" বলিয়া কেকওয়ালা দরজার নিকট উপস্থিত হইল, আমিও তথা হইতে ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপরে উপস্থিত হইলাম। একটু পরে আমার মনে হইল যে উক্ত বাটীর কর্ত্তাটি হিন্দু নাও হইতে পারেন, কুসংস্কার বর্জ্জিত ব্রাহ্ম, খৃষ্টানওতো হইতে পারেন? সেটা নিশ্চিতরূপে বুঝিবার জন্য পুনরায় ঐ গলিতে ফিরিয়া গেলাম, এবং পার্শ্বের লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে আমার সে ধারণাও ভুল। বাটীর কর্ত্তা নামতঃ হিন্দুই বটেন, ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান কিছুই নহেন, সেদিনও তিনি বিশুদ্ধ হিন্দু-মতে পুত্রের বিবাহ দিয়া ৪।৫ হাজার টাকা সিন্দুকজাত করিয়াছেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ!!

তখন উক্ত কেকওয়ালার শেষের কথাগুলির প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ের মধ্যে হইতে লাগিল "মোছলমান্ হারামখোর নয়! সে আপনারা বাবু!" ঠিক—কেকওয়ালা ঠিক বলিয়াছে, আমরাই হারামখোর বটে!

যখন নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াও আমরা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ফিরিওয়ালার প্রস্তুত রুটি বিস্কুট এবং কুক্কুটডিম্ব সহযোগে প্রস্তুত কেক্ ক্রয় করিয়া ছেলেপিলেদিগকে খাইতে দিতেছি, এবং নিজেরাও আহার করিতেছি, আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ পর্য্যন্ত এসব স্পর্শ করিতে এবং নিজ নিজ গৃহে স্থান দিতেও স্বামীপুত্রপরিজনকে পরিবেশন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না, তখন আমাদের সমাজের অবস্থা কি ভীষণ অধঃপাতের পথেই না অগ্রসর হইয়াছে! স্বধর্ম্ম এবং আচারের উপর আমাদের আস্থা কতই না শিথিল হইয়াছে। মুসলমানকে আমরা যতই না কেন যবন বলিয়া উপেক্ষা করি, তাহার স্বধর্ম্মে আস্থা আমাদের তথাকথিত হিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশী। মুসলমান স্বীয়ধর্ম্মানুমোদিত আচার যত বেশী মানিয়া চলে, হিন্দু তাহার শতাংশের একাংশও পালন করে কিনা সন্দেহ। অনেক মুসলমানের বিষয় অবগত আছি, যাঁহারা খৃষ্টিয়ান্ পাশ্চাত্য প্রদেশে বহুকাল অবস্থান করিয়াও তাঁহাদের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ শূকরমাংস কদাপি গ্রহণ করেন নাই,—সভাসমিতিতে স্বাস্থ্যপানের সময় মদ্যের পরিবর্ত্তে নির্ম্মল জলমাত্রই ব্যবহার করিয়াছেন,—তাঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত লোক নহেন, সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য বিদ্যানিপুণ সুধী। এই পশ্চিমপ্রদেশে অনেক শিক্ষিত মুসলমান দেখিতেছি, যাঁহারা সমরঋণের কাগজ ক্রয় করিবার কালে সুদ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মে সুদগ্রহণ পাপ বলিয়া গণ্য। আর আমরা?—আমাদের মধ্যে কতজন এইরূপ আচারনিষ্ঠ স্বধর্ম্মে আন্তরিক আস্থাবান্ লোক আছেন, তাহার একটা খোঁজ করিয়া দেখুন দেখি?

সমাজের বুকে বসিয়া সমাজের এক অঙ্গ বলিয়া গর্ব্ব করিব অথচ সেই সমাজের শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যথেচ্ছাচারিতার অভিনয় প্রকাশ্যভাবেই করিতে থাকিব, এ সাহস কেবল এই প্রাণহীন স্থবির হিন্দুবাঙ্গালীসমাজেই শোভা পায়। এই উত্তর

পশ্চিমপ্রদেশের হিন্দুগণ এসব বিষয়ে বাঙ্গালীহিন্দু অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

তাই বলিতেছিলাম "ভয়ের কারণ নাই কি?" মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত খাদ্য যদি অবাধে হিন্দুর অন্দরমহলে পর্য্যন্ত স্থান পাইতে পারে, তবে আর মিথ্যা "বর্ণাশ্রম বর্ণাশ্রম" করিয়া চীৎকার করিয়া কি হইবে? ব্রাহ্মণ-সমাজ, যদি এ স্রোতে বাধা দিবার সামর্থ্য আপনাদের না থাকে, সে সাহস ও সামর্থ্য যদি না থাকে, যদি জানিয়া শুনিয়াও আবার সেই সব লোককে হিন্দুসমাজভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ না হয়, তবে কি হইবে এই সব মিথ্যা অভিনয়ে? আপনারা একত্র হইয়া যুগোপযোগী শাস্ত্রবিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া দিন, এসবকে বর্জ্জিত ধারা হইতে খারিজ করিয়া আচরণীয়ের অন্তর্গত করিয়া দিন।

অথবা যদি মনে করেন যে ঐরূপ করিলে আপনাদের ধর্ম্মের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহা হইলে কোমর বাঁধিয়া ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করুন, "শরীরং বা পাতয়েৎ মন্ত্রং বা সাধয়েৎ" এই সত্য অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে কর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হউন। আমরা জানি না বলিয়া মনকে চোখঠারিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। "সত্যং ন তৎ যচ্ছলমভ্যুপৈতি।" জড়তান্ধ হইয়া থাকা কাপুরুষতারই নামান্তর মাত্র। কলিকাতার গলিতে গলিতে পাহারা নিযুক্ত করেন, দেখিতে পাইবেন কত বাড়ীতে কেক্ চায়, কত বাড়ীতে চাচার দোকানের রুটি চায়, কত বাড়ীতে গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলের রুটীর গাড়ী যায়। সমস্ত অনাচারীদিগের নাম ধামাদির তালিকা সংগ্রহ করিয়া নিষ্ঠাবান্‌গণ সকলে একমত হইয়া তাহাদিগের সামাজিক দণ্ডবিধান করুন। তাহাতে হিন্দুর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে; যাউক, যাহারা নামে হিন্দু, কাজে ম্লেচ্ছ, তাহারা খসিয়া পড়ুক, যাঁহারা তার পর থাকিবেন—অন্ততঃ তাঁহাদিগকে লোকে অন্তরে বাহিরে হিন্দু বলিয়া জানিবে ও শ্রদ্ধা করিবে। ইহাতে অনেককে সোণার ঘড়ার বিদায় হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, অনেক আত্মীয়ের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করিতে হইবে, অনেক বন্ধুর ভ্রুকুটিকুটিলমুখ দর্শন করিতে হইবে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু ধর্ম্মার্থে প্রাণপর্য্যন্ত উৎসৃষ্ট করা যায়, তা এ সব তো তুচ্ছ কথা! ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মস্তক, সুতরাং তিনিই অন্যান্য অঙ্গের চালক। কারণ বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির স্থান মস্তক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্যান্য অঙ্গ যদি বিপথে যায়, তবে সে মস্তকেরই দোষ। কারণ সুপথ বিপথদ্রষ্টা চক্ষুর (বাহ্য ও অন্তর) অবস্থানও মস্তকেই, বাহু, বক্ষ ও পাদ নহে।

আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তর্কবাগীশ বা ন্যায়চুঞ্চু আছেন, আপনার পুত্রটি কেক্ বিস্কুট রুটির আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, এ দৃষ্টান্ত কি এতই দুষ্প্রাপ্য? আজ দুষ্প্রাপ্য হইলেও কাল সুপ্রাপ্য হইতে বাধা হইবে না। আজ প্রতিঘরে 'কেক্' চলিতেছে, দুদিন পরে কলিমদ্দী চাচার পক্ক কুক্কুটমাংসও যে চলিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? আরও দশবিশ বৎসর পরে হয়ত কলিকাতার গলিতে ফিরিওয়ালার গলায় তাহাও ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

বড় দুঃখেই একথা বলিতে হয়, সেজন্য আমার উপর রাগ করিবেন না, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমি নিজে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবংশের সন্তান, বাল্যে নিষ্ঠাবান্ পিতৃগৃহে পালিত, কৈশোরে নবদ্বীপের নিষ্ঠাবান্ সমাজের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তারপর যৌবনের প্রথম ভাগ কলিকাতাতে পঠদ্দশায় কাটাইয়াছি, সে সময় মেসে থাকার অবস্থাতে কলিকাতার ঝি ও ব্রাহ্মণদিগের অধীন হইয়া আচার নিষ্ঠা হইতে কতক কতক স্খলিত হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু কোন কোন বন্ধুর পুনঃপুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ প্রলোভনে পড়িয়াও কোন হোটেলে গিয়া চপ্ কাটলেট কালিয়া কোপ্তা খাইতে পারি নাই। তারপর নানাদেশে ঘুরিয়াছি, নানা অবস্থাতে পড়িয়াছি, নানারূপ অনাচার কদাচারদুষ্টও যে না হইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু মুসলমান কি খৃষ্টানপ্রদত্ত চা রুটি বিস্কুট বা কেক গলাধঃকরণ করিতে কিছুতেই পারি নাই—দেহস্থ নিষ্ঠাবান্ পিতৃপুরুষের রক্ত যেন কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, কিছুতেই সেদিকে প্রবৃত্তি যায় না। সেজন্য অনেকস্থলে অনেক টিট্‌কারী সহ্য করিয়াছি, অনেক উপহাস পরিপাক করিয়াছি; কিন্তু কোন কোন বিধর্ম্মীর নিকট সেজন্য শ্রদ্ধাই প্রাপ্ত হইয়াছি। হাজারিবাগে মিসনারী কলেজে কার্য্য করিবার সময় সাহেব প্রিন্সিপাল একদিন প্রাতঃকালে আমাকে চা খাইতে অনুরোধ করিলে, আমি বলিলাম যে সাহেব আমি চা ব্যবহারই করি না। তবে ব্যবহার করিলেও আপনার এখানে তাহা আমি পান করিতে পারিতাম না, কারণ উহা আমার ধর্ম্মের আচারবিরুদ্ধ। সাহেব তাহাতে আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "দেখুন যাহারা স্বধর্ম্মে আস্থাবান্, তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টান করিতে পারিলে আমাদের বড় বিমল আনন্দ হয়, কারণ আমরা বুঝি যে, যে আস্থাবান্ হিন্দু আছে, সে যদি খৃষ্টান হয়, তবে সে বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টানই হইবে, কারণ সে ধর্ম্মবিশ্বাসেই তাহা হইবে, মেম্ বিবাহ করা, কি ভাল চাকরী পাওয়ার লোভে নহে।"

আমার ব্যক্তিগত কথা উপরে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদিও আমি প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি না, যদিও নানারূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনাচার দোষে আমিও দুষ্ট, কিন্তু ঐরূপ সব অনাচারে কদাচারেতো এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি গেল না; কিন্তু এখন প্রকাশ্য-ভাবেই যখন এসব চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এই সব ঘরের সন্তানগণ যে আরও উচ্ছৃঙ্খল হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরেই যে ক্রমে ক্রমে এই সব কেক স্থান পাইবে না, তাহারই বা বিশ্বাস কি? সুতরাং এখন হইতেই কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত নহে? তারপর যাঁহারা এই সব ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া কেন এই সব অখাদ্যগুলিকে নিজগৃহে পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া পবিত্র হিন্দুগৃহ অপবিত্র করিতেছেন?

যদি কেকের আস্বাদন আমাদের রসগোল্লা, পান্তুয়া, জিলিপি, খাজা, গজা প্রভৃতি অপেক্ষাও মধুর বলিয়া মনে হয়, তবে বরং উহার উপাদানতত্ত্ব পুস্তকাদি হইতে অবগত হইয়া

নিজের ঘরেই উহা প্রস্তুত করিয়া লউন, কুক্কুটাণ্ডের অনুকল্পে হংসডিম্বেই কার্য্য সম্পাদন করুন, সেও কতক ভাল।

আর এতই জাতীয়ত্ব বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছি আমরা, এতই অধঃপতিত হইয়াছি আমরা যে, দেশের টাটকা খই মুড়ি ফেলিয়া বিস্কুটের আদর করিব, এত সব মিঠাই পক্কান্ন পিষ্টক থাকিতে, কেকের প্রেমে গৃহলক্ষ্মীগণ পর্য্যন্ত মাতিয়া যাইবেন ?

যাঁহাদের ঐরূপই প্রবৃত্তি, হিন্দুর বিধিনিষেধের অধীন থাকিতে যাঁহারা ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদের জন্য মুসলমান, বা খৃষ্টিয়ানসমাজ না হউক, ব্রাহ্ম-সমাজ তো পড়িয়া আছে, তাহাতেই প্রকাশ্যভাবে যোগ দিয়া যথেচ্ছাচার করিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। বাহিরে দুর্গোৎসবে মা' মা বলিয়া লোক দেখান চীৎকার করিয়া ভিতরে নিষিদ্ধভোজন পানাদি দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের সপিণ্ডীকরণ এবং নিজমুখে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়া লাভটা কি ?

তার পর কলিকাতার রাস্তা ঘাটে আজকাল যে সমুদয় বিলাতী অনুকরণে পানালয়ও ভোজনাগার হইয়াছে, তাহারাও আমাদের অধঃপাতিত প্রবৃত্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই সমুদয় স্থানে যে সমস্ত চপ্‌ কাটলেট্‌ কারি প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়, ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বাস্থ্য ও প্রবৃত্তির দিক দিয়া বিচার করিলেও সে গুলি বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত। একথা পাশ্চাত্যজ্ঞানদীক্ষিত চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। এই সব বিশেষজ্ঞগণ ঐসব খাদ্য দ্রব্যের উপাদানাদির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, এবং তাহা সত্ত্বেও আমাদের যুবকগণ যে কেমন করিয়া সে সব খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা ভাবিতে গেলে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

সংযমধন হিন্দু সন্তান হইয়া আমরা কুপ্রবৃত্তির প্রলোভনে জিহ্বা লৌল্যবশতঃ এতই অধঃপাতে গিয়াছি যে, জানিয়া শুনিয়া এইসব বিষবৎ খাদ্যও উপাদেয় বোধে সাদরে গলাধঃকরণ করিতেছি! আমাদের এ মোহ কি দূর হইবে না ? হিন্দুসমাজ কি নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় জড়ভাবে নিজসন্তানগণের ধ্বংসের দ্রষ্টাসাক্ষী মাত্র হইয়া বসিয়া থাকিবে ?

প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইতে চলিল, অথচ প্রাণের বেদনা যেন কিছুতেই ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আজ বাধ্য হইয়া এই খানেই নিবৃত্ত হইলাম, কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মণ-সমাজ, ভয় নাই কি ? ওই শুনুন, আপনাদের গলির কাছ দিয়াই কলিমদ্দী মিঞা আপনাদেরই ঘরের সম্মুখ দিয়া ডাকিয়া যাইতেছে—"ভাল কেক্‌ চাই ? মা ভাল কেক্‌ চাই ?"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

সংবাদ।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

গতবর্ষ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত হইয়া যায়। এই বৎসর সেইজন্য উদ্যোগ আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই করা হইতেছে। শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের করুণার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আগামী ২৪শে ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ও রবিবার ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের দিনস্থির করা হইয়াছে। স্থান—"মৈমনসিংহসহর, সভাপতি—দ্বারভঙ্গেশ্বর বাহাদুর।" গতবৎসর বাধা প্রাপ্ত হইয়া মৈমনসিংহবাসী হিন্দুসাধারণের উৎসাহ এবার দ্বিগুণিত হইয়াছে। ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় ও লোকের উৎসাহের সমবায়ে কর্তৃপক্ষীয়গণ এবার সম্পূর্ণ আশান্বিত। বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধিবর্গ—রাজা মহারাজ ভূস্বামিগণ ও প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অধ্যাপকগণ সভাস্থল অলঙ্কৃত করিবেন। আমরা হিন্দুসাধারণকে এই জাতীয় মহোৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি। বলবাহুল্য যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের বাসস্থান ও আহারাদির সুবন্দোবস্ত এইবারও করা হইবে।

বিবাহ।

গত ২৮শে বৈশাখ রবিবারে রামপুর হাটের উকীল শ্রীযুক্ত শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ ভোলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ হইল লাভপুরের স্বনামধন্য মহাপুরুষ স্বর্গীয় যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রীর সহিত। বরযাত্রীদিগের অভ্যর্থনার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা অতীব সন্তোষজনক। দুইশত বরযাত্রী কোন বিষয়ে কন্যাপক্ষের কোনও ত্রুটি দেখিতে পান নাই।

এ বিবাহের বিশিষ্টতা এই যে, ইহাতে দেনা পাওনার কোন কথা ছিল না। তথাপি কন্যাপক্ষ পাত্রকে যে যৌতুক দিয়াছেন, তাহা যাদববাবুর পুত্রদ্বয়ের উপযুক্তই হইয়াছে। লাখ কথা ভিন্ন বিবাহ হয় না, কিন্তু এবিবাহে সেরূপ কোন কথাই হয় নাই।

আমরা প্রার্থনা করি নবদম্পতী অক্ষয় পরমায়ুঃ পাইয়া ধর্ম্মপথে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

REGISTERED No C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—নবম সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড।০ আনা।

সন ১৩২৬ সাল।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—678

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪১ শক, ১৩২৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ। } নবম সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ।

শুভক্ষণে লভিয়ে জনম পৃথিবীর পুণ্যভূমে,
হে মহান্, নিষ্কাম পুরুষ! আবরিয়া হুতধূমে
দশদিক্ নভোরসাতল, জীবের কল্যাণ তরে,
স্বার্থত্যাগ আত্মবলি ভবে শুধু শিখাইতে নরে,
করেছিলে বেদধ্বনি করি তুমি, আহুতি প্রদান।
তব জ্যোতিঃ কঠোর সাধনা স্বার্থত্যাগ সুমহান্
সমাজের শিরোপরি তোমা বসাইয়া পূজেছিল,
কি এক পুণ্যের জ্যোতিঃ এই অমরত্ব প্রদানিল।
জ্ঞানের অতল সিন্ধুমথি তুলিয়া রতন রাশি,
পৃথিবীর অজ্ঞান আঁধার দিয়েছিলে তুমি নাশি'।
ভারতের গৌরব যাহা বেদাদি রতন চয়
নিজধন সকলি তোমার; হে অনন্ত জ্ঞানময়!
তব জ্বালাময় তীব্রদৃষ্টি ওঙ্কারে জ্যোতিরাশি
সহিতে নাপারি হিংস্রকুল লুটে'ছিল পদে আসি।
অলৌকিক তপের প্রভাবে সপ্তসাগরের জল,

শুষিয়ে দেখায়েছিলে সুধু দীপ্ত ব্রাহ্মণ্যের বল।
ধরণীর পালনের ভার লভে নিজ বাহুবলে,—
স্বার্থত্যাগ শিখাইতে নরে ছেড়েছিলে কুতুহলে,
হোমধূম স্নিগ্ধ আশ্রমের নির্ম্মল অনিল চয়
কেড়ে নিত দহ্যমানবের ক্ষুধা তৃষ্ণা তাপ ভয়।
বচনের অনুগামী হয়ে কার্য্য যাঁর ছুটেছিল ;—
বচনের অমোঘত্ব যাঁরে পূজ্যতম করেছিল ; –
পবিত্র চরণ চিহ্নধরি হৃদয়েতে ভগবান্,—
শ্রেষ্ঠত্ব যাঁহার প্রকটিয়া দিয়েছিল শ্রেষ্ঠস্থান ;—
তুমি সেই ভারতের আদি জ্ঞানগুরু বলি খ্যাত ;—
তোমার আলোক দশদিশি সগৌরবে প্রতিভাত॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ।

চার্ব্বাক দর্শনে ধর্ম্মোপদেশ।

(৪)

চার্ব্বাকদের স্বর্গ নরক মোক্ষ ও ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ গুলিও বিচিত্র।

তাহাদের মতে "অঙ্গনালিঙ্গন জন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ, কণ্টকাদি জন্যং দুঃখমেব নরকং লোক সিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ। দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ।

অসুর মোহনার্থ যে শাস্ত্র রচিত, তাহার মুখ্যার্থ একটু নিগূঢ়ই থাকিবে। নাস্তিকগণ তামসবুদ্ধিতে তাহা ধরিতে না পারিয়া, যথা শ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া বুঝিতেছেন, এই দৃশ্যমান নরপতিই পরমেশ্বর, আর কোনও পৃথক্ ঈশ্বর নাই। স্থূলদেহের পতনই মুক্তি, স্বর্গ এবং নরকও পৃথক্ নহে। পূর্ব্বোক্ত সুখ দুঃখই স্বর্গ নরক পদ বাচ্য। নাস্তিকগণ যাহাই বুঝুন, বাস্তবিক নিপুণভাবে চার্ব্বাকের এই সকল উপদেশের আলোচনা করিলে, ইহার ভিতর সনাতনধর্ম্মের কোনও বিরুদ্ধ কথা আছে বলিয়া মনে হয় না। একে একে উপদেশগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

"অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ"

পুরুষের যাহা অর্থনীয় বা প্রার্থনীয় তাহাই পুরুষার্থ, অঙ্গনা শব্দের সাধারণ অর্থ রমণী, তাহার আলিঙ্গন সকলের পক্ষে অর্থনীয় নহে। যদিও রাগযুক্ত পুরুষ, ভোগযোগ্যা সুন্দরী যুবতী দেখিলে, মনে মনে ভাবেন ;—

খেলৎ খঞ্জননয়না, পরিণত-বিম্বাধরা, পৃথুশ্রোণী।
কমলমুকুল স্তনীয়ং, পূর্ণেন্দুমুখী, সুখায় মে ভবিতা॥

কিন্তু জ্ঞানী বিবেকী ইহাকে দেখিয়াই মনে মনে এইরূপ ঘৃণা করেন যে,—

চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রীয়ং মাংসাসৃক্ পূঁযপূরিতা।
অস্যাং রজ্যতি যো মূঢ়ঃ, পিশাচঃ ক স্ততোঽধিকঃ॥

এই স্ত্রী মূর্ত্তি, চর্ম্ম নির্ম্মিত একটী পাত্রীবিশেষ, উহা আবার মাংস রুধিরও পূঁযের দ্বারা পূরিত, এই জুগুপ্সিতপাত্রে যে মূঢ় আসক্ত, তাহা হইতে অধিক পিশাচ আর কে হইতে পারে? তবেই দেখুন জ্ঞানী, চার্ব্বাক কিছুতেই যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গনা শব্দের প্রয়োগ করেন নাই।

পুরুষের স্বামিত্ব ও বুদ্ধির ভোগ্যত্ব আরোপিত সেই মূলেই এইসূত্রে অঙ্গনা শব্দে বুদ্ধি বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করিলে যে সুখ হয়, তাহাই পুরুষার্থ। এই কথা-টীরও দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করা, আর জ্ঞানযোগের অভ্যাস করা একই কথা। জ্ঞানই পুরুষের অর্থনীয় সুতরাং ইহাই পুরুষার্থ।

অথবা যাঁহারা, বুদ্ধিকে আত্মা মনে করিয়া, তাহার উপাসনায় আসক্ত হন, এবং সাধনার পরিপাকে বুদ্ধিতেই লীন হইয়া যান, তাহারাও পরম সুখী, দীর্ঘকাল তাঁহারা জন্ম মরণাদি দুঃখ অনুভব করেন না, সুতরাং অঙ্গনালিঙ্গন শব্দে সেই সুখেরও ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

দশ মন্বন্তরানীহতিষ্ঠন্তীন্দ্রিয় চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ।
বৌদ্ধা দশ সহস্রন্ত তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ॥

বুদ্ধির উপাসকগণ, দশ সহস্র মন্বন্তর কাল, দুঃখ রহিত ভাবে অবস্থান করেন। চার্ব্বাক তজ্জন্যই অঙ্গনা বা বুদ্ধিকে আলিঙ্গন করিলে যে দীর্ঘকাল ব্যাপক নির্ম্মল আনন্দ হয় তাহাকেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন। যুবতির আলিঙ্গন জন্য পরিণাম বিরস কর ক্ষণিক সুখাভ্যাস কখনই পুরুষার্থ নহে। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞগণ প্রার্থনা করেন।

পুরাণান্তে শ্মশানান্তে সুরতান্তে চ যা মতিঃ।
সামতির্দীয়তাং নাথ! মম জন্মনি জন্মনি॥

"কণ্টকাদি জন্যং দুঃখমেব নরকম্"

পুরুষার্থের ব্যাখ্যা এইরূপ হইলে, চার্ব্বাকের মতে কণ্টকাদি জন্য ক্ষণস্থায়ী সামান্য দুঃখ কখনই নরক নহে। আমার বোধ হয় এস্থলে কণ্টক শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, শত্রু, (ইহা সংস্কৃত অভিধান সম্মত)।

পুরুষের সেই শত্রু কে? না, কাম, ক্রোধ ও লোভ; সুতরাং তজ্জনিত যে দুঃখ তাহাই

নরক। তাহা হইলেই ইহলোকে বা লোকান্তরে যতপ্রকার নরক দুঃখ আছে তৎ সমস্তের উপরই এই নরক লক্ষণ নিবিষ্ট হইল। যেহেতু দুঃখ মাত্রই কাম ক্রোধ ও লোভমূলক। এই নিমিত্ত ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলেন,—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশন মাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভ স্তস্মাদেত ত্রয়ং ত্যজেৎ।

কাম ক্রোধ লোভ এই তিন প্রকার নরকের দ্বার, ইহাই আত্মার অধোগতির কারণ, অতএব এই তিনটী ত্যাগ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—"নরকস্তম উন্নাহঃ" তমোগুণের উদ্রেকই নরকের কারণ, চার্ব্বাক সূত্রও কণ্টকাদি জন্য দুঃখকে নরক বলিয়া এই সকল সিদ্ধান্তে সম্মতি জানাইয়াছেন

"দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ"

এইস্থলে নাস্তিকেরা বুঝেন স্থূল শরীরের নাশেই মোক্ষ হয়, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। কিন্তু ইহার ভিতরের সূক্ষ্মকথাটার অনুসন্ধানেই তাহাদের এই ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। মুচ ধাতুর অর্থ বন্ধনবিশ্লেষ। মৃত্যুর পর যদি কিছু থাকে না, তবে দেহের উচ্ছেদে মোক্ষ হইবে কাহার? তখন মুচ ধাতুর কর্ম্ম কে হইবে? দেহপাতের পর আর কিছু না থাকিলে মোক্ষ শব্দের প্রয়োগই অযুক্ত; সুতরাং নাস্তিকগণও "কিছু থাকে" একথা স্বীকার করিতে বাধ্য।

দেহের উচ্ছেদে মোক্ষ হয়, এ কথা (নাস্তিক মতেও) মিথ্যা নহে, দেহ দুইপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম শরীরের বিলয়েই কৈবল্য মুক্তি হয়, ইহা আস্তিক দর্শন সমূহেরও মত। পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন,—"চিত্ত বিমুক্তির্মুক্তিঃ" তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সূক্ষ্মশরীরধারককর্ম্মবাসনা বিনষ্ট হইলে লিঙ্গ শরীর ভাঙ্গিয়া প্রকৃতিতে মিশিয়া যাইবে, তখন আত্মা, "সাক্ষী, বেত্তা কেবলো, নির্গুণশ্চ" হইয়া আভিমানিক বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন। শ্রুতি বলেন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি চ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাবর পরমাত্মার দর্শন পাইলে, হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব দেহের (স্থূল সূক্ষ্ম দেহের) উচ্ছেদে মোক্ষ হয়, বা আত্মার কৈবল্য হয় এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ব সম্মত।

"লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ"

এই উক্তি দ্বারা নাস্তিকগণ, বুঝিয়াছেন, এই যে পৃথিবীর নৃপতি তিনিই পরমেশ্বর, অন্য পরমেশ্বর নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভুল। "কেননা "নৃপতিঃ পরমেশ্বরঃ" এইরূপ না বলিয়া সূত্রে রাজার কথা বলেন কেন? তাহার উপর আবার "লোক সিদ্ধ" বিশেষণটাই বা কেন? অতএব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এই রাজা শব্দ বিরাট পুরুষের বাচক মনে হয়। বিরাট্ পুরুষই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই লোক সিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ।

অথবা লোক, চতুর্দ্দশভুবন, সিদ্ধ—নিষ্পন্ন, যাহা হইতে এইরূপ সমাস করিলেও লোকসিদ্ধ শব্দে হিরণ্যগর্ভকে বুঝায়। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ইহা শাস্ত্র সম্মত।

মায়োপহিত চৈতন্যই পরমেশ্বর, ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

মায়া বিম্বং বশীকৃত্য স স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥

বেদান্ত পঞ্চদশী।

শ্রুতিও বলেন—

হিরণ্য গর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে,

ভূতস্য জাতঃ পতি রেক আসীৎ।

মনু বলেন,—

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু র্বিবিধাঃ প্রজাঃ।

অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্।

তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহঃ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণে, সেই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে লোকসিদ্ধ রাজাও সর্ব্বলোকের ঈশ্বর বলিয়া জানা যাইতেছে।

অতএব—ঈশ্বর বিষয়েও চার্ব্বাকের উক্তির সহিত আস্তিকগণের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য আছে।

ঈশ্বরের জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে চার্ব্বাকের অভিমত এইরূপ,

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথানিলঃ।

কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥

এই যে অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, বায়ুর শীত স্পর্শ, এই সকল কে রচনা করিয়াছে? ইহারই উত্তর-স্বভাব বশতঃ হইয়াছে। সুতরাং জগতের নিয়ন্তা কোনও কেহ নাই, যিনি অগ্ন্যাদির উষ্ণতা প্রভৃতি বিচিত্র গুণের বিধান করিয়াছেন। ঋজু বুদ্ধি নাস্তিকগণ এইরূপ বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন।

আমরা বুঝিতেছি এই সূত্রের কেন শব্দ প্রশ্নবাচক নহে; "কেন অর্থে কেন চিৎ" অনির্ব্বচনীয়েন পুরুষেণ, ইহাই বুঝিব, তাহা হইলেই আর কোনও অসামঞ্জস্য থাকিল না। এই যে অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, বায়ুর শীতস্পর্শ, তাহা কি আপনা আপনি হইতেছে?

এই বিচিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল জগৎ কোনও অনির্ব্বচনীয় শিল্পী রচনা করিয়াছেন, ইহাই সূত্রের অর্থ। অথবা ক—শব্দের অর্থ ব্রহ্মা (একাক্ষর কোষ মতে) কেনেদং চিত্রিতং ইদং জগৎ কেন (ব্রহ্মণা) নির্ম্মিতং। এই জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তবেই দেখুন! পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতির সহিত চার্ব্বাক সূত্রের কেমন ঐক্য আছে।

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল, সৃষ্টিকর্ত্তা, অনির্ব্বচনীয় পুরুষই বল, আর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই বল,

তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন কেন? সাধারণতঃ দেখিতে পাই, কেহ কোনও কার্য্য করিতে হইলে, হয় স্বার্থবশতঃ না হয় করুণা বশতঃই করেন। জগৎ কর্ত্তার কার্য্যে স্বার্থ বা করুণা কোনটীই হেতু হইতে পারে না। যেহেতু যাহার স্বার্থ আছে তাহার কোনও না কোনও অভাব আছে, বলিতেই হইবে। অভাব থাকিলেই তিনি অপূর্ণ, অপূর্ণ হইলেই আমাদের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন বা সসীম কর্ত্তা, অসীম বিশ্বের সৃষ্টি করিবেন কিরূপে?

আর করুণা বশতঃই সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলেও সঙ্গত হইবে না, তাহা হইলে, অন্ধ, আতুর, ধনী, নির্ধন, রূপবান্, বিরূপ, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি বিসদৃশ সৃষ্টি হইত না। করুণা সকলের প্রতিই সমান থাকিবে ইহাই নিয়ম। কেহ জন্মমাত্রই মহাসুখী, কেহ বা চির দুঃখী, কেহ শোকাকুল, কেহ নিত্য উৎসবে বিভোর, কারুণিকের সৃষ্টিতে এইরূপ বৈচিত্র আসিতে পারে না। "জীবের কর্ম্ম বৈষম্যই সৃষ্টি বৈষম্যের কারণ—এস্থলে এইরূপ উত্তর হইলেও জিজ্ঞাস্য অবশিষ্ট থাকে যে, জগতের বৈষম্যের কারণ কর্ম্মই হউক; কিন্তু সৃষ্টি কর্ত্তা ত আর কর্ম্মাধীন নহেন, তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন কেন? স্বার্থ বা করুণা কোনওটীই যে তাঁহার সৃষ্টিপ্রবৃত্তির হেতু হইল না।

এতাদৃশ তর্কের সিদ্ধান্তেই চার্ব্বাকসূত্রে অতি স্বল্পাক্ষরে বলা হইতেছে,—

"তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ"

সেই স্বভাবেই অর্থাৎ জগৎ সৃজনস্বভাববশতঃ। জগৎ সৃজন করা সৃষ্টিকর্ত্তার স্বাভাবিক কার্য্য, ইহাতে কোনও উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই, সুতরাং জগৎ নির্ম্মাণে সৃষ্টিকর্ত্তার স্বার্থ করুণার গন্ধও নাই। যেমন জীবগণ, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বভাবতঃ সম্পন্ন করেন "ইহা হউক, উহা হউক" এইরূপ ভাবিয়া কেহ শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করে না। সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তাও স্বভাববশেই জগৎ সৃজন করেন। অতএব জগৎকর্ত্তার উপর বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ অর্পিত হইতে পারে না। চার্ব্বাকসূত্রে অতি সুকৌশলে জগৎকর্ত্তার পরিচয় দিয়া, তাহার সৃষ্টিকর্তৃত্বে যতগুলি পূর্ব্বপক্ষ আছে, তাহার নিরাসক্রমে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া বলিতেছেন,—*

"তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ"

চার্ব্বাকের আর একটা সিদ্ধান্ত "নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণম্" প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই, ইহাতেই নাস্তিকগণ বুঝিয়াছেন,—"ঠিকত! যাহা দেখা যায় তাহাই প্রমাণ। তোমার শ্রুতি স্মৃতি বর্ণিত যম, যমালয়, স্বর্গ, নরক, জন্মান্তর কিছুই দেখা যায় না, অতএব তাহা নাই ইহাও নাস্তিকের স্থূলবুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতেছি চার্ব্বাক বলিতেছেন, এই যে, অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি নানাবিধ প্রমাণের উল্লেখ দর্শনান্তরে আছে, তাহাও প্রত্যক্ষের রূপান্তর, কেননা, অনুমান করিতে যাও! হেতুসাধ্যের অবিনাভাব (ব্যাপ্তি) প্রত্যক্ষ

* লোকবত্তু লীলা কৈবল্যং এই বেদান্তসূত্র শঙ্করভাষ্য ও ভামতী টীকা দ্রষ্টব্য।

করিতে হইবে। উপমানের কথা বলিতে চাও! উপমান উপমেয়ের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। শব্দ জ্ঞান প্রমাণ বল তাহাতেও শব্দশ্রবণে শ্রাবণিক প্রত্যক্ষ আছে। প্রত্যক্ষ ব্যতীত জগতে কিছুই নাই, অনুমানাদি প্রত্যক্ষেরই প্রকারভেদ মাত্র। জগতে যাহা কিছু আছে সকলই প্রত্যক্ষের বিষয়।

বাস্তবিক নাস্তিকগণ, যাহা বুঝিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল, "যাহা দেখা যায় না, তাহা নাই" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, "ঘর হইতে তুমি বাহির হইয়া আসিয়াছ, পরিবারের কাহাকেও এক্ষণে দেখিতে পাইতেছ না, সুতরাং তাহারা নাই ভাবিয়া রোদন করিতে থাক। তুমি তোমার নিজ চক্ষু দেখিতেছ না, অতএব চক্ষু নাই ভাবিয়া স্বকীয় অন্ধত্ব নিশ্চয় কর। ফলকথা প্রত্যক্ষের যোগ্য উপায় উপকরণ থাকা সত্বেও যাহার কোনও প্রকার জ্ঞান হয় না, তাহাই নাই।

প্রতিবন্ধক বশাধীন অনেক বস্তু থাকিয়াও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতি দূরত্ব, অতি নৈকট্য, ইন্দ্রিয় ঘাত, চিত্তের ব্যাকুলতা, জ্ঞেয় বস্তুর সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, সমান দ্রব্য মিশ্রণ এই সকল কারণে বস্তু থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। * অতএব "যাহা দেখা যায় না। তাহাই যে নাই "এইরূপ সিদ্ধান্ত ভুল।

অথবা মহাজ্ঞানী চার্ব্বাক, জ্ঞান মার্গে আরূঢ় হইয়া বলিতেছেন "না প্রত্যক্ষং প্রমাণম্" তোমরা যাহাকে প্রত্যক্ষের অবিষয় মনে করিয়া অনুমান প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে যাও, তাহা কেবল তোমাদের দৃশ্যমান চক্ষুর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত। জ্ঞানচক্ষুঃ বিস্ফারিত হইলে, শ্রী শ্রীগুরু, তোমার চক্ষুতে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা লাগাইয়া দিলে, বিশ্বমধ্যে তোমার অদৃশ্য কিছুই থাকিবে না। জ্ঞেয়বস্তু সূক্ষ্মব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট যাহাই হউক, বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ যেরূপ অবস্থাতেই থাকুক, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" হউক, কিছুই তোমার দৃষ্টির অবিষয়ে থাকিবে না। তখন তোমার আর ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান করিতে হইবে না। গবয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া গোর উপমান করিতে হইবে না, গবয় ও গবয়দর্শনের সমকালে বহ্নিও গো দেখিতে পাইবে। করকুবলয়ের ন্যায় সর্ব্বদা সমগ্র বিশ্ব তোমার প্রত্যক্ষ দশায় উদ্ভাসিত হইবে। এই নিমিত্ত পাতঞ্জল সূত্রে বলিতেছেন,—

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্। (যোগদর্শনবিভূতিপাদ)

বুদ্ধি যখন অবিদ্যাদি আবরণ হইতে, মুক্ত হইবে, তখন অনন্ত জ্ঞান প্রকাশ পাইবে, এবং জ্ঞেয়—বিশ্ব, সেই জ্ঞানের হিসাবে অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে। সেই অবস্থায় আশংসা করিয়া, তদ্রূপ অবস্থা অনুভব করিয়া, চার্ব্বাক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন,—

"না প্রত্যক্ষং প্রমাণম্"

প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের কোনওরূপ আবশ্যকতা নাই।

---

* অতি দূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয় ঘাতান্ মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভি হারাচ্চ॥ সাঙ্খ্যকারিকা।

ইহা দ্বারা চার্ব্বাকের লোকায়ত নামটীও সার্থক। লোকান্তে ইতি লোকঃ দর্শনং (জ্ঞানং) লোক আয়তো বিস্তৃতো যস্ত। যাহার লোক বা দৃষ্টি বিস্তৃত, তিনিই লোকায়ত নামধারী মহাজ্ঞানী চার্ব্বাক।

দেব গুরু বৃহস্পতি, চার্ব্বাক সূত্র প্রণয়ন করিয়া যেমন এক দিকে অসুরদিগকে মোহিত করিতেছেন, তেমনি অন্যদিকে দেবমণ্ডলীকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। বৃহস্পতি, সমাধি ভাষায় এইরূপ অত্যন্ত বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের পোষক চার্ব্বাক দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই দেব বুদ্ধি ও অসুর বুদ্ধি বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন মার্গে ধাবিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রে তিন প্রকার ভাষার ব্যবহার হইয়া থাকে।

সমাধি ভাষা প্রথমা লৌকিকীতি বিনির্ম্মিতা।
তৃতীয়া পরকীয়েতি শাস্ত্রভাষা ত্রিধা স্মৃতা॥
গুপ্ত মেতদ্রহস্যং তু ভাষা তত্ত্ব বিদো বিদুঃ।
এতজ্ জ্ঞাত্বা প্রবর্ত্তধ্বং শাস্ত্র পাঠেষু সংযতাঃ॥

সমাধিভাষা, ইহাই প্রথম ভাষা, তৎপর লৌকিকী যাহা, মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, এবং তৃতীয়া পরকীয়া ভাষা, এইরূপে শাস্ত্র ভাষা তিন প্রকার। এই ভাষা বিষয়ে গুপ্তরহস্য ভাষা তত্ত্ব-বিদ্‌গণই জানেন। ইহা সম্যক্‌রূপে জানিয়া, সংযত ভাবে শাস্ত্রপাঠে প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত।

শাস্ত্র কামদুঘ, যাঁহার যেরূপ বুদ্ধি তিনি শাস্ত্রের অর্থ সেইরূপই দেখিয়া থাকেন। সাত্ত্বিকচিত্তে সাত্ত্বিক অর্থ এবং রাজস ও তামস চিত্তে তত্তৎ সমুচিত অর্থ প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রেই দেব বুদ্ধি ও অসুর বুদ্ধির প্রভেদটা দেখুন! এই নিমিত্তই লৌকিক আভাণক আছে,—

যাদৃশী সাধনা যস্য, বুদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

ওঁ

শ্রীব্রহ্মণ্যদেবায় নমঃ।

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য্যমা শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে নম স্তে বায়ো! ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু অবতু মাম্ অবতু বক্তারম্॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

শমদমাদিগুণসম্পদ্বিশিষ্টাঃ শাস্ত্রসম্পত্তিসমলঙ্কৃতা ব্রহ্মতেজোদধানা আচার্য্যাঃ! ধর্ম্মপরায়ণা নীতিনিপুণা মহারাজাঃ! মহোদয়াঃ সভ্যাশ্চ! অত্র ভবদ্ভির্নিরুপাধিকসৌজন্যপ্রেরণয়ৈব সমাহূয় সভায়াঃ সাদস্পত্যে প্রতিষ্ঠাপিতা বয়ং যথোচিতোপদেশপ্রদানায়, যদ্যপ্যস্মিন্ বিষয়ে যথোচিতং সামর্থ্যন্তু সোমং রাজানং বিহায় নান্যেষাং মানুষাণামিতি নাবিদিতং ভবতাম্, তথাপি বিপ্রপ্রসাদাজ্জগদীশ্বরোঽহম্ ইতি শ্রীকৃষ্ণোক্তিং মনসি নিদধতাময়মেব ভবদাশীরাশিপ্রবাহঃ সামর্থ্যাধায়কো ভবতীতি ব্রাহ্মণেষু নঃ সাধীয়সী শ্রদ্ধা; তামেবানুসৃত্য ভবদ্বচনানুরোধেন প্রাপ্তকালং যথাকথঞ্চিৎ কিমপি কথনীয়ং ভবেদেব। তত্র হংসন্যায়েন নীরক্ষীরবিবেকিনো গুণৈকপক্ষপাতিনো বাচংযমাঃ সুধিয়ঃ সারমেব গ্রহীষ্যন্তীতি নো মনীষা।

ইয়ঞ্চ খলু মহতী ব্রাহ্মণানাং সভা সর্ব্বভূতহিতেরতা সর্ব্বধর্ম্মজননী চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থাসংস্থাপনী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীতি বিদিতমেব। অস্মাকন্তু, 'শমোদমস্তপঃশৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।'

শম দমাদি গুণালঙ্কৃত শাস্ত্রসম্পদ্-বিভূষিত ব্রহ্মতেজোমণ্ডিত আচার্য্যগণ! ধর্ম্ম ও রাজনীতি-পরায়ণ মহারাজমণ্ডলী ও সভ্যমহোদয়গণ! আপনারা অহেতুক সৌজন্যের প্রেরণাবশতঃই যথোচিত উপদেশ প্রদানার্থ আমাকে এই সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। যদিও এই কার্য্য সম্পাদনের যথোপযুক্ত সামর্থ্য এক দ্বিজরাজ সোমদেবেই সম্ভবপর, কোনও মানবে ইহা সম্ভবে না, তথাপি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"বিপ্রপ্রসাদা জ্জগদীশ্বরোঽহম্" আমি এই ভগবদুক্তিস্মরণ করিয়া ও আপনাদের শক্তিসঞ্চারিণী আশীর্ব্বাদ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই যথাশক্তি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। আপনারা গুণপক্ষপাতী সুধীজন, হংসচয় যেমন নীররাশি হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, ভরসা করি আপনারাও আমার কথিত বিষয়ের সারাংশই গ্রহণ করিবেন।

এই বিরাট ব্রাহ্মণসভা সর্ব্বভূতহিতৈষিণী, সর্ব্বধর্ম্মজননী চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থাপিকা এবং চতুর্ব্বর্গপ্রদা, ইহা আপনাদের অবিদিত নহে।

শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জ্জব মেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

ইতি বচনাৎ স্বাধীনৈব গুণগণগরিষ্ঠা সর্ব্ববন্দ্যাত্যুচ্চমনা শমদমাদি সম্পৎ। এবঞ্চৈতাদৃশানাং বিবিধবোধশালিনাং তাদৃগেব কার্য্যং সমুচিতমিতি। পরমেশ্বরেণ নিত্যয়া কিল বাচা বোধিতমাদিশরীরিণে, যথা—ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি।

একদা সোমং রাজানং সমুপগতবত্য ওষধয়ো বদন্তি স্ম হে রাজন্! যস্মৈ পুরুষায় ব্রাহ্মণোঽস্মান্ প্রেরয়তি তং বয়ং পারয়ামসি অচিরেণৈব সাধয়াম ইতি তচ্চ নাব্রহ্মবর্চ্চসানাং সম্পদ্যেত, এবমেব ভাবমাদায় ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থিতং কিল শ্রুতিমুখেন ঋষিভিঃ পরমর্ষিভিশ্চ যথা—ওঁ আব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জায়তা মারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূরঃ, ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাং দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়াঽনড়্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধ্রির্যোষা জিষ্ণূরথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরোজায়তান্নিকামে নিকামে, নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্ত, যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্।

এবং যত্রৈতাদৃশা ব্রহ্মবর্চ্চসবিভূষিতাস্তপোনিকরদীপ্তিমচ্ছরীরা ভূসুরা অধিবসন্তি তং দেশং সর্ব্বথৈব পুণ্যং সমামনন্তি শ্রুতয়ঃ।

যথা—ব্রহ্ম চ ক্ষত্রশ্চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ তং লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেশং যত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা। পুণ্যলোকমপি জ্ঞাপয়তি শ্রুতিঃ। যত্র সোদি ম্ন বিদ্যত ইতি।

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং আমাদের এই ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এই সর্ব্বজন রমণীয় শমদমাদি গুণরাশি স্বভাবসিদ্ধ এবং ইহা অন্যান্য বহুগুণের আধার, অতএব তাদৃশ ভগবদ্বাক্য মনে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের গুণের অনুরূপ ব্যবহারই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি।"

একদা ওষধিরাজ—সোমের নিকট উপস্থিত হইয়া ওষধিগণ বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যে পুরুষের নিকট প্রেরণ করিতেছেন, আমরা অচিরে তাঁহাকে সাধন করিতে পারিব।" এই প্রেরণা কিন্তু ব্রহ্মতেজোবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ ভাব অবলম্বনেই ঋষি ও পরমর্ষিগণ শ্রুতিমুখে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছেন হে ব্রহ্মন্ রাষ্ট্র মধ্যে ব্রাহ্মণ যেন ব্রহ্মতেজোযুক্ত হয়েন, রাজন্যবৃন্দ যেন বলবান্, বাণপ্রয়োগকুশল, ব্যাধি বর্জ্জিত ও মহারথ হয়েন, ধেনু যেন দুগ্ধবতী হয়, বৃষ যেন বহনকুশল হয়, অশ্ব যেন ক্ষিপ্রগামী হয়, স্ত্রীগণ যেন পুরন্ধ্রি অর্থাৎ সুচরিত্রা হয়েন, রথী যেন জয়শীল হয়েন, যজমানের পুত্র যেন বীরত্ব লাভ করেন, পর্জ্জন্য যেন পর্য্যাপ্তবর্ষী হন, ওষধি যেন ভারাবনত হইয়া পরিপক্ক হয়, আমাদের যোগক্ষেম যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়।

যেখানে এইরূপ প্রার্থনাকুশল ব্রহ্মতেজোমণ্ডিত তপোদীপ্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন, শ্রুতি এমন দেশকে পুণ্যভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—

এতদেবনিশ্চিনোতি ছন্দোগানা মুপনিষদি গ্রথিতা গাথা, মহারাজেনাশ্বপতিনা স্বকীয় রাজ্য মুদ্দিশ্য গীতা ; যথা — ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ। নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণীকুতঃ' । ইত্যাকারিকা।

এতাদৃক্ সৌমনস্যং ন শাসকাধীনং কিন্তূপদেশকাধীনমেব, নহিতাদৃগ্ বলমস্তি রাজশাসনে যাদৃগ্ বরীবর্ত্তি সমুপদেশবত্যাং ব্রাহ্মণবাচি, যাবত্তাদৃশা ব্রাহ্মণা এব ভূষয়ন্তিস্ম এতাং ভুবং তাবদাসীল্লোকপ্রসিদ্ধং বৈভবং ঐশ্বর্য্যং ক্রিয়া-কৌশলঞ্চ স্পৃহনীয় মন্যদেশীয়ৈরপি, পরন্তু "তেহি নো দিবসা গতাঃ" ॥

ইদানীন্তু সর্ব্বপূজ্যায়া অপি ব্রাহ্মণজাতের্ম্মাহাত্ম্যং বহুশো বালিশা নিন্দয়ন্তি, শৃণ্বন্তোঽপি তেন শৃণ্বন্তি, পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি, জানন্তোঽপি ন জানন্তি, হন্ত হতদৈবং ব্রাহ্মণানাম্। ব্রাহ্মণেতরজাতয়স্তু স্বস্বজাতিসমুদ্ধার বিষয়ং নিমিত্তীকৃত্য সর্ব্বতঃ সজ্জীভূতা দৃশ্যন্তে। যতন্তে চ বহুশো যথামতি। পরন্তু কীদৃগ্ বিচিত্রং দৃশ্যং দৃশ্যতে, সকলং সমুচিতং পুণ্যালোকলক্ষ্মাদর্শনীভূতং সর্ব্বতোঽপি সঞ্চরন্নেব মূর্ত্তিমানিব কলি রিস্ততঃ প্রত্যক্ষতাং গতইব গ্রসমানশ্চ লোকান্ সমন্ততো দৃশ্যতে। তথাহি যচ্চেদং কিল ভারতবর্ষং ব্রহ্মবিভূতিমদ্ভবাং প্রতিগৃহং বেদঘোষ ঘোষিতং শ্চাগ্নিহোত্র ধূমধূপিতং বলিহরণরঞ্জিতাঙ্গণঞ্চাসীৎ শ্রীসমৃদ্ধম্। তদেবেদং সর্ব্বথাভারভূতজীবনময়ং সকলং বিপরীত মিব দরীদৃশ্যতে। ঈদৃশ্যাং ঘোরায়ামপ্যস্যামাপত্তৌ ভগবদ্বাক্যং—নহি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতীতি বিচার্য্য, সর্ব্বদৈব তদুপদেশং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইতি চিত্তে নিধায়, সর্ব্বভাবেন 'ক্লৈব্যংমাস্ম গমঃ পার্থ' ইতি সুদৃঢ় মন্তব্যা সংস্থাপ্য ভগবত্যা-

যত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ,
তং লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেশং যত্র দেবাঃ সহাগ্নিনা।

অর্থাৎ যে দেশে ব্রাহ্মণশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সমীচীন পথে পরিচালিত হয়, তাহাই পুণ্যভূমি বলিয়া অভিহিত।

যদিও পুরাকালে দেশের যেরূপ সৌভাগ্য ছিল, উপস্থিত সময় সেরূপ সৌভাগ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে পুরাকল্প বর্ণনায় মহারাজ অশ্বপতি, স্বকীয় রাজ্যবিশুদ্ধি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥

অর্থাৎ আমার রাজ্যে চোর নাই, কদর্য্যপ্রকৃতি সম্পন্ন লোক নাই, মদ্যপায়ী নাই। আমার রাজ্যে অনাহিতাগ্নি অর্থাৎ নিরগ্নি অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নাই। আমার প্রতিপালিত জনপদে স্বৈরচারী (দুশ্চরিত্র) পুরুষ নাই, স্বৈরচারিণী (দুশ্চরিত্রা) স্ত্রী নাই। রাষ্ট্রগত নরনারীর এই মানসিক বিশুদ্ধি, শাসক রাজশক্তির অধীন নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণগণের উপদেশ-মহিমার ফল। রাজশাসনের সেরূপ মহিমা কখনই থাকে না, হইতেও পারে না, ব্রাহ্মণগণের

শ্রুত্যা প্রোক্তস্য সন্মার্গস্য 'বলং সত্যা দোজীয়' ইত্যস্যানুসরণং কৃত্বা প্রকৃতকর্ত্তব্যে দত্তচিত্তৈ রস্মাভি র্ভবিতব্য মেবেত্যাবশ্যকং, কিঞ্চ বিচারিতে প্রতিভাতি, যথা গাঢ়স্তমঃ শনৈঃ শনৈরপসরতি, প্রকাশবৃদ্ধিঃ সমুপলভ্যতে চেতশ্চেতঃ, আলস্যমেঘাবরণঞ্চ ছিন্নং ভিন্নং দৃশ্যতে কচিৎ কচিৎ' কেবলমরুণোদয়ঃ সৌভাগ্য-সূর্য্যস্যাসন্ন ইব প্রতীয়তে।

প্রহর্ষপ্রদা বার্ত্তা চেয়ং—যদস্মাকং শাস্ত্রেষু কথিতা বহবঃ পদার্থা এতে মিথ্যেত্যুক্ত্বা পাশ্চাত্যৈ স্তদনুসারিভিশ্চ হাস্যেনৈব নীয়মানা আসন্—আকাশতত্ত্বং, বায়ুতত্ত্বং, বিদ্যুত্তত্ত্বং আকাশযানঞ্চেত্যাদিকা স্তাং স্তান্ সকলানিদানীং ন কেবলং সত্যমিতিকথয়ন্তি তে, কিন্তু পূর্ব্বমিব মনুজৈঃ স্তত্রত্যৈঃ গতাগতঞ্চাপি ক্রিয়তে তত্তত্তত্ত্ববিজ্ঞানং সম্পাদ্যৈব। এবমেব গঙ্গাজলং, তুলসীদলং, গোময়ঞ্চেত্যাদিকং পবিত্রং দ্রব্যমিতি কৃত্বা তৈ র্বিবিধান্ প্রয়োগানপিকৃত্বা তদ্গতং পবিত্রীকরণত্বং শাস্ত্রবাচাং যাথার্থ্যঞ্চানুসন্ধ্যায় প্রখ্যাপিতং দৃশ্যতে তৎকৃতেষু গ্রন্থেষু

এই মানসিক বিশুদ্ধি, শাসক রাজশক্তির অধীন নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণগণের উপদেশ মহিমার ফল। রাজশাসনের সেরূপ মহিমা কখনই থাকে না, হইতেও পারে না, ব্রাহ্মণগণের উপদেশবাক্যেই সে মহিমা বিরাজ করে। যে পর্য্যন্ত সেইরূপ ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই পর্য্যন্তই ইহা লোকবিখ্যাত বৈভবের অধিকারী ছিল। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতি স্ব স্ব জাতীয় উৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইতেছেন, যথাসম্ভব যত্ন চেষ্টাও করিতেছেন, এইরূপ উদাহরণ সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

সম্প্রতি অনেক অনভিজ্ঞ লোক এই সর্ব্বজন পূজনীয় ব্রাহ্মণজাতির নিন্দাই করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ তাহা শুনিয়াও শুনেন না, দেখিয়াও দেখেন না, জানিয়াও জানিতে চাহেন না। হায় ব্রাহ্মণগণের দুরদৃষ্ট, কি বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতে চলিল, সকল পুণ্য চিহ্ন অন্তর্হিত হইতে বসিল, আর কলি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া চারিদিক্ হইতে জনসমাজকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

যে ভারতবর্ষ এক সময় ব্রাহ্মণমহিমায় মণ্ডিত মঙ্গলময় ছিল, একসময় যাঁহার প্রতিগৃহ বেদধ্বনিতে মুখরিত হইত, অগ্নিহোত্রের পাবনধূমে প্রধূপিত হইত, যাহার প্রতিগৃহাঙ্গণ বিশ্বমূর্ত্তির জন্য উপহৃত বৈশ্বদেব নৈবেদ্যে রঞ্জিত হইত, আজ সেই ভারতবর্ষই দুর্ব্বহ জীবনভারে প্রপীড়িত মানবসমূহের বিষাদকালিমায় কলঙ্কিত? আজ সকলই বিপর্য্যস্ত, সকলই বিপরীত হইয়া গিয়াছে।

এই ভয়াবহ বিপদের সময়েও আমরা "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ, দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" এই ভগবদ্বাক্যই বিচার করিব। আমরা 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' এই ভগবদুক্তি স্মরণ করিব, 'ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে' এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া হৃদয় দৃঢ় করিব।

সার জে, সি, বসুনা বিদুষাং মান্যেন ধীমতা বৃক্ষাদিষ্বপি প্রাণানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়গণস্য চ আস্থিতিঃ সম্যগুপদর্শিতা নির্ম্মায় নানাবিধানি যন্ত্রাণি সোপস্করাণি চ যচ্চাদ্যতঃ পঞ্চসহস্রাধিকবৎসরপূর্ব্বলিখিতে মহাভারতাখ্যে কিলসমুপলভ্যতে, তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ, তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ, তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপা ইত্যাদি বচননিচয়েষু। বিদ্বদ্বরেণ দ্রবীড়দেশীয়েন টি, এস্, নারায়ণ শাস্ত্রিণা চ যস্তুচিরমেব স্বর্গতঃ, যস্যচামুত্রগমনেন মহতী হানি র্যাতা ভারতস্য, মহতা প্রযত্নেন স্বোপজ্ঞেহ মূল্যে গ্রন্থে নির্ণীতমস্তি যৎ কলিযুগস্ত প্রবর্ত্তমানমস্তি ইতঃ পঞ্চ সহস্রাব্দাদেবমেবান্যানি যুগানি কল্পাশ্চ প্রবর্ত্তিতা আসন্, অত্র পূর্ব্বমেব তথা শাস্ত্রমিতি চ।

পাশ্চাত্যৈ স্তদনুযায়িভিরত্রত্যৈশ্চ দেবানাং প্রিয়ৈ র্যাজ্ঞানদ্যোতিকা তন্ত্রশাস্ত্রনিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিতাভূদিদানীং মাননীয়েন বিদুষা সার জন, উড্রফেনাপি তন্নিন্দায়া এবাযথার্থত্বং প্রকটীকৃত্য, যাথার্থ্যঞ্চ বোধয়িত্বা সম্প্রচারঃ সমারব্ধ আগমশাস্ত্রস্য। ততোঽস্য সততং কৃতজ্ঞা বয়ং।

'বলং সত্যা দোজীয়ঃ' ভগবতী শ্রুতির এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কিন্তু একটু বিচার করিলে মনে হয় যেন গাঢ় অন্ধকার শনৈঃ শনৈঃ অপসৃত হইতেছে, এবং ইতস্ততঃ আলোক রেখা দেখা দিয়াছে। আলস্যরূপ মেঘের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন দেখা যাইতেছে। সৌভাগ্য সূর্য্যের অরুণোদয় নিকটবর্ত্তী মনে হইতেছে। বিশেষ আনন্দের কথা এই, যে, আমাদের শাস্ত্রের কথিত বহু বিষয়, এক সময়ে যাহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আকাশতত্ব, বায়ুতত্ব, বিদ্যুৎতত্ব ইত্যাদি বিষয়, আজকাল কেবল তাহারা সত্য বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু প্রাচীনকালের মত তাহারা সেই সেই তত্ববিজ্ঞানে অধিকারী হইয়া আকাশে গমনাগমন পর্য্যন্তও করিতেছেন। অপিচ তাহারা গঙ্গাজল, তুলসী, গোময় ইত্যাদি পবিত্র দ্রব্য স্বীকার করিয়া তৎসমুদয় ব্যবহার করিতেছেন, এবং এই সকলের অন্যবস্তু পবিত্র করিবার শক্তি স্বীকার করিয়া শাস্ত্রবাক্যের যাথার্থ্য প্রচার করিয়াছেন। "তস্মাজ্ জিঘ্রন্তি পাদপাঃ তস্মাৎ পশ্যন্তিপাদপাঃ তস্মাৎ শৃণ্বন্তি পাদপাঃ" (অর্থাৎ বৃক্ষগণ আঘ্রাণ করিতে পারে, দেখিতে পারে ও শুনিতে পারে) ইত্যাদি যে সমুদয় তত্ব পাঁচহাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে মহাভারত গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। আজ মাননীয় সার জে সি বসু মহোদয় নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কার পূর্ব্বক বৃক্ষাদির মধ্যে প্রাণ ও জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। দ্রবিড় দেশীয় বিদ্বদ্বর টি, এস নারায়ণ শাস্ত্রী যিনি অল্প দিন পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এবং যাহার পরলোক গমনে ভারতবর্ষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি অতি পরিশ্রম করিয়া তাহার অমূল্য গ্রন্থে নির্ণয় করিয়াছেন,—এই যে, প্রচলিত কলিযুগ ইহার পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে অন্য যুগ ও কল্প চলিতে ছিল। কিন্তু ইহাও পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন মাত্র।

বিদ্বংবরেণ ডাক্তার স্পুনরেণ চ স্বকীয়ে কিল লেখে সম্যগাস্থাপিতং যদ্ভারতবর্ষে পণ্ডিতানামদর্শনং ভারতভাগ্যাবিপর্য্যয়দ্যোতক মেবতদতোঽবশ্যং কৃত্বানেকযত্নান্ তেষাং রক্ষা বৃদ্ধিশ্চ বিধেয়া, সর্ব্বথা সবিশেষঞ্চ প্রযত্নীয়মত্রাপি ভবেদিতি।

বঙ্গদেশাধিকার মধিষ্ঠিতেন সম্রাট্ প্রতিনিধিনা লর্ড রোনেল্ড্‌শে' ইত্যাখ্যেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবার্ষিকে ক্রিয়মাণে প্রবচনে উপাধিপ্রদান সময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণানাং ছাত্রাণাং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যং পঠনীয়ানি এতদ্দেশীয়ানি দর্শনানি, সাগ্রহং সাদরং চ ইত্যুক্তং। তেন সর্ব্বথা কৃতার্থীকৃতাঃস্ম, আশাস্মহে চ অস্য বহুবিধং কল্যাণম্।

ন ব্যর্থং সমর্থয়িতু মীহামহে ভবতা মমূল্যং সময়ং নো চৈত্তথা বহুসংখ্যকানুদাহরণান্যে-তাদৃশানি স্মৃতিপথ মুপযান্তি। তথাপ্যেতৈ রপ্যুদাহরণৈ র্ভাবি সমুদয়কালপূর্ব্বরূপাণ্য পস্থিতা নীত্যবগন্তব্যং। তথাস্মাকং ধার্ম্মিকঃ কলহঃ শৈবশাক্তবৈষ্ণবাদীনাং যশ্চ পূর্ব্বং দৃশ্যমান আসীৎ প্রতিপদং তস্যাদর্শনমেব সমন্তঃ মসায়াতি শনৈঃ শনৈঃ।

অপরঞ্চ ভারতীয়েষু ব্রাহ্মণেষু জাগৃতি রপায়াতা, তথাহি স্বীয় সমুদ্ধারে প্রযত্যতে যথামতি সম্ভূয় সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র সংস্থাপ্য সদ স্তৈরপি, কিঞ্চপ্রাচীনানাং বহূনাং বিলুপ্তপ্রায়াণাং গ্রন্থানাং সমুপলব্ধিরাপি প্রাচীনসদাচারানুসারেণ চাতীবোপযুক্ততা মাদধাতি, আপাদয়তিচ কর্ম্মক্রিয়া-

---

পাশ্চাত্যগণ ও তদনুযায়িগণ আপন অজ্ঞানের সূচনা করিয়া ইতিপূর্ব্বে তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া ছিলেন, আজ মাননীয় বিচারপতি সার জন উড্‌রফ তাহাদের নিন্দা অজ্ঞান বিজৃম্ভিত খাপন করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের সম্যক্ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য ডাক্তার স্পুনর আপন প্রবন্ধে নির্ণয় করিয়াছেন—আজ ভারতবর্ষে যে তেমন পণ্ডিতগণ আর দেখা যাইতেছে না, ইহা ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফল, সুতরাং পণ্ডিতগণের রক্ষা ও বৃদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ প্রয়াস করা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের শাসনাধিকারে অধিষ্ঠিত সম্রাট্ প্রতিনিধি লর্ড রোনেল্‌ড্‌সে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় পরীক্ষোত্তীর্ণছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া এতদ্দেশের দর্শনশাস্ত্র ইহাদের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া অতি আগ্রহ ও আদরের সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই বিচক্ষণোচিত উপদেশে কৃতার্থ, আমরা তাঁহার অশেষ কল্যাণ কামনা করিতেছি।

এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, যাহা হউক এই কএকটি উদাহরণেই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যে ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক কলহ দেখা যাইত, উপস্থিত সময় ক্রমে ক্রমে যেন সে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

অপিচ ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যেন জাগরণের ভাব আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভাসমিতি ইত্যাদি স্থাপন পূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

কৌশলং সদাচারবৃদ্ধিং বেদে শাস্ত্রেচ নৈপুণ্যং। কিঞ্চ প্রতিদিনং পণ্ডিতা অপি বহুশ আচার্য্য তীর্থাদি বিবিধোপাধি ভূষণভূষিতাঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া শতশোঽধিকাঃ বিলোক্যন্তে, যথাপূর্ব্বং পঞ্চনদ প্রদেশীয় লবপুরে পঞ্চাপি বিদ্বাংস কৃচ্ছ্রেণোপলভ্যন্তেস্ম তত্রেদানীং পরঃশতাঃ শাস্ত্রিণো বিশারদাশ্চ দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কিম্পুনরন্যপ্রদেশেষু। এবমেব ব্রাহ্মণৈঃ স্থলে স্থলে পাঠশালা স্থাপনং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাপন মিত্যাদিকমপি নিশ্চয়েন জ্ঞাপয়ত্যোবাস্মজ্জাতে র্ভাবিসমুদ্ধারম্। প্রতিভান্তিচ অস্মদ্ বুদ্ধাবপ্যেতে সদুপায়াঃ।

(১)

সদ্ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম একচিত্তৈ র্বিধীয়তাং সর্ব্বহিতায় শীঘ্রম্।
তমন্তরানৈব ভবেৎ কথঞ্চিৎ যোগ্যা সতাং সন্ততিরিত্যবেত ॥ ১
দেশস্য বিত্তস্য তথাবলস্য সমুন্নতে র্মূলসিহামনন্তি।
যদ্ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিপালনং বৈ সন্তঃ সত্তাং তত্ত্ববিদো মহান্তঃ ॥ ২
তত্র স্থিতেভ্যঃ পঠনোৎসুকেভ্যঃ সাহায্যকং সংবিতরন্তু সভ্যাঃ।
বস্ত্রাদি দানৈঃ পটুতাবিধাত্রীং সৎপাঠরীতিঞ্চ বিচারয়ন্তু ॥ ৪
যেহপ্যন্যপাঠালয়গাঃ পঠন্তি পাশ্চাত্যবিদ্যাং বটবঃশুভার্থম্।
তানপ্যমোঘৈ রুপদেশবাক্যৈ র্মহাশয়া বেশ্মনি শিক্ষয়ন্তু ॥ ৪

প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় বহুগ্রন্থের উদ্ধার সাধন হওয়ায় প্রাচীন সদাচার বিষয়ে যথাযথ উপলব্ধির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ইহার ফলে সদাচার বৃদ্ধি, বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে নৈপুণ্য এবং ধর্ম্মক্রিয়ার বিবিধ কৌশল পরিজ্ঞানের সুযোগ হইয়াছে।

অপিচ আচার্য্য, তীর্থ ইত্যাদি বিবিধ উপাধিভূষিত পণ্ডিতগণের সংখ্যা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে পাঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত লাহোর নগরে পাঁচটি পণ্ডিতও পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল; সেখানেও আজ শতাধিক "শাস্ত্রী" ও "বিশারদ" দেখা যাইতেছে, অন্য প্রদেশেরত কথাই নাই। স্থানে স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি চেষ্টাও আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সূচনা করিতেছে।

এই শুভসূচনার দিনে যে উপায়গুলি অবলম্বনীয় মনে হয় আমি নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। আপনারা এক মতাবলম্বী হইয়া অবিলম্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করুন, তাহা না হইলে অন্যকোন উপায়েই যোগ্যসন্তান প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনকেই দেশের ধন,বল ও উন্নতির মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সজ্জনগণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থিত অধ্যয়ন নিরত ছাত্রগণের অন্নবস্ত্রাদি ভিক্ষা দানে সাহায্য করুন,এবং কোন রীতিতে অধ্যয়ন করিলে তাহারা অনুশীলনোপযোগী পটুতা লাভ করিতে পারিবে, তদ্বিষয় আলোচনা করুন। এতদ্ভিন্ন যাহারা পাশ্চাত্যবিদ্যার অনুশীলন করে, সভ্য মহোদয়গণ! তাহাদিগকে ও গৃহে সজীব উপদেশ বাক্য দ্বারা ধর্ম্ম বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করুন।

তথা যথৈতে ন কুসঙ্গদোষৈ রাক্রান্তচিত্তাশ্চ বিজহ্যুরেতৎ।
ধর্ম্মানুকূলং ব্যবহারজাত মাচার সৌচিত্যপরং বিচারম্ ॥ ৫।

(২)

কিঞ্চাত্র বিদ্বৎপ্রবরাঃ স্বপুত্রাঁল্লোভাৎ স্ববিদ্যাবিমুখান্ নকুর্য্যুঃ।
পরং যথৈতে নিজশাস্ত্র নিষ্ঠাঃ ভবেয়ুরেবং পরিবোধয়ন্তু ॥ ১
মহাশয়া স্তানভিতঃ স্বকীয়ৈরুৎসাহকার্য্যৈঃ পরিবর্দ্ধয়েধ্যাঃ।
যথা ন তে স্বোন্নতি পদ্ধতিং কদা প্যবজ্ঞয়া দ্রষ্টুমলং ভবেয়ুঃ ॥ ২
এবং স্ববিদ্যা বিষয়ানুরাগ-ভৃতাং সদা জীবন যোগ্যভারম্।
বিভজ্য রীত্যা জনতা সহর্ষং গৃহ্ণাতু ধর্ম্মোন্নতি তৎ পরা চেৎ ॥ ৩।

(৩)

কিঞ্চ স্ত্রিয়া মপ্যতি যোগ্য শিক্ষাং দদত্বদোষাং পরিচিন্ত্য রীতিম্।
যথা ভবেয়ু গুর্ণবঞ্চিতা ন তা ন দুষ্টভাবা ইতি চিন্তয়ন্তঃ ॥ ১।
সংশ্রাবয়ন্তোঽনুদিনং পবিত্রং চরিত্রজাতং কুলকামিনীনাম্।
বিপদ্ গতানামপি ধর্ম্মভাজাং সীতানসূয়াদিপতিব্রতানাম্ ॥ ২

অপিচ যাহাতে ইহা কুসঙ্গদোষে আবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মানুকূল আচার ব্যবহারাদি এবং যথাযথ বিচার পরিত্যাগ না করে, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করুন। আরও আমার নিবেদন এই পণ্ডিত-মণ্ডলী যেন লোভতন্ত্র হইয়া স্বীয় সন্তানগণকে শাস্ত্রবিদ্যায় বিমুখ না করেন; প্রত্যুত যাহাতে ইহারা শাস্ত্রপরায়ণ হয় তদ্রূপ উপদেশ দান করুন। সভ্যমহাশয়গণ! যাহাতে ছাত্রগণ আপনাদের উৎসাহে ও কার্য্যগত সহায়তায় উৎসাহিত হয়, এবং যাহাতে তাহারা তাহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি জনসমাজে অবজ্ঞেয় বলিয়া বুঝিবার সুযোগ না পায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। জনসমাজ এইরূপে যদি ধর্ম্মোন্নতি পরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা বিদ্যানুরাগী হইয়া বহনীয় আপন আপন জীবনভার সহর্ষে গ্রহণ করিতে পরিবে। ২।

অপিচ আপনারা বিশুদ্ধ রীতি উদ্ভাবন পূর্ব্বক স্ত্রীজাতির জন্য নির্দ্দোষ শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। যাহাতে তাহারা গুণলাভে বঞ্চিত না হয়, ভাবগত দোষ প্রক্ষালিত হয়, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।৩।১। কি রূপে সীতা, অনসূয়া প্রভৃতি কুললক্ষ্মীগণ বিপৎ সাগরে পতিত হইয়াও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিতেন, নিরন্তর উপদেশাদিদানে তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। ৩।

এইরূপ দেশের অন্যান্য অভ্যুদয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে নানাবিষয়ক সভা সমিতি সংস্থাপিত হউক, যাহাতে সেই সেই স্থানে জনসমাজ ধর্ম্মাদি আলোচনার সুযোগ পাইতে পারে। এই সকল সভার সুধীজনকৃত কত গুলি মুখ্য নিয়ম থাকিবে—যাহা প্রতিপালনের ফলে লোক কেবল আপন ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতি মাত্রই অনুসন্ধান করিতে পরস্পর বিবাদ বিসংবাদাদি পরিত্যাগ করিবে। ৪।

(৪)

কিঞ্চৈব মেষাভ্যুদয়ায় শশ্বৎ সংস্থাপিতা ভান্তু সভাঃ সমন্তাৎ।
গ্রামে চ মুখ্যে নগরেঽপিদেশে যাম্বেত্য ধর্ম্মাদি বিচারণা স্যাৎ॥ ১
মুখ্যাশ্চ তাসাং নিয়মা ভবন্তু প্রকৃষ্ট বিদ্বদ্বরসঞ্চিতাঃ শুভাঃ।
জনা যতঃ স্বোন্নতিমীহমানা মিথো বিরোধাদিক মুৎসৃজেয়ুঃ॥ ২।

(৫)

অপিচ—

"মৈত্রো হি বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে" শ্রুতে র্বাক্যেন চৈতেনভুতদ্বিবোধিতম্।
যথা শুনো মিত্রবদাচরেদ্ দ্বিজঃ কিন্নান শূদ্রাদিষু চেন্নহার্দ্দম্॥ ১
সদ্ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্যশ্চ শূদ্রৈ রন্যৈ রপীত্থং ততমিত্রভাবৈঃ।
কিমস্তি কৃত্যং দুরবাপমত্র মনাঙ্ মহান্তঃ পরিচিন্তয়ন্তু॥ ২।

(৬)

কিঞ্চ—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নাদি কানি বিপ্রস্য কর্ম্মাণি মতানি শাস্ত্রে।
ন তৈরিদানীং ভবিতা কথঞ্চি ন্নির্ব্বাহ আপদ্ গত ধর্ম্মভাজাম্॥ ১।

নের ফলে লোক কেবল আপন ব্যাষ্টি ও সমষ্টির উন্নতি মাত্রই অনুসন্ধান করিতে পরস্পর বিবাদ বিসংবাদাদি পরিত্যাগ করিবে। ৪।

শ্রুতি বলেন—ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতে মৈত্রীসম্পন্ন হইবেন, এই নিয়মে পশুজাতির মধ্যে অধম কুক্কুরের প্রতিও যখন ব্রাহ্মণের মিত্রোচিত ব্যবহার করা সঙ্গত, তখন আপন সমাজদেহের অঙ্গবিশেষ শূদ্রাদি জাতির প্রতি, কেননা ব্রাহ্মণ মৈত্রী পরায়ণ হইবেন? এইরূপে যদি সদ্ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ পরস্পর মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্য ইহাদের পক্ষে দুর্ঘট থাকে, আপনারা এই বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ৫।

অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ছয়টি কর্ম্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি কোনরূপেই তৎসমুদয় দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, সুতরাং বাণিজ্য হলচালনা বা সেবা ইত্যাদি আপদ্ধর্ম্ম মনে করিয়া যিনি যাহাই করুন না কেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণই যেন ব্রাহ্মণত্বের মূলস্বরূপ, নিজ জীবনের মুখ্য কার্য্যস্বরূপ, নিত্যআহ্নিকের কথা বিস্মৃত না হন। যিনি যে কার্য্যেই আসক্ত হউননা কেন কেহই যেন বংশগৌরব রক্ষা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, স্বধর্ম্মানুকূল আচরণ, বিবেক এবং পূজনীয় জনের প্রতি বিনয় প্রদর্শনে যেন উদাসীন না হন। আমরা নবীন পাশ্চাত্য বিদ্যা ও পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে যেরূপ অর্থ সাধনে সমর্থ হইতেছি, অতি মনোরম প্রাচীন বিদ্যাও প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিয়া আজ কোন প্রকারেই অর্থসাধনে সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু বিচক্ষণ শিষ্টজনের ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। প্রাচ্য বিদ্যানুরাগী প্রাচীনগণ যেমন ইহলোক ও

অতশ্চরন্তোহপি যথাবকাশং বাণিজ্য সংকর্ষণসেবনানি।
ন বিস্মরেয়ু র্নিজমুখ্যকার্য্যং নিত্যাহ্নিকং ব্রাহ্মণতৈকমূলম্॥ ২।
কুলানুরাগং, স্বজনেষু ভক্তিং, ধর্ম্মানুকূলাচরণং বিবেকম্।
পূজ্যেষু প্রশ্রয় মন্যকার্য্য-সক্তা অপীমানি ন সন্তজেয়ুঃ॥ ৩।

(৭)

কিঞ্চাতিহৃদ্যা মনুস্মৃত্য বিদ্যাং চিরন্তনী তামপি রীতি মদ্য।
ন পারয়ামোঽর্থমুসাধনে তথা, যথা নবীনা মনুস্মৃত্য সদ্যঃ॥ ১॥
পরন্তু শিষ্টাঃ পরিচিন্তয়ন্তু নবীন বিদ্যৈক ধনা বিচক্ষণাঃ।
কিমীদৃশাঃ সন্তি যথা চিরন্তনা জনাশ্চ লোকদ্বয়সাধিনোঽভবন্॥ ২॥
অতঃ সমেত্যাদর মাদধানা ভবন্ত ইত্থং প্রবিচারয়ন্তঃ।
প্রাচীন মর্ব্বাক্তন মুক্তিজাতং শাস্ত্রোক্তিবর্গং তুলয়ন্ত আরাৎ॥ ৩।
কার্য্যেষু তদ্রীতিজুষং বিশুদ্ধাং সভ্যাঃ সলীলাং সরণীঞ্চ নব্যাম্।
বিধায় সর্ব্বঞ্চ তয়ৈবকৃত্যং কুর্ব্বন্তুপন্থাঃ শুভদোঽধুনায়ম্॥ ৪।

(৮)

কিঞ্চ—
বিসহ্য দুঃখানি বহূনি শিষ্টাঃ সমর্জ্জয়ন্তীহ চ যে সুবিদ্যাম্।
তে চাপি চেতাংসি সমাদধন্তাং কুতর্কজালে নবনাস্তিকানাম্॥ ১।
এবং কৃতে তে সুবিদঃ পদিষ্ঠাঃ সমুন্নতাঃ স্যুঃ কিল জীবিতাপ্তাঃ।
বিদেশজানাং নিজদেশজানাং স্যুর্নাস্তিকানাং শিথিলাঃ প্রভাবাঃ॥ ২।
তথা কুতর্কৈ রিহ নাস্তিকানাং বিচিত্রকীটৈঃ ক্ষতকায়যষ্টিঃ।
সনাতনো নঃ শুভধর্ম্মবৃক্ষস্তেষাং প্রভাবৈ দ্রু´তমুন্নতঃ স্যাৎ॥ ৩।

পরলোকে সমান লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যসাধনে সমর্থ ছিলেন। নবীনগণের মধ্যে কি সেরূপ লোকদ্বয় সাধনের ভাব আছে। অতএব আপনারা মিলিত হইয়া এই বিষয় বিচার করুন, প্রাচীন শাস্ত্রোক্তির সহিত নবীনের গুণ ও যুক্তির তুলনা করুন।

সভ্যগণ! নবীন পদ্ধতিকে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিশোধিত করিয়া কার্য্যকালে এই বিশোধিত পদ্ধতির অনুসরণ করাই সঙ্গত মনে হয়, ইহাই উপস্থিত সময়ে কল্যাণকর পন্থা বলিয়া আমি মনে করি। ৬। ৭।

যাঁহারা বহু দুঃখ সহ্য করিয়া এই শাস্ত্রবিদ্যা উপার্জ্জন করেন, সেই সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণও যেন নবীন নাস্তিকগণের উদ্ভাবিত কুতর্কজাল খণ্ডন করিবার জন্য তৎ সমুদয় অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে চিন্তা স্থাপন করেন, এইরূপ করিলে সেই সুপণ্ডিতগণ পটুতর বলিয়া বিবেচিত হইবেন, অনায়াসে জীবিকাসমর্থ হইবেন। এদিকে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় নাস্তিকগণের প্রভাব শিথিল

সমুন্নতে ধর্ম্ম পুরাণবর্গ্যে কার্য্যে কুতশ্চিৎ স্খলনং নহি স্যাৎ।
সমুন্নতীনাং হি নিদানমেত দতোঽত্র যূয়ং দ্রুত মা যতধ্বম্॥ ৪।

(৯)

অপিচ—

বৃদ্ধাশ্চ যে নিয়ত কার্য্য মপাস্য গেহং প্রাপ্তা বিভান্তি সুসমাপিত লোক কার্য্যাঃ।
কার্য্যাচ তৈ রনুদিনং নিজ ধর্ম্ম রক্ষা বাক্যামৃতৈ র্নিজধনৈ রপি বদ্ধকক্ষৈঃ॥ ১।
শিক্ষা মবাপ্য সুসমাপ্য চ পোষ্যপোষং জোষং গতৈর্বিষময়ৈ বিষয়ৈরপেতাঃ।
ধর্ম্মোন্নতিং প্রতিগৃহং সমুপাদিশন্তঃ সন্তো ভবেয়ুরিহ চেৎ কিমসাধিতং স্যাৎ॥ ২
আসাদ্য গেহং সমুপেক্ষ্য দেহং দেশোন্নতিং স্বাং পরিচিন্তয়দ্ভিঃ।
মান্যৈঃ প্রতিগ্রাহ মুপেত্য কার্য্যো ধর্ম্মোপদেশঃ পরিশুদ্ধরীত্যা॥ ৩।

(১০)

কিঞ্চ—

মুখ্যে নিজে পর্ব্বণি বা যথেষ্টে কালে ভবন্তঃ প্রতিতীর্থ মেতৎ।
কিংবা প্রসিদ্ধে নিজদেব গেহে কুর্ব্বন্ত ইষ্টং হরিকীর্ত্তনং তৎ॥ ১।
শিবস্য বা কীর্ত্তন মেকচিত্তা স্তথা ভবানীগুণ কীর্ত্তনং বা।
সমাহরন্তঃ খলু ভক্তিভাবৈঃ স্বান্তং শুভং দর্শকপুঙ্গবানাম্॥ ২।

হইবে। আরও এক উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হইবে—নাস্তিকগণের কুতর্করূপ বিচিত্র কীটের দংশনে যে সনাতন ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষের অঙ্গযষ্টি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এই সুপণ্ডিতগণের প্রভাবে উহার সমাহিত হইয়া অবিলম্বে উন্নতি লাভ করিবে। তাহা হইলে উন্নতি কর বলিয়া প্রতিপন্ন কোন ধর্ম্মকার্য্যেই লোক স্খলিত হইবে না। অতএব এই উন্নতিকর ব্যাপারে আপনারা অবিলম্বে যত্নপরায়ণ হউন। ৮।

যাহারা জীবিকার্জ্জনের নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিয়া লৌকিক কার্য্যসমূহ পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপদেশ ও ধন দান দ্বারা প্রতিনিয়ত স্বধর্ম্ম রক্ষায় বদ্ধপরিকর হন। যাহারা যথা সময়ে গ্রন্থগত ও জীবন শিক্ষায় সুশিক্ষিত, পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও বিষময় বিষয়ের গ্রাস হইতে নির্ম্মুক্ত, এমন সজ্জনগণ যদি প্রতি গৃহে ধর্ম্মোন্নতির উপদেষ্টা হন, তাহা হইলে আমাদের কি অভাব থাকে? অবসর-প্রাপ্ত মাননীয় সাধুগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক যেন দেশের ধর্ম্মোন্নতি চিন্তা করেন, এবং গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হইয়া যেন বিশুদ্ধপ্রণালীতে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। পর্ব্ব দিন বা ইচ্ছামত অন্যসময়ে আপনারা তীর্থে তীর্থে গমন করিয়া অথবা আপন ইষ্ট দেবতার প্রসিদ্ধ লীলাভূমিতে গমন পূর্ব্বক শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন করুন। অথবা অনন্যমনে শ্রীশিবকীর্ত্তন কিংবা শ্রীভবানীর গুণ কীর্ত্তন করুন, ইহাতে যেমন একদিকে স্বীয় চিত্তশুদ্ধি হইবে,

তথা যতন্তা মুপদেশ বাক্যে র্ধর্ম্মোন্নতে র্গৌরব মাদধানাঃ।
যথা বিকাশং সমুপৈতি রম্যা নিজস্য ধর্ম্মস্য শুভা পতাকা ॥ ৩।
কিঞ্চাতি হৃদ্যং পরমানুকূল মিমঞ্চ মত্বা কৃতিনো ভবন্তঃ।
কৃতার্থয়িষ্যন্তি মদীয় চিত্তং স্বাধ্যাত্ম সংচিন্তনয়াঽচিরেণ ॥ ১ ॥
দিবাঽথবা রাত্রিগতং স্বকালং কার্য্যেভ্য আদায় মুহূর্ত্ততোঽপি।
স্বস্বং রহোভাবগতঞ্চ নিত্যং নিজেষ্টদেবং পরিচিন্তয়ন্ত ॥ ২ ॥
ইদং সুকৃত্যং সমবেত্য সারং সংসার পারং সুখমাতরন্ত।
অনেন লোকদ্বয় সাধনেষু ক্ষমা ভবন্ত প্রতিকালমার্য্যাঃ ॥ ৩ ॥
মন্যে মদীয়োক্তিচয়ং ভবদ্ভি র্বিচারয়দ্ভিঃ পরিবদ্ধ ধৈর্য্যৈঃ।
কার্য্যেষু রীতিং পরিণাময়দ্ভিঃ ফলান্বিতেয়ং পরিষৎ কৃতা স্যাৎ ॥ ৪ ॥
করোতি যঃ সর্ব্বজনাতিরিক্তাং সম্ভাবনা মর্থবতী ক্রিয়াভিঃ।
সং সৎসু জাতে পুরুষাধিকারে ন পূরণীতং সমুপৈতি সংখ্যা ॥৫ ॥
ইদং তদীয়াত্মগুণানুরূপং সমীরিতন্তারবিণাদরেণ।
তমর্থ মাদায়:বিহায় নিদ্রামালস্য মুদ্রাং কৃতিনো যতধ্বং ॥ ৬ ॥
ধন্যা ভবন্তোঽধিসভং সমন্তাৎ সমাগতা ভূসুরবৃন্দ মুখ্যাঃ।
যান্ বীক্ষ্যমাণা অপি মোদমানা সম্মানবাক্যৈ রনুমোদয়ামঃ ॥ ৭ ॥
নৈতাদৃশঃ ক্লেশভরঃ স্বদেশে জাতৌ যতঃশ্রেয়সি নঃ পুরাভূৎ।
অতঃ স্বমৌদার্য্য মুদারভাবাঃ পুরো নিধায়াশু ফলং লভধ্বম্ ॥ ৮ ॥

অপরদিকে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত ভক্তিভরে এই শুভ কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে। আপনারা উপদেশ বাক্য অবলম্বনে ধর্ম্মোন্নতির গৌরব বর্দ্ধনার্থ সেইরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে স্বধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী রমণীয় মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র শোভা বিকাশ করে। আপনারা সকলেই কৃতী, আপনারা কি আমার প্রদর্শিত কর্ত্তব্যগুলি মনোরম ও অতিমাত্র হিতকর মনে করিয়া অচিরে স্ব স্ব অধ্যাত্ম চিন্তায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমার প্রার্থনা সফল করিবেন। দিনে হউক রাত্রিতে হউক নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহ হইতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় করিয়া নির্জ্জনে স্বস্ব ইষ্টদেবের চিন্তা করুন।

আপনারা এই এক মাত্র সৎকার্য্য, ইহার সার মনে করিয়া সুখে সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করুন, আর্য্যগণ সকল সময়েই এই সার ধর্ম্মের সাহায্যে লোকদ্বয় সাধনে সমর্থ হইতেন।

আমি আশাকরি আপনারা বিচার পূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে বর্ণিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া এই সভার উদ্দেশ্য সফল করিবেন।

যে ব্যক্তি অনন্য সাধারণ নিজ যোগ্যতাকে চেষ্টাদ্বারা কার্য্যে পরিণত করিয়া সভাতে

যথেষ্ট দেবীং করুণার্দ্র চিত্তাং ধ্যাত্বং নমন্তঃ সুধীয়ো মহান্তঃ।
সমুন্নতিং তাদৃশ মাতনুধ্বং যথা পুনর্ভারত ভারতং স্যাৎ। ৯।
যদীদৃশে নৈব পথা ভবন্তঃ সন্তো মহান্তোঽঙ্গুপলং ব্রজন্তঃ। *
সঞ্চালয়েয়ু নিজ বন্ধুবর্গান্ ফলং তদাবশ্য মজস্র মাপ্ত। ১০।
আশাস্মহেচ ভবতাং শুভ ধর্ম্ম ভাজাং।
ভূত্বা স্বিভূতি মতুলাং নিজবংশজলব্ধাম্॥
সুপ্তা কলে র্হিমবৃত্তিবশাদিদানীম্।
কামেশ্বরীচরণ পঙ্কজয়োঃ প্রসাদাৎ॥ ১৪।

অধুনা শ্রী ১০৮ জগদীশ্বরীচরণ শরণৈকমানসৈ রস্মাভিঃ ভূত্বা পুরুষার্থং সর্ব্বভাবা বেদ শাস্ত্রোক্তেনৈব পথা সংসাধয়িতুং বদ্ধপরিকরৈ র্ভাব্য মেবাবশ্যক মিতি নো ধিষণা অতঃ সা ইত্থং স্তূয়তে শ্রুতিসার সমুদ্ধৃতাভি র্গাথাভিঃ।

পুরুষোচিত অধিকারলাভ করে, তাহাকে কখনও পূরণী সংখ্যা (দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যা] আশ্রয় করে না; অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তি জগতে অদ্বিতীয় হইয়া থাকে। উদারমতি কবিবর ভারবি ইহা তাহার গুণবত্তার অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। এই সারগর্ভ বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে আলস্য নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হে কৃতিগণ! আপনারা আপনাদের আত্মোন্নতি বিষয়ে যত্ন করিতে থাকুন।

এই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনকে লক্ষ্য করিয়া নানাদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণাগ্রণীগণ, আপনারা ধন্য; আমি আপনাদের দর্শনে আনন্দে গদগদ চিত্ত হইয়া সম্মানবাক্য দ্বারা আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পূর্ব্বে কখনও আমাদের আর্য্যদেশে জাতির মধ্যে এরূপ গ্লানি উপস্থিত হয় নাই, বর্ত্তমান এই জাতিগ্লানি মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। হে উদারমনা ব্রাহ্মণগণ! আপনারা নিজের ঔদার্য্যগুণকে সম্মুখীন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই ভয়াবহ জাতিগ্লানি নিবারণে সাফল্যলাভ করুন। হে মহানুভব সুধীগণ! আপনারা নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে আবাহন করিয়া এরূপভাবে উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হউন, যাহাতে আবার এই ভারতভূমি প্রতিভাশালিনী হইতে পারে।

হে সুধী মহাজনগণ আপনারা যদি এই মঙ্গলকর পথে নিজকেও আপনাদের বন্ধুবর্গকে সর্ব্বদা পরিচালিত করেন তাহা হইলে অবশ্যই অতি অল্পকাল মধ্যে সকল বিষয়ে শুভ ফললাভে সমর্থ হইবেন। অধ্যবসায় সম্পন্ন মনস্বিগণ যেরূপ আপন অভীষ্টলাভ করিয়া থাকেন, আমি আজ এই ব্রাহ্মণ মহাসভায় ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া, সমাগত সভ্যমণ্ডলীর পক্ষে সেইরূপ তাহাদের অভীষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গৌরব লাভের বিশেষ আশা করিতেছি।

আমার মনে হয় অধুনা আমাদিগকে শ্রীভুবনেশ্বরীর শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বতো

"পশুঃ" পশ্যামি পরাং দিব্যাস্তাং ব্রহ্মযোনিং হি।
পাপং বিধূয় পুণ্যং সাম্য মুপৈম্যেব যস্যাশ্চ ১

উৎপত্তি স্থিতি সংহৃতি কর্ত্রী ত্বং ভূতমাত্রস্য।
একৈব ব্রহ্মরূপা তাং ত্বাং নিত্যাং প্রপদ্যেঽহম্। ২

সত্যং জ্ঞান মনন্তং তত্ত্বং পরমে স্থিতং ব্যোম্নি।
আনন্দাত্মেতি পরং তব স্বরূপং বিজানামি। ৩।

বিদ্যা বিদ্যেতি পরং রূপদ্বয় মাহুরস্মভ্যাম্।
মুনয়ো বিমৃষ্য সকলং তত্ত্বং তেঽতোনমস্তভ্যম্॥ ৪।

ইন্দ্রস্যাপি বোধং পূর্ব্বং যা কৃতবতী দেবী।
হৈমবতী সোমা মে কামান্ দিশ্যাৎ কৃপাদৃষ্ট্যা। ৫।

অদিতি র্যা সম্ভবতি প্রাণেনচ দেবতা ময়ী পরমা।
তিষ্ঠন্তীং তাং হি গুহাং প্রবিশ্য জানামি জগদম্বাং।
যস্যাং কলাঃ সমগ্রা বিলয়ং যান্তীতি শ্রূয়তে পুংসঃ। ৬।

ভাবে শাস্ত্রোক্ত পন্থা অনুসারেই পুরুষার্থ সাধনে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। অতএব উপ-সংহারের শ্রুতির সর্ব্বস্ব এই স্তুতিবাক্য সমূহ তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি।

এই আমি দ্রষ্টা হইয়া সেই দিব্যরূপিণী পরমা বেদমাতাকে দর্শন করিতেছি। আমি পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া যাহার মান্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইব। তুমিই জীবমাত্রের সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারিণী, তুমি ব্রহ্মরূপিণী একান্ত সনাতনী, আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

পরমব্যোমে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এক অনন্ততত্ত্ব বিরাজমান, আমি কিন্তু তোমার স্বরূপতঃ আনন্দময়ী বলিয়া জানিতেছি। মুনিগণ সকল তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে তোমার রূপদ্বয় আমাদিগকে বলিয়াছেন, অতএব তোমাকে প্রণাম। পুরাকালে মুনিগণ সকল তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে তোমার রূপদ্বয় আমাদিগকে বলিয়াছেন, অতএব তোমাকে প্রণাম।

পুরাকল্পে যিনি ইন্দ্রেরও হৃদয়ে বোধ সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই হৈমবতী উমা কৃপাদৃষ্টি সঞ্চারণে আমাদিগের অভিলষিত দান করুন, যিনি মহাপ্রাণ হিরণ্যগর্ভের সহিত সর্ব্বদেবময়ী অদিতিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, আমার হৃদয়গুহায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমানা সেই তোমাকে আমি জগন্মাতা বলিয়া মনে করিতেছি।

যাহাতে পুরুষের সমগ্র কলা বিলীন হয় বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন। সেই চির রক্ষাকর্ত্রী পরাশক্তি দয়াগুণে মাতৃস্বরূপা স্বয়ং বেদপুরুষও শ্রী হ্রী ধী ইত্যাদিরূপে যাহাকে স্তব করিয়া

সৈব পরা মাতাসৌ দয়য়া বিজ্ঞেব নোঽবশ্যম্ ॥ ৭ ।
শ্রী হ্রীঁ হ্রীঁ রিতি ভক্ত্যা যাং স্তৌতিপরং বেদপুরুষোঽপি ।
সরঘাং হিরণ্যকোশে স্থিতামুপাস্যাং সদা বন্দে । ৮ । ইতি

থাকেন সেই হিরণ্ময় (মধু) কোশে সরঘা (মধুমক্ষিকা) রূপিণী উপাস্যদেবতাকে সদা অভিবাদন করি ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব ।

কেহ কেহ তন্ত্রশাস্ত্রকে আলোচনার অযোগ্য, অতি অকিঞ্চিৎকর, হেয় বস্তু মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মূল তন্ত্রশাস্ত্রগুলি আলোচনা করিলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রভূত উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন বিষয়ের শাখা মাত্রে কোন দোষ দৃষ্ট হইলে, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কেহ কেহ তন্ত্রশাস্ত্রকে, অন্ততঃ কতিপয় তন্ত্রকে বেদের বিধান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নূতন ও স্বাধীন বলিয়া মনে করেন; তাহাও ঠিক নহে। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মমত বেদ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা বেদবিরোধী নহে এবং তাহা হইতেও পারে না। কারণ বেদের মতগুলিকে সাধারণের বোধগম্য করিয়া বিস্তার করে বলিয়াই তাহার নাম তন্ত্র। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার করা।

অপর পক্ষে, তন্ত্রমাত্রেই শিববাক্য, এরূপ মনে করা বা বিশ্বাস করা বিজ্ঞ ও বিবেচকের কার্য্য নহে। তন্ত্রের মধ্যে কালক্রমে অনেক "বুড়া" শিব প্রবেশ করিয়া অনেক উপতন্ত্র ও অপতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতি সাবধানতার সহিত উপযুক্ত আলোক ব্যতীত ভ্রমণ করিলে সেগুলি পথ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া শেষে ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত পান করে। সেগুলিকে চিনিতে হইলে একগুঁয়েমী, গোঁড়ামী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, নিরপেক্ষভাবে অতি সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে এবং অনুসন্ধান করিয়া যেখানে পাওয়া যায় আলো সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। যদি বিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী প্রকৃত "সেথো" পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড় একটা চিন্তার কারণ থাকে না। কিন্তু সেরূপ "সেথো" এক্ষণে অতি দুর্ল্লভ, নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কারণ অনেক "বুড়া" শিবের চেলা ঐরূপ "সেথো"র বেশ ধরিয়া নিরীহ ব্যক্তিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া ঐ অপতন্ত্রের গর্ত্তে নিক্ষেপ করে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা "সন্ন্যাসীবাবা" "সাধুবাবা"

ইত্যাদি নামে অভিহিত তাঁহাদের মধ্যে পনর আনা উনিশ গণ্ডা (বোধ হয় আরও তিন কড়া তিন ক্রান্তি) ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত।

তন্ত্রশাস্ত্রে সকলশ্রেণীর সাধকের জন্য সাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাহ্যজগৎ অবলম্বন করিয়া; ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা সাধনাবিশেষের দ্বারা চিত্ত ক্রমে পরিশুদ্ধ না হইলে আন্তর বিষয়, আধ্যাত্মিক বিষয় আমাদের সম্যক উপলব্ধি হয় না। এইজন্য, আমাদের সমুদয় শাস্ত্রে প্রথমে জড়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে আন্তর বিষয়ে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তন্ত্রশাস্ত্রেও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। সাধারণ পঞ্চোপচারই বলুন বা সম্প্রদায়বিশেষের পঞ্চ-মকারই বলুন, সমস্ত প্রথম অবস্থায় জড়। তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে আন্তর পঞ্চে—পরে তাহাদের মূল এক পরব্রহ্মে উপনীত হইতে হয়। নির্গুণের ত কথাই নাই, সগুণ ব্রহ্মের সম্যক উপলব্ধি করা সাধারণ লোকের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মের এক এক বিভাবকে (aspect) নাম রূপের ভিতর আনিয়া উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, তারা এমন কি ষষ্ঠী, মনসা সমস্তই ব্রহ্মের বিভাব। যিনি যে ভাবকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করুন না কেন, শেষে ক্রমে যখন তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরিত হইবে, বিভাব ছাড়িয়া স্বভাবের দিকে লক্ষ্য পড়িবে; তখন সকল পথই ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া শেষে একস্থানে মিলিত হইতে দেখা যাইবে। সেই গন্তব্য স্থান পরমেশ্বর, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।

বিষ্ণু, শিব, শক্তিকে যাঁহারা বিভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। পরমাত্মা সকল শক্তির আধার। যিনি তাঁহার পুংভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলেন, তিনি তাঁহাকে ধাতা, পিতা, বিধাতা প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। আবার যিনি স্ত্রীভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলেন, তিনি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। যিনি তাঁহাকে যাহা বলিয়াই ডাকুন না কেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই উত্তর দিবেন, তিনি এক ভিন্ন দুই নহেন।

গন্তব্য স্থান জীবনের চরম লক্ষ্য সেই "এক"। তবে দেশ, কাল, পাত্র বা অধিকারিভেদে তাঁহাতে উপনীত হইবার সাধনা-পদ্ধতি ভিন্ন। এই বৈচিত্র্যময় জনসমাজে সাধনার পদ্ধতি বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক ও উচিত। সকলের পক্ষে একরূপ সাধনা-প্রণালীর উপদেশ সম্পূর্ণ সুফলপ্রদ হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না, সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে সাধনার অশেষ প্রকার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সকল সাধন-প্রণালীর লক্ষ্য এক, কিন্তু আমরা তাহা না বুঝিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকি। যাঁহারা ব্রহ্মের স্ত্রীভাবের উপাসক, শক্তির উপাসক, তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত দেখেন। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেরও গৌণ উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির নিবৃত্তি দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করা। চিত্তশুদ্ধ হইলে তবে তাহাতে ক্রমে আধ্যাত্মিক বিষয় প্রতিফলিত হয় এবং শেষে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়—ইহাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। ঐ মুখ্য উদ্দেশ্য

সাধন জন্য শাক্ততন্ত্রে দুই প্রকার উপদেশ দৃষ্ট হয়। ১ম সাত্ত্বিক ও প্রশস্তভাব প্রবৃত্তির কারণ হইতে দূরে থাকা; ২য় সংকোচ ও সংকীর্ণভাবে প্রবৃত্তিকে অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার ক্ষয় করিয়া নিবৃত্তিতে দেওয়া।

১। যাঁহারা ১ম মত অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা কাম ক্রোধাদির প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে লাগিলেন, যাহাতে মত্ততা জন্মে তাহা পরিত্যাগ করিলেন, "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ", এই নীতির অনুসরণ করিলেন, কামিনী কাঞ্চন হইতে দূরে থাকিয়া গন্ধাদি পঞ্চোপচারে মায়ের পূজায় রত হইলেন। ভগবান্ পশুপতি বদ্ধজীবের ত্রাণ করেন। সেই হিসাবে এই সম্প্রদায়ের নাম হইল "পশ্বাচারী" এবং ইঁহাদের সাধন-প্রণালী "পশ্বাচার" নামে অভিহিত হইল।

২। যাঁহারা সংকীর্ণমত অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করিয়া, নিবৃত্তির দিকে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রলোভনাদিতে লিপ্ত থাকিয়া নিবৃত্তির অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন।

যাঁহারা শেষোক্তরূপে সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সাধনা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ ব্যক্তিই সাধন-প্রণালীর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কেবল বাহ্যক্রিয়ারঅনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহার ফল একদিকে নির্জ্জীবতা, অপর দিকে গোঁড়ামী ও ধর্ম্মোন্মত্ততা। তাহাতেই জগতের ভণ্ডের অভাব নাই। তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ বাঁধাইয়া দিয়া এক দলে যোগ দিয়া স্বার্থ সাধন করা। এই শ্রেণীর লোকের প্রভাব ধর্ম্মজগতে সকল দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রেও ইহাদের প্রভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। তাহার ফলে এক দিকে শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ, অপর দিকে উক্ত সম্প্রদায় মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। পশ্বাচারীরা আপনাদিগকে বিশুদ্ধাচারী বলিয়া অপর সম্প্রদায়কে বামাচারী অর্থাৎ বেদ-বিরুদ্ধাচারী নামে অভিহিত করিল। ওদিকে বামাচারী সম্প্রদায় পশ্বাচারীদিগকে "পশু" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। পশ্বাচারীরা সর্ব্বপ্রকার অনাচার ও মদ্যপানাদি সর্ব্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিল। অপর পক্ষে মদ্য মাংসের ছড়াছড়ি আরম্ভ হইল। ঘারতর যুদ্ধ চলিল, প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র অপতন্ত্র ও উপতন্ত্রের আবর্জ্জনায় প্রায় নিমজ্জিত হইল। ঘরে ঘরে বিবাদ উপস্থিত হইল, বহিঃশত্রুরা নিশ্চিন্ত থাকে না, তখন তাহারা মিত্র সাজিয়া উপদেশ দিতে ক্রটী করে না। আধুনিক অনেক তন্ত্রগ্রন্থে শেষোক্ত ব্যাপারের যথেষ্ট লক্ষণ স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মজগতের এই বিপ্লবের দিনে হয় ত কোন ভণ্ড ধর্ম্মের নামে মদ্যাদি চালাইবার উদ্দেশ্যে পঞ্চমকার দ্বারা শক্তির উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া ছিল। অথবা কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মের গ্লানি

হইতেছে দেখিয়া সদভিপ্রায় প্রণোদিত হইয়া মদ্যাদি পঞ্চমকারের দ্বারা শক্তির উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষভাবে তত্ত্বদর্শী হইয়া গোঁড়ামী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তন্ত্র-শাস্ত্রসকল আলোচনা করিলে ইহার প্রধাণতঃ দুইটী উদ্দেশ্য উপলব্ধি হয়। (১ম) নিতান্ত তমোগুণান্বিত মানবগণের মোহালস্য দূর করিবার জন্য রজোগুণের উদ্বোধন পূর্ব্বক সত্বের দিকে লইয়া যাইবার জন্য উহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। (২য়) যাহারা মদ্যমাংসাদিতে পূর্ব্ব হইতে অনুরক্ত বা যাহাদের তাহাতে অনিবার্য্য প্রবৃত্তি, তাহাদিগকে প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া নিবৃত্তির পথে আনিবার জন্য মদ্য মাংস প্রভৃতি পাঁচটী বাহ্য উপকরণকে প্রথমে অবলম্বন করাইয়া আন্তর পঞ্চ ও পরিণামে এক ব্রহ্মবস্তুতে উপনীত করিবার উদ্দেশে উহা উপদিষ্ট হইয়াছিল। সাধারণভাবে আলোচনা করিলে এ ব্যবস্থা সমীচীন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ থাকিলেও দেশ, কাল, পাত্র, ও ক্ষেত্র-বিশেষে ঐরূপ ব্যবস্থা যে হইতে পারে না, তাহা নহে। আর এ ব্যবস্থায় ব্যভিচার ও বিপদের যে কতদূর সম্ভাবনা, তাহা ব্যবস্থাপক সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করিলেন যে, তন্ত্রোক্ত আচারচতুষ্টয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া বামাচারে উপনীত হইয়া পঞ্চতত্ত্বের সংকোচ অর্থবোধক মদ্যমাংসের দ্বারা জগদম্বার অর্চ্চনায় অধিকারী হইতে পারিবে, অন্য পক্ষে নিতান্ত তমোগুণান্বিত অনিবার্য্য আসক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন মনুষ্যগণ, সদ্‌গুরুর উপদেশ ও উপস্থিত পঞ্চমকার দ্বারা সাধনায় কেহ প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। যিনি পঞ্চমকার সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত আছেন, সেরূপ গুরুর উপদেশ ও পরিচালনা ব্যতীত উহাতে প্রবৃত্ত হইলে ব্যভিচার ও পতন অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান কলিকালে সেরূপ গুরু নিতান্ত বিরল এবং যাঁহারা ওপথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের শিক্ষা ও মনের বল অত্যন্ত অল্প। এরূপ অবস্থায় পঞ্চমকারের পথ অবলম্বনের যে বিষময় ফল, তাহা অধুনা নিত্য নিত্য চক্ষুর সম্মুখে পরিলক্ষিত হইতেছে। পঞ্চমকার দ্বারা সাধনার পথ যে নিতান্ত বিপদসঙ্কুল ও পতনসম্ভব, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। উপযুক্ত উপদেশক ও তত্ত্বদর্শী গুরুর অভাবে পঞ্চমকারের আচরণ করার জন্য উহার যে ব্যভিচার সংঘটিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অপর সাধারণে সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে আলোচনার অযোগ্য, নিতান্ত হেয় বস্তু বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা এক্ষণে পঞ্চমকারের দ্বারা শক্তির উপাসনার উপদেশ দিবেন, তাঁহারা নিজে একবার ভাবিয়া দেখিবেন পঞ্চমকারের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহারা অবগত আছেন কি না, যাঁহাদিগকে উহার উপদেশ দিবেন, তাহারা প্রকৃত অধিকারী কিনা, এবং তাহাদিগের ব্যভিচার ও পতন নিবারণ করিবার সামর্থ্য ও সুযোগ আছে কিনা। আর যাঁহারা এ পক্ষে আসক্ত, তাঁহারাও নিজে আচারশীল ধার্ম্মিক সদ্‌গুরু কি না। গৈরিক বস্ত্রপরিহিত রুদ্রাক্ষ-মালা পরিশোভিত রক্তচন্দনের তিলকবিশিষ্ট রক্তচক্ষু, যেসকল ব্যক্তি কথায় কথায় ষট্-

চক্র ভেদ করেন, এবং সঙ্গে একটী করিয়া "শক্তি" রক্ষা করেন, তাঁহারা কৈলাশপতি বিশ্বাধিপের লৌকিক রূপের অবজ্ঞাকারী, শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিত ক্ষীণবুদ্ধি, উন্মার্গগামী, সুরাপ্রিয় মনুষ্যগণের মোহবর্দ্ধনকারী ছদ্মবেশী প্রতারক।

তাঁহাদিগকে পঞ্চমকার—সদ্‌গুরু বিবেচনা করিলে অধুনা শতকরা ৯৯ ক্ষেত্রে প্রতারিত ও অধঃপতিত হইতে হইবে। এইরূপ বিপথগমনের সম্ভাবনা নিবারণ জন্যই আমাদের বর্ত্তমান পঞ্চমকারের আলোচনা।

পঞ্চমকারের দ্বারা সাধনা সাধারণভাবে সাধারণ লোকের জন্য উপদিষ্ট হয় নাই; ইহা আমরা বহুবার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। "তন্ত্র শিববাক্য, তাহাতে মদ্য মাংসাদি ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে, অতএব কোন দোষ নাই, মদ্য মাংস ব্যবহার কর" একথা যাঁহারা বলেন, এবং অন্য যে সকল শাস্ত্রে উহার ব্যবহার পুনঃ পুনঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে যাঁহারা অগ্রাহ্য করেন, অথবা বর্ত্তমান যুগের জন্য নহে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য মাংসাদির দ্বারা শক্তির উপাসনার যে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ অতি পবিত্র। পঞ্চমকারের সাধারণ এবং সংকীর্ণ অর্থ মদ্য মাংস এবং মৎস্য দ্বারা জগদম্বার অর্চ্চনা। তন্ত্রশাস্ত্র কাহাকেও সে অধিকার দেন নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে লোক-বিশেষে বা শ্রেণীবিশেষে ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইলে, অতি সাবধানতার সহিত সদ্‌গুরুর উপদেশ ও পরিচালনাসহ আচরণ করিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগেচ্ছা খাট করিতে হইবে। নতুবা ব্যভিচার ও অধঃপতনের একান্ত সম্ভাবনা। ভোগেচ্ছা খাট হইতে না দিলে "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" না সাধিলে সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু বাহ্য পঞ্চমকার সাধনায় ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করিয়া নিবৃত্তির অভিমুখে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহাই সচরাচর দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যখন সদ্‌গুরুর নিতান্ত অভাব, এবং সাধারণ লোকের শিক্ষা ও মনের বল নিতান্ত অল্প, তখন পঞ্চমকারের দ্বারা সাধনার উপদেশ বর্ত্তমান সময়ের জন্য বিহিত নহে, অনেক তন্ত্রশাস্ত্রে তাহাই স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে আদ্য ও অন্ত্য তত্ত্ব বিশেষভাবে ভয়ানক। সেইজন্য যাঁহাদিগের কুল-ক্রমাগত প্রথানুসারে এই পথে চলিতে হইবে, তাঁহাদের পক্ষে একালে ঐ দুই তত্ত্বের অনু-কল্পের ব্যবস্থা প্রামাণিক তন্ত্র মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চমকার দ্বারা শক্তির সাধনা ভিন্ন কলিকালে অন্য গতি নাই, একথা একদেশদর্শীর অশ্রদ্ধেয় বাক্য; বড় জোর উহা সম্প্রদায়বিশেষের নিষ্ঠা-উৎপাদক উপদেশ মাত্র। তন্ত্র-শাস্ত্রেই বিনা পঞ্চমকারে অথবা আধ্যাত্মিক পঞ্চমকারের সাহায্যে শক্তিসাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহা বিপদসঙ্কুল নহে, তাহাতে পতনেরও কোন বিশেষ সম্ভাবনা নাই। তাহাকে পশুর আচার বলিয়া ঘৃণা করিবার কোন কারণ নাই। হে কলিকালের মানবগণ!

তোমরা অতি দুর্ব্বল,—কি শরীরে, কি মনে তোমাদের আদৌ বল নাই। সুতরাং তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় মদ্য মাংসাদি দ্বারা জগদম্বার অর্চ্চনা একান্ত অসম্ভব।

যদি বল গিয়াছে বলিয়া মনে দুঃখ হয়, যদি অন্তরের অন্তর হইতে বীর হইবার বাসনা হইয়া থাকে, প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাক, সাত্ত্বিক উপকরণে তাঁহার পূজা কর। তমঃ ঘুচিয়া যাইবে, রজঃ জাগিয়া উঠিবে, সত্ত্ব বিকশিত হইবে, আর তাহাতে শক্তিস্বরূপিণী মা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবেন। তখন তোমার সম্মুখে দাঁড়ায় কে? যদি মদ্য মাংসে দুর্দ্দম প্রবৃত্তি থাকে, অথবা যদি তুমি ইতঃপূর্ব্বে উহাতে অনুরক্ত হইয়া থাক, এবং প্রলোভনকে সহসা ত্যাগ করিতে না পার, উহাদিগকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানিয়া উহা হইতে নিবৃত্তি হইবার বলের জন্য মাকে প্রাণ ভরিয়া ডাক, এবং যত শীঘ্র পার উহা হইতে নিবৃত্ত হও। 'নিবৃত্তিকে মূলমন্ত্র বলিয়া জানিয়া রাখ। অসদাচারী মদ্যপায়ী সম্প্রদায় ভোগেচ্ছা না করিয়া কর্ম্মেচ্ছু হইয়া সাধনার উপায়-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া মদ্যপান করে, তবে তাহাতেই তাহার প্রবৃত্তির ক্রমে নিবৃত্তি হইলে অবশ্যই তাহার সদ্গতি হইবে। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

কপটাচারীর মনোমুগ্ধকর কথায় কর্ণপাত করিও না। অহিফেন রোগবিশেষে উপকারী হইলেও, তাহা সাধারণের জন্য ব্যবস্থেয় নহে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া কোন ব্যক্তি অত্যধিক পরিমাণে সেবন করিয়াও সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, হয় ত তাহার কোন পীড়াদি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না, সর্পে দংশন করিলেও হয় ত তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহা দেখিয়া তাহাকে সিদ্ধপুরুষ মনে করিয়া তাহার দেখাদেখি অহিফেন সেবন করিতে আরম্ভ করিও না। সেইরূপ উপদেশ দেওয়ায় তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহার উপদেশানুসারে তুমি কার্য্য করিলে তাহার যথেষ্ট লাভ আছে। কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ ও তোমার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ।
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।
মুণ্ডক উপনিষদ্।

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
ইত্যাদি ... ...
মহৎ সেবাং দ্বারমাহু র্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ।
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥
শ্রীমদ্ভাগবতম্॥

জগদ্বাসিগণ সাত্ত্বিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তপস্যাচরণ করিবেন, শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিতেছেন; যাহারা নরলোকে জন্ম লইয়া মানব দেহ পাইয়াছে, তাহাদের ঐ দেহে বিষ্ঠাভোজী শূকরাদি-ভোগ্য দুঃখদ বিষয় ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে, তপস্যা সার বস্তু, তপস্যার দ্বারা চিত্ত পবিত্র হয়। তাহাতেই অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হইয়া থাকে। মহতের সেবা মুক্তির দ্বার, এবং যোষিৎসঙ্গী-দিগের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী, এবং যাহারা সর্ব্বপ্রাণীকে সমান দেখেন, তাহারাই মহৎ। আমি ঈশ্বর যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া তাহাই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, যাঁহারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তি পুত্র কলত্র ধন মিত্রাদিবিশিষ্ট গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন, এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহযাত্রা নির্ব্বা-হোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন, তাহারাই মহৎ। মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের সাধনে ব্যাপৃত হইলে প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে। একবার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া আত্মার এই ক্লেশকর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

লোকে যে পর্য্যন্ত না আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহে, সে পর্য্যন্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্ম-স্বরূপের অভিভব হয়, যে পর্য্যন্ত ক্রিয়া থাকে, সে পর্য্যন্ত এই মনে কর্ম্ম স্বভাব প্রকাশ পায়; ইহাই দেহবন্ধের কারণ।

হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্ত্যা
বিতৃষ্ণয়া দ্বন্দ্ব তিতিক্ষয়া চ।
সর্ব্বত্র জন্তোর্ব্যসনাবগত্যা
জিজ্ঞাসয়া তপসেহা নিবৃত্ত্যা
সৎকর্ম্মভির্যৎকথয়া চ নিত্যং
মদ্দেব সঙ্গাদ্গুণকীর্ত্তনান্মে।
নির্ব্বৈরসাম্যো পশমেন পুত্রা
জিহাসয়া দেহগেহাত্মবুদ্ধেঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

হংস ও গুরু-স্বরূপ যে আমি—আমাতে ভক্তি সহকারে অনুবৃত্তি করা, বিতৃষ্ণা, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, ইহ পরলোক সর্ব্বত্র সকল প্রাণীর দুঃখ দর্শন, তত্ত্বজিজ্ঞাসা তপস্যা, কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ, যাহারা আমাকে পরমদেব বলিয়া জানে, তাহাদের সহিত নিত্য সহবাস, আমার গুণকীর্ত্তন, নির্ব্বৈরতা, সমতা, উপসম, আত্মদেহ ও "আমি আমার" এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগের কামনা, অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জ্জন স্থানে বাস, প্রাণ ইন্দ্রিয় মন—এ সকলের সম্যক্ প্রকারে জয়, সৎশ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপরিত্যাগ, বাক্যসংযম, সর্ব্বদা মদীয় চিন্তানিপুণ—অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান, সমাধি—এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য, যত্ন ও বিবেকবান্ হইয়া অহঙ্কার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। ধীরব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে আকর্ষণ

করিয়া, বুদ্ধির সাহায্যে ঐ মনকে সর্ব্বতোভাবে ভগবানে নিবিষ্ট করিবেন। সর্ব্বব্যাপক ঐ মনকে আকর্ষণ করিয়া ভগবৎ চিন্তা করিবেন। ভগবান্ সমুদয় সিদ্ধি, মোক্ষ, মোক্ষ-সাধন জ্ঞান, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রহ্মবাদীদিগের কারণ, ভগবান পালনকর্ত্তা ও প্রভু। ভগবান আবরণশূন্য সর্ব্বদেহীর ব্যাপক, অন্তর্য্যামী আত্মা, যেমন ভূত সকল ভূতগণের অন্তর ও বাহ্যে অবস্থিত, সেইরূপ ভগবানও সকলের বহিরন্তরস্থ। তিনি সকল ভূতের আত্মা, সুহৃদ ও ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বভূত এবং তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের হেতু। তিনি বেদাধ্যাপক হিরণ্যগর্ভ এবং মন্ত্রগণের মধ্যে অবয়বত্রয়সম্পন্ন ওঙ্কার। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়। তিনি বিনা কোথাও কোন পদার্থ নাই। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য বাক্য সংযত করা, মন সংযত করা, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত করা, এবং আত্মার দ্বারা আত্মাকে সংযত করা, যে যতি মন দ্বারা বাক্য ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত না করিয়াছেন, আমঘটান্ত বারির ন্যায়, তাঁহার ব্রত, তপস্যা ও দান বিগলিত হইয়া যায়, ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি, মন ও প্রাণ সংযত করিবেন, তৎপর ভগবদ্ভক্তি বিদ্যা দ্বারা কৃতার্থ হইবেন। যেমন সমৃদ্ধশিখ অগ্নি কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভগবদ্বিষয়া ভক্তি যাবৎ পাপ দগ্ধ করিয়া থাকে। ভগবৎপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ব্যতীত—যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যায়ন, তপস্যা এবং দান দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। সত্য দয়াসমন্বিত ধর্ম্ম বা তপোযুক্ত বিদ্যা ভগবদ্ভক্তিশূন্য আত্মাকে সম্যক প্রকারে পবিত্র করিতে অসমর্থ।

ধ্যায়েদ্ যো হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং সর্ব্বস্য পীঠালয়ং
দেবস্যানিলহীনদীপকলিকা হংসেন সংশোভিতং।
ভানোর্মণ্ডলমণ্ডিতান্তরলসৎ কিঞ্জল্কশোভাধরং
বাচামীশ্বরোঽপি জগতীরক্ষা বিনাশক্ষমঃ।

ষট্‌চক্র নিরূপণ তন্ত্র।

কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্বকামদ এবং ক্রীড়মান শিবের নিত্য আবাস স্থান সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভাবশালী ও বায়ুহীন দীপশিখাকার জীবাত্মার দ্বারা শোভাসম্পন্ন অনাহত পদ্ম। ঐ পদ্মের ধ্যান করিলে উপাসক বাক্‌পতিত্ব প্রাপ্ত হন এবং সৃষ্টিস্থিতিসংহারকরণে সমর্থ হন। কিন্তু আত্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি সম্ভাবনা অতি কম। পূজা, হোম, তপঃ, জপ এবং যম ও নিয়ম প্রতিপালনের সঙ্গে আত্মজ্ঞান না হইলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই যথা ;—

ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি
ব্রহ্মজ্ঞোঽহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥

আত্মজ্ঞান নির্ণয়ঃ তন্ত্র।

কি জপ, কি হোম, কি উপবাস, অহং ব্রহ্ম এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না।

জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ। ঐ তন্ত্র।

আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেয় এবং আত্মাই জ্ঞাতা। ঐ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই আত্মবিৎ বলা যায়।

কর্ম্ম সর্ব্বত্র আদিষ্টং ন জানামি চ কিঞ্চন।
কর্ম্মব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
(জীবন্মুক্তি গীতা)।

শাস্ত্র বিহিত কার্য্য পরিজ্ঞাত থাকিয়াও সমুদয় কার্য্যকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত কহে।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র বা মানবের জীবন-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গতবারে মানবের জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে পূর্ব্বাভাষ দিয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ, আরও কতকগুলি কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বলিতে হইবে, নতুবা "জীবন-বিজ্ঞান" হিন্দুর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সহিত কতদূর সংস্পৃষ্ট, তাহা পাঠকের পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে। এই পূর্ব্বাভাষের সূত্রগুলিকে আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যতের বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হইবে।

এই আর্য্যভূমি—ভারতের প্রধান গৌরবের বিষয় আর্য্যগণের প্রাণস্বরূপ বেদ। ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণ সেই অপৌরষেয় বেদের মন্ত্র সকলের দ্রষ্টা ছিলেন, বেদের ছয়টি অঙ্গ, সেই ষড়ঙ্গ বেদের মধ্যে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষু জ্যোতিঃ-শাস্ত্রমকল্মষম্।

জ্যোতিষ যদি বেদাঙ্গ হয়, পূর্ণ সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—আজকাল জ্যোতিষীদের প্রতি সকলে শ্রদ্ধাহীন কেন? যাহা সত্য, তাহা জগতের লোক-সমাজে চির আদৃত হইয়া আসিতেছে, তবে জ্যোতিষের প্রতি লোকে ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হইতেছে কেন?

এরূপ প্রশ্ন করিবার পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট অধিকার আছে। প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমরা উৎসুক। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে প্রশ্নের বিশদভাবে উত্তর দিবার উপায় নাই,—স্থানাভাব, এজন্য সংক্ষেপে এখানে দুই চারি কথা বলা যাইতেছে।

পাঠকগণ যে সকল জ্যোতিষীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ, যাঁহাদের গণনার ফলাফল দর্শনে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপরে পর্য্যন্ত পাঠকগণ হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সেই সকল জ্যোতিষীর মধ্যে অনেকেই মূর্খ; প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতিয়া—বিজ্ঞাপনের চটকে জনসাধারণকে ভুলাইয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বসিয়া আছেন। অনেকেই ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া, কোন দিন সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচিত না হইয়া বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। তার পর, উদরান্নসংগ্রহের আশায়, দশ-পনর টাকার জন্য বহুদিন উমেদারী করিয়া উপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া, কলিকাতায় আসিয়া, "তিব্বত হইতে প্রত্যাগত" "প্রধান জ্যোতিষী" ইত্যাদি সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া ব্যবসা করিতে বসিয়াছেন।

হিন্দুর জ্যোতিষ বেদের অঙ্গ, ইহা লোক ভুলাইয়া টাকা উপার্জ্জনের জন্য আবিষ্কৃত হয় নাই, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের জ্ঞান গুরুবক্ত্রগম্য, উপযুক্ত অধিকারী না হইলে বেদ পাঠ করিবার অধিকার পূর্ব্বে এদেশে কাহারও ছিল না। "প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ, শাস্ত্রকার মুণিঋষিগণ লোভী ছিলেন, ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে হইবে, ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রশিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন" ইত্যাদি প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই, তবে একথা যথার্থ যে, প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এদেশে বিদ্যা বিক্রয় করিতেন না, ভিক্ষা করিয়া অন্নবস্ত্র সংগ্রহকরতঃ তদ্দ্বারা ছাত্রগণকে ভরণপোষণ করিয়া, স্বগৃহে চক্ষের সম্মুখে অপত্যনির্ব্বিশেষে ছাত্রগণকে পালন করিতেন,—শিক্ষাদান করিতেন।

কিন্তু শিক্ষার্থীদিগকে প্রথমে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদির সাধনায় শুদ্ধচিত্ত এবং সাধনোপযোগী হইয়া, তবে ছাত্ররূপে পাঠগ্রহণের অধিকারী হইতে হইত। সর্ব্বপ্রকার পরাবিদ্যার জননী ভারতভূমিতে কোন যুগে, কোন কালে উপযুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর অভাব ঘটে নাই। তবে ইহাও সত্য যে, এই মহান্ বেদাঙ্গ—জ্যোতিষের বিদ্যা, অনুপযোগী সাধারণের পক্ষে শিক্ষার উপায় ছিল না, সেজন্য এই শাস্ত্রের অপব্যবহারে লোকবঞ্চনারও উপায় ছিল না।

বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ—মুক্তিলাভের রহস্য—সেই সকল সাধকের পক্ষেই উপযোগী, যাঁহারা মুক্তির জন্য, পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য সাধনপরতন্ত্র। বেদরূপ জ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার ষড়ঙ্গ বেদের ছয়টি অঙ্গরূপ অর্গলে আবদ্ধ। জ্যোতিষ-শাস্ত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান অর্গল, এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিলে প্রথম অর্গল মুক্ত করা যায়।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—গণিত ও ফলিত। গ্রহগণের পরস্পর দূরত্ব, গতিবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ গণিতের সাহায্যে হয়, এজন্য বলিতে হইবে যে, সূক্ষ্ম গণিতাংশের ধারণা প্রথমে প্রয়োজন। গ্রহগণের স্থিতি প্রভৃতি অভ্রান্তরূপে স্থিরীকৃত না হইলে ফলিতাংশের গণনায় অভ্রান্ত ফললাভ অসম্ভব।

"মানবের জীবন-বিজ্ঞানের" আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমেই মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়, যথা—কি কারণে আমার এ সংসারে আগমন হইল, কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেই বা আমি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি? ঈশ্বর যদি ন্যায়বান্ বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তবে তাঁহার অধীন মানবের রাজ্যে সুবিচার আছে, আর সেই রাজাধিরাজের রাজ্যে অবিচার হইতেছে বোধ হয় কেন? তুমি ধনী, আমি নির্ধন, আর আমার প্রতিবাসী মধ্যবিত্ত কেন? এ প্রশ্নের সমাধানে ব্যাপৃত হইয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পড়িয়া নানারূপ উত্তর পাওয়া গেল, তাহাতে তুমি হয়ত সন্তোষলাভ করিলে, কিন্তু আমি দরিদ্র বিধায়, আমার সে সকল উত্তরে চিত্তে শান্তি জন্মিল না। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত, পণ্ডিতগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান তোমার আমার অপেক্ষা বেশী, কাজেই তর্কে পরাভূত হইলাম, এক্ষেত্রে আমার তোমার অভ্যন্তরে ঈশ্বরদত্ত সহজ যে জ্ঞান আছে, তাহার দ্বারা এ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করা যাউক।

প্রত্যেক মানবের আত্মাই সেই অজর, অবিনাশী পরমাত্মার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। এ জন্য মানবাত্মাও অবিনাশী, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য এবং অদাহ্য। তন্ত্রের একটি মাত্র ছত্রে এই মহান্ সত্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই ছত্রটি বাঙ্গালায়;— "জীব শিব, শিব দেব"। "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ!"। সেই অবিনাশী পরমাত্মা সম্পূর্ণ অপার্থিব। এজন্য অপার্থিব পরমাত্মার সহিত অপার্থিব আত্মার সম্বন্ধের তুলনা পার্থিব বস্তুর দ্বারা হইতে পারে না। অথচ, পার্থিব জীব আমরা,— আমাদের পক্ষে পার্থিব তুলনা ভিন্ন বুঝিবার, ধারণা করিবার উপায় নাই। পার্থিব বস্তুর দ্বারা তুলনা করিয়া বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে, সেই তীর্থযাত্রার প্রারম্ভেই অসীম অগ্নি-সমুদ্ররূপ পরমাত্মা হইতে অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ মানবাত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

প্রত্যেক বিচ্ছিন্ন মানবাত্মা, কল্পনাতীত যুগে, অনন্ত পরমাত্মার সিংহাসনতল হইতে তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যেক মানবাত্মা স্বয়ং পূর্ণ ও বিশিষ্ট, ঈশ্বরের নিয়মে—স্বতঃ অভিব্যক্তির ফলে,—বর্ত্তমান কালে, জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া এই সংসার—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মের বীজ বপন করিতে করিতে উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আবার, কর্ম্মবীজবপনের যেমন নিবৃত্তি নাই, তেমনই স্ব স্ব কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত ও শাখা-প্রশাখায় পরিণত হইয়া ফল-ফুলে শোভিত হইতেছে। সংসারে আমার বাগানে আমি একটি আম্রবীজ রোপণ করিলাম, তাহা ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইয়া, কালক্রমে সহস্র সহস্র ফল প্রসব করিল, পরীক্ষায় বুঝিলাম ফলগুলি মিষ্ট বা সুখাদ্য নহে, নিতান্ত অম্লগুণসম্পন্ন; তখন আমি ফলগুলি ফেলিয়া দিতে পারি, ভক্ষণ করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন।

কিন্তু, সংসারকর্ম্ম-ক্ষেত্রে এরূপটী চলিবে না। স্বীয় শ্রমজাত রোপিত বীজ অম্ল হউক, তিক্ত হউক, স্বীয় শ্রমবারিনিষেকে সে ফলগুলি সংগ্রহ আমাকেই করিতে হইবে, সে ফলগুলি আমাকেই ভোগ করিতে হইবে, "আমি পারি না, ভাল লাগে না;" "খাইব না"

বলিয়া ত্যাগ করিবার উপায় নাই, স্বীয় কর্ম্মবীজপ্রসূত ফলগুলি আমাকে ভোগ করিতেই হইবে,—সঙ্গে সঙ্গে, সে গুলির সাহায্যে আমাকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহার ফলে, আমার—"জীবের"—"আমিত্বটি" পূর্ণায়তন ও বলবান হইয়া অন্যান্য জীবের সহিত "আমার" বৈশিষ্ট্যটি ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে, তীর্থযাত্রার আরম্ভ কালে তুমি, আমি, মধু এবং হরি সেই একই পরমাত্মার সিংহসনতল হইতে যাত্রাকালে যে একীভাব, একী-গুণ-সম্পন্ন ছিলাম, তাহা এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জীবের নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম তীর্থ-যাত্রাকালে, যদি বুঝিবার জন্য ধরিয়া লওয়া যায়, সকল যাত্রীই "জন্তু" পদবাচ্য ছিল, এক্ষণ এইরূপ অভিব্যক্তির ফল ওটা "সিংহ," এটা "ব্যাঘ্র," অন্যটা "হস্তী," অপরটা "শৃগাল" হইয়া দাঁড়াইল, প্রত্যেকে একই নামধারী বিভিন্ন দেহী হইবার সুযোগ পাইল।

আর একটু বিশিষ্ট স্তর,—মানুষের পদবী লইয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে, প্রথমে সকলে মধ্যএশিয়া হইতে তীর্থযাত্রা করিয়াছে। কতকগুলি লোক হিন্দুকুশ পার হইয়া পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছে; ইহারা হিন্দুপদ বাচ্য। ইহারা যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে,—কর্ম্মের দ্বারা, হিন্দু পদবাচ্য হইবার উপযোগী নাম ও রূপ পাইয়াছে। আর কতকগুলি লোক পারস্যে প্রবেশ করিয়া পারশী বলিয়া আখ্যাত হইবার উপযোগী নাম ও রূপ পাইয়াছে। এই এইরূপ গ্রীক, রোমান, ইংরাজ ও ফরাসী হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজের সহিত হিন্দুর বিশেষ পার্থক্য জন্মিয়াছে।

মধ্যএসিয়া হইতে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে হিন্দু, গ্রীক ও রোমানের যে একই জাতীয়তা ছিল, তাহা হারাইয়া কতকগুলি মানুষ হিন্দুর রূপ, গুণ ও আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর কতকগুলি গ্রীকের রূপ, গুণ ও আখ্যা লাভ করিয়াছে, কিন্তু সকলেই মানুষ বলিয়া আখ্যাত হইবে সন্দেহ নাই।

তোমার ও আমার জন্মজন্মান্তরে অনেকরূপ দেহ ধারণ করিয়া অনেক কর্ম্মবীজ বপন করিতে হইয়াছে, অনেক প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। অনেক জন্ম; "এটা আমার, ওটা আমার," বলিয়া পরস্পর লড়াই করিয়া তবে এতটা এ জীবনে আমিত্বের প্রসরণে সমর্থ হইয়াছি। ফলে কিন্তু, ঝড়ে পড়া ফুলের মত আপন শক্তি হারাইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে বাধ্য নহি; ভাগ্য-চক্রে শৃঙ্খলিত, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—হারা দাসত্বে পরিণত হই নাই। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মবলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাকে কার্য্যে লাগাইয়া আপনার মনুষ্যত্বের সম্প্রসারণ করিতে হইবে, উন্নতির বর্ত্ম পরিষ্কার করিবার জন্য জন্মান্তরের বহুদর্শিতাকে নিয়োগ করিতে হইবে। এ কারণে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি। মনুষ্যোচিত জ্ঞান ও বুদ্ধি পাইয়াছি।

দেবজগৎ ও পশুজগতের মধ্যে মানবের স্থান। মানুষের আবরণের মধ্যে সেই পবিত্র আত্মা বিরাজিত। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মের স্রোতে তোমায় দেহ মনকে ছাড়িয়া দিলে, ভাগ্যের স্রোতে তোমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তাহাতেও উন্নতি আছে, কিন্তু সে

উন্নতি পশু-জগতের জন্য, মানবের জন্য নহে। পূর্ব্ব জন্ম-জন্মার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলে পার্থিব আবরণে আবদ্ধ আত্মাকে ক্রমে পার্থিব হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পশুত্বের গুণাবলী ত্যাগ করিয়া, দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতার গুণাবলী গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—সকল শক্তির অন্তরালে জগজ্জননীর মহীয়সী শক্তি খেলিতেছে। তুমি সেই জগন্মাতার পুত্র, মায়ের অফুরন্ত শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াই পুনরায় তোমাকে জগন্মাতার চরণতলে পৌঁছিতে হইবে। এখনও তোমার আমার ভিতরে, চন্দ্র-সূর্য্যের ভিতরে, সেই এক অনন্ত জগন্মাতার মহীয়সী শক্তিই খেলিতেছে। পঞ্চাশখানি দর্পণে সেই একই মহান রবিচ্ছবি প্রতিভাত হইতেছে। মধ্যে মায়া আসিয়া সকলকে পঞ্চাশটি বিভিন্ন সূর্য্যের অবস্থিতির কথা বুঝাইয়া দিতেছে। মায়া অপসারিত হউক, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হউক, তখন একই সূর্য্যের কথা বুঝা যাইবে।

এক একখানি কোষ্ঠী সেই তীর্থের বর্ত্মপার্শ্বস্থ এক একখানি দূরত্বপরিচায়ক "মাইল-ষ্টোন্" বা প্রস্তর। কলিকাতা হইতে কাশীদর্শনের জন্য যাত্রা করিয়া কোন্ যাত্রী কত মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছে, সেই স্থানের নাম, ধাম, কর্ত্তব্য, প্রভৃতি সেই মাইল-ষ্টোন বা জাতচক্রের সাহায্যে নির্ণীত হওয়াই কোষ্ঠী প্রস্তুতের উদ্দেশ্য। সে স্থানে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুগণের প্রাবল্য কিরূপ, তাহা বুঝিয়া সতর্ক হইতে হইবে, দেবচরিত্রোপযোগী কতটা শুভ লাভ হইয়াছে, আর কি দৈবগুণ সে স্থানে, অর্থাৎ সে জীবনে, লাভ করা যাইতে পারে, তাহা জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে।

আবার জন্মকালীন গ্রহচক্রে সেই মানবের পূর্ব্বজন্মের কার্য্যপ্রণালী বেশ বুঝা যায়, আর এজন্মের ভোগাভোগনির্দ্দেশক ফলগুলি মিলাইলে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মপ্রণালীর সহিত বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়, জ্যোতিষশাস্ত্রই এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ। চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল প্রভৃতির অবস্থান দৃষ্টে জাতক-জীবনের ফলাফল বলা যায়। আমাদের এই সৌরজগতের সূর্য্য যেমন প্রাণস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, মানবের দেহ জগতেও আত্মাই সর্ব্বস্ব। জন্মকালীন গ্রহচক্রে সূর্য্যের অবস্থানদর্শনে জাতকের অবস্থা বলা যায়, এজন্য নারায়ণের ধ্যানে উল্লেখ আছে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ,"—এজন্য এদেশে সূর্য্যপূজার এত প্রাধান্য।

সৌরজগতে সূর্য্য গ্রহরাজরূপে প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছেন, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি তাঁহারই আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া পৃথিবীকে রসদান করিতেছেন, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নদী ও সমুদ্রের জলে জোয়ার ভাটার বিধান করিতেছেন, ওষধিলতা পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন, সে সকল ওষধিও মানবের জীবনরক্ষা ও রোগদূরীকরণে সমর্থ হইতেছে, জীবের রক্ষা কার্য্য সাধিত হইতেছে, সৃষ্টি পরিবর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত হইতেছে। তদ্রূপ কোষ্ঠীতে চন্দ্রের স্থিতি ও গোচর প্রভৃতির দ্বারা তাৎকালিক যে মানবের জন্ম হইয়াছে, তাহার ভিতরে চন্দ্র কিরূপ কার্য্য করিতেছেন,

তাহা বুঝা যায়। জেলার মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যেরূপ আমাদের রাজার শক্তিলাভে সেই শক্তিরই পরিচালনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ চন্দ্র, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণ সৌর-জগতে সূর্য্যেরই অধীন এবং তাঁহার রাজত্বের পরিচালন কার্য্যে সাহায্যকারী। চন্দ্র যদিও ওষধি লতার পরিবর্দ্ধন করিতেছেন, কিন্তু সে শক্তিও তাঁহার জ্যোতিঃ তাহার নিজস্ব নহে। সে শক্তি ও জ্যোতিঃ গ্রহরাজ সূর্য্য হইতে লাভ করিতেছেন। মানবের কোষ্ঠীতেও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের দূরত্ব ও সম্বন্ধ দর্শনে মানবের মানসিক জ্ঞানের অল্প বা অধিক জ্যোতিঃ বুঝা যায়। বারান্তরে গ্রহগণের শক্তির সহিত মানবের জীবন-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সম্বন্ধ কিরূপ, তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী।

প্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঝালকাঠি—বরিশাল জেলার প্রধান বন্দর। এই স্থানের বাণিজ্য পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে প্রধান। নদীবক্ষ হইতে ঝালকাঠিকে দেখিতে ঠিক একটী শ্বেতপদ্মের ন্যায় দেখায়। এই স্থানে থানা আছে, মিউনিসিপলিটী আছে, ষ্টীমারের প্রধান আড্ডা আছে, "গুরুধাম" বলিয়া জমীদারের কাছারী আছে, প্রায় সহস্রাধিক ব্যবসায়ী এই স্থানে ব্যবসা করে, ইহার অতি নিকটে কৃষ্ণকাঠি গ্রাম। গোস্বামী গৌরীচরণ এই গ্রামের পুরাতন অধিবাসী, নদীর পরপারে "পোনাবিলার চৌধুরীগণের" দীক্ষাগুরু, কিন্তু শিষ্য চৌধুরীবংশ নিঃস্ব হইয়াছেন বলিয়া গোস্বামী দরিদ্র। কৃষ্ণকাঠির পার্শ্ব দিয়া বাজারের রাস্তা গিয়াছে, থানা এই রাস্তার পার্শ্বে।

বালক রাধাচরণ আম লইয়া যাইতেছে, এমন সময় একটী কনেষ্টবল আসিয়া তাহার হাতে আম দেখিয়া ডাকিয়া থানায় লইয়া গেল। তথায় দারোগা বাবু ছিলেন—তিনি বালকের হস্তে প্রথম বৈশাখের পাকা আম দেখিয়া একটী লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ আম কোথায় পেয়েছিস, বালক বলিল তাতে দরকার কি, দাম দিয়ে তবে লও—দারোগা বালকের তেজ দেখিয়া মনেমনে খুসি হইলেন, কিন্তু তাহার পদের গরমে কহিলেন - তুইতো ছোঁড়া ভারি জ্যেঠা—আচ্ছা এর দাম কত? উত্তর হইল দু আনা। দারোগা তখন আম দুইটীর মধ্যে ভাল পাকা বড় আমটী লইয়া বলিলেন, এক আম দুই আনা—বজ্জাৎ কোথাকার—তুই গুরুধামের বাগিচা হইতে আম চুরী করিয়া এনেছিস? বালক বলিল—ভদ্রলোকের ছেলে চুরি জানে না—ভিক্ষা করিবে, তথাপি চুরি করিবে না, কুকাজ করে না ও জানে না।

দারোগা। 'বটে—কুকাজ সুকাজ বুঝিস্? কুকাজ কোন্ গুলো?

রাধা। চুরি করা, জুয়াচুরী করা, পরের দ্রব্য কেড়ে নেওয়া, গরীবের মুখের গ্রাস টেনে ক্ষমতার অপব্যবহার করা, লোকের উপর অত্যাচার করা।

দারোগা। বা রে জ্যেঠা ছেলে। তুই এঁচড়ে পেকে রসা হয়েছিস্।

বালক। অত কথায় কাজ নাই বাবু, আম নেবে তো দাম দেও। আমরা উপবাসী, আম বিক্রী করে চাউল কিনবো।

দারোগা। ও তুই সেই ছোড়া নাকি? গৌরীচরণ গোঁসাইর ছেলে; চিনেছি—নিলামে মালপত্র তোদের আজ না বিক্রয় হয়েছে, তোর পিসি নাকি বড় রূপসী? বালক গর্জ্জিয়া উঠিল, আমি থানায় তাহার এজেহার দিতে আসি নাই, দাম দেও, নয় আম দেও। দারোগা চটিয়া উঠিলেন,বালকের সৎসাহস দেখিয়া আবার বিস্মিতও হইলেন, এবং বলিলেন—এই আমটি আমি রাখিলাম। তুই এইটি যে মূল্যে বিক্রী করবি, আমি তার দ্বিগুণ দেব। যা বাজারে যা।

রাধাচরণ অগত্যা একটী আম হাতে লইয়া প্রস্থান করিল। দারোগা বাবু নূতন পদার্থ পাইয়া তাহা লইয়া কন্যার হাতে দিলেন—সে বালিকা তখনি তাহা খাইয়া ফেলিল। বিক্রেতা রাধাচরণ বাজারে চলিল, পথে আবার নূতন বিপদে পড়িল।

দূরে একটী সাহেব অশ্ব লইয়া আসিতেছিলেন। পায়ে হাঁটিয়া জানিনা কি কারণে সাহেব অশ্বের বলগা ধরিয়া আসিতেছেন। বালকের সহিত পথে দেখা হইল। বালক সাহেবকে চিনিল না, কিন্তু আম লইবার জন্য যেই হাত বাড়াইলেন, অমনি রাস্তা ছাড়িয়া নিকটের একটী ধান্যের জমির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তখন তথায় গিয়া যেই উপস্থিত হইলেন অমনি বালক কান্দিয়া বলিয়া উঠিল—'হা শ্যামসুন্দর! তোমার পূজা বুঝি আর করিতে পারিলাম না।' সাহেব শ্যামসুন্দরের কথা শুনিয়া বুঝিয়া লইলেন ও সেই জলে ভিজা ঠাকুরের নাম শ্যামসুন্দর। ঠিক কথা, সে ঠাকুর শ্যামসুন্দরই বটে; রূপ প্রাণে জড়িয়ে গেছে।

প্রকাশ্যে বলিলেন—টোমার ভয় নাই! হামি টোমার আম মূল্য ডিয়া লইবং; এই লও বলিয়া সাহেব একখানি ২০ কুড়ি টাকার নোট রাধাচরণের হাতে দিয়া—বলিলেন যাও, টোমার ঠাকুর পূজা করগে। গোলোকমণ্ডল টোমার ঠাকুরঘর মেরামত করিয়া ডিয়াছে টো?—রাধাচরণ নোট লইয়া রাস্তায় উঠিল। সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া পল্লীর দিকে চলিয়া গেলেন। বালক সাহেবের কথা ভাবিতে ভাবিতে একপা দুইপা করিয়া থানায় দারোগার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। দারোগা তখন তাহাকে দেখিয়া বলিল—কিরে ছোকরা, তুইতো ভারী বদ্, একটা শুকটা আমের দাম লইতে এসেছিস? বালক বলিল—বাবু আমরা গরীব, ঐ আম আমার বাড়ীর নয়, একজন দিয়াছে। উহা বিক্রী করে চাউল কিনিব, তবে খাইব। আপনি দাম দিন।

দারোগা। বাজারে সে আম কত বিক্রী করেছিস্?

রাধা। এই দেখুন, কুড়ি টাকা।

দারোগা। দুর ছোঁড়া, একটা আম কুড়ি টাকা হয় রে? তুই নিশ্চয় কার নোট চুরি করে এনেছিস্।

রাধা। আবার চুরি, থানায় থেকে চুরি ডাকাতি ভিন্ন আর বুঝি অন্য কথা আপনাদের মুখে নাই। পৃথিবীতে সকলে দারোগা নয়। আমি কুড়ি টাকায় আম বিক্রী করিয়াছি।

দারোগা তখন নোটখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল; একটী কনেষ্টবলকে বলিল—এই ছোঁড়াকে ধরে রাখ। আমি বাজারে গিয়া তদন্ত করে দেখে আসি কার নোট হারাইয়া গিয়াছে, এই বলিয়াই দারোগা উঠিল। কনেষ্টবল রাধাচরণকে নিকটে লইয়া থানাঘরের বারান্দায় গিয়া বসিল। দারোগামহাশয় বাজার হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—ওহে বাছেরখাঁ কনেষ্টবল, আমিতো বলেছি, এ ছোঁড়া চোর, এই দেখ—এই কালুসাহের নোট চুরি করে এনেছে। ছোঁড়া এর দোকানে গিয়া বসে এটা ওটা দেখিতেছিল। সাহাজি তখন নোটের হিসাব মিলাইয়া ভুলক্রমে একখানা কুড়ি টাকার নোট দোকানের গদিতে ফেলিয়া খদ্দেরকে লবণ দিতে অন্য ঘরে গিয়াছেন—এই অবসরে ছোঁড়া নোট লইয়া আমটি পথে বসে খেয়ে চলে এসেছে।

কনেষ্টবল কিন্তু একথা বিশ্বাস করিল না, কারণ সে ইতিমধ্যে রাধাচরণের নিকট সমস্ত শুনিয়াছে। বলিল—সাহাজি প্রকৃতই কি তোমার নোট হারাইয়াছে? সাহাজি বলিল হাঁ। এই ছোঁড়া কি তাহা লইয়াছে? দেখেছ—না জান? এই বলিয়া বাছেরখাঁ কনেষ্টবল রাধাচরণকে দেখাইল। দোকানদার তাহাকে পুর্ব্ব হইতে চিনিত। দেখিয়াই বলিল, না এ লয় নাই, হারাইয়াছে—কে নিয়াছে তাহা জানি না। দারোগা বলিলেন তোমার ভয় নাই সাহাজি, খোলাশ এজাহারের ভয় রাখনা—বল যে এই নিয়েছে। তাহ'লে নোট পাবে, আর বদমাইস ছোঁড়া জব্দ হবে। কি বদ্‌ছোকরা রে বাবা, এই বয়সে এই। এখনও মুখে দুধের গন্ধ আছে,—না জানি পরিপক্ক বয়সে ছোঁড়া কিরূপ বদমাইস বা হয়। একটা আম নাকি কুড়ি টাকা বিক্রী হয়? দেখ সাহাজি তোমাকে যা বলি সেইরূপ বল; আমি ডায়েরি প্রস্তুত করি। তাহ'লে টাকাও পাবে, আর এই চোর ছোঁড়াটা শিক্ষা পাবে।

এইরূপ বলিয়াই দারোগাবাবু রাধাচরণের হাত বান্ধিতে হুকুম দিলেন।

বাছের খাঁ কনেষ্টবল আর থাকিতে পারিল না। উচ্চ কর্ম্মচারিমহাশয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কহিল—বাবু একটা সামান্য বালক লইয়া যৎসামান্য একটা আমের জন্য প্রকাণ্ড একটা কাণ্ড ঘটাইবেন না; এতে পরিণামে ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হবে। এ বালক চোর নহে।

দারোগা ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন—তোমার গাঁয়ের লোক বুঝি? এর পিসিকে মাকে চেন? প্রাতে মুনসী মহাশয়কে লইয়া একটা কাণ্ড করেছে—তারপর এই চুরি; এসব তদন্ত না করিলে এই থানায় থাকার দরকার? বদমাইস ছোঁড়া কোথাকার? একটা আম কুড়ি টাকা?

রাধানাথ এই সময় যেন চিত্রপুত্তলিকার স্থায় স্থির, অচল। ঠাকুরপূজার সময় এইরূপ হইয়াছিল, প্রেম—ভক্তি আর সরলতাজনিত বিশ্বাসে। এই স্থানে হইল পুলিষের ব্যবহারে, ভয়ে বিস্ময়ে। সদাশয় কনেষ্টবল দোকানদারকে বলিল—দেখ সাহাজি—ঠিক্‌ঠাক এজাহার দিও। নিম্নকর্ম্মচারীর ব্যবহারে উচ্চকর্ম্মচারী দারোগা আরও চটিল। বলিল সাহাজি বলে যাও, রাস্তায় পরে যাহা বলছিলে, সেইরূপ সব বলে যাও, দেখি কে এই ছোঁড়াকে বেতের হাত হইতে রক্ষা করে। একটা আম কিনা কুড়ি টাকা বিক্রী হয় ?

তখন সহসা থানা গৃহের পশ্চাৎ হইতে শব্দ উঠিল 'হাঁ, এক আম হামি কুড়ি টাকা ডিয়া লইয়াছি" বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে একটী ইউরোপীয় মহাপুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

রাধানাথ এই সময় কান্দিয়া উঠিল। দারোগা সাহেবকে চিনিতে না পারিয়া কিছু বিরক্তির সহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। দোকানদার এককোণে গিয়া দাঁড়াইল। কনেষ্টবল সাহেবকে চিনিল, পুলিসের কায়দায় "স্যালিউট" করিয়া তাড়াতাড়ি পোষাক পরিতে ছুটিয়া গেল। সাহেব বসিয়াই রাধাচরণকে ডাকিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন "নোট কই"। বালক কান্দিয়া বলিল, এই দারোগা বাবু নিয়েছেন। ইনি পূর্ব্বে আমার আরও একটি আম লইয়া বলিয়াছিলেন এইটি যে মূল্যে বিক্রী করিতে পারিবি, আমি তাহার ডবল দেব। তা আপনি আমার সে আম লইয়া কুড়ি টাকা দিয়াছেন, আমি তাই দারোগা বাবুর কাছে—এসেছি; মূল্য দেওয়া দূর হউক, বেশীর ভাগ আমাকে চুরী মোকর্দ্দমায় ফেলিবার জোগাড় করিতেছেন, বান্ধিতে হুকুম দিতেছেন।

শুনিয়া সাহেব গ্রীবাবক্র করিয়া আরক্ত চক্ষে দারোগার দিকে চাহিলেন—দারোগার পেটের প্লীহা চমকিয়া উঠিল—ভাবিল—একি ব্যাপার ? এ সাহেব কে ? প্রকৃতই তো ছোঁড়া আম কুড়ি টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। উপায় ? সত্যই কি আমাকে এখন চল্লিশ টাকা দিতে হইবে ? এই সময় কনেষ্টবল বাছের খাঁ—ইউনিফরম পরিয়া আসিয়া পুনরপি সাহেবকে সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। তখন দারোগা বুঝিল ইনি জেলার কোন উপর কর্ম্মচারী, বোধ হয় নবাগত ম্যাজিষ্টেড্ মিষ্টার হ্যামিলটন।

সাহেব বলিলেন "ইউ সাবইনেস্‌পেক্টর, ডেও, আমের দাম চল্লিশ টাকা ডেও, টোমার মুখ ঠিক্ রাখ, জবান ডোরষ্ট রাখ। বলিয়াই সাহেব দোকানদারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—টুমি বড় হারামজাডা আছ। টোমার নোট কোটা গিয়াছে ?

হামি সব শুনিয়াছে। টোমার দারোগা আর টোমায় বরিশাল যেটে হবে। কাছারিটে টোমার টাকা আডায় হবে। পুনরপি কহিলেন, বাবু ডেও, টাকা ডেও, নোট ডেও। জবান ঠিক রাখ।

এই সময় দারোগাবাবুর বালিকা কন্যা পূর্ব্বের সেই ভক্ষিত দলিত আমের খোসা লইয়া আসিয়া কহিল—বাবা বল মিতে আম, আমাকে আল একতা দেও। সাহেব হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন,

বাবু তোমার কন্যা একটা খেয়েছে আরও চায়। ডেও, ডাম ডেও, আগেরটো চল্লিশ টাকা ডেও, হামি কুড়ি টাকাটো ডিয়েছি, বলিয়াই সাহেব পকেট হইতে একটি আম বাহির করিয়া দারোগার শিশুকন্যার হাতে দিলেন, সে তাহা লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। বাবু মহাবিপদে পড়িলেন, বুঝিলেন যে, ইনি বরিশালের সেই নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যামিলটন; আজ আমার কি কুক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল—এক আমের দাম চল্লিশ টাকা তো দিলাম, তারপর এই ঘটনাটি সাহেব বুঝিয়াছেন, উপায়? হতভাগা কনেষ্টবলটা আগে বুঝে ছিল, তাই নিষেধ করেছিল। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ।

বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা-প্রতিষ্ঠিত—

ব্রাহ্মণ ছাত্রাবাস—(৫৮নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

১৯১৮-১৯ সাল—আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—	
কুড়িজন ছাত্র বাবত্ (প্রাবেশিক ২৲ হিসাবে)	৪০৲
ভাড়া—	
জুলাই (১৯১৮ সন)	১০৯৲
তেতালায় ১০ জন ৬০৲ টাকা	
দোতালায় ৯ জন ৪৫৲ টাকা	
" ১ জন ৪৲ টাকা	
আগষ্ট—	১০০॥৵০
উক্ত মাসে একটি সিট নিয়া গোলমাল হওয়াতে তাহার ভাড়া ও তাহার বাসা খরচ বাদ যায় ৬৲+২।৵০=৮।৵০	
সেপ্টেম্বর	১০৪৲
অক্টোবর	১০৪৲
নবেম্বর	১০৪৲
ডিসেম্বর	১০৪৲
	৬৬৫॥৵০

খরচ—	
Stamp—	॥/১০
নিয়মাবলীছাপা	৪।৵০
বটুয়া	/৫
ঝাঁটা	৴১৫
চাকর	১৲
খাতা	৸৵১৫
পিঁড়ে	৬।৵০
বাসন (শুঃ হর্ষবাবু)	৩১।/০
আহ্নিক কৃত্য	১।০
	৪৫৸৶৫
ভাড়া (১০ মাসের ১২৫৲ হিসাবে)—	১২৫০৲
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মহাশয়ের দরুণ খরচ (জুলাই ও আগষ্ট)	১৭৲
	১৩১২৸৵৫

জমা জের — ৬৬৫॥৵০

পূজার বন্ধের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণধন গোস্বামী নামক জনৈক ছাত্র বাড়ী যায় ও বন্ধের পরে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া আর আসে না।

জানুয়ারী	১০৪৲

নরেন্দ্রনাথ সান্যাল নামক ছাত্র পড়াশুনা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহার ভাড়া ৬৲ ছয় টাকা মধ্যে তক্তাপোষ বিক্রয় করিয়া এক টাকা পাওয়া যায়।

ফেব্রুয়ারী	১০৯৲
মার্চ্চ	১০৯৲
এপ্রিল	৭৬৲

তেতালায় ৩ জন ও দোতালায় ৩ জন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী মার্চ্চ মাসে চলিয়া যায়।

বোর্ডিংএর আয় মোট	১০৬৩॥৵০

প্রাপ্ত সাহায্য

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	১০০৲
" মনোমোহন ভট্টাচার্য্য	৩০৲
" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩০৲
" বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১০৲
" কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়	১০৲
	১৮০৲
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য	১০৲
" চিরসুহৃৎ লাহিড়ী	১৲
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৫৲
" শরচ্চন্দ্র সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ	৫৲
	৩১৲
মোট জমা	১২৭৪॥৵০

খরচ জের	১৩১২৸৶৫
সেপ্টেম্বর	১১৲
অক্টোবর	৩৲
নবেম্বর	৪৲
ডিসেম্বর	১২৲
জানুয়ারি	১২৲
ফেব্রুয়ারী	১২৲
মার্চ্চ	১২৲
এপ্রেল	৯৲
মোট খরচ	১৩৮৭৸৶৫
" জমা	১২৭৪॥৵০
ঋণ	১১৩।৴৫

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সেক্রেটারী—
শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী

২৯শে এপ্রিল ১৯১৯ সাল।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ-সভা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনি ধ দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণসমাজ

(মাসিক পত্র)

A Non-Political Hindu Religious & Social Magazine

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—দশম সংখ্যা।

আষাঢ়।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড।০ আনা।

সন ১৩২৬ সাল।

আষাঢ় সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—675

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪১ শক, ১৩২৬ সাল, আষাঢ়। } দশম সংখ্যা।

জাগরণ।

জাগ জাগ আজ বিপ্র-সমাজ
ত্যজিয়া তন্দ্রালস,
গৌরবে নব হ'ক মুখরিত
তোমার কীর্ত্তি যশঃ।

বিলাস ব্যসনে— আর কতকাল
রহিবে চেতনাহীন ?
চাহি নিজ পানে ভাব একবার
আজ তুমি কত দীন !

সেই তুমি আজ, কত রাজরাজ—
মুকুটশোভিত শির
নমি পদতলে ভকতি পুলকে
ঢালিত নেত্রনীর।

সাম-স্তোত্র গানে পুণ্য তপোবন
হ'ত সদা মুখরিত,
হব্য সমিধে যজ্ঞ অনল
রহিত প্রজ্জলিত।
পুষ্প চয়নে, তটিনী পুলিনে
বালু-কণ্ঠে বেদ-গান,
ব্রহ্মচর্য্য রত, সংযমিত চিত্ত
কামনাশূন্য প্রাণ।
বেদ অধ্যয়নে, পূজা পাঠে হোমে
কাটিত দিবস যামী,
বিষয় লালসা নাহি ছিল প্রাণে
ছিলে যে মুক্তিকামী।
জগতের হিতে জীবন সঁপিয়া
লভিতে আত্মসুখ,
ছিল না তোমার হৃদয়ে কখনও
অভাবের কোন দুখ।
নিখিল ভারতে— আর্য্য সমাজ
করি শির অবনত
মানিত তোমার— আদেশ বিধান
ঈশ্বর-আদেশ মত।
তপে সাধনায়— জ্ঞান পুণ্যে চির
আছিলে পূজিত তুমি,
স্বার্থ বিহীন— কর্ম্মে তোমার
উজ্জ্বল ভারতভূমি।
ছিলে যুগে যুগে সমাজে পূজিত—
আজ একি অধোগতি?
আচার ভ্রষ্ট— কর্ম্মবিহীন
বিলাস ব্যসনে মতি?
কি ছিলে কি হ'লে, ভাব একবার
কি মহাপতন আজ!
জগতের কাছে বদন দেখাতে
নাহি কিহে তব লাজ?

বিলাস বাসনা মুছে ফেলে দাও
অতীত গৌরব স্মরি,
সাধনের পথে হও আগুয়ান
ধর্ম্ম লক্ষ্য করি।
মনে রেখ দ্বিজ— সেই মহাকুলে
জনম লভেছ তুমি,
যাঁদের পুণ্য চরণ পরশে
পবিত্র ভারতভূমি।
বশিষ্ঠ বাৎস্য— গর্গ সনকের
তোমরা বংশধর,
সাজে কি কখনও তোমাদের হেন
কদাচার ঘৃণাকর ?
ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে— পূজা পাঠে হোমে
কামনাবিহীন প্রাণে,
সমাজের হিত সাধহ নিয়ত
তোমার আত্মদানে।
আপন কর্ম্মে হও নিষ্ঠাবান্‌
করিয়া আত্মজয়,
আগেকার মত, দেবতা বলিয়া
পূজা পাবে লোকময়।
কপিলের তেজে জেগে উঠে পুনঃ
নিজ কাজে হও রত,
বিশ্ব আবার মহিমায় তব
হইবে চরণে নত।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মর্ম্মকথা।

(পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়-কর্ত্তৃক
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত)

আমি ক্রমেই জীর্ণশীর্ণ হইতেছি, আগামী সম্মিলনে আমার কিরূপ পরিণতি হইবে বলিতে পারি না, নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে এই সম্মেলনেই মুক্তকণ্ঠে আমার মনোভাব ঘোষণা করিতেছি। বিশেষতঃ ময়মনসিংহের মহাসম্মিলনই এই ঘোষণার উপযুক্ত স্থান। এই স্থানের বহু ভূস্বামী ব্রাহ্মণাচারে অনুরক্ত, আবার এই স্থানের বহু ভূস্বামী নবীনশিক্ষায় বিভ্রান্ত; এই ময়মনসিংহে এমন ভূস্বামী আছেন, যিনি ব্রাহ্মণরক্ষার্থ সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও অকুণ্ঠিত, এই ময়মনসিংহেই ত্যাগশীল এমন বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং বিষয়ী সামাজিক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য অসীম ক্লেশ সহ্য করিতেও প্রস্তুত, এই ময়মনসিংহেই এমন দেশহিতৈষী আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য সর্ব্বপ্রকার নির্যাতন ভোগ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অতএব ভাবসন্ধিপরিপূত এই মহাক্ষেত্রেই আমি আমার মনোভাব স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইতে প্রবৃত্ত।

বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা এবং ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন গত অধিবেশনের অভিভাষণে প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু এখনও দেখিতেছি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও তাহা গ্রহণ করেন নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, আমাদের সভা বা সম্মিলনের উদ্দেশ্য 'দলাদলি'। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। আত্মরক্ষাই আমাদের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। সমগ্র মানবমঙ্গল চরম প্রয়োজন। চরম প্রয়োজনের কথা এবার বলিব না, একাধিক-বার তাহা বলিয়াছি। সাক্ষাৎ প্রয়োজনের কথা পূর্ব্বে কথিত হইলেও অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া বলিব।

বৈষম্যের পথে সাম্যের সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন আমাদের প্রাচীন শিক্ষার ফল। সৃষ্টি বৈষম্যময়,—জগতে যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই পরস্পর বিভিন্ন,—সর্ব্বত্রই এক একটা বিশেষত্ব বর্ত্তমান,—এইরূপ বৈষম্যসত্ত্বেও সাম্যের ফল্গুপ্রবাহ তাহার মধ্যে প্রবাহিত। সে সাম্য তত্ত্বদর্শীর নয়নে অভিব্যক্ত। সাম্যদর্শন যাঁহার ঘটে, তিনি আম্র-ফল আনয়নের জন্য অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা অনুসন্ধান করিতে কাহাকেও উপদেশ দেন না, অশ্বত্থ পত্র আহরণের উদ্দেশে—আম্রবৃক্ষের শরণাপন্ন হইতেও বলেন না। অশ্বত্থ ও আম্রের যে বৈষম্য প্রাকৃত, তাহা তাঁহার অগোচর নহে; আর যে সাম্য তাহার মূলে বর্ত্তমান—সেই ব্রহ্মসত্তা বা ত্রিগুণ,—তাহাও তাঁহার পরিজ্ঞাত।

আমাদের চতুর্ব্বর্ণ সমাজতত্ত্বে এই সৃষ্টিরহস্য অধিকতর পরিস্ফুট। জগতের সর্ব্বত্র সাম্যদর্শন কেবল জীবন্মুক্ত পুরুষেরই হইয়া থাকে,—কিন্তু সমাজে সাম্যদর্শন তদপেক্ষা

স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন মানবেরও হইয়া থাকে। আমাদের সনাতন শাস্ত্র—সমাজের বৈষম্য যেমন ফুটাইয়া দিয়াছেন, সাম্যের বার্ত্তাও তেমনই ঘোষণা করিয়াছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক বর্ণ বিভিন্ন—অথচ সমাজস্বরূপ বিরাট দেহের সকল বর্ণই অঙ্গ। মানব-দেহে কর চরণ মস্তক বক্ষঃ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও এক দেহের সকলই অঙ্গ। কর-চরণাদির যেরূপ স্বরূপবৈষম্য এবং অঙ্গরূপে সাম্য বর্ত্তমান, সেইরূপ চতুর্ব্বর্ণেরও স্বরূপতঃ পরস্পর বৈষম্য এবং সমাজাঙ্গরূপে সাম্য বর্ত্তমান। এ সাম্যদর্শন স্বল্পজ্ঞেরও ঘটিয়া থাকে। আমাদের সমাজ মানবসমষ্টি নহে—চতুর্ব্বর্ণের সংঘাতে সুগঠিত অবয়বী। আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ—ধূলিস্তূপের ন্যায় মানবস্তূপ নহে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনক-কণিকার মুষ্টি নহে,—সেই কনক-মুষ্টি নির্ম্মিত—সুমেরু পর্ব্বত। সুবর্ণ-কণিকায় ফুৎকার প্রদান করিলে, তাহা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়, কিন্তু সুমেরুপর্ব্বত ঝঞ্ঝাবাতেও অটল অচল। আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত সকলেই একটা বিরাট সূত্রে সম্বদ্ধ। সে সূত্র ধর্ম্মশাসন, সংযমই তাহার বন্ধন। সেই সূত্রবন্ধন অব্যাহত রাখিয়া সুগঠিত চাতুর্ব্বর্ণ্যদেহ রক্ষাই আমাদের আত্মরক্ষা। সেই আত্ম-রক্ষার উদ্দেশে আমাদের ব্রাহ্মণ-সভা—আমাদের মহাসম্মিলন।

ব্রাহ্মণ-সভা ও ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন বলিয়া ইহা অন্য বর্ণের বিরোধী বা অন্য বর্ণের সহিত সম্বন্ধহীন নহে। সর্ব্ববর্ণের হিতচিন্তা ও কল্যাণসাধন ব্রাহ্মণগণ চিরদিন করিয়া আসিতেছেন, আজও ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া সেইরূপ হিতচিন্তা ও কল্যাণসাধনে শক্তিসঞ্চয়ে উদ্যত। সেই উদ্যমের ফলেই সভা ও মহাসম্মিলন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগতে সর্ব্বত্র বৈষম্য পরিস্ফুট, সে বৈষম্য বিধাতৃকৃত, মানবকল্পিত নহে,—সমাজে বর্ণবৈষম্যও সেইরূপ বিধাতৃকৃত—মানবকল্পিত নহে। মানবের জন্মান্তরকৃত কর্ম্মফলের অনুসারে এই বর্ণভেদ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে বর্ণে উৎপন্ন, তিনি শাস্ত্রশাসনানু-সারে সেই বর্ণোচিত ধর্ম্মপালন করিবেন। সেই ধর্ম্মপালনই শান্তিময় মার্গ। ধর্ম্মরক্ষিত শাস্ত্রশাসিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ পরাধীন হউক, অন্য জাতির নিকট অবজ্ঞাত হউক, তাহার শান্তি, তাহার স্থিতি অব্যাহত। এই প্রকার আত্মরক্ষাই আমাদের চিরন্তন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় শিক্ষায় ইহার বিপর্য্যয় ঘটিতেছে—ঘটিতেছে কেন—প্রতি মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনার সনাতন ভাণ্ডারে কত খাদ্য সঞ্চিত আছে, অনেকেই তাহা দেখিবার অবসর পাইতেছে না, মুগ্ধ হইয়া পরের অনুকরণ বা অন্যদীয় ভুক্তাবশিষ্ট আহরণে লোলুপ হইয়া পথে পথে ধাবিত হইতেছে। ইউরোপের সহিত যাহার যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে ততই এইরূপ মুগ্ধ। স্বাধীনতার একটা মোহ—এই ইউরোপসংসর্গের ফল। বর্ত্তমান ইংরাজিশিক্ষা ইউরোপসংসর্গের প্রথম ধারা। শিক্ষাময় সংসর্গ হইতেই বহুবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের উৎপত্তি। লর্ড উপাধি বা ভারতীয় আভিজাত্য-বিলোপ তাহার চরম পরিণতি। স্বাধীনতা-মোহের অবশ্যম্ভাবী প্রাথমিক ফল—রাজনীতি চর্চ্চা এবং পরিণাম ফল বিপ্লবপরম্পরা। সুতরাং, অশান্তিই ইহার আদ্যন্তে মিলিত। ইহার ফল আত্মরক্ষা নহে, আত্মধ্বংস। শাস্ত্র বলেন—

অপারে যো ভবেৎ পারঃ অপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদি বাপ্যন্যঃ স সম্যঙ্ মানমর্হতি॥

ভাবার্থ—শূদ্রই হউন বা ম্লেচ্ছাদি অপর জাতীয়ই হউন, যিনি বিপদে রক্ষাকর্ত্তা—ধর্ম্ম-সেতু ভঙ্গ না করিয়া দস্যুপ্রভৃতির দুরাচার হইতে পরিত্রাণ করিতেছেন—তিনি সম্যক্ মাননীয়, সুতরাং রাজ্যপালক রাজার প্রতি ভক্তিমান্ হওয়াই শাস্ত্রাদিষ্ট। স্বাধীনতা বা পরাধীনতার চিন্তায় প্রয়োজন নাই, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিয়া চল, অশান্তি হইবেই না। রুষ দেশ স্বাধীন, সেখানে নিষ্ঠুরভাবে সবংশ রাজহত্যা সম্পাদিত হইল কেন? অতএব স্বাধীনতাই শান্তির হেতু নহে। গণতন্ত্র রাজ্যেও সভাপতির হত্যা হয় কেন? ধনীর লাঞ্ছনা আরব্ধ হইয়াছে কেন? এ সকল চিন্তা করিলে,—এই বিপ্লবের অবসান কোথায় কেহ কি বলিতে পারেন? কল্পনামূলক সুখ মানবের নব নব কল্পনা আশ্রয় করিয়া উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার হিল্লোলে নাচিতেছে। সুখের সেই নব নব নৃত্যলীলা অসংযত মানবকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া যথেচ্ছাচারী পশুত্বে অবনমিত করিতে উদ্যত হয়। এ ভাবনা আমাদের সমাজস্থ সদ্বংশজাত শিক্ষিত নামধারী বহু ব্যক্তিরই নাই, ইউরোপীয় শিক্ষাজনিত মোহ এতই ভীষণ!

সেই মোহতিমিরবিনাশে একমাত্র শাস্ত্রমতাবলম্বনই অঞ্জনশলাকা। সেই শাস্ত্রমত চিরন্তন সদাচারদ্বারা সমুজ্জ্বল। এই সনাতন সমাজ অন্ততঃ দ্বিসহস্র বৎসর যে সদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরাধীনতার মধ্যেও আত্মরক্ষা করিয়া সনাতন নাম সার্থক করিয়াছেন, সে সদাচার উপেক্ষণীয় নহে, তাহাই আমাদের রক্ষাকবচ। সেই সদাচারেই শাস্ত্রমত পরিস্ফুট। বর্ণভেদের বৈষম্য মধ্যে সাম্যের সৌম্যমূর্ত্তি শাস্ত্রালোকেই উদ্ভাসিত।

ইউরোপীয় শিক্ষা ঠিক ইহার বিপরীত; মৌখিক সাম্যবাদের আবরণে বৈষম্যের করাল-মূর্ত্তি প্রকটনই তাহার ফল। যে দেশে ধনের আধিপত্য, তদ্দেশজাতের অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞা কার্য্যতঃ প্রকাশিত, মুখে কেবল সাম্যবাদ; সে দেশের বহু লোকও এই মৌখিক বা কাল্পনিক সাম্যবাদে মুগ্ধ হয় না, তাই সে স্থলেও নব নব বিপ্লববিভীষিকা সতত জাগরূক; আর আমাদিগের দেশস্থ তথাকথিত শিক্ষিতগণ সে কাল্পনিক সাম্যবাদে মুগ্ধ হইয়া আজ কি না বিধাতৃকৃত বৈষম্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান! তাঁহাদের দোষে যে সমাজ-দেহের অঙ্গ সকল বিচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে, মানবতার সুমেরুপর্ব্বত এই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনক-কণিকার সমষ্টি মাত্রে পরিণত হইতে বসিয়াছে, এক এক ফুৎকারে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা কে ভাবিয়া থাকে? ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অনেকের অসহ্য, কিন্তু এ প্রাধান্য হইতে ব্রাহ্মণ অন্যের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবার সুবিধা করেন নাই, নিজের মুখের অন্ন অন্যের মুখে তুলিয়া দিয়া স্বয়ং পুরুষানুক্রমে অর্দ্ধাশনেও কাটাইয়াছেন। আর সাম্যবাদীর দল—অন্যের অন্ন আত্মসাৎ করিতেই ব্যস্ত। এ ভাব শান্তির অনুকূল নহে, আত্মরক্ষার অনুকূল নহে।

প্রতিকূল শিক্ষা নানাপথে ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ধীরে ধীরে শাস্ত্রশাসনে

অনাস্থা জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে,—এই অন্নপূর্ণার সন্তানগণ আজ বিদেশের অন্ন—পাউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বৎসরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিদেশীয়ের চরণে অর্পণ করিবে কেন? অপেয় জল, অপরিধেয় বসন-ভূষণ, অস্পৃশ্য বিলাস-দ্রব্য ব্যবহারের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা অপব্যয় করিবে কেন?

হে নবাগত শিক্ষায় বিমুগ্ধ বিভ্রান্ত দেশবাসি! দেশের দারিদ্র্য তোমার রাজনীতি-চর্চ্চার একটা প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু এ দারিদ্র্য কি শাস্ত্রশাসনে অনাস্থার একটা প্রধান ফল নহে? যদি বিদেশাগত বহু বস্তুই শাস্ত্রমতে তোমাদের অব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে দেশের অর্থ কি বিদেশে নীত হইতে পারে? অতএব ব্রাহ্মণ-সভা এবং ব্রাহ্মণ-সম্মিলন এই মত :পোষণ এবং প্রচার করেন—সদাচারপরিশোভিত শাস্ত্রপথই আশ্রয়ণীয়। সে পথ হইতে যিনি যতটা ভ্রষ্ট হইয়াছেন, অকপটে তিনি নিজ স্খলন সংশোধন করুন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয়ের মিলনস্থান শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, সদাচারী ব্রাহ্মণ ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণেরও মিলনস্থান শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস; মৌখিক বিশ্বাস নহে, আন্তরিক বিশ্বাস। শাস্ত্রবাক্যের নিজকল্পিত অর্থে বিশ্বাস নহে, শিষ্টপরিগৃহীত শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসই প্রকৃত শাস্ত্রবিশ্বাস। বিশ্বাসমত সকল কার্য্য করিতে না পারিলে অনুতপ্ত হইতে হইবে—কার্য্যকরী শক্তি লাভের জন্য শাস্ত্রসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় সৎশিক্ষা।

এইরূপে আমরা প্রকৃত মিলন চাহি, দলাদলি চাহি না। আহারাদি সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে হইলেও এ মিলনে বাধা হয় না। এই মিলনই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মর্ম্মমিলন। ইউরোপীয় শিক্ষার মোহে যাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত, আত্মরক্ষা তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহারা বিপথে ধাবিত, সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই দলাদলির স্রষ্টা, তাঁহারাই প্রকৃত মিলন চাহেন না। তাঁহারা ভারতী জননীর স্নেহ পীযূষধারার আস্বাদ না বুঝিয়া পূতনার মায়ায় মুগ্ধ। নিজ নিজ সর্ব্বজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণের বচনে আদরসম্পন্ন ত' নহেনই, প্রত্যুত অবজ্ঞাসম্পন্ন। নিগ্রোজাতির ইতিহাস লিখিয়া ভারতের জ্ঞান সম্পাদন করিতে তাঁহারা ব্যগ্র! তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই কোটি কোটি পতিত ভারতবাসীকে অপূর্ব্ব মনীষাপ্রভাবে উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ! তাঁহাদের এই মোহদর্শনে যাঁহারা ব্যথিত, স্বজনের ঘোর বিকারদর্শনে যাঁহারা ঘোর উদ্বিগ্ন ও ভীত, শিক্ষামুগ্ধগণ তাঁহাদিগকে উপহাস করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন, লাঞ্ছনায় তাড়নায় নিপীড়িত করেন। তাঁহারা এক বার ভাবেন না, আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম সনাতন, আমাদের ধর্ম্মের একমাত্র ধর্ম্মই প্রাচীন সংজ্ঞা। ধর্ম্ম বলিলে আর কোন ধর্ম্ম বুঝায় না, আমাদের সনাতন ধর্ম্মই ধর্ম্ম পদের বাচ্য, অর্থাৎ যখন জগতে অন্য কোন ধর্ম্মের উদয় হয় নাই, তখনও আমাদের ধর্ম্ম নিজ অপূর্ব্ব আলোকে বিশ্ব উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর কত ধর্ম্মের উত্থান পতন, কত জাতির উদয় বিলয় সনাতনধর্ম্মের নিমেষপাতে হইয়া গিয়াছে, কত যুগ-যুগান্তর ক্ষণমুহূর্ত্তের ন্যায় এই সনাতনধর্ম্ম হেলায় অতিবাহিত করিয়াছেন—সেই সনাতনধর্ম্মের

সুসংযত ও সুসংহত উপদেশ—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র—বিশ্ববিজ্ঞানের প্রসূতি। তাহা বিশ্বমানবের অক্ষয়-কবচ। সেই উপদেশ বা শাস্ত্রশাসন আমাদের মৃতসঞ্জীবনী সুধা ও পথপ্রদর্শক দিগ্‌যন্ত্র। ইউরোপীয় শিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি স্বজনগণ, সেই শাস্ত্রবিশ্বাসীকে অবজ্ঞা করে, মূর্খ জ্ঞান করে;—তাহারাই যে কুশিক্ষামদিরাসেবনে মত্ত উদ্দাম নৃত্যলীলায় সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, সদাচার ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচার গ্রহণ করিতেছে, সে কথা কেহ বলিলে—পথ অপরিষ্কৃত করিয়া চোখ রাঙ্গাইতেছে, যাহা মিলনের মন্দির তাহা চূর্ণ করিবার জন্য অনবরত মুদ্গরাঘাত করিতেছে, তাহারাই দলাদলির স্রষ্টা। রাজ-প্রবর্ত্তিত কুশিক্ষাপ্রভাবে সমাজ বিপ্লুত, রাষ্ট্রবিপ্লব-কলঙ্কে মলিন,—সুতরাং এই কুশিক্ষার সংশোধনের জন্য সংশিক্ষা প্রবর্ত্তন আবশ্যক। সেই সংশিক্ষা শাস্ত্রবিশ্বাসের প্রসবনির্ঝরিণী হইবে, মিলনমন্দিরের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রোথিত করিবে। সেই সংশিক্ষাই আমাদের উপায়-রূপে অবলম্বনীয়। যাহারা মিলনে অন্তরায়, যাহারা আপনাদিগকে নিগ্রো জুলুর ন্যায় বর্ব্বরবংশসম্ভূত মনে করিয়া আপাতমনোরম ইউরোপীয় উপায়ে দেশোন্নতির আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগের মোহ অপনোদনের জন্য তাহাদিগকে সংশিক্ষা প্রদানের জন্য ব্রাহ্মণ-সভা ও ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের আন্তরিক প্রযত্ন আছে। সে প্রযত্ন দলাদলি নহে, তাহা মিলনেরই প্রযত্ন—শাস্ত্রবিশ্বাসের ভূমিতে সমবেত করিবারই প্রযত্ন। আত্মরক্ষা ও তংসাধনসমূহের ক্রমিক পারম্পর্য্যেই ব্রাহ্মণ-সভা ও ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের আশাপূর্ণ দৃষ্টি সতত নিপতিত।

রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং বিদেশীয় হইলেও শাস্ত্রশাসনে বিশ্বাস ও তাহার ফলে তদনুরূপ আচরণ সম্যক্ করিতে পারিলে আমাদের সমাজ সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ। রাজনীতির চর্চ্চা অকর্ত্তব্য, রাজার জাতির সমান হইতে চেষ্টা করা অনুচিত, বিপদের রক্ষক রাজাকে দূর হইতে সম্মান করিতে হয়, তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজাতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে হয়, তাঁহাদের সহিত পান ভোজন, তাঁহাদের দাস্য ইত্যাদি গুরু সংসর্গ করিতে নাই। শাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ, এই জন্যই করিতে নাই। বিদ্বেষ নহে, ক্রোধে নহে, ধর্ম্ম-শাসনেই তাহা করিতে নাই। এই ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ত্যাগের পবিত্র আসন চাতুর্ব্বর্ণ্য হৃদয়ে পূর্ব্ববৎ স্থাপিত হইলে সমাজের আর চিন্তা কি? এই ভাবই আমাদের চিরন্তন মঙ্গলময় মার্গ। মস্তিষ্কবিকারে এই মঙ্গলপথ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মস্তিষ্ক, তাহারই চিকিৎসার্থ ব্রাহ্মণ-সভা ও ব্রাহ্মণসম্মিলন। চিকিৎসার ফল—সময়ে চাতুর্ব্বর্ণ্যময় সমাজদেহের আরোগ্য বা কল্যাণ। সংশিক্ষাই সেই চিকিৎসা।

যাঁহারা বিশ্বাস হারাইয়াছেন, সমাজকে স্বমতে বিপথে চালিত করিতে ইচ্ছুক—আমরা তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে ভীত। তাঁহারা বহু সময়ে কপটের আবরণে আত্মভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহাদের মোহবিজৃম্ভিত কুশিক্ষা-হলাহল সমাজে বিকীর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে মিলিত হইতে চাহেন—কিন্তু তাহা ঘোর অনিষ্টের হেতু। সে অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য

আমাদের চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহার মূলে দ্বেষ ঈর্ষা নাই—দলাদলি নাই। স্পষ্ট বলিতেছি, অন্নপানে একাকার ও যথেচ্ছাচার চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মিলনচিহ্ন নহে, এক ভাষা, একবিধ উপাসনা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের মিলনচিহ্ন নহে,—শাস্ত্রবিশ্বাসই এই বিশাল সমাজের মিলনচিহ্ন। অনাচারী ব্রাহ্মণ সদাচারীর আহার সংযম দেখিলেই চটিয়া লাল, বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিবাহাদি বিষয়ে সদ্বিচার দেখিলেই বলিবে দলাদলি—কিন্তু তাহা নহে,—বৈষম্যময় সৃষ্টির মধ্যে সাম্যের সূত্র যাহা আছে,—তাহা অবলম্বন করিয়াই জাতির ঐক্য সংসাধিত হইয়া থাকে, হইতে পারে। ইহাতে দলাদলি হয় না। যাঁহারা সদাচারে বিশ্বাসী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, অথচ ব্যক্তিগত ভাবে স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের বাক্যের বৈপরীত্য সমর্থিত হয় না —তাঁহাদের সম্মিলন ব্রাহ্মণ-সভায় সাধারণতঃ হইতেছে—মহাসম্মিলন তাঁহাদের বিশিষ্ট সম্মিলন-স্থান। এই সদাচারবিশ্বাসীর মধ্যে অনেকে এমন আছেন, যাঁহারা পরান্ন ভোজন করেন না ; কিন্তু তাঁহাদের এই আচরণ অন্য সদাচারী বিদ্বিষ্ট-ভাবে দর্শন করেন না, আর আচারভ্রষ্টগণ,—গৃহে আহার না করিলেই বিদ্বেষ পোষণ করে ; এই ভাব-ভেদ কাহার হৃদয়ের মালিন্য ঘোষণা করিতেছে, ইহা সুধীগণ বিবেচনা করুন। ফলতঃ স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে সমাজের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত, এ স্বার্থত্যাগ ধর্ম্মত্যাগ নহে, শাস্ত্রশাসনত্যাগ নহে, সংযমত্যাগ নহে ; এ স্বার্থত্যাগ লোভনীয় বিষয়ের ত্যাগ, ধনত্যাগ, দুরভিমানত্যাগ ইত্যাদি। যিনি আচারভ্রষ্ট হইয়াও ধনী, তিনি যদি তাঁহার ধনাভিমান ত্যাগ করিয়া আত্মদোষ দর্শন করেন, এবং তাঁহার অন্ন অপরের বর্জ্জনীয়-ইহা শাস্ত্রাদেশ, এই বিশ্বাস হৃদয়ে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মিলনের স্থান আসন্ন হইয়া থাকে। এই মিলনস্থান নির্দ্দেশ আমাদের কার্য্য। এখন সমাজে বহু বিরুদ্ধাচার যথেচ্ছভাবে গৃহীত হইতেছে, আমি তৎসমুদায়ের বিরোধী, তাহার জন্য প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বেনামা পত্রে এবং অন্যান্য প্রকারে নিন্দা তিরস্কার ও লাঞ্ছনা আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে। আমার নাম জাল করিয়াও অব্যবস্থাপত্রে কেহ কেহ আমার নাম মুদ্রিত করাইয়াছে। আমি জানি, রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে এসকলের প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা মিলনপথের কণ্টক এবং ব্রাহ্মণের অনুচিত কার্য্য। কেবল আমি নহি, ব্রাহ্মণ-সভার বহু সদস্যই এই ভাব পোষণ করেন। প্রতিপক্ষগণ ইহাতে বিজয়-সুখ অনুভব করনে, ক্ষতি নাই. আমরা কিন্তু শাস্ত্রশাসন ব্যতীত নবীন উপায়ে মিলন-পথে বাধা উপস্থিত করিব না, ইহা আমাদের সঙ্কল্প।

উপসংহারে পুনরায় বলিতেছি, ব্রাহ্মণসভা বা ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের—সদাচারী ব্রাহ্মণ ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের মিলনস্থান নির্দ্দেশ করিয়া আত্মরক্ষা ও মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনে উদ্যত। সে মিলনস্থান পানাহারে বা আদান-প্রদানে একাকারতা নহে,—সে মিলন শাস্ত্রবিশ্বাস। বল বল—ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ—সদাচারী অনাচারী, একবার উচ্চকণ্ঠে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শাশ্বতী ভগবচ্ছক্তির ধ্যান করিয়া বল—অকপটে বল "আমরা শাস্ত্রবিশ্বাসী ;—" আমাদের হৃদয় শীতল হউক,—পুণ্যগন্ধে সমীরণ পূর্ণ হউক—ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার ধন্য হউক।

ময়মনসিংহাধিবেশনে—

অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

শ্রীগুরুঃ

—:•:—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

সমাগত ভূদেবমণ্ডল! শাস্ত্রসেবি পূজনীয় সুধীসমাজ! মাননীয় রাজন্যবৃন্দ! যথা-যোগ্য নমস্কার ও সম্ভাষণান্তে আমি আপনাদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি।

ব্রাহ্মণ-সভার বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সম্মেলন বিগতবর্ষে এই ময়মনসিংহ নগরে সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল; সভা ঐ প্রস্তাবিত বিষয়ে যথাসম্ভব অগ্রসরও হইয়াছিলেন। কিন্তু সভার মনোনীত সভাপতি মাননীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর আমাদের জনপ্রিয় সম্রাট্‌প্রতিনিধি কর্ত্তৃক দিল্লীনগরীতে আহূত হওয়ায় তদনুরোধে ঐ সময়ে সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সাধু মহাত্মগণের নিকট যে ত্রুটি হইয়াছে, অনুষ্ঠানসভা তদ্বিষয়ে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। আশা করি স্বতঃক্ষমাপরায়ণ ভূদেববৃন্দ এবং সাধুগণ আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এতদিন পৃথিবীব্যাপী মহামারীতে দেশ উপদ্রুত থাকায় ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে আপনা-দিগের আহ্বান করার ভাগ্য লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

করুণাময় ভগবানের কৃপায় "সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি," মহাকবি বর্ণিত এই সুযোগের ভাগ্যদেবতা আজ সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। তাই আপনাদের পুণ্যদর্শনে আজ আত্মাকে পুণ্যবান বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছি।

বিন্দুর গৃহে আজ সিন্ধু অতিথি! বামনের গৃহে দ্বিজরাজ সমুদিত! বিন্দু স্বীয় সহযাত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া যে লোভনীয় দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য চিরদিন ব্যাকুল—কত ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনা হৃদয়ে বহন করিয়া—কত উৎপাত অধঃপাতের যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া যে সৌন্দর্য্য—যে মনোরম সুষমা দর্শন করিতে চিরদিন প্রধাবিত, আজ সেই বিরাট সম্মিলন দয়া করিয়া স্বয়ং তাহাদের পর্ণকুটীরে অতিথি হইয়াছেন। সম্মিলিত ব্রাহ্মণশক্তি আজ তাহাদেরই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে আপন বিশাল প্রবাহে মিশাইয়া মহাশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য আতিথ্যব্যপদেশে তাহাদিগের গৃহ ধন্য করিয়াছেন। ময়মনসিংহের প্রান্তচারী ব্রহ্মপুত্র চিরদিন যে সম্মিলনের জন্য লালায়িত—সেই অনন্ত গুণরত্নের আধার মহাসম্মিলন—সেই মহাসিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের গৃহে অতিথি। ব্রহ্মপুত্রের এ আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। নদনদীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু রত্নাকর-সাগর যখন নদনদীকে নিজের বিশাল বক্ষে টানিয়া

লইবার জন্য আতিথ্যের ছলনায় তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন সে মিলন-উৎসবের আনন্দ নদনদীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরে না; আতিথ্যসৎকার করিতে যাইয়া নদনদী সে বিরাট সত্তায় যখন আপন সত্তা হারাইয়া ফেলে—তখন আত্মদানের কৌশলে আত্মলাভ করে। তাই আজ ময়মনসিংহের নরনারীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে এ বিপুল আনন্দ ধরে না। ব্রহ্মপুত্র আজ এই মহাসিন্ধুর আতিথ্যপরিচর্য্যা করিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছে। তাই ময়মনসিংহের হৃদরবিন্দু এই বিরাট ব্রাহ্মণ-সমাজ-সিন্ধুকে বরণ করিতে আসিয়া আত্মসমর্পণের ফলে আত্মলাভ করিতেছে—সৎকার করিতে আসিয়া সংকৃত হইতেছে—পূজা করিতে আসিয়া পূজিত হইতেছে।

ভৃগুপদলাঞ্ছন শ্রীভগবান যে ব্রাহ্মণের চরণচিহ্ন গৌরবচিহ্নরূপে ধারণ করেন, সেই ভৃগু, কশ্যপ, ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহাদের সন্তানদেহে লুক্কায়িত থাকিয়া চরণচিহ্নে যাহার দেহ আজ পবিত্র করিয়াছেন, সেই ময়মনসিংহ ধন্য—কৃতার্থ।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীভগবান স্বয়ং যাঁহাদের চরণপ্রক্ষালনের ভার লইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ভাবসম্পদহীন ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে সেই গুরুভার সম্যক বহন কি সম্ভব? বরণীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলি! আপনাদের করুণাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। যে অহেতুক মৈত্রীর আকর্ষণে আপনারা আজ দরিদ্রের গৃহ ধন্য করিয়াছেন, ভরসা করি তাহারই প্রেরণায় দীনহীন ময়মনসিংহের শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

বরেণ্য অতিথিবৃন্দ! বহুকাল পরে আত্মজন গৃহে উপনীত হইলে হৃদয়ের দ্বার স্বতঃই উদ্ঘাটিত হয়—"স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে"; তাই কথাপ্রসঙ্গে দুই একটী দুঃখের কথা আপনাদের নিকট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বলিয়াছি আমরা দীনহীন দরিদ্র। বাহ্যদর্শনে ইহা আত্মগোপনকর বিনয়ের ভাষা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা অন্তর্নিহিত বেদনার উচ্ছ্বাস—বিনয় নহে। যে সাধনালব্ধ ভাবরাশি আপনাদের প্রিয় উপচার, আমরা সে ভাবসম্পদে বস্তুতঃই দীনহীন। কিন্তু এই দীনহীনভাব আমাদের ছিল না, আমরা বড় হইয়াও ছোট, ধনী হইয়াও দরিদ্র, তাই আমরা জীবনে মৃত। এমন একদিন ছিল, যখন ব্রাহ্মণ্যের সকল সম্পদই ময়মনসিংহে ছিল, কিন্তু আজ তাহা সাধন-কুণ্ঠার আবরণে লুক্কায়িত। ব্রাহ্মণ্য প্রধানতঃ যজন, অধ্যয়ন ও দান লইয়া স্ফুরিত, তপস্যা, সাধনা, বিদ্যা প্রভৃতি অবয়ব লইয়া পরিবর্দ্ধিত এবং দেবদর্শনসিদ্ধি ও জীবন্মুক্তি লইয়া ফলিত হয়। এক সময়ে এই ভূমি আপন ব্রাহ্মণ্যস্ফুরণোচিত উর্ব্বরতাগুণে ব্রাহ্মণ্যের এই সকল অঙ্গেরই পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। এই ময়মনসিংহনগরের অনতিদূরবর্ত্তী পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে সাধকশ্রেষ্ঠ দ্বিজদেবের সাধনার সিদ্ধিরূপে শ্রীজগদম্বা অর্দ্ধকালীদেহে তাঁহার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, এখন ও তত্রত্য দেবনদী, রাঘব-খাত প্রভৃতি স্থান সাধকগণের নিকট পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত। এই ময়মনসিংহেরই অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে 'শ্যামারহস্য' 'সারদা-তিলক' ও 'ষট্‌চক্রবিবেক', প্রভৃতি তন্ত্ররহস্যের সঙ্কলয়িতা সাধকপ্রবর পূর্ণানন্দ

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই ময়মনসিংহের অনতিদূরবর্ত্তী মুক্তাগাছাগ্রামে উদয়নাচার্য্যের মত তপস্বিব্রাহ্মণের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। এই ময়মনসিংহেই মনুসংহিতার টীকাকার পণ্ডিতকুলচূড়ামণি কুল্লূকভট্টের অধস্তন পুরুষগণ এখনও বিদ্যমান। এই ভূমিরই গর্ভে মহার্ঘ্য রত্ন চন্দ্রকান্ত সমুৎপন্ন হইয়া আপন জ্ঞানপ্রভায় দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। হরসুন্দরের মত নানা শাস্ত্রবিচক্ষণ অধ্যাপক ও গ্রন্থকার, তত্ত্বাবশিষ্টপ্রণেতা কালীচরণের মত অধ্যাপকমণ্ডলী ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আনন্দকিশোর, কৃষ্ণকিশোর, রাজসিংহ ও পদ্মচন্দ্রের মত রাজর্ষিকল্প ভূস্বামিগণ কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ইহাকেই বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই ময়মনসিংহেই বিমলা, ভাগীরথী ও বিদ্যাময়ীর মত দানব্রতপরায়ণা মাতৃমণ্ডলী আপনাপন বিমল যশোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল আপ্যায়িত করিয়া বিরাজ করি:তন।

যে ভূমির ব্রাহ্মণ্যস্ফুরণোচিত উর্ব্বরতা একসময়ে দেশবিদেশে কীর্ত্তিত হইত, আজ দুর্ভা: :্যর তাড়নায় সে দেশের অধিবাসিগণ অবসন্ন মূর্চ্ছিত। এক সময় যাঁহারা আর্য্যশিক্ষার প্রভাবে সিদ্ধসাধক ও তপস্বী ছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ আর্য্যশিক্ষার অভাবে ও অনার্য্য আচরণের প্রভাবে স্বীয় লোভনীয় মর্য্যাদা, আপন স্পৃহণীয় সাধনসম্পদ ভুলিয়া সুষুপ্ত-মন্ত্রমুগ্ধ। তাই বলিতেছিলাম—যাহারা বড় হইয়াও আজ ভাগ্যদোষে ছোট—সিংহশিশু হইয়াও মেষশাবক সঙ্গহেতু আত্মবিস্মৃত, তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি-উদ্বোধনের জন্য ময়মনসিংহভূমি—আমাদের জন্মভূমি—আপনাদের সম্মিলিত বিরাট মূর্ত্তির চরণে শরণার্থিনী।

এই ঘোর দুঃসময়েও আপনারা অনেক করিয়াছেন ও করিতেছেন। বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবৎসর ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সম্মিলন আপনাদের অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ। যে সময়ে পরিবারের দুইটী লোক পরস্পর মিলিতে পারে না, রাজসিক বিক্ষেপ যে সময়ে জীবহৃদয়কে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া বহুমতে বিভক্ত করিতেছে—যে সময়ে বালকও আপন মত বৃদ্ধের হৃদয়ে স্থাপন করিতে সতত ব্যস্ত, এমন দুঃসময়ে ব্রাহ্মণ্যস্থাপনের জন্য এই বিরাট সাত্ত্বিক সম্মিলন আপনাদের সাধনাজাত ব্রহ্মণ্যদেবের করুণার ফল। যে সময়ে শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত সাধনা লুপ্ত—ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলী একে একে অন্তর্হিত—ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিকৃত গর্জ্জনকে দেবগর্জ্জন মনে করিয়া যে যুগ শ্রুতিস্মৃতিপাঠের সুদীর্ঘ অনধ্যায় কাল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, আপনারা সেই সময়ে সেই বঙ্গীয়সমাজে বেদবিদ্যালয় ও স্মৃতিপাঠশালা স্থাপন করিয়া যে ভবিষ্যৎ স্থায়ী কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যে সময়ে পুরাণপাঠ নাই—কথকতা নাই অধিকাংশ গুরু পুরোহিত যে সময়ে উপদেশ দানে অযোগ্য—ধর্ম্মভাব উন্মেষের পক্ষে এমন দুঃসময়ে আপনারা উপযুক্ত ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনার সুযোগ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে

অণুমাত্র সংশয় নাই। যে সময়ে হীনবর্ণসেবী পতিত ব্রাহ্মণগণও সান্যাল, বাগচি, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিতে মিথ্যা আত্মপরিচয় খ্যাপনের জন্য লালায়িত, সে সময়ে কুলপরিচয়সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়া আপনারা ব্রাহ্মণগণের কুলোচিত বিশুদ্ধিরক্ষাকল্পে যে বিশেষ প্রয়াস করিতেছেন, এজন্য সমগ্র চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ আপনাদের নিকট ঋণী। কাল-স্রোতের তীব্র প্রতিকূলতা লঙ্ঘন করিয়া আপনারা যে এইরূপ কঠোর সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, এই যে প্রতি বৎসর আপনারা বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মণ্যদেবের অশেষ অনুকম্পায় সেই সেই স্থানের অধর্ম্মভাব অপসারিত করিতেছেন, শুনিয়াছি তাহারই ফলে কত শত কদাচারী সদাচারী হইয়াছেন, কত গায়ত্রীবর্জ্জিত ব্রাহ্মণসন্তান সন্ধ্যাহ্নিকপরায়ণ হইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম আপনারা অনেক করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাই আমরা প্রত্যাশিত হৃদয় লইয়া আজ আপনাদের শরণাপন্ন।

চিকিৎসক স্বীয় অণুবীক্ষণী শক্তিদ্বারা রোগীর সকল অবস্থাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন; তথাপি রোগী স্বয়ং অন্তর্বেদনা প্রকাশ করিয়া অনেক সময় চিকিৎসকের ঔষধ নির্ণয়ের সাহায্য করে—অনেক সময় পূর্ব্ব ব্যবহৃত ঔষধের সাফল্য-বর্ণনায় রোগীও চিকিৎসাব্যাপারের সাহায্য করিয়া থাকে। আমরা রোগী; ভোগের রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া আমরা অন্তঃসারশূন্য—কঙ্কালসার। কিন্তু এখনও ত সুস্থ লোক সমাজে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। যখন সামাজিক উন্নতজনের সুস্থ সবল দেহ, চিরপ্রফুল্ল হৃদয়, বিনয়মধুর ব্যবহার ইত্যাদি আমাদিগকে আপ্যায়িত করে, তখনই মৌলিক বংশের সন্তান আমরা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না—কেন আমরা এমন হইলাম—কেন এত ভোগেও রসনা অতৃপ্ত—কেন এত অন্নরাশির মধ্যে থাকিয়াও দেহ শীর্ণ, রুগ্ন, অবসন্ন—কেন এত গ্রন্থ অধ্যয়নজাত সুচিন্তাপ্রবাহে স্নান করিয়াও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত? আমাদের সেই সাত্ত্বিক আহার ব্যবহার নাই, সাত্ত্বিক সঙ্গ সম্পদ নাই—সাত্ত্বিক আচার অনুষ্ঠান নাই। তাহার স্থানে আছে রজঃ ও তমঃ—আছে লোভ ও মোহ—তাহার স্থানে আছে আলস্য ও অনিচ্ছা। তমঃ আমাদিগকে দিন দিন অলস করিতেছে, আর রজঃ ভোগের জন্য চিত্তকে লোলুপ করিয়া তুলিতেছে—তমঃ মানবকে সাধনাশক্তিতে বঞ্চিত করিতেছে, আর রজঃ অসাধককেও সাধনালভ্য ফলের জন্য আকুল করিতেছে। ফলে, সত্ত্বসুলভ সতত প্রসন্নতা আর আমাদিগের নাই। সেই আত্মক্রীড় আত্মরতি আত্মতৃপ্ত ভাব কথার কথায় পরিণত হইয়াছে। আমারা জীবিতোদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি; আমরা ব্রাহ্মণ হই, ক্ষত্রিয় হই, বৈশ্য হই বা শূদ্র হই, আমরা ত্যাগীর জাতি, ভোগীর জাতি নহি—আমরা সকলেই কর্ম্মভূমির সন্তান, ভোগভূমির সন্তান নহি। আমরা পূজা করিতে আসিয়াছি, পূজনীয় হইতে আসি নাই, আমরা সেবা করিতে আসিয়াছি, আজন্ম সেবাগ্রহণের জন্য আসি নাই। জন্মভূমির দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছি, জন্মভূমির উপর প্রভুত্ব করিতে আসি নাই। কিন্তু এই যে ত্যাগীর মধ্যে ভোগলিপ্সা—

পূজকের মধ্যেও পূজনীয় হইবার প্রবৃত্তি, দাসের মধ্যেও প্রভুত্ববাসনা—ইহাতে কি সূচনা হয় না আমরা বিকারগ্রস্ত?—ইহাতে কি মনে হইবে না আমরা রজঃ ও তমোবিকারে জর্জ্জরিত? এই যে ধর্ম্মশূন্য শিক্ষায়, এই যে কর্ম্মশূন্য জ্ঞানে এই বিকার দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; তদুপরি দেশের ভবিষ্যৎ জীবন্তমূর্ত্তি বঙ্গের হিন্দু ছাত্রগণ যে ভাবে ছাত্র-জীবন যাপন করেন, তাহা চিন্তা করিলে আরও নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। এই যে হোষ্টেলে, বোর্ডিংএ ছাত্রগণের অবস্থান, ইহার ভাবী পরিণাম চিন্তা করিলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রাণে নিশ্চিতই ভীতির সঞ্চার হইবে। এই সকল স্থানে খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই বলিলেই চলে, কারণ খাদ্যসম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদাসীন। অথচ, এই খাদ্যই চিন্তাশক্তির উপাদান, স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র সহায়ক, ধর্ম্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন। স্বাস্থ্যে, সুচিন্তায়, ধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়া অভিভাবকগণ সন্তানগণকে কোন্ সুখের জন্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন, তাহা ভাবিয়া আমরা কূল পাই না। শ্রুতি বলে—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ"—খাদ্যপদার্থের সারাংশে মন গঠিত হয়; অথচ এই উদীয়মান ছাত্রজীবনে রজঃ ও তমঃ দ্বারা যে মন প্রস্তুত হয়, তাহা সতত বিক্ষিপ্ত—সতত অলস কেন হইবে না? যদি তাহাই হইল, তবে এই ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনে অন্তরে ও বাহিরে যে কর্ম্মকুশলতা ও ঐক্যস্থাপনের আবশ্যকতা হইবে, তাহার প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইবে এই চিত্তবিক্ষেপ, এই আলস্য ও অনিচ্ছা। ফলে হইয়াছে তাহাই। আমরা এখন পরিবারে, সমাজে, সম্প্রদায়ে, দেশে সর্ব্বত্র পরস্পর বিক্ষিপ্ত হইতেছি—বহু মতভেদে জর্জ্জরিত হইতেছি। সংস্কারকগণ জাতিভেদকেই এই মতভেদের কারণ মনে করিয়া বাহিরে সাম্যসংস্থাপনের প্রয়াস করিলেও, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ইত্যাদি একতার প্রলেপে ঐক্যগঠনের চেষ্টা করিলেও আন্তরিক বৈষম্যের ফুৎকারে উহা উড়িয়া যাইতেছে। অপর দিকে রাজস-খাদ্যজাত বহু অসংবদ্ধ চিন্তা, নানা প্রকার আধি-ব্যাধি সমাজদেহকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহসর্ব্বস্ব-ভাবের বহুল প্রচারে আমরা দিন দিন পরকালের অস্তিত্বে অন্ধ হইতেছি। এই অন্ধতা, এই মূঢ়তা ইহকালের ভোগে জীবহৃদয় লোলুপ করিয়া ভোগভূমিতে নানারূপ বিবাদবিসম্বাদ আনয়ন করিতেছে। সুতরাং, আমাদের মনে হয়, এই ভোগের রোগ নিবারণ করিবার জন্য যাহাতে ত্যাগমূলক ধর্ম্মশিক্ষা আমাদের শিক্ষার সহিত সংযোজিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনকল্পে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তাহাদের জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগর ও উপনগরে বিশুদ্ধ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেখানে ছাত্রগণ বিশুদ্ধ খাদ্যের দ্বারা দেহপোষণে অভ্যস্ত হইবে, মতভেদ, আধি-ব্যাধি, নাস্তিকতা, শোক, মোহ, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ দুঃখের মূলীভূত অসদাচার পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইবে। ধর্ম্মশিক্ষার ফলে প্রীতি-মৈত্রী, ভগবদ্ভক্তি ইত্যাদি কোমল বৃত্তি উন্মেষের পক্ষে সুযোগ ঘটিবে। ইহাতে বহুবিধ সুফলের সম্ভাবনা, অথচ ব্যয় অল্প।

আমাদের রোগ অবশ্যই আপনারা ধরিয়াছেন, তথাপি রোগীর মুখে রোগের বর্ণনাশ্রবণ

হয় ত আপনারা প্রয়োজনীয় মনে করিতে পারেন, এই জন্যই অবস্থা ও প্রতীকার সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র ধারণা আপনাদের সমীপে নিবেদন করিলাম।

পরিশেষে আমার স্বদেশবাসিগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ নিবেদন—মহানুভবগণ, 'মাতেব হিতকারিণী,' শ্রুতির আদেশ আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এই শুভ মুহূর্ত্তে উত্থিত হউন— জাগ্রৎ হউন। ব্রাহ্মণ্যশক্তি জাগরণের জন্য সে সংযম, সে ত্যাগ, সে ব্রহ্মচর্য্য, সে সদাচার পুনরায় লাভ করিবার জন্য আসুন আমরা বর প্রার্থনা করি। এই যে অভয়বরদাত্রী সম্মিলিতব্রাহ্মণশক্তি অতিথির বেশে আমাদিগকে উদ্বোধিত করিতে আসিয়াছেন। পূর্ব্বগৌরবকে কত আর উপেক্ষা করিব—পুরুষানুক্রমিক সে সাধনে আর কতদিন উদাসীন থাকিব? যে বাহ্যসম্পদে—আত্মহারা হইয়া আমরা এই অন্তঃসম্পদ উপেক্ষা করিয়াছি, সে বাহ্যসম্পদ, সে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সে ধন, রত্ন, সে সম্মান যে সেই অন্তঃসম্পদেরই ফল! শতবার উপেক্ষা করিলেও যে এখনও সে পূর্ব্বগৌরব আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। যদি আমার পূর্ব্বপুরুষ সোমেশ্বরের সাধনতপস্যামহিমা আমাকে উপেক্ষা করিত, তাহা হইলে এই বিরাট ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের পরিচর্য্যার গৌরব কখনই আমার মত অপরিণতবয়স্ক অকৃতী জনের পক্ষে সুলভ হইত না। আমি নিজে এই গৌরবের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইলেও আমার পূর্ব্বপুরুষের সাধনাপূত শোণিতবিন্দু আমার দেহে আছে বলিয়াই আপনারা আমাকে এই লোভনীয় অধিকার দিয়াছেন, পরন্তু আমি আমার অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইতেছি।

শুনিয়াছি—রাজদেহে পরকায়প্রবিষ্ট ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহারই প্রণীত মোহমুদ্গর পাঠে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়—আমাদেরও মধ্যে সেইরূপ বহু কশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গৌতম, বশিষ্ঠ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদেরই উপযুক্ত সন্তান এই বিরাট ব্রাহ্মণমণ্ডলী এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

আমার স্বদেশবাসিগণ! আজ গ্রহবৈগুণ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ লুপ্তপ্রায়, তাঁহাদের আচরিত নিত্য নৈমিত্তিক জীবন্ত অনুষ্ঠান এখন প্রাণহীন মিথ্যাচারে পরিণত, তাঁহাদের হোমবহ্নিশিখা নির্ব্বাপিত, পূতযজ্ঞভস্ম এবং ব্রাহ্মণদেহের শোভাসম্পদ রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা বহুকাল হইল ব্রহ্মপুত্রের নিম্নপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এতকাল তুচ্ছ ছাই ভস্ম বলিয়া যাহা উপহসিত হইতেছিল, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই বিভূতিই ললাটে ধারণ করিয়া তাহারই অঙ্গরাগে রঞ্জিতদেহ হইয়া আজ বিরাট ব্রাহ্মণমণ্ডলী সুপ্তশক্তিউদ্বোধনের জন্য আমাদের দ্বারে উপস্থিত এবং আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, আমরাই ৺জগন্মাতা অর্দ্ধকালীর—মায়ের সন্তান, পূর্ণানন্দের, তপোধন উদয়নাচার্য্যের, পণ্ডিতাগ্রগণ্য কুল্লুকভট্টের সন্তানসন্ততি; আত্ম-

পরিচয়ের আত্মপ্রত্যয়ের এমন মাহেন্দ্রক্ষণ জীবনে আর মিলিবে কিনা সন্দেহ। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আজ এই শুভমুহূর্ত্তে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, আবার উদয়ন তাঁহার সন্তানদেহে উদ্বুদ্ধ হইবেন, আবার সোমেশ্বর জাগরিত হইবেন—আবার কৃষ্ণকিশোর, আনন্দকিশোর নয়ন উন্মীলন করিবেন, তাঁহারা আবার এই অভিনব সন্তানদেহের রাজা হইয়া এই দেহযন্ত্র পরিচালন করিবেন, বঙ্গভূমির পূর্ব্বাকাশ আবার গৌরবের অরুণরাগে রঞ্জিত হইবে।

উপসংহারে আমার নিবেদন এই—ব্রাহ্মণ ভূদেব! জানি না কোন্ অতীত সাধনার সিদ্ধি-রূপে আমরা এই দেবদর্শন লাভ করিয়াছি। দেবদর্শন বিফল হয় না। আমরা ভূদেবচরণে প্রার্থনা করিতেছি যেন আমরা তাঁহাদের উপযুক্ত পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হই এবং পরিচর্য্যা-শেষে তাঁহাদের মানুষীকরণচরণরেণু লাভ করিয়া ময়মনসিংহ যেন সাধনায়, তপস্যায়, বিদ্যায় সর্ব্বত্র লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে।

যাঁহার শান্তিময় শাসনে আমরা নির্ব্বাধে ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করিতেছি, যাঁহার সুশীতল করচ্ছায়ার আশ্রয়ে ভারতবাসী নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ, সেই মহনীয় ভারতসম্রাট্ বিশ্ববিধ্বংসী ইউরোপীয় মহাসমরে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিজয়ে আজ আমরাও বিজয়-গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

কিন্তু এদিকে অল্পকাল অতীত হইতে না হইতেই ভারতের উত্তর পশ্চিম আফগান সীমান্তে আবার সমরভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় মহাসমরের তুলনায় এ যুদ্ধ অতি ক্ষুদ্র হইলেও, বিশ্ববিজয়ী ভারতসম্রাটের প্রভাবের নিকট শত্রুশক্তি অতি তুচ্ছ হইলেও, নিরীহ দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ত্রাসসঞ্চার স্বাভাবিক। তথাপি আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি কাহারও অণুমাত্র আশঙ্কার কারণ নাই, ভীতির কারণ নাই, কেন না ন্যায় ও ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। যিনি যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে প্রতি জাতির কল্যাণার্থ এ নরজগতে অনিয়ত কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন—সেই ব্রহ্মণ্যদেব ভারতরক্ষা-ব্রত সম্রাটের সর্ব্বত্র বিজয়গৌরব প্রদান করিবেন।

আমরা আজ একীকৃতকণ্ঠে সমবেত সাধনায় সেই কৃপাময় ব্রহ্মণ্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—ভারত-সম্রাটের জয় হউক, জগতে শান্তি স্থাপিত হউক, অভ্যুদয় মঙ্গলে জগৎ পূর্ণ হউক।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহশর্ম্মা।

পণ-প্রথা।*

পণ-প্রথা-নিবারণের কথা বলিতে গিয়া বিবাহের লক্ষণ কি, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উদ্বাহতত্ত্বটী ব্যাখ্যা করিলে সুপণ্ডিত সভ্য মহোদয়মণ্ডলীর কেবল যে ধৈর্য্যহানির কারণ হইব, তাহা নহে, পরন্তু অনাবশ্যক বিদ্যাড়ম্বরপ্রকাশ-হেতু ভৎসনাভাজনও হইব, ইহা মনে করিয়া কেবল এই প্রবন্ধের অবতারণাস্বরূপ এইটুকুমাত্র বলিয়া রাখি যে, উদ্বাহতত্ত্বে লিখিত বিবাহলক্ষণের মর্ম্মটুকু বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, কন্যার সম্প্রদাতা কন্যাকে সহধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত দান করিলে বর "স্বস্তি" এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক যে কন্যাগ্রহণরূপ জ্ঞানের অভিব্যক্তি করেন, সেই জ্ঞানবিশেষই বিবাহ। এবং বিবাহের ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ ভেদ থাকিলেও ব্রাহ্মবিবাহই অধিকাংশরূপে উক্ত লক্ষণের মধ্যে পড়ে, এবং কতিপয়সংখ্যক অনার্য্য ও অন্ত্যজ জাতিকে বাদ দিলে, হিন্দুসমাজের ভিতর ব্রাহ্মবিবাহেরই প্রচলন আজকাল সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মবিবাহের লক্ষণ মনু এইরূপ করিয়াছেন,—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন বরকে ডাকিয়া আনিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া অর্চ্চনা-পূর্ব্বক কন্যার দানই ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মবিবাহ।

যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্॥"

যে বিবাহে বরকে নিজের বাটীতে ডাকিয়া আনিয়া যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করা হয়, সেই বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। এই ব্রাহ্মরীতি অনুসারে বিবাহিত দম্পতী হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পিতা এবং মাতা এই উভয়ের বংশপরম্পরায় একুশ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে।

এই ব্রাহ্মবিবাহই অন্য বিবাহগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে দৈববিবাহের ন্যায় দৈবকার্য্য-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নাই, আর্ষ বিবাহের ন্যায় গো-মিথুনরূপ শুল্কাভাস নাই, প্রাজাপত্যবিবাহের ন্যায় গার্হস্থ্যপ্রতিপালনের কড়ার নাই, আসুরবিবাহের ন্যায় পণলুব্ধতা নাই, গান্ধর্ব্ববিবাহের ন্যায় যথেচ্ছাচারিতা নাই, রাক্ষসবিবাহের ন্যায় জিঘাংসাবৃত্তি নাই, পৈশাচবিবাহের ন্যায় প্রলোভনের ছল নাই। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের জন্য আহূত পিতৃপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদদ্বারা

---

* ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত।

অভিষিক্ত, পাত্র ও পাত্রীর বংশপরিচয়ের দ্বারা অনুবদ্ধ এবং হোমক্রিয়া দ্বারা পরিশোধিত এই ধর্ম্মসঙ্গত শুল্কগ্রহণাদিদোষবর্জ্জিত ব্রাহ্মবিবাহে বর কন্যাকে গ্রহণ করিয়া যখন বলে— "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব। প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্"—আজ হইতে আমি তোমার হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব। আমার চিত্তানুরূপ তোমার চিত্ত হউক। একমনা হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। প্রজাপতি তোমাকে আমার জন্য নিয়োজিত করুন।" আর কন্যাও আপনার জীবনের একমাত্র দেবতা ও আশ্রয় লাভে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া অবনতমস্তকে চিরদিনের জন্য যখন তাহার সেবাব্রত গ্রহণ করে, তখন দুইটী হৃদয় কি মধুর অদ্বৈতভাবেই না সম্মিলিত হয়।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে বিবাহভেদেরও ব্যবস্থা থাকায় পূর্ব্বোক্ত অষ্টপ্রকার বিবাহেরই প্রচলন ছিল। তাহার পর, কালের উপযোগিতাক্রমে সভ্যতালঙ্কৃত হিন্দুসমাজ অপরাপর বিবাহ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রাহ্মরীতিই অবলম্বন করিয়া ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এখন তাহারা প্রবল অর্থলালসাহেতু মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিয়া পণলুব্ধতাদ্বারা এই পবিত্র রীতিকে ক্রমশঃ আসুরিকতার দিকে চালিত করিতেছে। যে কন্যাদানের ফল সংবর্ত্ত বলিয়াছেন—

"তাং দত্বা চ পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
পূজয়ন্ স্বর্গমাপ্নোতি নিত্যমুৎসববৃত্তিষু॥"

পিতা বস্ত্রালঙ্কার ও অশনদ্বারা কন্যাকে প্রদান করিলে নিত্য উৎসবের সহিত স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন, এবং যমও ঐ কথার অভিব্যক্তি করিয়া বলিয়াছেন,—

"কন্যাপ্রদঃ সেতুকারী স্বর্গমাপ্নোত্যসংশয়ম্।"

সেই স্বর্গফলপ্রদ, অতএব একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয় কন্যাদান আজ পণগ্রহণের তাড়নায় সাধারণের পক্ষে গুরুতর দায়স্বরূপ হইয়া এরূপ অনাকাঙ্ক্ষণীয় হইয়াছে যে, লোকে "দশপুত্রসমা কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে"—শীলবান্ পাত্রে প্রদত্ত হইলে একটী কন্যা দশপুত্রসমা হয়, এই ঋষিবাক্য ভুলিয়া গিয়া কন্যাজনন একরূপ আপনার অমঙ্গলস্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। শুধু কি তাহাই? এই পণলুব্ধতার তাড়নায় অস্থির হইয়া কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা শীত, আতপ ও বর্ষার প্রবল উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিয়া কখনও অর্দ্ধাশনে কখনও বা অনশনে অভিশপ্ত জীবের মত পরকৃপাভিক্ষু হইয়া বিফল চেষ্টায় পরিভ্রমণ করিতেছেন; নিজেদের সুখদুঃখের দিকে দৃষ্টি নাই, নিজেদের মান অপমানের দিকে দৃষ্টি নাই, নিজেদের পরিবারপ্রতিপালনের দিকে দৃষ্টি নাই। যেন তাঁহাদের সকল চিন্তা একমুখী হইয়া ঐ কন্যাদায় উদ্ধারের দিকে ছুটিয়াছে। বরপক্ষের এই পণগ্রহণ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য কত না কন্যাজনক স্বকীয় বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি মাথা পাতিবার স্থান গৃহটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া কপর্দ্দকহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী, পদে পদে পরপদদলিত ও দারিদ্র্যের কঠোর নির্য্যাতনে নিপীড়িত হইয়া নিরুপায় পরিবারবর্গের সহিত নিরাশ্রয় অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাত্রপক্ষের এই পণলুব্ধতার কবলে পড়িয়া অহর্নিশ দুশ্চিন্তাদগ্ধ কন্যাজনকের জীবনকুসুম নিত্য নব অপমানের শলাকায় বিদ্ধ হইয়া অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, আর তাঁহার অসহায় রোরুদ্যমান পরিবারবর্গ অদৃষ্টের তীব্র উপহাসে সন্তাপিত হইতেছে। বর-পক্ষের এই জুগুপ্সিত পণলুব্ধতার ফলে কত কোমলাঙ্গীর সুখসাধপূর্ণ জীবন বাল্যে কন্যাদায়-ভীত জনকের সুখের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া, এবং যৌবনে পণরুধিরপিপাসু স্বামীর অতৃপ্তির কারণস্বরূপ হইয়া, কেবল নিগ্রহে নিগ্রহে আমরণ বিষাদ ও নৈরাশ্যের করুণ কাহিনী গাহিয়া যাইতেছে। কেহ বা আপনাকে দারিদ্র্যপীড়িত পিতার সর্ব্বনাশের মূল মনে করিয়া আত্মহত্যাদ্বারা নারীজীবনের সকল অভিলাষ শেষ করিয়া দিতেছে! শুধু কি তাহাই? পণপ্রথার দুষ্পরিণামে কত নারী আজীবন অবিবাহিতা ও দাম্পত্যসুখবর্জ্জিতা হইয়া মরুভূমির মত বিফল জীবন ধারণ করিতেছে, আবার কেহ বা তাদৃশ সুখসাধহীন জীবন ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া জঘন্য পুংশ্চলীবৃত্তি ধারণকরতঃ পবিত্র পিতৃ-কুলে কালিমার প্রলেপ দিতেছে! সমাজের এই সর্ব্বনাশকরী আসুরিকী পণগ্রহণ-প্রথার মূল অর্থলালসা; কৌলীন্য তাহার ছলমাত্র। কৌলীন্য অর্থলালসায় বর্দ্ধিত হয় না, বরং নষ্ট হইয়া যায়। কন্যাকে নিজের ক্ষমতামত বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ভূষিতা করিয়া সৎকুলজাত সচ্চরিত্র পাত্রের হস্তে আনন্দের সহিত প্রদান করা এক জিনিষ, আর বরপক্ষের বাধ্যতা-মূলক নির্ব্বন্ধে আপনার শক্তি অতিক্রম করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও পণ দিতে বাধ্য হইয়া কন্যা-জননাপরাধী পিতার কাতর ও উদ্বিগ্নপ্রাণে কন্যাদান অপর জিনিষ। একটীতে কন্যাদানের কি অনির্ব্বচনীয়া তৃপ্তি, অন্যটীতে কন্যাদানভীত প্রাণের কি নিদারুণ হা হুতাশ! একটীতে স্বর্গফলকামিপিতৃপ্রদত্তা কন্যার সহিত পাত্রের ধর্ম্মসঙ্গত প্রসাদময় মিলনে কি স্বর্গের মধুরিমা, অন্যটীতে পণরুধিরার্থী বরপক্ষের অতৃপ্তি-বহ্নিদগ্ধ শ্মশানভূমিতে দুইটী হৃদয়ের নিগড়বন্ধনে কি নারকীয় দৃশ্য! আমরা অর্থলালসায় স্বর্গকে নরক করিয়াছি, সুখময় বৈবাহিক সম্বন্ধ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি, চিরপবিত্র দাম্পত্যতরুর অকৃত্রিম ধর্ম্মরূপ মূলের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম অর্থরূপ মূল বসাইয়া তাহার শিথিলতা ও বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।

এই পণপ্রথা যে আমাদের ধর্ম্মপথের কিরূপ অন্তরায় হইতে পারে, তাহা দুই একটী প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছি। প্রথমতঃ, বরপক্ষের অভিলষিত পণ দিতে অসমর্থ পিতা প্রায়ই শাস্ত্রসম্মত বিবাহযোগ্যকালে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না বলিয়া তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রে বিবাহের যোগ্যকাল এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে যথা,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ॥"

অর্থাৎ, আটবৎসরের মেয়েকে "গৌরী" এবং নয় বৎসরের মেয়েকে "রোহিণী" বলে. দশ বৎসরের মেয়ের নাম কন্যা, দশবৎসরের পর কন্যা রজস্বলা হয়। অতএব পণ্ডিতগণ কন্যা দশবৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই যত্নসহকারে তাহাকে প্রদান করিবে। মলমাসাদি কালদোষ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেনা।

এখন দরিদ্র পিতা উপযুক্ত অর্থের অভাবে পণ দিতে না পারায় কন্যার এই বিবাহ-যোগ্য কালের মধ্যে পাত্র খুজিয়া পাইলেন না। কাজে কাজেই বিবাহকাল অতিক্রম করিয়া কন্যার রজস্বলা অবস্থায় বিবাহ দিতে হইল। এই কালাতিক্রমণের পাপ বড় কম নহে। যম বলেন,

"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্॥

—যে কন্যা বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা ব্রহ্ম-হত্যা পাপের ভাগী হয়। এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ং বর খুঁজিয়া বিবাহ করাই উচিত।" রাজমার্ত্তণ্ডেও উক্ত আছে—

সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্।
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তু তাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥

—যে পিতা দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে প্রদান না করে, সেই পিতা প্রতিমাসে ঐ কন্যার রজোজনিত শোণিত পান করে, কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখিলে তাহার পিতামাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই তিন জন নরকগামী হয়। আর যে ব্রাহ্মণ মদমত্ত হইয়া ঐরূপ কন্যাকে বিবাহ করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ বা একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করা উচিত নহে, "সে শূদ্র বলিয়া গণ্য হয়।"

অত্রি ও কাশ্যপ বলেন,

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতাঃ॥

পিতার গৃহে যে কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় রজোদর্শন করে, তাহার পিতার ভ্রূণহত্যাপাতক হয়, এবং সেই কন্যা শূদ্রীরূপে গণিতা হইয়া থাকে।"

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, যে বরপক্ষের পণ গ্রহণের খেয়ালে কন্যাজনকদিগের কন্যাদান-জনিত স্বর্গলাভের পরিবর্ত্তে বিবাহকালাতিক্রমণ হেতু নরকযন্ত্রণা ভোগই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে!

দ্বিতীয়তঃ—বরপক্ষের পণাভিলাষ পরিপূরণে অসমর্থ কন্যাজনক প্রায়ই কন্যার জন্য

সংপাত্র প্রাপ্ত হন না, কাজেকাজেই অসৎ পাত্রে কন্যাদান করিয়া শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিয়া থাকেন। কারণ মনু বলেন,—

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈ বৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হি চিৎ॥
উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

—কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকে, সেও ভাল, তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রের হস্তে প্রদান করিবে না। উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন,সুরূপ এবং বিবাহ-যোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইলে বিবাহের যোগ্য বয়স অপ্রাপ্ত কন্যাকেও যথাবিধি প্রদান করিবে।"

যে সংপাত্রের খাতিরে মনু কন্যাকে আজীবন কুমারী রাখা, কি অপ্রাপ্তবয়সে বিবাহ দেওয়াও সমীচীন মনে করেন, সেই সৎপাত্র পণপ্রথার ফলে সমাজে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কোন অল্পধনবিশিষ্ট কন্যার পিতা সৎপাত্রে কন্যাদানের আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না, ইহা কত দূর না ক্ষোভের বিষয়। তাহার পর পণ দিতে অসমর্থ হওয়ায় অনেক কুলীন পিতা নিজকন্যাকে নীচ ঘরে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া স্বকীয় কুলমর্য্যাদা নষ্ট করিয়া থাকেন, ইহা কত দূর না পরিতাপের বিষয়!

তৃতীয়তঃ—যে বিবাহের মূলে অর্থলালসা, সে লালসার একটু অতৃপ্তি হইলেই চিত্তে দারুণ অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা, এবং সেই অসন্তোষের ফলে কন্যা শ্বশুরগৃহের চক্ষুঃশূল হইয়া আজীবন নানাপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিয়া থাকে। এই নারীনির্য্যাতন একটী ঘোর অধর্ম্ম। মনু বলিয়াছেন—

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে কুলে কুলস্ত্রীগণ কষ্টপ্রাপ্ত হন, সেই কুল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া থাকে, আর যে কুলে তাঁহারা কষ্ট প্রাপ্ত হন না, সেই কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

চতুর্থতঃ—আমি এত টাকা পণ না পাইলে পুত্রের বিবাহ দিব না, এইরূপ ঝড়ারের উপর যখন বিবাহকার্য্য নির্ভর করে, তখন এই পণকে বরমর্য্যাদা না বলিয়া বিবাহশুল্ক বলাই সঙ্গত। শুল্কগ্রহণ যে অতি পাপকর, তাহা জানাইবার জন্য কন্যাপিতার শুল্কগ্রহণের প্রসঙ্গ তুলিয়া মনু বলিয়াছেন—

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥

কন্যার পিতা জ্ঞাতসারে অণুমাত্র শুল্কগ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভবশতঃ শুল্কগ্রহণ করিলে, তিনি অপত্যবিক্রয়রূপ উপপাতক দ্বারা অন্বিত হইবেন।"

কাশ্যপও বলেন—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িনঃ পাপা মহাকিল্বিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্॥

যে সকল ব্যক্তি লোভমোহিত হইয়া শুল্কগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান করে, সেই আত্মবিক্রয়কারী মহা পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পাপিগণ ঘোর নরকে পতিত হয়, এবং সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত কুলের নাশ করে।"

দানের যোগ্যা কন্যার দান স্থলে শুল্কগ্রহণ করিলে যখন এত পাপ, যাহাকে দান করা হইতেছে না এইরূপ পুত্রকে দেয়রূপে কল্পনা করিয়া এই কল্পিত দানের শুল্কস্বরূপ পণ আদায় করা যে দ্বিগুণ পাপজনক, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়।

তাহার পর আর একটা কথা, পণদানের বিষম উদ্বেগে কন্যাজনক সেরূপ প্রীতিহৃদয়ে কন্যাদান করিতে পারেন না, কাজেকাজেই তাঁহার দান ঠিক আন্তরিকভাবে ও আদরের সহিত না হওয়ায় উহা তামস দানরূপেই পরিগণিত হয়। গীতায় আছে—অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্" দান অসৎকৃত ও অবজ্ঞাত হইলে তামসরূপে কথিত হয়।" সুতরাং তামসরূপে পরিণত হওয়ায় কন্যাজনকের কন্যাদানের প্রকৃষ্ট ফল যে স্বর্গফল, তাহা সম্পূর্ণ দুরধিগম্য হইয়া পড়ে।

ইতঃপূর্ব্বে পণপ্রথার প্রস্তাব তুলিবার সময় ইহার কতকগুলি সামাজিক ও গার্হস্থ্য দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে আরও দুই একটা তদ্রূপ দোষের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমতঃ—কন্যাবিবাহে সামাজিক হিসাবে আত্মীয় কুটুম্ব বৃদ্ধি একটা অভীপ্সিত বস্তু। কিন্তু পণপ্রথা দ্বারা অনাত্মীয় বৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে। কারণ, পণলুব্ধ বর বা শ্বশুর কখনই কন্যাজনকের সহিত সদ্ভাবে বা আত্মীয়ভাবে থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ—কন্যা শুভবিবাহের রাত্রিতে ধর্ম্মপত্নীরূপে গৃহীত হইবার সময় যদি দেখে যে, তাহার জনকের দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত একরাশি অর্থ বর বা শ্বশুরের পণপিপাসা নিবৃত্তির জন্য সজ্জিত রহিয়াছে, সে সেই বয়ঃসন্ধিস্থলে বিবাহকে অর্থমূলক মনে করিয়া কখনই আপনাকে স্বামীর ধর্ম্মপত্নীরূপে ভাবিতে পারে না। আর যদি পণলোভী শ্বশুর বা স্বামি-কর্তৃক দরিদ্র পিতার নির্য্যাতন প্রত্যক্ষ করে, সে কখনই পিতৃনির্য্যাতকের প্রতি আন্তরিক ভক্তিমতী হইতে পারে না। বিবাহসময়ের এই চিত্তবিকারের ফলে সে কখনই সংসারের অনুকূলা বধূ হইয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে না। বরং, শ্বশুরগৃহের প্রতি বিদ্বেষভাব তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকায় সে সংসারের নানাবিধ অশান্তিরই কারণ হইয়া উঠে।

তাহার পর আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, যাহারা যত পণলুব্ধ, তাহারা তত কন্যার জাতকাটের বা লক্ষণালক্ষণের দিকে না চাহিয়া অর্থের পরিমাণের দিকেই তাকাইয়া থাকে। কাজে কাজেই, অধিক অর্থ পাইলে তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঘরে কুঘরে এমন কি সময়ে সময়ে নীচজাতীয়া কন্যাকে ঘরে আনিয়া আপনার পবিত্রকুলকে একেবারে কলঙ্কিত করিয়া থাকে।

(পণপ্রথার দোষ আর কত বলিব? এই আসুরিকী পণপ্রথা এইরূপে প্রতিক্ষণে আমাদিগের ধর্ম্ম, কুল, সমাজ ও সংসার নষ্ট করিয়া দিতেছে। শান্তির সুখময় কুঞ্জে অশান্তির বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছে। আশালোকোদ্ভাসিত জীবনে নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার আনিয়া ফেলিতেছে! প্রবল ধনলালসা আমাদিগের মনুষ্যত্ব অপহরণ করিয়া আমাদিগের হৃদয় একেবারে মরুভূমি করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এই সর্ব্বনাশকরী প্রথা নিবারণের কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন না করিয়া ক্রমে ক্রমে সংবর্দ্ধনেরই চেষ্টা করিতেছি। কোথায় উচ্চবিদ্যা আমাদিগের চিত্ত মার্জ্জিত করিয়া এই জঘন্য প্রথা নিবারণের উপদেশ দিবে, না কোথায় আমাদিগের চিত্ত আরও কলুষিত করিয়া আরও অধিকতর পণগ্রহণে প্রণোদিত করিতেছে! আর সমাজকে ধ্বংসপথে লইয়া যাইতেছে।)

প্রবল অর্থলোভেই আমরা এই জঘন্যপ্রথা সমাজে আনয়ন করিয়াছি, এবং মহনীয় কৌলীন্যকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরাই ত অর্থলালসা কমাইয়া এই প্রথার সমুচ্ছেদ করিতে পারি? তবে কেন করি না? আমরা বড় বড় রাজনৈতিক বিষয় লইয়া মাতিতে পারি, সনাতন ধর্ম্মকে জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য নূতন উদ্ভট ধর্ম্মের আবিষ্কার করিতে পারি, হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ পুরাতন প্রথাগুলির ওলট পালট করিয়া 'কিম্ভূত কিমাকার' নূতন নূতন প্রথা প্রচারিত করিবার ক্ষমতা, যোগ্যতা ও অবসর পাইতে পারি। আমরা অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতিষ্ঠাপন জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারি, কিন্তু যে সকল বস্তু আমাদিগের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর, সে সকলের জন্য ত একমুহূর্ত্তও ভাবি না! সে সকলের নিবারণ আমাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইলেও মূঢ়তাবশতঃ আমরা অবজ্ঞার সহিত ফেলিয়া রাখি। পণপ্রথা আমাদেরই সৃষ্ট বস্তু, পণপ্রথার কুফল আমরাই ভোগ করিতেছি, পণপ্রথা নিবারণ আমাদেরই করায়ত্ত। হায়! আমরা অর্থলোভে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে হারাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিতেছি। কবে আমাদের চক্ষু ফুটিবে? কবে আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত শুভোদ্বাহ পণগন্ধবিহীন হইয়া আমাদের সংসারকে শান্তিক্ষেত্রে পরিণত করিবে? অপ্রীতির নিগড়বন্ধন দূর করিয়া সুখময় প্রীতিপুষ্পের কোমলবন্ধনে সকল হৃদয় বান্ধিয়া সংসারে নির্ম্মল আনন্দের অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত করিয়া দিবে? কবে আমরা আমাদের ধর্ম্ম বুঝিব? আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিতে শিখিব?

(হে ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদিগকে আর অধিক কি বলিব? আপনারা সকলেই পণপ্রথার বিষময় ফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা, আন্দোলন ও বক্তৃতা ত অনেক হইয়া গিয়াছে। আর কেন? আসুন সকলে মিলিয়া নির্ভেতার মন্দাকিনী ধারায় এই ধর্ম্মসমাজধ্বংসকারিণী পণপ্রথার দুর্গন্ধময় পঙ্কিল স্রোতঃ বিদূরিত করিয়া ফেলি। আমাদের কুদৃষ্টান্তে, সমস্ত সমাজ যেমন অধোগত হইয়াছে, আমাদিগের সদৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহা অবার পূর্ব্বের মত অভ্যুদয় লাভ করুক।)

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন।

গত বৎসর ব্রাহ্মণ-সম্মিলনে যাইব বলিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; কিন্তু সে লেখাই আমার সার হইল। ব্রাহ্মণ সম্মিলন আর হইল না। এ বৎসর যাইব না স্থির করিয়া ভৃত্য সঙ্গে লইয়া খুলনা অঞ্চলে শিষ্যবাটী যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে রাণাঘাট ষ্টেশনে আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক দেশবিশ্রুত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পুত্র ও ছাত্রাদিবেষ্টিত হইয়া সম্মিলনে যাত্রা করিতেছিলেন। আমি ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকার একজন সেবক—কাজেই আমি সম্মিলনে যাইতেছি না শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তর্করত্ন মহাশয় আজ্ঞা করিলেন, আমাকে সম্মিলনে যাইতেই হইবে। শ্রীজীব ভায়াও আমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একদিকে গুরুর আজ্ঞা, অপর দিকে বন্ধুর উপরোধ—আমি যাওয়াই স্থির করিলাম। আমার পাথেয় নাই, তখন তাঁহারা নিজেদের যাহা কিছু ছিল, তাহার সাহয্যে আমার ও ভৃত্যের দুই খানি টিকিট ক্রয় করিলেন। বাস্তবিক আমার তখন বড় আনন্দ হইল। আমার এত আদর ভাবিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

শ্রীজীবভায়া, আমি ও শ্রীনবদাস ন্যায়তীর্থ এই তিনজনে ট্রেণের একটি কক্ষে আশ্রয় লইলাম। নবদাসদাদা ও শ্রীজীবভায়া দুইজনে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় আলোচনায় মন দিলেন। গাড়ীও যেমন ছুটে, তাঁহাদের তর্কের ফোয়ারাও তেমনি ফুঠে। নবদাসদাদা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় প্রকার জ্যোতিষের আলোচনায় কৃতশ্রম—তাহা বুঝিলাম। যদিও সে গুরুপাক হজম করার আমার সাধ্য ছিল না, তথাপি উপর উপর পাকা রকমের আস্বাদনে বিরত হইলাম না।

আমি নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ গণনার কথা পাড়িলাম। যদিও কোন্ সাল, কোন্ সময় আর কোন্ লগ্ন তাহার ঠিক নাই, তথাপি আমার গণনা চাই। গণনা আরম্ভ হইল। দাদার আমার দিব্য হাতযশ, কল্পনাশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ। সে সচল যানের মধ্যে আমাদের সরস আলাপও সচল হইল। প্রাণের দুয়ার খুলিয়া গেল। নবদাসদাদা কচিৎ চুটকি গান ও কবিতা দ্বারা কচিদ্ বা হরবোলা রকমের অভিনয় দ্বারা গাড়ী জমাইয়া তুলিলেন। রাত্রি জাগরণ সার্থক হইল। "অবিদিতগতযামা" হইয়া রাত্রি পোহাইল।

প্রাতঃকালে অপর বন্ধুবর্গের নিকট যাইয়া আমাদের সে শুভ রজনীর গল্প করিলাম। সমস্ত রাত্রি দিব্য সুনিদ্রায় কাটাইয়াও আমাদের এ আনন্দের ভাগ না পাওয়ায় তাঁহারা ঈর্ষান্বিত হইলেন। শ্রীযুত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, ভবভূতি বিদ্যারত্ন ও শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ (বিদ্যোদয়ের সম্পাদকদ্বয়,) শ্রীঅমরনাথ স্মৃতিরত্ন, শ্রীকানাই তর্কতীর্থ আর কয়জন উপস্থিত ছিলেন।

তিস্তামুখ ঘাটে ষ্টীমারে পার হইলাম। ব্রহ্মপুত্রের—আমাদের মতে যমুনার—জলে আমি

স্নানাহ্নিক সারিয়া লইলাম। আমি যে বুদ্ধিমানের মত কার্য্য করিয়াছি—তাহা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ বাসায় যাইয়া স্বীকার করিলেন।

ময়মনসিংহ ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ ও ময়মনসিংহবাসী ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজেরা মোট স্কন্ধে লইয়া আমাদিগকে অশ্বযানে আরূঢ় করাইলেন। বাসা বেশ মনের মতই পাইলাম। স্থানীয় ভদ্রলোকগণের খোলাপ্রাণের রসালাপ, অক্লান্ত অকৃত্রিম সেবা আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। ভোজনের আয়োজন সুপ্রচুর, বন্দোবস্তও তেমনই সুন্দর। আমাদের কথাগুলি দেবাদেশের মত তাঁহারা নতমস্তকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আমরা আনন্দিত, কিছু বা লজ্জিত হইলাম।

স্বেচ্ছাসেবক ভ্রাতৃগণ, আমাদের অন্তরের ভালবাসা গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক। ময়মনসিংহবাসী ভদ্রগণ, আপনাদের ভদ্রতা ও আতিথেয়তার বিনিময়ে আমাদের এই অতি তুচ্ছ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ময়মনসিংহ-জেলার সঙ্গে আমার পূর্ব্ব হইতেই প্রাণের যোগ ছিল।

"তত্তস্ত কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ"। দশবৎসর পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনার বক্ষের উপর দিয়া আমি একবার ময়মনসিংহ যাই। জীবনে সে আমার এক মহাসুখ, সে আমার এক মহাগর্ব্ব। ময়মনসিংহবাসী যে আতিথেয়তায় চিরপ্রসিদ্ধ, তাহা আমি অগ্রেই জানিতাম। আমার সহযাত্রীদের ত পূর্ব্ব হইতেই ভরসা দিয়া রাখিয়াছিলাম।

আমি ও শ্রীজীব ভায়া রন্ধনে লাগিয়া গেলাম। আত্মীয় বন্ধুবর্গকে রন্ধন করিয়া, পরিবেশন করিয়া খাওয়াইব তাহাতে কত সুখ! নবদাস দাদা ভাটপাড়ার দলেই নাম লেখাইলেন। আমরাও তাঁহাকে ছাড়িলাম না। তর্করত্ন মহাশয়ের পৃথক বাড়ীতে একা থাকার বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না। ভগবান্ কি সাধে তাঁহাকে বড় করিয়াছেন?

বাসায় কি আনন্দ! দলে দলে লোক আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মহারাজ সুসঙ্গ, ব্রজেন্দ্র বাবু প্রভৃতিও দেখিয়া যাইতেছেন। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আলাপ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। তারানাথ সপ্ততীর্থ, মহেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ, যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, নবীন তর্কতীর্থ, রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ প্রভৃতির পদার্পণে বাসা পবিত্র হইল। পণ্ডিত যামিনী ময়মনসিংহ বাসী, কাজেই তিনি আমাদের অভাব অভিযোগের কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছিলেন। নৈয়ায়িক হইয়া অমন নিরভিমান শান্তপ্রকৃতি পুরুষ বড়ই দুর্ল্লভ। শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্যও প্রায়ই আসিতে লাগিলেন।

খাওয়া দাওয়ার প্রচুর আয়োজন। আমরাও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম। আম, সন্দেশ, দধি, ক্ষীরের হাট বসিয়া গেল। সঙ্গের ভৃত্যটি বলে এমন আহার সে জীবনে কখন পায় নাই।

গাড়ী আসিল, আমরা সভাক্ষেত্রে গেলাম। ৺দুর্গাবাড়ীর সম্মুখে বিশাল মণ্ডপ। রাজা, মহারাজ হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সকলেই সমুপস্থিত। শিক্ষিতবিষয়ী, বিদেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, দেশীয় ব্রাহ্মণ ও সাধারণ দর্শক প্রভৃতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছাত্রদের জন্য বেঞ্চ ছিল। বেলা ২ টার সময় গরমে সেই জনতার মধ্যে লোকে স্থির ছিল, ইহা উৎসাহের লক্ষণ সন্দেহ নাই। লোক সংখ্যা ৪।৫ হাজার হইবে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুসঙ্গের মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আমাদের মত একজন হইয়া সভায় দাঁড়াইলেন। মহারাজের ধীর ও প্রশান্ত আকৃতির, মধুর ও কোমল-কান্তির অনুরূপ কণ্ঠস্বরে অভিভাষণটি পঠিত হইল, মোলায়েম এবং বড় মিষ্টই লাগিল, হৃদয়ের ভাব ভাষায় মূর্ত্তি পাইল, প্র্াণের কথাটি সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্রের যোগ্যপুত্র দেশের ধর্ম্মের রক্ষক হউন। তিনি বয়সে নবীন, আশীর্ব্বাদ করিতে পারি, যেন তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার মুখ উজ্জ্বল করুন। স্বনামধন্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর বংশধর নাটোরের কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের, তাহেরপুর রাজকুমার মান্যবর শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের ও মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য মহোদয়ের সমর্থনে মিথিলাধিপ স্যার মহারাজ শ্রীযুক্ত রমেশ্বর সিংহ কে, সি, আই, ই বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন।

তর্করত্নমহাশয় মিথিলা ও বাঙ্গলার প্রাণের যোগের কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন। গঙ্গেশ ও বাসুদেব, পক্ষধর ও রঘুনাথ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা পাড়িয়া বন্ধনটি চক্ষুর উপর ধরিলেন। একদিকে বিদ্যাপতি, অপর দিকে চণ্ডীদাস উভয়ে উভয়কে দেখিবার জন্য, হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গিত হইবার জন্য উন্মত্তের মত ছুটিয়াছেন, কি সুন্দর দৃশ্য! দ্বারবঙ্গেশ্বর বড় খুসী হইলেন বোঝা গেল। মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে আবার যেন সেই কোমল বন্ধন দেখা যায়। হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে পূর্ব্বের মত আবার মেশামেশি হউক। কুমার শিবশেখরেশ্বর ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে দেশের নিকট সুপরিচিত, তিনি তিন চারি মিনিট মাত্র সময়ের জন্য সমর্থন করিতে উঠিয়া সকলকে হাসাইয়া বাহাদুরী লইলেন। কুমার প্রিয়দর্শন ও সুরসিক। সভা বিবাহের কৃতমঙ্গলা কন্যা, বর সভাপতি মহারাজ স্বয়ং। কুমার বর-কন্যার কথা পাড়িয়া বেশ দুই একটি সরস, অথচ বিশুদ্ধ রসিকতার সঞ্চার করিলেন।

সভাপতি দ্বারবঙ্গেশ্বর সংস্কৃতভাষায় শ্লোকবহুল অভিভাষণটি ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন। মহারাজের গম্ভীর আকৃতির অনুরূপ কণ্ঠস্বরটি গম্ভীর ছিল না। সভাবিজয়ী কণ্ঠে পাঠ না হইলেও উহা বিশুদ্ধ, অথচ মিষ্ট হইয়াছিল। শ্লোকগুলির উচ্চারণ বড় মোলায়েম লাগিয়াছিল।

সভাপতির সংস্কৃত অভিভাষণটির একটি মুদ্রিত অনুবাদ পাঠ হইল। অনুবাদের সাহায্য

সকলে বুঝিল মহারাজের প্রবন্ধ কাজের কথায় পূর্ণ। অনুবাদপাঠের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল। পাঠ করিয়াছিলেন নবীনপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ। পরিশেষে বাঙ্গালার মত করিয়া সেই নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার সংস্কৃত বক্তৃতা বড়ই মিষ্ট লাগিল, ভঙ্গিটি অতি সুন্দর! রামনারায়ণের সহিত আমার আলাপের বড়ই ইচ্ছা জন্মিল, কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভ আমার ঘটিল না।

আচার্য্য তর্করত্ন মহোদয় যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহাই এ সম্মিলনের সেরা প্রবন্ধ। উহা মুদ্রিত হইয়া সভাক্ষেত্রেই বিতরিত হইয়াছিল। ইহাতে এমন অনেক যুক্তিযুক্ত কথা ছিল—সেজন্য সকলেরই ইহা পাঠ করা উচিত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সম্মিলন যে সমগ্র দেশের ও জাতির মঙ্গলবিধানের জন্য সৃষ্ট, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপন যে ইহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর আবার সভা বসিল। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ সদাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি কিরূপ তাহা দেশের অবিদিত নাই। ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে যেন সকলে অভিভূত হইয়া পড়িল। আবেগে আত্মহারা হইয়া গেল। জ্বালাময়ী ভাষা হইতে উন্মাদনার স্রোতঃ নাচিয়া নাচিয়া বাহির হইতে লাগিল। জনতার উপযুক্ত বাগ্মী কুলদা-প্রসাদ দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার বক্তৃতাশক্তি সনাতনধর্ম্মের রক্ষায় নিযুক্ত করুন। তাহার পর খ্যাতনামা রামদয়াল বাবুর বক্তৃতার কথা ছিল। উন্মাদনার পর অনুপ্রেরণা আসিত, ভেরীধ্বনির পর বীণাধ্বনি হইত, সে আর হইল না। তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহারই দক্ষিণ হস্তস্বরূপ উৎসবের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ বক্তৃতা করিবার জন্য উপস্থিত হন। পরদিন তাঁহার বক্তৃতা হইল। বক্তৃতা লোককে মুগ্ধ করিল। তিনি সন্ধ্যাহ্নিকের উপযোগিতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার প্রকৃত মনোহারিণী মূর্ত্তি সকলের সম্মুখে ধরিলেন।

পরদিন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পনের মিনিট মাত্র বক্তৃতা করিয়া লোকের শ্রবণলালসা সম্যক্ পরিতৃপ্তির পূর্ব্বেই মুখ বন্ধ করিলেন। আরও সময় তাঁহাকে দেওয়া হইলেও আর তিনি মুখ খুলিলেন না; শঙ্খধ্বনি হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতবর সভায় বসিয়া পড়িলেন। বক্তৃতায় মহোৎসাহের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

বহরমপুর—ব্রাহ্মণসম্মিলনের পরদিন খাগড়ার বাজারে ৭ শত কোশাকুশী বিক্রয় হয়—এ সংবাদ কুমার শিবশেখরবাবু আমাদিগকে প্রদান করিলেন; কলিকাতায়ও ব্রাহ্মণসভার জন্য ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং অতি সত্বর হিন্দুত্বের উপযোগী আদর্শ ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের আদর্শ জমিদার মান্যবর ব্রজেন্দ্রবাবু মহাশয়ের দানের কথা যখন উদ্ঘোষণা করিলেন, সভায় ধন্য ধন্য রব পড়িল। মান্যবর ব্রজেন্দ্রবাবু যে কোথায় অন্তরালে বসিয়াছিলেন—তাহা আমরা দেখিতেই পাইলাম না।

শ্রীজীব ভায়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম্মরক্ষার উপযোগী গ্রন্থের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। কোন কোন গ্রন্থ যে হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্টতার পরিপন্থী, তাহাও দেখাইলেন। বালকদিগকে বাল্যেই শিক্ষা দেওয়া হইল, "জাতিভেদ ব্যবসাগত, আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে সমাগত, বেদ পৌরুষেয় এবং বিভিন্নকালীন রচনার সমষ্টি মাত্র।" ভায়ার আমার মিষ্ট গলার স্বরটি বীণাধ্বনির মত বড়ই মিষ্ট লাগিল। পনের মিনিট সময় বক্তৃতা হওয়ার পরই শঙ্খধ্বনি হইল।

বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবা মাত্র শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা ছিল। বেশ সমীচীন এবং নূতন ব্যবস্থাটি বড়ই ভাল হইয়াছে। বক্তৃতা বা প্রবন্ধপাঠের সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট মাত্র সময় প্রদত্ত হইয়াছিল। ভূমিকা হইবা মাত্র বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠের বলিদান হইতে লাগিল।

নবদাস দাদা পাঁচ মিনিট সময় মাত্র বক্তৃতা করিয়া বেশ বাহবা পাইলেন, হাততালিও পড়িল। অষ্টবঙ্গ সম্মিলনের কথা পাড়িয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বড়ই সন্তুষ্ট করিলেন। ভববিভূতি ভায়া পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করিলেন। তিনি বহরমপুরে হিন্দুধর্ম্মরক্ষার উপযোগী ছাত্রাবাস সংগঠনের প্রস্তাব করেন, কার্য্য হইতেছে শুনিয়া তাঁহার বড় আনন্দ জন্মিল। প্রবন্ধ আর তিনি পাঠ করিলেন না। মহেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থের বক্তৃতা জমিত ভাল, কিন্তু তিনি সময়প্রার্থী হইলেও বড় সময় পাইলেন না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের জ্যোতিষের প্রবন্ধপাঠ আরম্ভ হইল, আর বিষম গোলমাল উঠিয়া তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ত্রিপুরা রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণের অবস্থাও এতদ্রূপ হইল। অনেক পণ্ডিতেরও ইংরাজীশিক্ষিত দুইচারিজনের বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠ হইতে লাগিল। আমি তাঁহাদিগের পরিচয় জানি না—কাজেই ইচ্ছাসত্ত্বেও পরিচয় দিতে পারিলাম না, আশা করি পণ্ডিতমহাশয়গণ ক্ষমা করিবেন, নামের তালিকাটি পাই নাই, কাজেই নিরুপায়। ভবভূতি বিদ্যারত্ন ও ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম-এ ভ্রাতৃযুগলের প্রবন্ধ ছিল। শ্রীযুত তারানাথ সপ্ততীর্থ ও শ্রীকানাই তর্কতীর্থ প্রভৃতির প্রবন্ধ পাঠ যথারীতি নিষ্পন্ন হইল। নাটোরের ছোটতরপের রাজা শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ রায়, ৺ইন্দ্রনাথ বাবুর পুত্র শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ, কুণ্ডলার জমিদার শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ এবং পাবনার জমিদার যোগেন্দ্রনাথ, অখিলচন্দ্র, শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ও রংপুরের কালীকেশ, দিনাজপুরের টঙ্কনাথ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

এ অধম সম্মিলনে আহার ও শ্রবণ ব্যতীত আর কিছুই করে নাই বলিয়া আজ সমালোচনার ভার লইয়াছে। অনুরুদ্ধ হইয়াও যে আমি এত বড় সভায় দাঁড়াইবার সৌভাগ্য লাভ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিলাম—এজন্য যদি কোন বন্ধু আমায় বাহবা দেন, ত লইতে প্রস্তুত আছি। এ স্বার্থত্যাগের জন্য যশোভাগী হইব না কি ?

চৌগ্রামের রাজকুমার আগামী বৎসর নাটোরে ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের নিমন্ত্রণ করিলেন। ভাগ্যে যদি থাকে, রাজসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইব।

তারপর বিদায়ের পালা। ব্রজেন্দ্রবাবু দুই টাকা করিয়া নিজ হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বিদায় করিলেন, সম্মিলন পণ্ডিতবর্গকে পাথেয় দিয়াছিলেন। আরও দুইচারি দিন থাকিলে আমাদের পক্ষে লাভই হইত, কিন্তু নিমন্ত্রকদের প্রাণান্ত ঘটিত—কাজেই তৃতীয় দিন ৩টার গাড়ীতে বিদায় লওয়াই স্থির হইল।

তৃতীয় দিন প্রাতে হিতসাধনসমিতি নামে একটি সাধারণ হিন্দুসভা আহুত হয়। কুমার শিবশেখরেশ্বর বাবু সম্মিলনে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে উক্তসভায় যাইবার জন্য হিতসাধন-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের হইয়া নিমন্ত্রণ জানাইলেন। আমাদের বাসা হইতে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ ও নবদাস দাদা উক্ত সভায় যাত্রা করিলেন। এবং শুনিলাম দুইজনে সেখানে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। আমাকে তর্করত্ন মহাশয় সিলেক্ট কমিটিতে লইয়া যান। হিতসাধনসমিতিতে যাই নাই, সে সংবাদ দিতে পারিলাম না। সে সভারও সভাপতি মিথিলাধিপতি স্যার রমেশ্বর সিংহ মহোদয়। সিলেক্ট কমিটিতে যাইয়া লাভ হইল, পদ্মনাথ বাবুকে পরোক্ষভাবে বিশেষ জানিতাম, এবার চাক্ষুষ আলাপ হইল। মনোমোহন বাবু ব্রাহ্মণসমাজের লেখকরূপে ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু যেভাবে আমাকে গ্রহণ করিলেন, তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল।

ব্রাহ্মণসম্মিলনে কি হইল, কি হইবে? এপ্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি না। কি হইয়াছে, কি হইতেছে, তাহা দেশত প্রত্যক্ষ করিবে। আর কি হইবে, ইহা শ্রীভগবানই জানেন। ফলাফল ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া আমরা শাস্ত্রনির্দ্দেশমত, আপনাদের জ্ঞান ধারণামত পথে চলিতেছি মাত্র। ফল হইতেছে কিনা নিজমুখে বলাও উচিত নহে।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ব্রাহ্মণ-সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা।

বর্ত্তমান সময় ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পর্কে কোন কথা বলিতে গেলে, অথবা প্রাচীনকালের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সঙ্গে অধুনাতন হিন্দুজাতির আচার নিয়মের তুলনা করিতে আরম্ভ করিলে সমাজের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ভ্রূকুঞ্চিত করেন, কেহ বা নাক সিটকাইয়া চতুরাশ্রম পদ্ধতিকে উপহাস করিতেও ছাড়েন না। সমাজের এই প্রকার দুরবস্থার কালে ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা বা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য-বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রয়াস করা যে শিক্ষিত ব্যক্তির সমক্ষেই উপহাসের বিষয়ীভূত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তবে নিজে ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন পঠিত বলিয়া গৃহীত। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল।

নিজের ধর্ম্মে থাকিয়া প্রাণ গেলেও তার স্বর্গলাভ হয়, পক্ষান্তরে পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও তাহার আত্মার সদ্গতি অসম্ভব।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

যাঁহারা প্রকৃতই হিন্দুর হিতাকাঙ্ক্ষী, যাঁহাদের হৃদয়ে বস্তুতঃই আর্য্যজাতির বিশ্ববিজয়ী গৌরবকাহিনীশ্রবণে আনন্দের উদ্রেক হয়, তাদৃশ মহাপুরুষগণ বিদেশে যাইয়াও কদাপি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে নিজের আত্মীয়স্বজনকে নষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন না। ঐ দিন স্বয়ং সার (Sir) কে, জি, গুপ্ত আমাদিগকে কি এক আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন—"যে দিন আমি বিলাত হইতে শুনিতে পাইব যে, সমাজের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ বিদেশ প্রত্যাগতের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া একচিত্তে জাতীয়তা রক্ষার চেষ্টা পাইতেছে, অথচ বিদেশপ্রত্যাগতগণও স্বেচ্ছায় হিন্দুসমাজের বাহিরে থাকিয়াই ভারতবাসীর উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিতেছে, সেই দিন বুঝিতে পারিব যে সত্যসত্যই আমাদের দেশে এখনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছেন, পরন্তু আমাদের হিন্দু-জাতিটাও শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে না।"

যাঁহারা জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে যান, প্রায়শ্চিত্তের পর তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে আমাদের কোন আপত্তিই থাকিত না, যদি সেই ব্যবস্থায় কোনও ব্যতিক্রম বা ব্যাবৃত্তি (exception) না থাকিত। হিন্দুদের ধর্ম্মঘটিত আইনের মধ্যে যদি একটু ব্যতিক্রম থাকে, অথবা যদি একটী অতি ক্ষুদ্রও ফাঁক থাকে, তবে সেই ফাঁক দিয়া যে কত রকম ফাঁকী-বাজিরই প্রবেশলাভ করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মনে করুন এমন ব্যবস্থা যদি করা হয় যে, যাঁহারা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাইবেন, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করার পর সমাজে গ্রহণ করা হইবে; তাহা হইলে যাঁহারা বিলাস-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য বা সখের পর্য্যটন (travelling) করিবার জন্য বিদেশে যাইবেন, তাঁহারাও যদি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে 'হাঁ' আমরাও অমুক অমুক বিদ্যা 'শিক্ষা করিতে বিদেশে গিয়াছিলাম', তবে সেই 'ডবল'পাপীদের নিয়া ব্যবস্থা কি? এই নিমিত্তই হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র এইদিককার দরজাটাই একেবারে বন্ধ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যায় ব্রাহ্মণদিগকে ইহা বিশেষভাবেই চিন্তা করিতে হইবে যে, কালের গতি লক্ষ্য করিয়া যদি ব্যবস্থার গতিকেও পরিবর্ত্তিত করা না হয়, তবে এই ঘোর কলিতে নিজেদের পদমর্য্যাদা অব্যাহত রাখা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে—

"স্লেচ্ছাচাররতাঃ সর্ব্বে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।"

ব্রাহ্মণগণ যদি এই ম্লেচ্ছাচারীদের সংশোধনের নিমিত্ত কোনও প্রতিবিধান না করেন, তবে সময়ে অসংখ্য দানবের তাণ্ডবনৃত্যে অল্পসংখ্যক সাত্ত্বিকপ্রকৃতি দেবতাকেও উদ্বেজিত ও উৎপীড়িত হইতে হইবে। সেই দানবদলের জন্য তখন কোনও অবতারের আবির্ভাব হইবে

কি না কে জানে? কাজেই এই স্থানে সংক্ষেপে ইহা প্রকাশ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, যাঁহারা যথার্থই হিন্দুজাতির গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতে চান, তবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা চিন্তাশীল ও উন্নতিকামী ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা, কালের আবর্ত্তনে পড়িয়া কতক কাল পর নিজেদের মধ্য হইতে একে একে অনেকেই প্রতিকূল স্রোতে চলিয়া গেলে তখন অনুকূলপক্ষই মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িবে।

বিদেশগামীদের নিকটও আমাদের বক্তব্য এই—কি কারণে তাঁহারা বিদেশে যান? বিদ্যাশিক্ষার অজুহতে যদি ভিন্নদেশে যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, যেই বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা ভিন্নদেশে যাইতে চাহিতেছেন, সেই বিদ্যায় পারদর্শী কোনও বিচক্ষণ পণ্ডিত আমাদের দেশে আছেন কি না, অথবা যাঁহারা বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া পূর্ব্বেই আমাদের দেশে আসিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও পণ্ডিত তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারেন কি না? যদি তাহা সম্ভবপর হয়, তবে বৃথা কেন তাঁহারা নিজের জাতি হারাইতে ও ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বিদেশে যাইবেন? পূর্ব্বাগত প্রাজ্ঞের নিকট জ্ঞানলাভ করিলে বরং আমাদেরই উপকার বেশী। এক পক্ষে যিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারও বিদ্যাচর্চ্চা সফল হইবে। অন্য পক্ষে আমাদের ভারতবাসীকেও পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। এই প্রণালীতে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিনিময় দ্বারা আমাদের দেশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিদেশপ্রত্যাগতগণ যদি নিজেদের জ্ঞান ও আবিষ্কার-ক্ষমতা লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে সুযোগ পান, তবে ক্রমে ক্রমে বিদেশে যাওয়ার ব্যাধিটা আমাদের দেশ হইতে কমিতে পারে, পরন্তু ধনীদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে এই ভারতবর্ষেই কত কত কলকারখানার সৃষ্টি হইতে পারে, এবং বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারতবাসীকে ইহা প্রতিমুহূর্ত্তেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে সব ছিল ও সব আছে। শুধু অনুসন্ধিৎসার অভাবে ও গবেষণার ত্রুটিতে তাঁহারা সকল তথ্যের আবিষ্কার, সকল তত্ত্বের পরিচয় ও সকল সত্যের উদ্ঘাটন করিতে পারিতেছেন না। আমাদের দেশের পদার্থ সমূহ গ্রহণ করিয়া আজ যাঁহারা পৃথিবী মধ্যে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত, সেই ইংরেজ এবং জার্ম্মাণগণও শতমুখে ভারতবর্ষের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারেন না। ভারতবাসীকে সময় সময় তাঁহাদের সাহায্য নিতে হইলেও দলে দলে সকলকে জাত্যন্তর পরিগ্রহ করার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। কোন এক বিষয়ে একজনমাত্র বিশেষজ্ঞ (specialist) হইয়া আসিলে, সেই একজনই ইচ্ছা করিলে একসহস্রজনকে শিক্ষিত করিতে পারেন। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও যে রসায়নশাস্ত্র, নৌবিদ্যা, ব্যোমযান, খ-পোত প্রভৃতির ব্যবহার ছিল,

আমাদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তসমূহই তাহার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কৈ সেই অমূল্য শাস্ত্র, কোথায় বা সেই সংস্কৃত শিক্ষা? বিমানে অবস্থান করিয়া মেঘনাদের যুদ্ধ, সীতা উদ্ধার করিয়া সপারিষদ্ রামচন্দ্রের আকাশপথে অযোধ্যায় আগমন প্রভৃতি তাৎকালিক বিজ্ঞান-গবেষণার পরিচায়ক। তৎপর জৃম্ভকাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও গাণ্ডীব প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যাপারে অদ্ভুত রসায়নশাস্ত্রপর্য্যালোচনার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ভাবিলে অনেকেই বিস্মিত হইবেন যে, ইদানীন্তন প্রতীচ্য দেশবাসী বিজ্ঞানবিদ্‌গণও সেই সমস্ত রসায়নের সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অগ্নিবাণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বরুণবাণের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন কি? যদি বা কেহ বলেন হাঁ, পারিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বায়ুবাণ কোথায়? (বায়ুভক্ষণকারী) সর্পবাণের আবিষ্কারইবা কোথায়, এবং গরুড়বাণইবা কোথায়? এই বিজ্ঞানের যুগে কেহই যেন এ সমুদয়কে 'চণ্ডুখোরের' গল্প বলিয়া উড়াইয়া না দেন। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়—কোন্ বিজ্ঞানবলে শ্রীরামচন্দ্র তখন রামেশ্বর হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধের সাজসরঞ্জামকে অমানুষিক কাণ্ড বলিয়া মনে করিতে পারি, সেই স্থলে প্রাচীন যুগের ঘটনাগুলিকে অতিমানুষ বলিয়া মানিয়া নিবনা কেন?

তারপর ত্রেতাযুগের বহু পরে আমাদের দেশে যে নৌবিদ্যার (Navy) বিশেষ প্রচলন ছিল, তাহা আমাদের দেশের সওদাগরগণের ও সিংহল প্রভৃতি দ্বীপের বণিক্‌গণের পরস্পর পরস্পরের দেশে যাতায়াত ও বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী-বৃত্তান্ত হইতেই বেশ ধারণা করা যায়। তবে এই কথা স্বীকার না করিয়া পারিব না যে, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানালোচনা উৎকর্ষ হইতে বহুদূরেই উপনীত হইয়াছে। তাহার প্রতি কারণ এই যে, সেই সময় জলপথে ও আকাশপথে যুদ্ধযাত্রা করিয়া এক দেশ হইতে ভিন্নদেশ জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা লোকের কিছু কমই ছিল।

আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ যদি দেশীয় বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিন্মাত্র অর্থও ব্যয় করেন, তবে একদানে দুইটী কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। প্রথম—বিজ্ঞানের উৎসাহ দ্বারা দেশীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি করা; দ্বিতীয়তঃ—আমাদের দেশের মনীষীদিগকে বিদেশে যাইতে না দেওয়া।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদিগকে অন্য এক সমস্যায় পড়িতে হইতেছে, অধুনাতন সোপবীতী নরপুঙ্গবদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া। নিজের মধ্যে কোনও গুণ নাই, তবু তাহাদের নয়গুণ আছে।* জুগি, জোলা, হাল, মাল, ঝাল, কোচ, বারুই—ইহাদের দেখাদেখি ধোবা নাপিত পর্য্যন্ত লেংটী ছাড়িয়া নগুণ ধারণ করিতে প্রয়াসী। বাজারের খরিদ সূতার মালা গলায় ঝুলাইয়া

* নয়গুণের অপভ্রংশ নগুণ—পৈতা।

পদস্থ ব্রাহ্মণদিগকে অপদস্থ করিতে মনস্থ করিয়া তাহারা কতনা সভাই করিতেছে; কতনা বক্তৃতাই করিতেছে। যার অশৌচ ছিল একমাস, সে করিয়াছে সাড়েবার দিন; আর কয়েক বৎসর পর হয় ত অশৌচ পালনের ব্যবস্থাটাই তাহাদের মধ্যহইতে উঠিয়া যাইবে। ব্যস্, সব ফরসা! খৃষ্টান ও মুসলমানগণ যে অশৌচপালন করে না, কি ব'য়ে যায় তাদের?

তারপর কথা এই যে, যাঁহারা উপবীত ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের আপত্তি এই "ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ও ব্রাহ্মণগণ মৎলববাজ, তাই তাহারা নিজেদের উপর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া অপরকে অধীন রাখিতে চাহিতেছে। ঈস্, এতবড় কথা? ব্রাহ্মণরাই কিনা "সর্ব্বেসর্ব্বা" অথচ তারাই কিনা "বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি", তবে যাঃ, আমরাও ব্রাহ্মণ হব।" এই সমস্ত হিংসা-দ্বেষের সূচনা করিয়া সকলেই আজ গলায় মালা ঝুলাইতে ব্যস্ত। কিন্তু কি মুস্কিল! কথাগুলি শুনিয়া যে হাসি পায়! যে জাতি এত মৎলববাজ, লোকে আবার সেই জাতিই হইতে চায়? হিংসার চরমসীমা নহে কি? ছেলেরাও যে এমন তামাসা করে না। রাজার রাজোচিত ভোগবিলাস হেলায় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তিকেই স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহারাই আবার স্বার্থপর! রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি? ষট্‌কর্ম্ম। (১) যজন, (২) যাজন, (৩) অধ্যয়ন, (৪) অধ্যাপন, (৫) দান ও (৬) প্রতিগ্রহ।

ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণদের উত্তমাঙ্গের শক্তি প্রবল, অতএবই তাঁহারা মস্তিষ্কের পরিচালনা যাহাতে হয়, সেই সমস্ত বৃত্তির অধিকারী; বাহুজগণ (ক্ষত্রিয়গণ) বাহুবলে বিখ্যাত; উরুজগণ (বৈশ্যগণ) উরুর ক্রিয়ায় অর্থাৎ দেশপর্য্যটন প্রভৃতিদ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার অধিকারী ও শূদ্রগণ পরের পরিচর্য্যার নিমিত্ত দাবী করিতে পারে। যাহার যেমন শক্তি ঠিক সেই শক্তি অনুসারেই তাহার বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছে। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

তবে বৃথা কেন লোকে হিংসা করিয়া মরে যে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" এই শ্লোক রচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ অপরজাতিকে বেদপাঠে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করিয়াছে?

ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিবার পূর্ব্বে লোকের ইহা চিন্তা করা উচিত যে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের শক্তি আছে কি না। ব্রাহ্মণের মেদ, মজ্জা, বীর্য্য ও রক্তের সংস্রব না থাকিলে তাহারা তিন বেলা সন্ধ্যা উপাসনার কঠোর শ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কি? যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানেরাই ব্রাহ্মণোচিত সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। সন্ধ্যামন্ত্রকে ভূতের মন্ত্র বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন! তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন না যে, সন্ধ্যার অন্তর্গত শুধু এক প্রাণায়ামদ্বারাই অশেষ সুফল পাওয়া যাইতে পারে। যথানিয়মে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, তাহার নিকট প্রকাণ্ড পলোয়ানের পরাক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়। বিপ্রশক্তির নিকট ক্ষাত্রশক্তি এই স্থানেই পরাভূত।

কপিলমুনির নয়নবহ্নিতে ষষ্ঠিসহস্র ক্ষত্রিয়-নৃপতির মৃত্যু-মূর্চ্ছা এই স্থানেই বিশ্বাসযোগ্য।

প্রাণায়াম, যোগের একটী প্রধান অঙ্গ।

"যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণাধ্যায়-সমাধয়োঽষ্টা চাঙ্গানি।"

এই আটটী যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে কি ফললাভ হয়? তদুত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তি রাবিবেকখ্যাতেঃ।"

অষ্টযোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় ও জ্ঞানের আলোকে মোক্ষ সাধক উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার পন্থা দর্শনশক্তির গোচরীভূত হয়। বিশেষতঃ "মৈত্র্যাদিষু বলানি।" "বলেষু হস্তিবলাদীনি" প্রভৃতি যোগসূত্রে যোগীদের অদ্ভুত শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, শক্তিদ্বারাই কে ব্রাহ্মণ ও কে অব্রাহ্মণ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, পক্ষান্তরে চণ্ডালও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে, যদি তাহার ব্রাহ্মণোচিত আচার নিষ্ঠা থাকে। কেননা—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

আমরা বলিব এই যে, পরশ্রীকাতর জাতিগণ এই সমস্ত শ্লোক ঘন ঘন আবৃত্তি করিয়াও কয়জনে বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপোনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা বিশ্বামিত্র না হইয়া বরং বিশ্বের অমিত্রই হইয়া উঠিতেছেন।

ব্রাহ্মণ্যশক্তি গ্রহণ ও উপনয়নধারণে যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন, তাহাও ইদানীং বিরল। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ যজ্ঞের উপকরণ বিশুদ্ধ ঘৃতের অভাব। গোজাতির প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলায় ভারতবাসী এখন স্বাস্থ্যধনে বঞ্চিত। হবির্ভুক্ দেবতাগণও আজ প্রজার প্রতি প্রসন্ন নহেন। পরন্তু দেশ হইতে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা কমিয়া যাওয়ায় সেই দেবভাষা এখন অমৃতময়ী হইয়াও মৃতভাষারূপে (dead language) পরিগণিত! আর্য্যগণ এখন সংস্কৃতালোচনায় তত মনোযোগী নহেন। যিনি পাঁচপুত্রের পিতা, তিনিও আজ কালমাহাত্ম্যে সকল ছেলেকেই বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতেছেন। যদি বা সেই পঞ্চপুত্রের মধ্যে একটী ছেলেকে বোকা (dull headed) বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকেই সংস্কৃতের সেই দুরধিগম্য দুর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুশাস্ত্রের কি এই পরিণতি!

যে বঙ্গদেশে পূর্ব্বে এমন কোন গ্রাম বা জনপদ ছিল না, যেখানে সংস্কৃতপাঠীদের টোল বা চৌপাড়ীতে (চতুষ্পাঠীতে) শত শত পড়ুয়া শিক্ষিত না হইত। হায়! কোথায় সেই বঙ্গদেশ কোথায় বা সেই সমস্ত পড়ুয়া! পঞ্চাশটী গ্রাম ঘুরিলেও এখন ক্রিয়াকাণ্ডে পারদর্শী ও পৌরোহিত্যকার্য্যে বিচক্ষণ একটী লোক পাওয়া যাইবে না। শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা লোপ পাইতে বসিয়াছে। আর্য্যদের স্মৃতির ব্যবস্থা এখন অনেকেরই নিকট বিস্মৃতির অবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহার চেয়ে অধিক অবনতির কারণ আর কি হইতে পারে?

কষ্টে, দুঃখে, শোকে, ক্ষোভে বুক ফাটিয়া যায়। আর্য্যজাতির পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া প্রাণে বড় ব্যথা অনুভব হয়।

বাঙ্গালার এই দুরবস্থার কালেও আমাদিগকে হতাশ হইলে চলিবে না। ধৈর্য্য ধরিয়া এখনও একবার সকলে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা ও অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। দেখিতে পাইবেন এখনও সেখানে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া নিজের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা রক্ষায় আজীবন চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সেই উদাত্তানুদা ও স্বরিত-লয়সমন্বিত সামগান শ্রোতার প্রাণ মুগ্ধ করে, তাঁহাদের দিব্যমুখোচ্চারিত স্তোত্র পাঠ শ্রবণে হৃদয়ে বস্তুতই অপার আনন্দের সঞ্চার হয়। অদ্যাপি তাঁহারা অপর জাতিকে স্পর্শ করিয়া কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন না। স্পর্শদোষের সঙ্গে সঙ্গে যে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী, ইহা তাঁহাদের ধারণা হইতে অদ্য পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

দীর্ঘকাল যাবৎ ভারবর্ষ বিভিন্ন জাতির অধীন থাকিলেও ব্রাহ্মণগণ শুধু ধর্ম্মের বলেই এখনও নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণগণ কত সময় কত সংঘর্ষ ও সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছেন, কত সময় নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের জন্য যত কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত তেমন কিছু চেষ্টাই করেন নাই। তাই তাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ ব্যবস্থিত নাই। তাই তাঁহারা জনসংখ্যায় অন্য জাতিকে অতিক্রম করেন নাই, তেমন স্পৃহাও কভু করেন না। চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম ও দশকর্ম্ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত প্রার্থনা। চতুরাশ্রমের নিয়মে নিয়মিত হইয়া আর্য্যসন্তানগণ যাহাতে চিরদিনের জন্য নিজের জাতীয় গৌরব অব্যাহত রাখিতে পারে, ইহাই তাঁহাদের কামনা।

ব্রাহ্মণগণ অবহিত হউন, পূর্ব্বের যোগবল ফিরিয়া আসুক, সুস্থ ও নিরাময়শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ সমাজের উপর অব্যাহত শাসনদণ্ড পরিচালনা করুন। জগৎ দেখুক, ব্রাহ্মণত্বের প্রচ্ছন্নবহ্নি আবার বিশ্বব্যাপী হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকে জগৎ আলোকিত হউক, অজ্ঞানান্ধকার সাগরের অতল তলে আশ্রয় লউক।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন।

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবসদ্বয় ময়মনসিংহনগরে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে নিষ্ঠাবান্ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ প্রখ্যাতনামা মিথিলাধিপতি মহারাজ স্যর শ্রীল শ্রীযুক্ত রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর জি, সি, আই, ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তান উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় দর্শকের সংখ্যাও আশাতীত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মানুরাগী অনেক নিষ্ঠাবান বৈদ্য ও কায়স্থ-সন্তানও দর্শকরূপে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

সভাপতির অভ্যর্থনা।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ বেলা ১২টার সময় মাননীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর রেলগাড়ী ময়মনসিংহ ষ্টেশনে পৌঁছিলে, সহরের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ এবং সহরের অন্যান্য শ্রেণীর প্রায় দশসহস্র লোক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মহারাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা করেন। মহারাজ বাহাদুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত অভ্যর্থনা-সূচক কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতঃ তাঁহার গলায় মনোহর পুষ্পমাল্য পরাইয়া দেন। অতঃপর শোভাযাত্রা করিয়া মহারাজ বাহাদুরকে ব্রহ্মপুত্র তটস্থিত তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আমবাড়ীয়া ভবনে লইয়া যাওয়া হয়। এস্থলে ইহাও বলা সঙ্গত যে, মখমল, কিংখাপ, স্বর্ণাভরণ মণ্ডিত বহুসংখ্যক হস্তী এবং শতাধিক সুসজ্জিত আসাশোঠাধারী এই শোভাযাত্রায় অগ্রবর্ত্তী হইয়া মহারাজ বাহাদুরকে স্বর্ণচ্ছত্রাদিসুসজ্জিত শকটে বহুতোরণদ্বারপরিশোভিত পথ বাহিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসভবনে লইয়া যাওয়া হয়। ময়মনসিংহে আর কোনও অতিথির অভ্যর্থনায় এরূপ লোক সমাগম ও জাঁকজমক হইয়াছিল কিনা জানি না।

প্রথম দিনের অধিবেশন।

শনিবার অপরাহ্ণ ৩—৩০ মিনিটের সময় সম্মিলনের প্রথম দিনের আরম্ভ হয়। মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে একটী শোভাযাত্রা করিয়া সভাগৃহে আনা হয়। এই শোভাযাত্রা সভাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র উপস্থিত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতিমহাশয়ের অভ্যর্থনা করেন, এবং তাঁহার আসন গ্রহণের পরে সকলে আসন গ্রহণ করেন।

সাঙ্গবেদ-বিদ্যালয়ের আচার্য্য ও ছাত্রগণকর্ত্তৃক যথারীতি বেদগানদ্বারা মঙ্গলাচরণাদি করা হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় সুসঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে মাননীয় সভাপতিমহাশয় সুললিত সংস্কৃত ভাষায় স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন, এবং স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় একটী

নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তদনন্তর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "মর্ম্মকথা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধপাঠ করেন; তাঁহার এই "মর্ম্মকথা" ব্রাহ্মণ মাত্রেরই মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল।

তৎপরে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঁইহাটের জমিদার হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুরের উকিল ও জমিদার সত্যেন্দ্রনারায়ণ বাগচি মহাশয়গণের মৃত্যু জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। ইহার কিছু পরেই সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য প্রায় এক ঘণ্টার মত সভার কার্য্য বন্ধ থাকে।*

সন্ধ্যার পর পুনরায় সভাধিবেশন হইলে শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতভূষণ বি-এ, এবং শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ, মহোদয় "ব্রাহ্মণ সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা" সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে রাত্রি ১১টার সময় ঐ দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় মহাসম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য আরম্ভ হয়। এদিন সভার জনতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সুবক্তা আগ্রহ সহকারে এবং আন্তরিকতার সহিত সভায় উপস্থাপিত প্রত্যেক আলোচ্য বিষয় অনুকূল বক্তৃতা দ্বারা পোষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সভাপতিমহাশয় একে একে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঘোষণা করেন ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমর্থন ও অনুমোদন করেন।

১। ব্রাহ্মণ-পরিবারস্থ প্রত্যেক উপনীত ব্যক্তির ত্রিসন্ধ্যোপাসনায় এবং ব্রাহ্মণোচিত সদাচার রক্ষায় ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য জাতীয়গণের ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষায় অধিকতর আগ্রহ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ।

২। বর্ণাশ্রমী বিদ্যার্থীদিগের অধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং সংস্থাপিত বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসে ধর্ম্ম ও সদাচার শিক্ষা এবং রক্ষার ব্যবস্থার চেষ্টা করা হউক।

বক্তা—কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শরৎকমল তর্কতীর্থ।

৩। হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার্থ এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সুবিধার জন্য হিন্দু

* প্রোফেসর রামমূর্ত্তি কোনও প্রকারে দর্শকরূপে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাবন্দনা জন্য যে সময় সভার কার্য্য বন্ধ থাকে, সেই সময়ে মাত্র ব্রাহ্মণ্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে তিনি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে সভামণ্ডপের বাহিরে কয়েকটী ছাপান প্রশ্ন বিতরণ করেন। মণ্ডপ মধ্যে সম্মিলনের নিকটে ঐরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত করেন নাই। এ সম্বন্ধে যথাযথ প্রতিবাদ অমৃত বাজার, সঞ্জীবনী প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও যদি কেহ বলিতে চাহেন, যে, সম্মিলনে শ্রীমান্ রামমূর্ত্তি কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর পান নাই, তাহা হইলে আমরা নাচার। ব্রাঃ সঃ সঃ

গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীর দেবালয় রক্ষা ও সংস্থাপন করা এবং অতিথি-সৎকার, জলাশয়, গাভী ও গোচারণ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র পত্রনবিশ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঝা।

৪। জাতিগত পবিত্রতা এবং ব্রাহ্মণের বংশ-পরিচয় রক্ষা ও জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘটক।

৫। আচারবান্ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত ও কুলাচার্য্য মহোদয়গণকে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ হইতে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে বৃত্তিদানে সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, কুমার শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নবদাস ন্যায়তীর্থ

৬। সমাজে পণপ্রথা নিবারণের ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ।

৭। বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানিকর পুস্তক অধ্যয়ন নিবারণ এবং স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রণয়নের বিহিত উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৮। অবিলম্বে পঞ্জিকার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।

৯। বিবিধ উপায়ে হিন্দুসমাজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা করা হউক।

বক্তা—শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

১০। শাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন অসবর্ণ-বিবাহ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

বক্তা—শ্রীযুক্ত তারানাথ চক্রবর্ত্তী।

ময়মনসিংহের একটি ব্রাহ্মণসভা গঠিত করিয়া একজন সুযোগ্য অধ্যাপক নিয়োগপূর্ব্বক জেলাস্থ চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

বক্তা—শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, সভাপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর রমেশ্বর সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর জি, সি, আই, ই মহাশয়।

১১। মহামান্য ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবন লাভকরতঃ জয়শ্রী ও সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ মঙ্গলদ্বারা বিভূষিত হউন, এতদর্থে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বক্তা—সভাপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রমেশ্বর সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর জি, সি, আই, ই মহাশয়।

ধন্যবাদ প্রদান।

বক্তা—শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর পত্রনবিশ, শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ, কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর রাজসাহী জেলার পক্ষ হইতে চৌগ্রামের কুমার শ্রীযুক্ত রাজেশকান্ত রায় মহাশয় আগামী বর্ষের জন্য ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনকে আহ্বান করার পর রাত্রি ১০॥টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা
অনুষ্ঠান-সমিতির সভাপতি।

শ্রীবিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী
শ্রীহরিহর চক্রবর্ত্তী
শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী
শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী
শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মা পত্রনবিশ
সম্পাদক।

সমালোচনা।

সানুবাদ সুবিশুদ্ধ সর্ব্ববেদীয় সন্ধ্যাবিধি

৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হইতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত, ১০১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৵১০ দশ পয়সা মাত্র। প্রাপ্তি স্থান উল্লিখিত ঠিকানা, অপরন্তু ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক এই সন্ধ্যাবিধির নামকরণেই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিজের পুস্তকের বিজ্ঞাপন জাহিরের ভাষা বটে, 'সু-বি-শুদ্ধ'। নিজের পুস্তককে মাত্র 'শুদ্ধ' বলিয়া আত্মতৃপ্তি হইল না, তাই তাহার পূর্ব্বে ডবল উপসর্গ জুড়িয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছেন।

যাহা হউক, প্রকাশকের স্বীয় মন্তব্যে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া উপসর্গদ্বয় যোজনার সমর্থন করিতেছি। বাজারপ্রচলিত 'সন্ধ্যাবিধি' পুস্তকসমূহের মধ্যে আলোচ্য 'সর্ব্ববেদীয় সন্ধ্যাবিধির' স্থান যে উচ্চে, তাহা আমরা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিতে পারি। ইহাতে মুদ্রাকর-প্রমাদের সংখ্যা খুব কম থাকায় সুবিশুদ্ধ ও মূলমন্ত্র বড় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় আধুনিক ক্ষীণদৃষ্টি চশমাধারী মাণবকের উপযোগী 'সন্ধ্যাবিধি' বলিতে আমরাও অকুণ্ঠিত। এই পুস্তকের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে নির্দ্ধারিত মূল্য অল্পই হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

শিরোমা।

মাথাধরার ঔষধ। সর্ব্বরূপ মাথাধারা ইহা দ্বারা আরাম হয়। খাইবামাত্র অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে আরোগ্য, অথচ শিরা অবসন্ন হয় না। জ্বর জন্য মাথাধরা হইতে স্নায়বিক শীরঃপীড়া পর্য্যন্ত ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। উদর এবং জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র বিকৃতিজন্ত মথাধরার এমন ঔষধ জগতে দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১২ বড়ী ৷৵৹ আনা।

ক্রিমির বটিকা।

ক্রিমি দ্বারা শরীরে না করিতে পারে এমন পীড়া নাই, বিশেষ বালক বালিকাগণ সর্ব্বদা ক্রিমি দ্বারা উৎপীড়িত—তাই দেশীয় চারিটী দ্রব্যযোগে এই বটিকা প্রস্তুত করিয়াছি—সেবনে কোন বিঘ্ন নাই, নিশ্চয় ক্রিমি ইহাতে মরিয়া বাহির হইবে এবং অন্ত উৎপাত নিবারণ করিবে। প্রতি কৌটা ।৴৹ আনা।

অগ্নিকুমার রস।

অজীর্ণ, উদরাময়, অম্ল, আমাশয়, অক্ষুধা, বমি, উদগার ইত্যাদি উপদ্রব নিবারণ করিতে এই অগ্নিকুমার রস শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বস্তুতঃ ইহা পাচক এবং ধাবক গুণশালী, অথচ পিত্তপ্রণালীর শোধক এবং বলকারক। সাত্ত্বিক আহার বিহারকারী ব্যক্তিগণের এবং ব্রাহ্মণ, বিধবাগণের পক্ষে অমৃততুল্য গুণশালী। গর্ভিণী হইতে শিশু পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা নিরাময় হইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা ।৴৹ পাঁচ আনা।

দাদের মলম।

ইহা পূর্ণ বিলাতি বস্ত, ইহাতে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই। ইহা দ্বারা দাদবিকার চুলকোনা, খোস, পাঁচড়া, এমন কি কোরচ দাদ হইতে ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

মূল্য প্রতি কৌটা ।৴৹ পাঁচ আনা।

ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

১২৭ নং জঙ্গমবাড়ী, কাশীধাম।

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ-সভা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non-Political Hindu Religious & Social Magazine

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা।

শ্রাবণ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৬ সাল।

শ্রাবণ সংখ্যার লেখকগণ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ।
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা এম, এ বাহাদুর।

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—675

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৪১ শক, ১৩২৬ সাল, শ্রাবণ। } একাদশ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

(১)

দীন বলে—দীননাথ ! ঠেলনা চরণে
দাও দাসে পুণ্য-পদাশ্রয় !
জীবনে মিটেনি সাধ—আতঙ্ক মরণে
মহাপাপী অতি নীচাশয় !

(২)

গেছে সুখ—গেছে আশা—নাহি সে সাহস—
প্রাণ ভরা শুধু অবসাদ !
এ হৃদয় মরুভূমি—তাপিত নীরস—
চিত্ত সনে সদা বিসম্বাদ।

(৩)

সংসার-সমরাঙ্গনে প্রবৃত্তির কাছে
চিরদিন পরাজিত হয়ে ;—
অসংখ্য অরাতি আজি হেরি আগে পাছে
ডাকি তাই কাতর হৃদয়ে !

(৪)

জীবনে ডাকিনি' তোমা পতিতপাবন
নেত্র ঢাকা ছিল অন্ধকারে,
এ মোহের পরিণাম নিরখি ভীষণ
তাই আজি ডাকি হে তোমারে !

(৫)

তুমিনা তারিলে পরে দীন অশরণে
কে তারিবে বল দয়াময় ?
কার্পণ্যে কুখ্যাতি তব রটিবে ভুবনে
তাহে কিহে নাহি তব ভয় ?

(৬)

তুমিই ত খেলা দিয়ে ভুলাইয়া ছলে
ফেলিয়াছ সঙ্কট-সাগরে,
করযোড়ে ডাকি তাই নয়নের জলে
এস নাথ,—তার কৃপা করে !

(৭)

এস হৃৎপদ্মাসনে বস রাজরাজ
ব্যর্থ কর রিপুর বিক্রম !
বিনাশ আঁধাররাশি, করুক বিরাজ
জ্ঞানজ্যোতিঃ পূত মনোরম !

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও জন্মগত বর্ণভেদ।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি বৈষ্ণব-প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের প্রমাণ সম্বলিত)

ইদানীং কলির প্রবল প্রকোপ হেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পদে পদে নিগ্রহ হইতেছে,—অনেকে শাস্ত্রবচনের প্রকৃতার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যথেচ্ছ অপব্যাখ্যা করিয়া নিরীহ ব্যক্তিগণকে বিপথগামী করতঃ পাপের পঙ্কিল পথ প্রসারিত করিতেছে এবং সরল ধর্ম্মবিশ্বাসিগণের শাস্ত্রপ্রবণ হৃদয়ে বর্ণধর্ম্মের পরিপন্থী কলুষ ভাবের উদ্রেক করিয়া "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—এই ভগবদুপদেশের প্রতি অযথা অনাদর প্রদর্শন করতঃ বর্ণচতুষ্টয়ের আপেক্ষিক মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক শান্তিপ্রিয় সমাজে অশান্তির বিপ্লববহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। এই বিপ্লবকে অনেকে বর্ত্তমান সভ্যজগতে নবাঙ্কুরিত Bolshevismএর রূপান্তর বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আমরা কিন্তু উহার অমঙ্গল ছায়াপাতে সমাজ-শরীরে ঘোর অজ্ঞানতিমিরের নিবীড় প্রাবরণই প্রত্যক্ষ করিতেছি। অনেকে মনে করেন, রাজনীতিক্ষেত্রে প্রজাশক্তির অভ্যুদয়, রাজশক্তির হ্রাস এবং পুরুষ জাতির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নারী জাতির মস্তকোত্তোলন যদি সম্ভব হয়, তবে এই ভারতে অনাদিকালের ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যই বা কেবল অটুট থাকিবে কেন? ইহার উত্তর—ভারতবাসী হিন্দু কোনও দিন শাস্ত্রের প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া ঋষিগণের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছায় আপনার সুবিধা মত পথ বাছিয়া লইতে শিখে নাই—শাস্ত্রবাক্যে ও শাস্ত্রার্থে এবং পারম্পর্য্যাগত আচারের প্রতি চিরদিনই আস্থা স্থাপন করিয়া আসিতেছে। এই সমাজ শাস্ত্ররূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্ব্বাচীন জনকয়েক এই প্রাচীন সমাজের অচলপ্রতিষ্ঠ ভাব দেখিয়া উপহাস করিতে হয় করুন, সমগ্র সভ্যজগৎ কিন্তু এইজন্যই ইহার প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুমাত্রের ইহাই শ্লাঘা।

যে সকল ধর্ম্মমত বেদ ও ঋষি-প্রণীত,শাস্ত্ররূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া আত্ম-প্রত্যয় বা মনস্তুষ্টি অর্থাৎ Intuisionকে মূল করিয়া হিন্দুসমাজের প্রতিকূলে এই ভারতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল,—বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পর্য্যন্ত সে সমস্তই আজ শিথিলবন্ধন হইয়া জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণে অসমর্থ। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম আজ ক্ষীণ, অবসন্ন, ব্রাহ্মধর্ম্মের শৈশবেই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিসংষ্ঠুল ভাব দেখিয়া সত্যই হৃদয়, ব্যথাভারে অবনত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, মনস্তুষ্টির অপর নাম ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, কেননা মন ইন্দ্রিয়গণের অন্যতম। সেই মনস্তুষ্টিরূপ অসত্যের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা

কখনই সত্য হইতে পারে না, কাজেই তাহা স্থায়ী হয় না। তাই আজ বৌদ্ধাদিধর্ম্মের এই সন্তাপকর পরিণতি। এই সকল ধর্ম্মবাদ শাস্ত্ররূপ সত্য লঙ্ঘন করিয়া, বিকৃতার্থ করিয়া, শাস্ত্রোক্ত অধিকারীবিচার অমান্য করিয়া, প্রাণ যাহা চায় তাহার উপর নির্ভর করিয়া,—আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু ঐ ভিত্তি অসত্য ও অদৃঢ় বলিয়া ঐ সকল ধর্ম্মমত শিথিলমূল সৌধের মত শীর্ণবিশীর্ণ হইয়া কোনটী পতিত, কোনটী বা পতনোন্মুখ অবস্থায় বিদ্যমান্।

অপরদিকে অপৌরুষেয় বেদ এবং দিব্যদৃষ্টি ও সত্যানুসন্ধানপর—ঋষিগণের বহুযুগ সিদ্ধ অভিজ্ঞতার সৎফল,—শাস্ত্ররূপ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হিন্দুসমাজ আদিকাল হইতে সনাতন নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই শাস্ত্রসমূহ অপ্রামাণিক বলিয়া যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের ব্যবহারে বরং সরলতা দৃষ্ট হয় কিন্তু যাহারা নিজেদের ভ্রান্ত মতগুলি শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা পোষণকরতঃ ঐগুলি প্রামাণিক বলিয়া প্রচার করিতে থাকে এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মের নামে ঘোর অশাস্ত্রীয় অধর্ম্মাচরণে সরলচিত্ত ব্যক্তিগণকে প্রলুব্ধ করে তাহারাই সমাজের প্রকৃত বৈরী। সামাজিকগণ এই সকল শঠগণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাদের আচরণ সাবধান হইয়া পর্য্যবেক্ষণকরতঃ তাহাদের উপাংশু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্যোগ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বৈদিককাল হইতে বেদপ্রতিপাদিত পারম্পর্য্যাগত চাতুর্ব্বর্ণিক সমাজ জন্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবহমানকাল প্রচলিত। ভগবন্নির্দ্দিষ্ট গুণগুলি যে বর্ণচতুষ্টয়ের মণ্ডনস্বরূপ, তাহা কোন্ বিবেকবান্ ব্যক্তি অস্বীকার করেন? কিন্তু জন্মরূপ সত্য সহজে উড়াইয়া দিবার নহে। শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ দেখুন শ্রীমদ্ভাগবতের উপোদ্ঘাতে (১ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক) মহর্ষি শৌনক সূতকে বলিতেছেন—

"তৎ সর্ব্বং নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন।
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ॥

অর্থাৎ হে সূত, যাহা কিছু পৃষ্ট হইল সে সমস্তই আমাদিগকে বল, বেদ ব্যতিরিক্ত সকল প্রকার শাস্ত্রেই তোমাকে পারদর্শী বলিয়া জানি।

সূত পরমভাগবত, যাঁহার নিকট হইতে মহর্ষিগণ সকল নিগমবল্লীর সৎফলরূপ শ্রীভগবন্নাম শুনিবার জন্য উৎসুক, —তিনি যে শমদমাদি নিখিল গুণের আধার ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই,—তথাপি তাঁহার বেদে অধিকার নাই বলা হইল কেন? সুধীগণ একবার এই কথাটী নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। মনীষী টীকাকারগণ একবাক্যে বলিতেছেন—যেহেতু সূত দ্বিজপদবাচ্য নহেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অন্তর্গত নহেন, এইজন্য বেদে তাঁহার অধিকার নাই। ("অত্রৈবর্ণিকত্বাৎ তস্য বেদে অনধিকারাৎ।")

গুণই যদি বর্ণভেদের একমাত্র লক্ষণ হইত, তবে শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা সূতও দ্বিজপদবাচ্যও বেদে অধিকারী বলিয়া বর্ণিত হইতেন।

তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতেরই—৭ম স্কন্ধের ১১ অধ্যায়স্থ ত্রয়োদশ শ্লোকটীতে দ্বিজের লক্ষণ দেখুন—"সংস্কারা যত্রবিনচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যম্।" অর্থাৎ যাহার গর্ভাধানাদি দশবিধসংস্কার মন্ত্রপূর্ব্বক নিপন্ন হইয়া থাকে—একটীরও বিচ্ছেদ হয় না—তিনিই দ্বিজ, ব্রহ্মা সৃষ্টি সময়েই তাঁহাকে দ্বিজনামে সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন। টীকাকার বিদ্বন্মণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলিতেছেন—"অজো ব্রহ্মা, যং জগাদেতি-ব্রহ্মসৃষ্ট্যারম্ভত এব প্রবৃত্তায়াং দ্বিজজাতৌ, বিশুদ্ধমাতাপিতৃকং জন্মৈব মুখ্য লক্ষণ মিতার্থঃ।" অর্থাৎ "ব্রহ্মা যাহাকে দ্বিজনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই কথা বলায় ইহার তাৎপর্য্য এই হইতেছে যে, ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই দ্বিজজাতি বিদ্যমান আছেন, এবং ঐ দ্বিজকুলে বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে জন্মলাভই দ্বিজত্বের মুখ্য লক্ষণ। ইহাই সংহিতাকার যাজ্ঞবল্ক্যের-"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ"—"বিন্নাস্বেষ বিধি স্মৃতঃ—এই বচনদ্বয়ের প্রতিধ্বনি। উক্ত বচনে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিবাহিতা সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রেই দ্বিজাতির লক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিতেছেন—"অবিচ্ছিন্ন-ভাবে দশবিধ সংস্কার নিষ্পন্ন হইলেই যদি তথাবিধ সংস্কৃতের দ্বিজত্ব সংজ্ঞা হয়, তবে শূদ্রের ঐরূপ সংস্কারগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন হইলে তাহাকে দ্বিজ বলা যাইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্মা যে বর্ণকে সৃষ্টি করিয়া দ্বিজরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তজ্জাতিক ব্যক্তিই সংস্কার প্রাপ্ত হইলে দ্বিজসংজ্ঞার অধিকারী হয়,—অন্যে নহে। এখানে 'তজ্জাতিক' শব্দটী বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—ইহা দ্বারা দ্বিজকুলে জন্ম যে দ্বিজত্বের প্রধান লক্ষণ ইহাই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন—শূদ্রের সংস্কারগুলি যথাযথ নিষ্পন্ন হইলেও তাহাকে দ্বিজ বলা যায় না। কেননা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষেই গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহের মন্ত্রপূর্ব্বক বিধান করিয়াছেন। শূদ্রের পক্ষে তাহা করেন নাই। বিশেষতঃ শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কার নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে স্মৃতির বচন যথা—

> বিবাহমাত্র সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাং সদা।
> ন কেনচিৎ সমসৃজচ্ছন্দসা তং প্রজাপতিঃ॥

এবং শ্রুতিবচন—

"গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণমসৃজৎ, ত্রিষ্টুভা রাজন্যং, জগত্যা বৈশ্যং, ন কেনচিচ্ছূদ্রমিতি।"

এই স্মৃতি ও শ্রুতির বচনদ্বয়ে শূদ্রের "বেদে অনধিকারই কথিত হইয়াছে এবং সংস্কার সমূহের অমন্ত্রকরূপে নিষ্পাদনের বিধানই করা হইয়াছে।

তাহার পর বিরুদ্ধবাদিগণ বর্ণভেদ গুণগত দেখাইবার জন্য নিজেদের সাপক্ষে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন তাহা দেখুন—

> যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
> যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

প্রতিবাদিগণ এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে—যে বর্ণের যে লক্ষণ কথিত হইল, তাহা বর্ণান্তরে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই বর্ণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবে। অর্থাৎ যদি শম দমাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণসমূহ শূদ্রে দৃষ্ট হয় তবে সেই শূদ্রকে ব্রাহ্মণই বলিবে। যদি ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য হয়—তবে ভাগবতের বক্তা সূত ঐ সকল গুণের অধিকারী বলিয়া ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত হইতেন, এবং ঋষিগণ তাঁহাকে "মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ।" বলিয়া বেদে তাঁহার অনধিকার প্রদর্শন করিতেন না। পূর্ব্বাপরবিষয়ের পরস্পর সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া একটা শ্লোকের মুখ্যার্থে কতকটা নিজেদের মনোমত মতলবের সমর্থনের আভাস পাইয়া-একটা চিরাচরিত,—লোকে ও বেদে প্রতিপাদিত—জন্মগত বর্ণভেদরূপ প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপের চেষ্টা করা কি শঠতা নহে? মুখ্যার্থই যদি শব্দ বা বাক্যের একমাত্র বৃত্তিরূপে সর্ব্বত্র অর্থবোধ করিতে সমর্থ হইত, তবে ভাষাতত্ত্ববিৎ আলঙ্কারিকগণ লক্ষণাবৃত্তি উদ্ভাবনের গৌরব স্বীকার করিতেন না। স্থলবিশেষে মুখ্যার্থের বাধ হইয়া যে লাক্ষণিকার্থ বলবান্ হয়, ইহা পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন। যাহা হউক লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে আলোচ্য শ্লোকটার এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, বর্ণভেদ যে জন্মগত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই,—তবে কোন ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাহাতে না থাকে, তবে সে শূদ্র তুল্য কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে শূদ্র নহে। আবার যদি কেহ জাতিতে শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণোচিত শম দমাদি গুণমণ্ডিত হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণের তুল্য আদর পাইবার যোগ্য,—একেবারে ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বকৃতটীকায় স্পষ্ট এই কথাই বলিতেছেন—"* * * তজ্জাত্যন্তরমপি তেনৈব ব্রাহ্মণাদিশব্দেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ইতি—ব্রাহ্মণাদি তুল্যাদরং লক্ষয়তি।" অর্থাৎ শমদমাদি গুণযুক্ত বৈশ্য বা শূদ্র—ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীনজাতীয় হইলেও ব্রাহ্মণের তুল্য আদর পাইবার যোগ্য।—লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা এই অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শ্রীধরস্বামীও এই শ্লোকটার প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"শমদমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ"—অর্থাৎ শমদমাদিযুক্ত ব্রাহ্মণই মুখ্য ব্রাহ্মণ, শৌর্য্য-বীর্য্যাদি যুক্ত ক্ষত্রিয়ই মুখ্য ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল গুণবর্জ্জিত ব্রাহ্মণাদির জন্ম জন্য ব্রাহ্মণত্বাদি গৌণ হইলেও তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। গুণহীন ব্রাহ্মণ যে সমাজে অপদস্থ এবং গুণবান শূদ্র যে সম্মানভাজন তাহা কে অস্বীকার করিয়া থাকে? সামাজিকগণ চিরদিনই গুণানুসারে উভয়ের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। পাপাসক্ত, কু-কর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের জন্য কোথায় শ্রেষ্ঠ আসন পাতিয়া অভ্যর্থনা করা হয়, এবং গুণবান, ধর্ম্মপরায়ণ, শৌচাদিমান্ শূদ্রকে কোথায় যথোচিত আদর না করিয়া তাহার বিপরীত আচরণ করা হইয়া থাকে? প্রতিবাদিগণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিজেদের ভ্রান্ত মতের সমর্থক মনে করিয়া একটী মাত্র শ্লোক অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিকৃতার্থ টীকাকারগণের শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যার শাণিতধারে টিকিল না দেখিয়া আমরাই তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডারের দৈন্যে দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের সাপক্ষ্যেই ভাগবতোক্ত শ্লোকটার অনুরূপ মহাভারতের নহুষ-

যুধিষ্ঠিরসংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি--কিন্তু এটীরও মহাজনানুসৃত ব্যাখ্যায় বিরুদ্ধবাদিগণের মুখ অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হইবে। দেখুন যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

"সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে তু যদ্‌ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নৈব শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

প্রতিবাদিগণ পূর্ব্বোক্ত ভাগবতের শ্লোকের মত এই যুধিষ্ঠির বাক্যের অর্থ করিবেন যে, সত্য, দান, ক্ষমাদি, গুণবান্ ব্যক্তি, জাতিতে শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ, আর ঐ সকল গুণবর্জ্জিত ব্যক্তি বিপ্রবংশে জাত হইলেও শূদ্র। কিন্তু এই অপার্থ কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারেন না।

"যে ফল সরস ও মধুর তাহাই আম,—অতএব এই—টক ছোট আমগুলি আম নহে—কুল। আর এই বড় বড় সুমিষ্ট কুলগুলি ঠিক আম"—এই মহাজন বাক্যকে প্রমাণ করিয়া যদি একটী কুল গাছের যাবতীয় কুল একত্র মিলিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী আম্রতরুর শাখায় শাখায় দোদুল্যমান আম্রফলগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলে—"ওহে - মহোদয়গণ, আপনারা আম্রশাখায় ঝুলিলে কি হয় আপনাদের আম্রত্ব অভিমান বৃথা। আপনারা যে আম এ চিন্তা মনের কোণেও স্থান দিবেন না,—কেননা পূর্ব্বোক্ত মহাজন বাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আম গাছে ছোট ও টক ফল হইলে তাহার নাম কুল; আর কুল গাছে বড় ও মিষ্ট ফল হইলে তাহা আম। অর্থাৎ কিনা বৃক্ষ ভেদে ফলের নামকরণ করা ঠিক নহে, মিষ্টত্ব বা অম্লত্ব ও অবয়ব ভেদেই ঐরূপ নাম হওয়া উচিত।"—ইহাও যেমন যুক্তি,—বর্ণভেদের প্রাগুক্ত গুণগত ব্যাখ্যাও তেমনি বুদ্ধির পরিচায়ক। দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের যদি ইহাই তাৎপর্য্য হয়, তবে তিনি একদিকে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের অমিত শক্তি ও প্রতাপ এবং অপরদিকে শম দম সত্যাদি অশেষ সদ্‌গুণের আধার হওয়ায় আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া উদ্বোষিত করিতে পারিতেন, এবং ব্রাহ্মণের প্রতি বিনায় মধুর প্রহ্বীভাব দেখাইতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন না। এক্ষণে শাস্ত্রপারগত মহামহোপাধ্যায় বিদ্বদ্‌বৃন্দ যে ভাবে ধর্ম্মরাজের এই বাক্যের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দেখুন—

"সত্যাদি লক্ষণবান্ ক্ষত্রিয়াদিরপি সত্বভাবত্বাৎ ব্রাহ্মণসদৃশস্তত্তদ্ গুণ বিবর্জ্জিতো ব্রাহ্মণোঽপি তমঃপ্রধানত্বাৎ শূদ্রতুল্য ইতি।"

(একাদশী তত্ত্বের টীকাকার শ্রীরাধামোহন গোস্বামী মহাশয়।)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি জাতি সত্যাদি গুণযুক্ত হইলে সত্বপ্রধান হেতু ব্রাহ্মণ সদৃশ, এবং ঐ সকল গুণ বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ তমঃপ্রধান হেতু শূদ্রতুল্য। কই বৈষ্ণব টীকাকার এ কথাত বলিলেন না যে গুণহীন ব্রাহ্মণ একেবারে শূদ্রপদবাচ্য।

অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" নামক বৈষ্ণবশাস্ত্রের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতে ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয়ের বর্ণভেদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, সুধী পাঠকবর্গের গোচরে আনয়ন পূর্ব্বক এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্লোকটী এই—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ

* * *

শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।

(পূর্ব্ববিভাগ ১ লহরী ১৩শ শ্লোক)

অর্থাৎ যাহার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তি দ্বারা চণ্ডালও সদ্য সোমযাগের যোগ্য হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, কোন ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডাল হইয়াও—শ্রীভগবন্নাম শ্রবণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণোচিত সোমযাগ করিবার অধিকারী হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা দেখুন—

"ততশ্চাস্য ভগবন্নামশ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব সবনযোগ্যতায়াঃ প্রতিকূলদুর্জ্জাতিত্ব-প্রারম্ভক প্রারব্ধ-পাপনাশ-পূর্ব্বক-সবন যোগ্য-জাতিত্বজনকপুণ্যলাভঃ প্রতিপদ্যতে ব্রাহ্মণানাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনায় সুজাতিত্ব জনক জন্মাপেক্ষাবৎ।" অর্থাৎ চণ্ডাল যে তাহার দুর্জ্জাতিত্ব নিবন্ধন যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনধিকারী, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপই তাহার মূল। তবে ইহ জন্মে শ্রীভগবন্নাম শ্রবণাদির ফলে পরজন্মে সবনযোগ্য জাতিরূপে যাহাতে জন্মাইতে পারে সেইরূপ পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। যেমন ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নের পূর্ব্বে—জাতিগত দোষ না থাকিলেও—"শূদ্রেণৈব সমস্তাবৎ যথানিনয়নাদৃতে"—এই বচন দ্বারা যজ্ঞাদিতে অধিকারী হয় না, পরন্তু সাবিত্র্যজন্ম বা উপনয়ন রূপ সংস্কার দ্বারা যজ্ঞে অধিকার লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ চণ্ডালও ইহজন্মে প্রাক্তনপাপের ফলে দুর্জ্জাতিত্ব নিবন্ধন যজ্ঞে অধিকারী না হইলেও শ্রীভগবদ্ ভক্তি দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করে, তাহার ফলে পরজন্মে সুজাতি বা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারে ইহাই তাৎপর্য্য। ব্রাহ্মণকুমারের যজ্ঞাদিতে অধিকার যেমন সাবিত্র্য জন্ম (উপনয়ন) সাপেক্ষ সেইরূপ শূদ্রাদিরও ও ঐরূপ কার্য্যে অধিকার পুণ্য বিশেষ জনিত জন্মান্তর সাপেক্ষ। কারণ শূদ্রাদি জাতীয় ব্যক্তি যতই পুণ্যশীল ও ভক্তিমান্ হউন, ইহজন্মে তাঁহার বৈদিক কর্ম্মে অধিকার হইতে পারে না ("ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবন যোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক-পুণ্যবিশেষ-ময় সাবিত্র-জন্মাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। অতঃ-প্রমাণবাক্যেঽপি সবনায় কল্পতে—সম্ভাবিতো ভবতি নতু তদেবাধিকারী স্যাদিত্যভিপ্রেতম্।")

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ বৈষ্ণব গ্রন্থ ও মহাজন বাক্যে কোথাও কি কেবল গুণগত বর্ণভেদের সন্ধান পাইলেন? আজকাল সকলের মুখে এক কথা শুনিতে পাওয়া যায়; ব্রাহ্মণ বৃত্তিচ্যুত ও অধঃপতিত। কথাটী অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু ইহার

জন্য কি সমগ্র চাতুর্ব্বর্ণিক সমাজ দায়ী নহে? ব্রাহ্মণেতর জাতির সহানুভূতি থাকিলে ব্রাহ্মণ আজ শাস্ত্রোক্ত যজন, যাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বৃত্যান্তর গ্রহণ করিত না। পাশ্চাত্য জাতি ধর্ম্মযাজকগণের ভরণ পোষণার্থ যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার শতাংশও যদি হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ পোষণের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ আজ শবৃত্তির জন্য লালায়িত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ যাহা করিতেছে তাহা আপৎকল্প বুঝিতে হইবে। তাই ব্রাহ্মণের এই বৃত্তিগত অধঃপতনে হিন্দু সমাজান্তর্গত বক্তি মাত্রেরই মুখ লজ্জায় অবনত হওয়া উচিত। ইহাতে আস্ফালন করিবার মত কিছুই নাই।

কিন্তু এই বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণ ঘোর অমার্জ্জনীয় পাপে আপনা হইতে ক্রমে ক্রমে লিপ্ত হইতেছেন। ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অবহেলা ও অপালন। বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়াও পুণ্যশ্লোক ভূদেব ও গুরুদাস ব্রাহ্মণোচিত সদাচার ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতঃ স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহা জানিয়া শুনিয়াও ব্রাহ্মণসন্তানগণ যদি সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ত্তব্য পালন না করিয়া যথেচ্ছ অনাচারের প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই স্বকৃত পাপের ফলে পদে পদে নির্য্যাতিত ও নিগৃহীত হইতে হইবে। অতএব হে ব্রাহ্মণতনয়গণ! পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যগৌরবময় চরিত্র অনুসরণ করতঃ—তাঁহাদের সদাচার ও কর্ত্তব্য পালনের অমল ধবল জ্যোতির্ম্ময় ছবি আত্মজীবনে প্রতিফলিত করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণের আদর্শ হইয়া দাঁড়ান। কলঙ্কের পঙ্কিল পথ আর প্রশস্ত করিবেন না।

আর হে ব্রাহ্মণেতর সজ্জনগণ! আপনারা ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ কালবশে বিপন্ন বলিয়া তাহাকে পদদলিত করিবার চেষ্টা না করিয়া "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" এই শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত স্ব স্ব বর্ণোচিত গুণকর্ম্ম সমূহের যথাযথ পালন দ্বারা নিখিল সমাজের মঙ্গল জীবনের প্রধানতম ব্রত করিয়া পরস্পর সহযোগিতায় এই বিরাট কার্য্যে অগ্রসর হউন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য্য এম, এ।

পৃথিবীতত্ত্বে প্রাচ্য-গবেষণা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা পৃথিবীর গোলত্ব বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছি; এই সংখ্যায় পৃথ্বী আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যে স্বভাবতঃই বিনা আধারে শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে; এবং তাহার যে গতি আছে ইহাই এই সংখ্যায় আমরা দেখাইব। ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে :—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে,
তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে"? ।

অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিবিশিষ্টা, যেহেতু কোন বস্তু যদি আকাশে ক্ষেপ করা হয়, তবে পৃথ্বী স্বীয় আকর্ষণ শক্তি দ্বারা উক্ত পদার্থকে নিজের অভিমুখে টানিয়া লয় ইত্যাদি।

আর্য্যভট্ট বলিতেছেন—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে তৎ তয়া ধার্য্যতে"।

অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণ শক্তিবিশিষ্টা, কেননা আকাশে প্রক্ষিপ্তবস্তু পৃথ্বী স্বীয়শক্তিদ্বারা ধারণ করিয়া থাকে। পৃথিবী যে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে সে বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তেও উল্লেখ আছে যথা :—

"ভূ গোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি"

অর্থাৎ গোলাকার পৃথ্বী আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। ভাস্করাচার্য্যও সিদ্ধান্তশিরোমণিতে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তিচ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শাশ্বৎ সদনুজ মনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ"।

অর্থাৎ বিনা আধারে পৃথিবী স্বীয়শক্তি দ্বারা আকাশে অবস্থিতি করিতেছে, ইহার চতুর্দ্দিকে দেব, দানব, মনুষ্য ইত্যাদি অবস্থিতি করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্যবাসী আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেরই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, পৃথিবী গোলাকার, শূন্যেস্থিতা, এবং তাহার আকর্ষণ শক্তি আছে, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরই মত, হিন্দুরা এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেবল পৃথিবী ত্রিকোণাকার, সর্পাদি পৃষ্ঠে অবস্থিত, এই অসারমতই হিন্দু শাস্ত্রের মত। কিন্তু এই সংস্কার গুলি যে আর্য্যশাস্ত্রের অপবাদ তাহা এখন অনেকে বুঝেন। কোথা হইতে এই সকল প্রবাদ জন্মিয়াছে; তাহার আলোচনা করিতে গেলে একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে; অতএব এই স্থলে উহার আলোচনা হওয়া অসম্ভব।

পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু প্রমাণাদি দর্শাইব; তাহা কোন আধুনিক গ্রন্থের নহে; উহা আমাদের প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রাদি হইতেই দেখান হইবে।

হে প্রাচ্যবাসিগণ! আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনারা আপনাদের ঘরের রত্নাদি

সন্ধান করুন, ইউরোপীয় যে সকল গুণগ্রাহী পণ্ডিত হিন্দুর ঘরের রত্নানুসন্ধান পাইয়াছেন ; তাঁহারাই স্বীকার করেন যে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি লেখা হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ সকল যে পাশ্চাত্য দেশে গিয়া লেখা হয় নাই ইহা অবশ্য বলাই বাহুল্য, কেন না তখন পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাদি বিষয়ে অন্ধযুগ ছিল ।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহাই ইউরোপাদিতে পরে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তৎ তৎ দেশবাসী পণ্ডিতগণ তাহারই নূতন ভাবে সংস্কার করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যভট্ট অতি প্রাচীন লোক, সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য্য, লল্ল, বরাহ, মিহির, শ্রীমতী খনা, ইত্যাদি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ আর্য্যভট্টের মত স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহ, মিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের জীবিত-কাল প্রায় দুই হাজার বর্ষ অতীত হইতে চলিল ; অতএব তাহার অনেক পূর্ব্বকালের লোক আর্য্যভট্ট, গ্রীসদেশবাসী পিথাগোরস (Pythagorae) প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আর্য্যভট্টের মত শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন, কিন্তু সেই সময়ে পিথাগোরস পণ্ডিতের মত গ্রীসদেশবাসীর সহিত অনৈক্য হওয়ায় তিনি তাঁহার মত দেশের জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারেন নাই। পরে ইটালীদেশবাসী কোপার্নিকস (Copernicus) পণ্ডিত পিথাগোরসের মত বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া বহুকষ্টে পৃথিবীর গতি আছে ইহা অনেকের মনে সংস্কার জন্মাইয়া দেন। ফলতঃ আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্তরূপ বারি নির্ঝর গ্রীস দেশ দিয়া অন্তঃসলিল প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র ইউরোপে বেগবতী নদী হইয়াছে। পৃথিবীর গতি আছে এই মতের স্রষ্টা যে প্রথম ইণ্ডিয়াবাসী আর্য্যভট্ট তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট বলেন—

"চলাপৃথ্বী স্থিরা ভাতি"

পৃথিবী ঘুরিতেছে কিন্তু স্থিরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, আর্য্যভট্ট স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন :—

"ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।

ভপঞ্জর অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদিমণ্ডল (রাশিচক্র) স্থির রহিয়াছে, পৃথিবীই কেবল আবর্ত্তন অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে। শ্রীপতি— "নৌস্থো বিলোমগমনাৎ" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে,—মানুষ যখন নৌকায়, এখন যেমন ষ্টীমারে, বা ট্রেণে, চলে তখন গ্রাম, নদ, নদী প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উক্ত অচল গ্রামাদি চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত কিন্তু তাহা অচল ; যাহা সচল যথা নৌকা, ট্রেণ বা ষ্টীমার, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা অচল বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার পৃথিবীর পরিভ্রমণ দ্বারা পৃথিবীস্থ লোকের সুস্থির "ভচক্র" চলিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়।

পৃথিবীর গতি কতদ্রুত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট "আর্য্যসিদ্ধান্ত টীকায়" উল্লেখ করিয়াছেন এই যে,—

যোজনানাং সহস্রে যে যে শতে যে চ যোজনে।
পলাদল্পেন কালেন পৃথিব্যা গমনং স্মৃতম্॥

অর্থাৎ এক পলের অল্পকাল সময়ে পৃথিবী ২২০২ যোজন গমন করে, ইত্যাদি পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ দর্শাইয়া আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি মনীষিগণ সূর্য্যসিদ্ধান্ত লল্ল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের "অচলা পৃথ্বীর" প্রমাণগুলি খণ্ডন করিয়াছেন, বাস্তবিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পৃথিবীর গতি নাই এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আর্য্যভট্টের প্রমাণের কাছে আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া ঐ প্রমাণগুলি আর আঁলোচনা করিব না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসূর্য্যেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সরস্বতী।

বলিতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

মহামায়ার মায়িক সৃষ্টির মায়িক জীব আমরা, সেই মায়া অতিক্রম কি আমাদের সাধ্যায়ত্ত?

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

সেই ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিদেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহগর্ত্তে নিঃক্ষেপ করেন। কাহার সাধ্য তাঁহার করুণা ব্যতীত মায়া অতিক্রমে সমর্থ হয়?

করুণাধার সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যে সকল সদুপদেশ শাস্ত্র মধ্যে নিহিত করিয়া গিয়াছেন, মহামায়ার কৃপাব্যতীত তাহারও সারমর্ম্ম বোধগম্য হইবে না।

জগদম্বার করুণাদৃষ্টি থাকে ত ঋষির উপদেশ তোমার কল্যাণে নিয়োজিত হইবে। তদন্যথায় সেই অমূল্য উপদেশরাশি তোমার অশেষ অকল্যাণেরও হেতু হইতে পারে।

শাস্ত্রের মর্ম্মমর্ম্ম অবগত হওয়া যাঁহার তাঁহার কার্য্য নহে।

যে ভীষ্মদেব শান্তিপর্ব্বে ও অনুশাসনপর্ব্বে অশেষ সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বমীমাংসা দ্বারা ধর্ম্মরাজের সংশয়রাজি দূরীকৃত করিয়াছিলেন,তিনিই আবার সভাপর্ব্বে দ্রৌপদীর প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন—

ন ধর্ম্ম সৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেক্তুং
শক্নোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ॥

হে সুভগে! ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তোমার এই প্রশ্ন যথাযথ বিচার করিতে সমর্থ হইতেছি না।

জ্ঞান গরিষ্ঠ ভীষ্মদেবও ধর্ম্মবিচারে অসমর্থ, পাঠক! তুমি আশ্রিত বহুদূরে; তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন—

ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ হেত্বাগম-সদাচারৈর্যদ্যুক্তং তদুপাস্যতাং। সেই সেই বাদিগণ অনেক প্রকার ন্যায় তন্ত্র বলিয়াছেন, হেতু (তর্ক) আগম (শাস্ত্র) ও সদাচার দ্বারা তন্মধ্যে যাহা সমর্থিত হইবে তাহারই উপাসনা কর।

এতাদৃশ ধর্ম্মসংশয়স্থানে মনু বলিয়াছেন—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে।

পিতা ও পিতামহগণ যে সৎপথে বিচরণ করিয়াছেন, সেই সৎপথেই বিচরণ করিবে, সেই পরিচিত ও পরীক্ষিত পথে গমন করিলে আর স্খলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আমার পূজনীয় পিতৃ পিতামহাদি অগণিত পুরুষপরম্পরা জগদম্বার প্রীতির জন্য শারদীয় মহাপূজায় ছাগমহিষাদি বলিদান করিয়া আসিতেছেন, এবং অন্যান্য শক্তি যজ্ঞেও পশুবলি প্রদান করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক এযাবৎ শক্তি যজ্ঞে ছাগ-মহিষাদি বলিদান করিয়া থাকি।

মহাভারত, দেবীভাগবত, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে, গায়ত্রী নিবন্ধ ও মৎস্যসূক্তাদি তন্ত্রে বলিদানের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই পাঠ করিয়াছি। সাংখ্য, পাতঞ্জল-মীমাংসা বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে পশুঘাতের নানারূপ বিচার বিতর্ক দেখিয়াছি। তথাপি পূর্ব্বাচরিত প্রথায় কোনও রূপ সংশয় উদিত হয় নাই।

"নহি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢ়েণ ভবিতব্যম্"

(বেদান্তবোধা)

"পূর্ব্বপুরুষেরা মূঢ় ছিলেন বলিয়া নিজেরাও মূঢ় হওয়া উচিত নহে।"

শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তি স্মরণ করিয়াও পূর্ব্বাচরিত প্রথায় সংশয়ের কারণ নাই।

কারণ, আমার পিতৃ পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকেই শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ও সিদ্ধসাধক ছিলেন।

তাঁহারা অনেকেই জগদম্বার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। 'এই ভগবদনুগৃহীত মহামহিমান্বিত শাস্ত্রদর্শি-সাধক সৎপুরুষগণ, যে আচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কখনও ভ্রম বিজৃম্ভিত বা অশুভ হইতে পারে না।

আমরা যতই কেন শাস্ত্র পাঠ করিনা, যতই কেন উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা করিতে থাকিনা, ভগবতীর কৃপাবিন্দু না পাইলে কখনই তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব না। সেই মহাপুরুষগণের শোণিতবিন্দু মাত্রই এক্ষণে আমাদের প্রধানতম সম্বল।

সম্প্রতি আমরা অকৃতী হইলেও আমরা তাঁহাদের কৃত অসংখ্য শিষ্যের ধর্ম্মোপদেষ্টাও আচার প্রবর্ত্তক।

আমাদের হইতে ধর্ম্মোপদেশ ও শাস্ত্র মিমাংসা শুনিবার জন্ত অত্যাপি সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্য উদ্‌গ্রীব।

আমরা যেমন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" বুঝিয়াছি, কালমাহাত্ম্যে ও শিক্ষা স্বাতন্ত্র্যে সমাজের সকল ব্যক্তির সেরূপ বিশ্বাস সম্ভব নহে। তাঁহাদের সংশয় দূর করিবার জন্ত বিচার-বিতর্ক করিতে হইবে।

কয়েক বর্ষ যাবৎ শক্তিপূজার পশু বলিদান সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক পূর্ণ প্রবন্ধও পুস্তিকাদি প্রচারিত হইতেছে। কত কত মহা মহা পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত পাতিপত্র পত্রস্থ হইতেছে। এক্ষণে আবার কাশীধাম হইতে বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নামক পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া বিনা মূল্যে গৃহে গৃহে বিতরিত হইতেছে, জানিনা জগজ্জননী ইচ্ছাময়ী মহামায়ার কিরূপ ইচ্ছা।

ভারতে যখন বৈদিক যাগযজ্ঞের আতিশয্য তখনই যেমন বুদ্ধদেব অহিংসা পরমো ধর্ম্ম, এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া জগতে এক নূতন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন—বর্ত্তমানের পুথিপত্র সেইরূপ কিছু করিবে কিনা জানিনা। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ভারতের মঙ্গল কি অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিচারের ক্ষেত্র ইহা নহে। এই সকল পুথিপত্রও সমাজের কল্যাণ কি অকল্যাণের জন্ত, জগদম্বার সাধকগণের ভ্রমনিরাসের না মহাপরীক্ষার জন্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

মানবের কল্যাণ অকল্যাণ উভয় কার্য্যের জন্তই প্রকৃতির ক্রিয়া হইয়া থাকে। যে শাস্ত্র মানুষের সৎ পথ প্রদর্শক সেই শাস্ত্রেরই অংশ বিশেষ অসুর মোহনার্থ রচিত হয়। অথবা কোনও কোনও শাস্ত্র এমনই কৌশলে রচিত হইয়া থাকে যে, দৈবী ও আসুরী সম্পদে অভিজাত মনুষ্যের একই শাস্ত্র হইতে অত্যন্ত বিরুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। ফলে বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারও বিরুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন হয়।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শাস্ত্রে যখন অধিকারী ভেদে, অবস্থা ভেদে একই বিষয়ে বিধি নিষেধ উভয়ই আছে, তখন যিনি যেরূপ অধিকার বলে কুলক্রমানুযায়ী যেরূপ আচার পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি তাহাই বা করুন না কেন? সকল মনুষ্য একই প্রকৃতির বা এক শ্রেণীর অধিকারী নহেন, সুতরাং সকলের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা হিতকরী হইতে পারে না।

জগৎ হইতে পশু বলিদান রহিত করিবার জন্ত যেসকল ব্যক্তি লেখনী সঞ্চালনপূর্ব্বক নিজকে ধন্ত মান্ত ভাবিতেছেন, তাহাদের অভিপ্রায় পশু বলিদানে, "জীবহত্যা" হয়; এইরূপ মহাপাপ সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে পারিলে সমাজের কল্যাণ করা হইল, ভগবৎ সমীপে তাহারা নিজেও পুরস্কার পাইবেন।

যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে কোথাও ভুল থাকে, আর তাহাদের সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণে ভ্রমবশে গৃহস্থ সাধকগণ সনাতন পদ্ধতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ পণ্ড করেন, তখন এই সকল লেখকও ব্যবস্থা দ্বারা ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইবেন কি না ?

এই অবসরে আমরা বৈধ হিংসা সম্বন্ধে দার্শনিকদের মতামত এবং স্মৃতিপুরাণ ও তন্ত্রাদির আলোচনা করিব। সঙ্গে সঙ্গে লেখকগণের প্রদর্শিত যুক্তিপ্রমাণাদিরও পরীক্ষা হইয়া যাইবে।

বৈধ হিংসা বিচার।

(১) সাংখ্য দর্শনের মত—

যজ্ঞে যথাবিধি পশু ও বীজাদি নাশ করিলে যজ্ঞের উপকার হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পশুবধ ও বীজনাশ জন্য কিঞ্চিৎ পাপও হইয়া থাকে। কিন্তু এই পাপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই বিনষ্ট হইবে, এবং যজ্ঞ হইতে প্রচুরতর মঙ্গলজনক ফল জন্মিবে। আর যদি প্রমাদতঃ প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের পুণ্যরাশির ফলে যজমান যখন স্বর্গাদি দিব্য লোকে বিচরণ করেন, তৎকালে এই পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পশুহনন ও বীজ নাশে যে পাপ ছিল তাহারও পরিপাক হইয়া যাগকর্ত্তার যৎসামান্য দুঃখ উৎপাদন করিবে। কিন্তু এই দুঃখ তিনি স্বর্গ-ভোগের বিপুল আনন্দের মধ্যে অনায়াসেই সহ্য করিতে পারিবেন।

বাচস্পতি মিশ্র এই কথাটাই লিখিয়াছেন,—

মৃষ্যন্তে হি পুণ্য সম্ভারোপনীতস্বর্গসুধা-মহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ, পাপ মাত্রোপপাদিতাং দুঃখ বহ্নি কণিকাং। (সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী।

যে সকল পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্য প্রচুরতর পুণ্যের ফলে উপনীত স্বর্গরূপ মহাসুধাহ্রদে অবগাহন করিতেছেন, তাহারা সেই সামান্য পশু বীজাদি বধজনিত ক্ষুদ্র পাপ হইতে উৎপাদিত দুঃখরূপ বহ্নিকণা অনায়াসেই সহ্য করিতে পারেন।

ফল কথা, যেমন কেহ সুধাহ্রদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিলে বহ্নিকণা তাহার দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে না, বা সামান্য দুঃখ সৃজন করিলেও তাহার পক্ষে সেই দুঃখের বিশেষ অনু-ভূতিই হয় না, তেমনি যজ্ঞফলে স্বর্গভোগের কালে সেই সামান্য দুঃখ গ্রাহ্যই হইবে না।

সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্তের উপর অন্যান্য দার্শনিক বলেন, যজ্ঞে পশুবীজাদি বধে পাপ হয় না, কেন না ইহা বেদ বোধিত। বেদ সামান্যভাবে "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" সকল ভূতের হিংসা করিও না বলিয়াছেন,—

অন্যত্র "অগ্নীষোমীয়ং পশু মালভেত" অগ্নীষোমীয় পশুকে আলম্ভন কর, এইরূপ বিশেষ শাস্ত্র আছে, এই বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রকে দুর্ব্বল করিয়া তাহার স্থান করিয়া লইবে। আর সামান্য শাস্ত্র বৈধ পশু হিংসা ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ অবৈধ হিংসায় অবকাশ পাইবে।

সাংখ্য বলেন, তাহা হইবে না,—বিরোধ স্থলেই বলবান্ দুর্ব্বলকে বাধা দেয়, এস্থলে

কোনও বিরোধ নাই। "মাহিংস্যাৎ" এই নিষেধ দ্বারা বুঝিলাম ভূতহিংসায় মানবের অনর্থ হয়, পশুমালভেত এই বিধি দ্বারা জানা গেল, বৈধ পশু হনন যজ্ঞের উপকারক।

যাহা মনুষ্যের অনর্থের কারণ তাহা দ্বারা যে যজ্ঞের উপকার হইতে পারে না। এইরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

অম্ল ভক্ষণ তোমার অপকারক বলিয়া এই অম্ল যে আর কাহারও উপকার করিতে পারে না তেমন নহে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যজ্ঞীয় পশু বধে পাপ হয় কিন্তু যজ্ঞের প্রচুর উপকারও হইয়া থাকে। পাপের পরিমাণ হইতে উপকারের পরিমাণ বহু শতগুণে অধিক।

এই সাংখ্য মতেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে—

বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গা প্রীতা ভবেন্নৃণাং হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।

(১৬।৬৫ অঃ প্রকৃতি খণ্ড)

(২) পাতঞ্জল-দর্শনের মত।—পাতঞ্জল-দর্শনও সাংখ্যদর্শনের সম্যক্ সমর্থন করেন। কৃতকারিত ও অনুমোদিত সর্ব্বপ্রকারের হিংসা ত্যাগ করিবে, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বজাতীয় জীবের হিংসা পরিত্যাগ করিলেই চিত্তমল দূর হয়; ইহাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলে। তাহার সার উপদেশ মুমুক্ষু যোগিগণ বৈধাবৈধ কোনওরূপ হিংসাই করিবে না।

(৩) বেদান্তদর্শনের মত।—বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৫ সংখ্যক সূত্র ও তদীয় শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিলেই বৈধহিংসা সম্বন্ধে বেদান্তমত অবগত হওয়া যায়, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত হইল—

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ।২৫। তৃতীয় ১ম পাদ

যৎ পুনরুক্তং পশুহিংসাদি যোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কর্ম্ম, তস্যানিষ্টমপি ফলমবকল্পত ইত্যতো মুখ্য মেবেহানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদি জন্মাস্তু তত্র গৌণীকল্পনা অনর্থিকেতি, তৎপরিহ্রিয়তে ন শাস্ত্রহেতুত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিজ্ঞানস্য।

অয়ং ধর্ম্মোঽয় মধর্ম্ম ইতি শাস্ত্র মেব বিজ্ঞানে কারণ মতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ; নিয়ত দেশকাল নিমিত্তত্বাচ্চ; যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মোঽনুষ্ঠীয়তে স এব দেশ কাল নিমিত্তান্তরে-ষধর্ম্মো ভবতি। তেন শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ং বিজ্ঞানং কস্য চিদস্তি?

শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম্ম ইত্যবধারিতং সকথং অশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্।

নন্বু ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি ভূতবিষয়াং হিংসা মধর্ম্ম ইত্যব গময়তি, বাঢ়ং, উৎসর্গস্তু সঃ অয়ন্ত্বাপবাদঃ, অগ্নী ষোমীয়ং পশু মালভেতেতি, উৎসর্গাপবাদয়োস্তু ব্যবস্থিত বিষয়ত্বং তস্মাদ্ বিশুদ্ধং বৈদিকং কর্ম্ম, শিষ্টৈরনুষ্ঠীয় মানত্বাৎ অনিন্দ্যমানত্বাচ্চ তেন ন তস্য প্রতিফলং যাতি স্থাবরত্বং। (শঙ্কর-ভাষ্য)।

কেহ কেহ বলে,—"যজ্ঞীয় কর্ম্ম অশুদ্ধ" যেহেতু তাহাতে পশুহিংসাদি আছে, তাহার (ইষ্টফলের ন্যায়) অনিষ্ট ফলও হয়, এই নিমিত্ত যাগকর্ত্তাদের (শারীর কর্ম্মদোষপ্রযুক্ত)

ব্রীহি যবাদি স্থাবরজন্ম হউক, এস্থলে গৌণী কল্পনার কোনও ফল নাই, তাহারি পরিহার করা হইতেছে। নাহে! ধর্ম্মাধর্ম্ম বিজ্ঞানের হেতু শাস্ত্র, ইহা ধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্ম, এই অবধারণে শাস্ত্রই একমাত্র কারণ; কেননা ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় এবং নিয়তঃ দেশ কাল ও নিমিত্ত হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যে দেশে যেকালে যে নিমিত্তে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ধর্ম্মই অন্যদেশে অন্যকালে অন্য নিমিত্তে অধর্ম্ম হইবে; এই হেতু শাস্ত্র ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক অবধারণ কোন ব্যক্তির হইতে পারে না?

শাস্ত্র হইতে হিংসানুগ্রহাদি স্বরূপ জ্যোতিষ্টোম ধর্ম্মরূপে অবধারিত হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে সমর্থ হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, মাহিংস্যাদিত্যাদি শ্রুতি, ভূতবিষয়া হিংসাকে অধর্ম্ম বলিতেছেন, বলুন! ইহা কিন্তু সামান্য বিধি,—"অগ্নিষোমীয়পশু হননকর" ইত্যাদি শ্রুতি বিশেষ বিধি, সামান্য ও বিশেষ বিধির স্থান ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং বৈদিককর্ম্ম বিশুদ্ধ, যেহেতু শিষ্টব্যক্তিগণ, ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অথচ শাস্ত্রে কোথাও জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক কর্ম্মের নিন্দা নাই। অতএব জ্যোতিষ্টোমাদির প্রতিফল স্থাবরযোনি লাভ হইতে পারে না।

(৩) মীমাংসা দর্শনের মত—

মীমাংসাও ন্যায়মতে বৈধ হিংসায় পাপ নাই। অবৈধ হিংসায়ই পাপ হয়, পুরাণ, তন্ত্র এবং স্মৃতিও এই মীমাংসকের মতেরই পোষণ করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই;—যদি যজ্ঞীয় পশুহনন যাগকর্ত্তাদের অমঙ্গলের কারণ হয়, তবে যজ্ঞকর্ম্মে মানবের প্রবৃত্তি হয় কেন? অমঙ্গলজনক কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। "ইহা আমার ইষ্টসাধন এইরূপ জ্ঞানেই প্রবৃত্তি হয়, কেবল ইষ্টসাধনতা জ্ঞানেই বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হয়। এই নিমিত্ত মধুমিশ্র অন্ন উপকারী এবং তৎপ্রতি বুদ্ধিমানের ইচ্ছা হইলেও; মধুবিষমিশ্র অন্ন রসনা তর্পণকারক হইলেও প্রাণসংহারক, তজ্জন্য তাদৃশ অন্ন ভোজনে কোন ক্ষুধিতেরও ইচ্ছা হইবে না।

এইরূপ যজ্ঞ উপকারক হইলেও, পশুঘাত সংপৃক্ত অমঙ্গলজনক যজ্ঞ উপকারক হইবেনা, সুতরাং বুদ্ধিমানের তাদৃশ যজ্ঞে প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

দুই একজন ভ্রান্ত থাকিলেও, বিশ্বমানবের প্রবৃত্তি যে ভ্রমযুক্ত তাহা বলা যাইতে পারেনা। যজ্ঞে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়,—সুতরাং যজ্ঞে পশুবধ ও বীজনাশে পাপ হয় না। এই নিমিত্তই স্মৃতি বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ"

(৪) মনু স্মৃতির মত—

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ। ৩৯।
মধুপর্কেচ যজ্ঞে চ পিতৃ দৈবত কর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ। ৪১।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিন্ চরাচরে।
অহিংসা মেব তাং বিদ্যাৎ বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ।

৪৪। পঞ্চম অধ্যায়।

যজ্ঞ সম্পাদন জন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভু, পশুসকল সৃজন করিয়াছেন। যজ্ঞ সর্ব্বলোকের মঙ্গলের জন্য, অতএব যজ্ঞে যে বধ, তাহা বধ মধ্যে গণ্য নহে। ৩৯।

মধুপর্ক (অতিথি সৎকার) যজ্ঞ এবং পিতৃকার্য্য বা দেবকার্য্য, এই সকল স্থলেই পশু হনন বিহিত, অন্যত্র নহে। ইহা মনু বলিয়াছেন,—

বেদ বোধিত যে হিংসা তাহা নিয়ত অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত তাহাকে অহিংসা বলিয়া জানিবে, [illegible] তাহাতে হিংসাজন্য অধর্ম্ম হয় না। যেহেতু বেদ হইতে ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

এই শ্লোক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাদিগণ অনুমান করেন,—

বৈধ পশুহননমপ্যধর্ম্মঃ প্রণিহননত্বাৎ ব্রাহ্মণহননবৎ।

যজ্ঞীয় পশুহননও অধর্ম্ম যে হেতু ইহাও প্রাণিহনন, যেমন ব্রাহ্মণহনন।

এই অনুমান যজ্ঞীয় পশুহননে বাধা প্রাপ্ত, কেননা বেদ বলিতেছেন, তাহাতে অধর্ম্ম নাই। ব্রাহ্মণহননে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা তুমি কেমনে জানিলে? বেদ, তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়াছেন। এই বেদই যজ্ঞীয় পশুহননকে ধর্ম্ম বলিতেছেন। ইহা ধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্ম, যখন শাস্ত্র হইতেই জানিতে হয়, তবে আর এই যজ্ঞীয় পশুহনন অধর্ম্ম এই শাস্ত্র বিরোধী তোমার অনুমানের মূল্য কি? এই নিমিত্তই বলিয়াছেন,—

"বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ"

(৫) পুরাণ মত—দেবীভাগবতে লিখিত আছে—

দেব্যগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বর্গমব্যয়ম্।
ন হিংসা পশুজা তত্র নিহ্নতাং তৎকৃতেঽনঘ॥
অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্র বিনির্ণয়ে।
দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশূনাং স্বর্গতির্ধ্রুবা॥

(৩৩।৩৪ শ্লোক তৃতীয় স্কন্ধ ২৩ অধ্যায়)

দেবীর সম্মুখে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বর্গে গমন করে। হে অনঘ! তাহাতে হননকারীদের পশুহিংসা জনিত পাপ হয় না। যজ্ঞীয় হিংসা অহিংসা; ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। দেবতা উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পশুর স্বর্গলোকপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

(তন্ত্রমত)। —বৃহন্নীলতন্ত্রের ষষ্ঠপটলে কথিত আছে,—

ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনাদেব্যা হিংসাংসর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
বলিদানার্থ যা হিংসা ন দোষায় প্রকীর্ত্তিতা।

বেদসম্মতসিদ্ধান্তঃ স মমাপিচ সম্মতঃ।
পশুযাগে মহেশানি! পশুং হন্যান্ন সংশয়ঃ।
সা হিংসা নিন্দিতা বেদৈ র্যাচ বৈধেতরা ভবেৎ॥
বৈধহিংসাচ কর্ত্তব্যা সংশয়ো নাস্তিকশ্চন।

ভূতহিংসা বিশেষতঃ পশুহিংসা কর্ত্তব্য নহে। দেবীপূজায় বলিদান ব্যতীত সর্ব্বত্রই হিংসা বর্জ্জন করিবে।

বলিদানের নিমিত্ত যে হিংসা তাহা দোষের নহে। ইহা বেদ সম্মত সিদ্ধান্ত এবং আমারও (মহেশ্বরেরও) তাহাই মত। হে মহেশানি! পশুযাগে পশু হনন করিবে, তাহাতে সংশয় নাই; বেদে যে হিংসার নিন্দা আছে, তাহা অবৈধ হিংসা বিষয়ে। বৈধহিংসা কর্ত্তব্য ইহাতে কোনও সংশয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

নব মল্লিকা

(গল্প)

১

উড়িষ্যার রাজা মহামহিমান্বিত কেরলবিজয়ী গঙ্গেশ্বর চতুর্ভুজ আজ সভা করিয়া বসিয়াছেন। স্ফটিকশিলানির্ম্মিত স্বচ্ছগৃহতলে ছাদের কারুকার্য্যসমূহের অবিকল প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। স্তম্ভের পর স্তম্ভের সারি চলিয়া গিয়াছে। সভাস্থ জনতারণ্যের মধ্যে তাহারা যেন বিশাল দৈত্যপ্রহরী। স্তম্ভগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মুখগুলিও যেন সম্পূর্ণ অবিচল থাকিয়া আপনাদের প্রহরীজনোচিত গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিতেছিল। সভার চারিপার্শ্বে বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রসমূহের ঝালর ঝুলিতেছিল। তাহা হইতে এক মৃদু সুবাস বাহির হইয়া সকলকে আমোদিত করিতেছে। সিংহাসনের উপরিভাগে এক বহুমূল্য চন্দ্রাতপ টাঙ্গান রহিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে স্ফটিক ও ধাতুগোলক সমূহ বিলম্বিত, চারিধারে মূর্ত্তিমতী রাজ্যশ্রীর পূর্ণ বিকাশ। সেই সভার সিংহাসনের উপর গম্ভীরভাবে বসিয়া মহিমান্বিত কেরলবিজয়ী চেদিবংশগর্ব্ব খর্ব্বকারী রাজা গঙ্গেশ্বর চতুর্ভুজ।

কয়েকদিন হইল রাজসভায় একজন নূতন সভাকবি নিযুক্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধরাজার অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজার যৌবরাজ্যকালে যিনি সভাকবি ছিলেন, তিনি বড় পণ্ডিত-কবি ছিলেন। তিনি প্রায় রূপকে মনুষ্য ও প্রকৃতির সংযোগ ব্যঞ্জক কবিতা লিখিতেন। বুড়ারাজা তাহা

বড় পছন্দ করিতেন। কিন্তু বাহিরে দশজনার তাহা একেবারেই ভাল লাগিত না। তাহারা দুটা ভালবাসাবাসি, দুটা অশ্রু ও দুটা অভিমান ও দুটা মানভঞ্জনের কথা শুনিতে চাহিত। আত্মা ও প্রকৃতির রূপকে তাহাদিগের মন উঠিত না। বৃদ্ধ-কবি তাহাদিগকে তাহার বেশী আদিরস যোগাইতে পারিতেন না। হাজার হ'ক বুড়াবয়সে একটু আধটু মন বদলাইয়াই থাকে। তরুণ-কবি যখন পাকিয়া ঝুনা হইয়া যানি, তখন ভিতরের রস শুকাইয়া বাহিরে অঙ্কুর গজাইতে থাকে। কিন্তু সুখের কথা বুড়া-কবি বৃদ্ধরাজার পর বেশীদিন টেঁকিলেন না। লোকে বলিত তিনি রাজার অনুগমন করিয়াছেন। হিংসুক লোকে বলিত তিনি স্বর্গে গিয়াও রাজাকে আত্মাও প্রকৃতির রূপক শুনাইবেন, ছাড়িবেন না। আর ত কেহ তাঁহার কবিতা শুনিত না, রাজা শুনিতেন।

সুতরাং এইকালে মহামহিমান্বিত রাজা গঙ্গেশ্বর চতুর্ভুজ যখন কেরল বিজয়ান্তে ফিরিতে ছিলেন, তখন পথে একদিন সন্ধ্যাকালে একজন অতি বিনীত অথচ প্রিয়দর্শন যুবক তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হয়, এবং একটী অতি সুন্দর শ্লোকপাঠ করিয়া তাঁহাকে বন হইতে আহৃত নবমল্লিকার একগাছি মালা উপহার দেয়। রাজা তাহার কবিত্বে এতদূর প্রীত হন যে, সেইখানেই তাহাকে সভাকবির পদে নিযুক্ত করেন। সেইখান হইতে পরদিন কবি চলিয়া যান, এবং রাজার সহিত রাজধানীতে মিলিত হইবেন প্রতিশ্রুত হয়েন। কয়েকদিন হইল তিনি রাজধানীতে আসিয়াছেন, এবং আজ তাঁহার প্রথম কবিতাপাঠের দিন। রাজা তাঁহার নবমল্লিকার মালা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নবমল্লিকা সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। আজ তিনি তাহাই পড়িবেন।

রাজা চতুর্ভুজ সভা করিয়া বসিয়াছেন। সমস্ত সভা লোকে লোকারণ্য, লোক ধরে না। বাতায়ন-জালিকা-অন্তরালে উৎসুক পুরনারীগণের মৃদু কঙ্কণঝঙ্কারে যেন সে কোলাহলময় সভাস্থলও শান্ত সুখাবাস বলিয়া মনে হইতেছে। পরম সুন্দর শত শত কৃষ্ণনীলচক্ষু বাতায়ন-জালিকার অন্তরাল হইতে অসংযত পুরুষদিগের এই ত্রস্ত ব্যবহারের উপর স্নিগ্ধ শান্তির করুণা-লেপন করিতেছিল। সকলেই কবিকে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এমন সময় ধীরে ধীরে চন্দনচর্চ্চিত ললাটে কি এক বিমল শান্তি বহন করিয়া সেই কোলাহল-ক্ষুব্ধ সভায় কবি আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণেকের জন্য সব স্তব্ধ হইয়া গেল। সমস্ত আগ্রহ যেন তাঁহাকে ঘেরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার অঙ্গে মিলাইয়া গেল। কবির আকৃতি অতীব কমনীয়। ইতিমধ্যেই সহরের অনেক অভিসারিণী তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। কিন্তু কবির চিত্ত শিশুর ন্যায় নির্ম্মল। তিনি আপনার পুণ্যতেজে আপনি উদ্ভাসিত, গৌরবান্বিত। কবির গলায় একগাছি অনতিদীর্ঘ ক্ষীণ মালতীমালা। কবির দক্ষিণহস্তে তাঁহার স্বরচিত শ্লোকের পুঁথি—ঈষদুত্থিতহস্তে তাহা রাজার দিকেই অবনত। রাজাও তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, এবং পরম সমাদরে এই আপনারই ন্যায় তরুণ কবিটিকে হৃদয়ে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কিন্তু রাজমর্য্যাদা আসিয়া বাধা দিল। কবি

তাঁহার সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট হইলেন। তখন একবার চারিদিকের স্তব্ধ জনতার মাঝে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া এবং বাতায়ন-জালান্তর্ব্বর্ত্তিনী কামিনীদিগকে উদ্দেশে অভিবাদন করিয়া কবি ধীরে ধীরে পুঁথি খুলিয়া অতি পরিষ্কার স্বরে আপনার কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কবি লিখিয়াছেন,—

"হে নবমল্লিকে! তুমি চিরদিনের তরে আমার হৃদয়ারাধ্যা। কারণ তুমি আমাকে মানুষ চিনাইয়াছ। মানুষের মত বহুমূল্য কি আছে? পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্নে একটী গত জীবন কিনিতে পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে সেইরূপ একটী অমূল্য জীবনের সহিত পরিচিত করাইয়াছ।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন।

কবি ধীরে ধীরে শান্ত অথচ উদাত্ত গম্ভীর স্বরে আপনার কবিতা পড়িয়া গেলেন। সভাস্থ সকল লোকে (মন্ত্র মুগ্ধবৎ,) 'চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ' অথবা চিত্রপটের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া তাহা শুনিয়া গেল। কবি যখন সেই মনোহারিণী কবিতার শেষ শ্লোকে পৌঁছিয়া কবিতার লয়ের সহিত আপনার গলার স্বর অতিশয় ক্ষীণ করিয়া আবৃত্তির সমাপ্তি করিলেন, তখন সেই কবিত্ব মুগ্ধ সভার লোকদের মনে এক অতুল অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতির অনন্ত বিশালতা থাকিয়া থাকিয়া ঢেউ দিয়া যাইতেছিল। তাঁহার কবিতা প্রকৃতির এমনই সুন্দর বর্ণনায় ভরা। এইরূপে কিছুক্ষণ গেল।

রাজা তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে কবির দক্ষিণ স্কন্ধে হাত রাখিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে টানিয়া বুকের মধ্যে লইলেন। ভাবগম্ভীর সেই মিলনে সভাস্থ লোক বিস্ময়ে ও হর্ষে আপ্লুত হইয়া উঠিল। সেই হীরক-মণি-মুক্তারাজি মণ্ডিত উষ্ণীষধারী তরুণ রাজার বুকে এই চন্দন-শুভ্র উত্তরীয় ও ফেন-শুভ্র পট্টবস্ত্রে শোভমান তরুণ কবির মুখশ্রী যেন স্বর্গের ছবি জাগাইয়া তুলিল। যুবকেই যুবককে চিনিতে পারে।

কতক্ষণে স্থির হইয়া রাজা ডাকিলেন "শ্রীরাজ!" কবি কহিলেন "মহারাজ,!" "আমি তোমাকে আজ কি বিদায় দিব! তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।" শ্রীরাজ করযোড়ে জানাইলেন, তাঁহার কিছুরই প্রার্থনা নাই। তাঁহার ন্যায় গুণগ্রাহী রাজার আশ্রয় পাইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। রাজা কহিলেন, "তা হইবে না শ্রীরাজ!" লোকে তা বুঝিবে না। তারা আমার বিদায় দেখিয়া তোমার কবিত্বের মাপ করিবে। আমি কবিতার বিচার করিব তোমার বন্ধুরূপে। কিন্তু রাজরূপে প্রজাদিগের সমক্ষে আমাকে তোমার গুণের পুরস্কার দিতে হইবে। শ্রীরাজ! প্রার্থনা কর।"

শ্রীরাজ শুনিলেন রাজা তাঁহার বন্ধুরূপে তাঁহার কবিতার বিচার করিবেন। তাঁহার মনে সাহস হইল। স্মিতমুখে করপুটে কহিলেন "মহারাজ আমার প্রার্থনা আছে। আমি আপনার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিন আপনাকে একগাছি নবমল্লিকার মালা দিয়া বরণ করিয়াছিলাম। যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন তবে আজি আপনিও আমাকে সেই নবমল্লিকার মালাগাছি প্রত্যুপহাররূপে দান করুন"।

তৎক্ষণাৎ রাজার অভিমতে একজন সভাসদ্ বহুমূল্য, নানা কারুকার্য্য খচিত, অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত বিরচিত, একগাছি নবমল্লিকার মালা আনিয়া রাজার হস্তে দিল। রাজা তখন উঠিয়া আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে সেই কোমল চিকণ মালাগাছি লজ্জাবনত কবির কণ্ঠদেশে অর্পণ করিয়া কহিলেন, 'সখে!' আজি রাজ্যের সম্মুখে আমাদের হৃদয় বিনিময় হইল। যেন মনে থাকে আমরা মালাবদল করিলাম।" সভার সকলের মুখে একটু শুভ্র সরল হাঁস উঠিয়া মিলাইয়া গেল। কেবল হাঁসিলনা চক্রপত্তি-সেনানায়ক।

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

(২)

রাজকন্যার নাম নবমল্লিকা। সে খুব বালিকা নয়। অথচ এখনও নিজে যৌবন অনুভব করে নাই। তাই এখন সে পরের চোখে সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যময়ী। সেই কুসুম সুকুমার ললিত ভঙ্গীতে বোধ হয় যেন বিশ্বের নিয়মচক্রও সে শাসন করিতে পারে। যেন তাহার পায়ে পাছে ব্যথা লাগে বলিয়া সে যেখানে চলে সেখানকার মাটিও সরমে সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

সেই দিন শ্রীরাজের কবিতা পাঠের সময় অন্যান্য শত শত পুরনারীগণের মত নবমল্লিকাও বাতায়ন পথে আসিয়া অনিমেষনয়নে নিম্নে সভার জনক্ষোভ লক্ষ্য করিতেছিল। বয়স্থা সুন্দরী সকলেই একটু আধটু কবিতা-রসজ্ঞা ছিলেন। অনেকেই কালিদাসের দু'একটা শ্লোক মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন। তায় আবার তরুণ কবির শ্লোক। বৃদ্ধ কবির আমলে বাতায়ন-জালিকার দিক্ কেহ মাড়াইতেন না।

কিন্তু নবীনা নবমল্লিকা অত শত কিছুই বুঝিত না। সেও কবিতা পড়িয়াছিল। কিন্তু কবিতার জিনিষ যে বাহিরেও অনেক সময়ে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে তাহার আদৌ জ্ঞান ছিল না। বইএর পাতার বাহিরে কবিতার কল্পনা তাহার কাছে অসম্ভব ঠেকিত। তাই সে হাঁসিত, খেলিত, ঘুরিয়া বেড়াইত। মৃগশিশুগুলিকে দর্ভাঙ্কুর দিয়া হৃষ্টপুষ্ট করিত। পালিত হংস-গুলিকে কোলে করিয়া অন্তঃপুর সরোবরের ঘাটে বসিয়া থাকিত। তাই যখন চারিধারের প্রবীণা সুন্দরীগণ সেদিন তাহাকে লইয়া কত নীরব ইসারা সঙ্কেত করিতেছিল, কবি কর্ত্তৃক নবমল্লিকার প্রতি উক্ত বিষয়ের সহিত আসল নবমল্লিকার মিল করাইয়া দিতেছিল, তখন সে বেশ অন্য মনে কবির উত্তরীয় শোভা একাগ্রমনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। ক্রমে যাইবার সময় হইল। কবির নবমল্লিকা-মালা প্রার্থনার কথা তাঁহার কাণে উঠিল। চমকিত সৌদামিনীর ন্যায় তাহার মনটা বারেকের জন্য কাঁপিয়া উঠিল।

এতক্ষণ সে তাঁহার উন্নতগভীর গৌরকান্তি দেখিয়া তাঁহাকে পুরুষশ্রেষ্ঠরূপে কল্পনা করিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে আপনার হৃদয়পটে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া লইতেছিল। এতক্ষণে তাহার মনে তাঁহার কথাগুলির স্থান হইল। সে আজ না জানিয়া পরের কাছে আপনা বিকাইল। কিন্তু অন্য কেহ তাহা বুঝিল না। তাহারা দু'দণ্ডের জন্য সেখানে বসিয়া

তাহাকে লইয়া অনেক ঠাট্টা-তামাসা করিল। আবার দু'দণ্ডবাদে গৃহকর্ম্মের মধ্যে সে সব ভুলিয়া গেল। কিন্তু রাজকন্যা নবমল্লিকা কবির নবমল্লিকাকে ভুলিতে পারিল না।

সে ভাবিতে লাগিল—"আমি কি সেই"—সে ভাবিতেছিল অথচ সে বুঝিতে পারিতেছিল না সে ভাবিতেছে—সে ভাবিতেছিল 'আমি যদি ঐ নবমল্লিকা হই তাহা হইলে আমি ধন্যা।' আবার ভাবিতেছিল কি ছলনা! আমি ও নবমল্লিকা হইতে গেলাম কেন? সে ত বনের ফুলকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছে। তখন সে ভাবিল, আমি যদি বনের ফুল হইতাম। তখন সে আস্তে আস্তে শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া গৃহতলে রাখিয়া দিল। তরঙ্গায়িতকেশরাশি এলাইয়া দিয়া, অঞ্চলাগ্র দন্তে ঈষৎ চাপিয়া ভাবিল 'আমার এই বনবাসিনী মূর্ত্তি যদি হইত!' আঃ কি ভাবিতেছি' বলিয়া ক্ষণেক শুইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও ভাবনার বিরাম হইল না। এমন শুভ মুহূর্ত্তে কার কবে ভাবনার' বিরাম হয়! অন্তহীন চিন্তায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

পলকে সব মিলাইয়া যায়। আজ একদিনে তাহার শৈশব কৈশোরের শেষ চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া গেল। তাহার আপনার মন তাহাকে নবীনা তরুণীরূপে জানাইয়া দিয়া গেল। সে আপনার দিকে চাহিয়া আপনি চমকিয়া উঠিল। রতিরূপিণী সে তাহার রূপে কাহাকে জিতিতে চায়? এক সামান্য কবিকে? সে সুপুরুষ বলিয়া! ছি! কত 'সু' হইবে! সে যে রাজকুমারী! কিন্তু আবার সেই 'নবমল্লিকার' শ্লোক মনে পড়িল। দূর ছাই! সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

এমনি করিয়া প্রথম দিন কাটিল। আগে যাহার বৎসর কাটিয়া গেলেও লক্ষ্য হইত না, আজ তাহার দিন কাটিল, ইহাও লক্ষ্য হইল। কিন্তু দিনও যেন আর কাটিতে চাহে না। কি যেন কি ভাবিয়া, কিছু বুঝিয়া, কিছু না বুঝিয়া তাহার প্রাণ সংশয় মগ্ন হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা যেন কেমন করে অথচ সে বুঝিতে পারে না। পল গেল, দণ্ড গেল, দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস যায়, কিন্তু সেই সভার একটী দিন আগেকার রাজকন্যা নবমল্লিকাকে ফিরিয়া পাওয়া গেল না। সে মরিল, তাহার স্থলে আর এক নবমল্লিকা আসিল। এ মল্লিকা পূর্ব্বের মল্লিকা নহে।

একমাস পরে নবমল্লিকা কৃশা, দীনা, শেষে শয্যাশায়িনী হইলেন। রাজপরিবার উৎকণ্ঠিত। রাজা চিন্তিত। দেশ-বিদেশ হইতে চিকিৎসক আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহই রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে সুবর্ণরেখার তীরে লোক পাঠাইয়া বিখ্যাত অবধূত সন্ন্যাসী বংশদণ্ডীকে আনান হইল। ভারতবর্ষে তখন তিনি দ্বিতীয় চরকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি রোগ সারাইবার ভারগ্রহণ করিলেন, এবং সকলকে আরোগ্যের আশ্বাস দিলেন। এমনিভাবে ছয়মাস কাটিয়া গেল।

ইতি মধ্যে রাজকন্যার বিষম ব্যাধি সংবাদে রাজসভা নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। কবি কদাচ দু'একটী শ্লোক পাঠ করেন। তাহাও রাজকুমারীর পীড়ায় কাতর হৃদয় কবির আর্ত্ততাব্যঞ্জক। লোকে তাহা শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না। একদিনের কোলাহল

ক্ষুদ্র আলোকমালা বিভূষিত গৃহটী দেখার পর কবি তাঁহার সেই গৃহটীর চারিদিকে কেমন একপ্রকার বিজন অন্ধকার নিস্তব্ধতা অনুভব করিয়া জ্বালাতন হইয়া উঠিতেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সেই 'নবমল্লিকাটি' বাহির করিতেন। মনে হইত যেন কবেকার কোন্ স্বপ্নে লেখা। আপনার লেখা বলিয়া বিশ্বাস হইত না।

(৩)

কবি জানিতেন না রাজকন্যার নাম নবমল্লিকা। কবি আপন বিমল প্রতিভায় আপনিই দিবারাত্র মগ্ন হইয়া থাকিতেন। নারীগণকে সুদূর স্বর্গের দেবপ্রতিমারূপে জ্ঞান করিতেন। তাই তিনি সেই দিনের পর দিনের কলহ, নিন্দা ও রসাভাসপূর্ণ নগরীর মধ্যে থাকিয়াও রাজকুমারীর নামটী কি জানিবার অবসর পান নাই। যাহা বাহিরের তুচ্ছ কল্পনাজল্পনাময় মানবচিত্তে অহরহঃ অতি অনাদৃতভাবে প্রসঙ্গের খাতিরে উচ্চারিত হইত, কবি একদিনও তাহা জানিয়া ধন্য হন নাই। কবি হৃদয়ে বসাইয়া তাহাকে তাহার উপযুক্ত স্বর্গে তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই।

কবির ঘরে বড় কেহ ছিল না। তাঁহার এক প্রৌঢ়া দাসী ছিল, সে তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিল। সেই তাঁহার সকল কাজকর্ম্ম করিত। সে বড় বেশী কথা কহিত না। কিন্তু প্রয়োজনার্থে সহরে বাহির হইলে অনেক সুন্দরী অভিসারিকা তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া জ্বালাতন করিত। কবির নামটী কি? সে সংক্ষেপে বলিত "শ্রীরাজাচার্য্য"। কবি কোথায় থাকিতেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন? ইহার কোন সদুত্তর সে দিত না, এবং কখন কখন কথার মাঝখানে বাটী ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিত। কিন্তু তাহার উপর কেহ রাগ করিত না, বরং পরের বার অধিক আদর-অভ্যর্থনা করিত।

কবি ক্রমে শুনিলেন, রাজকুমারীর রোগ ক্রমেই দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ম্লানমুখ করিয়া যখন পরেরদিন সভায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন—সকলের মুখেই শোক ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন অঙ্কিত। তিনি সেই সভার মধ্যে আপনার শ্লোকপাঠ বর্দ্ধিত একদিনের আনন্দ-কোলাহল স্মরণ করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর হইতেই রাজকুমারীর রোগ প্রকাশ পাইয়াছে। সেই দিনের পর হইতেই আর তাঁহার সেই আনন্দোচ্ছলিত-বাণী কাহারও মুখে উচ্চারিত হয় নাই। সেইজন্য যেন কবি একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ধীরে ধীরে সিংহাসনের পাশে আসিয়া অবনত মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দুঃখভারকাতর রাজার চিত্ত হইতে সেই বন্ধুসন্নিধানে যেন একটা প্রকাণ্ড পাথর উঠাইয়া লইল। উচ্ছলিত অশ্রুবেগ থামাইয়া এক গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত রাজা ডাকিলেন—কবিরাজ! শ্রীরাজ কহিলেন—"আজ্ঞা করুন"।

রাজা বলিলেন—নবমল্লিকাত' বাঁচে না, তাহার কি রোগ কেহ বুঝিতে পারিল না। ভারতের দ্বিতীয় চরকস্বরূপ বৃদ্ধদত্ত আজ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। আমি কি করিব বলিতে পার?

গীতায় বেদের অনাদর ?।

৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গীতার প্রচার ভক্তসমাজে ও পণ্ডিত মণ্ডলীতেই ছিল,—স্কুলের ছাত্র হইতে অনাচারী স্থবির পর্য্যন্ত, অন্তঃপুর হইতে ব্যসনাগার পর্য্যন্ত গীতার অবাধগতি তখন ছিল না। এই যে গীতার প্রচার বা প্রসার বৃদ্ধি, ইহার মূলে গীতার বিকৃত ব্যাখ্যা আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান "বৈদিক ধর্ম্ম ও গীতোক্ত ধর্ম্ম এক নহে, বৈদিক ধর্ম্ম অসার অনুদার আড়ম্বর পূর্ণ—এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-বিড়ম্বিত, গীতোক্ত ধর্ম্ম সারগর্ভ, উদার, সুখসেব্য ও সাম্যতন্ত্র। গীতায় বর্ণভেদ গুণগত, গীতায় বেদের ধর্ম্ম অনাদৃত—গীতায় নব ধর্ম্ম উপদিষ্ট";—কতিপয় পাদ্রিসাহেবের মতের প্রতিবাদ ও অনুবাদের জন্য যে কয়জন 'শিক্ষিত' ব্যক্তি গীতার চর্চ্চা আরম্ভ করেন, তাঁহারা উপরি লিখিত মতের পোষক। সেই মত যখন ছড়াইতে লাগিল, তখন গীতার প্রসার বাড়িতে লাগিল।

আজ 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' যদি অনাচারের প্রবর্ত্তক হয়—তাহা হইলে ইহার গ্রাহক সংখ্যা যে, অত্যধিক হইবে, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

যাহা ধর্ম্মকার্য্য, তাহাতে কালপ্রভাব-সঞ্জাত অধর্ম্মের সংযোজন না করিলে একালে তেমন আদর হয় না, নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচার সংঘটিত হওয়াতেই এ সময়ে এক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সম্প্রদায়ের প্রধান ও সৎপুরুষগণ যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষায় মনোযোগী হইয়া সেই ব্রত পালন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সর্ব্বাংশে ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষক হইতেন, কিন্তু কলিরাজ তাহাতে প্রতিবাদী। তাঁহাদের সে বিষয়ে মতি নাই। মতি থাকিলে হয় ত প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইত না। আর কথা বাড়াইব না,—প্রকৃত এই যে নবধর্ম্মের লোভে গীতার প্রসার বৃদ্ধি, তৎপরে গতানুগতিকতায় তাহার আধিক্য। গীতায় যে বিকৃত ব্যাখ্যা চলিতেছে, তাহার ইঙ্গিত এই ব্রাহ্মণ-সমাজে "হিন্দু-জাতিতত্ত্ব" প্রবন্ধে পূর্ব্বে করিয়াছি।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—

এই গীতামন্ত্রের ব্যাখ্যা সেই স্থানেই বিশদভাবে করিয়া দেখাইয়াছি,—বর্ণসৃষ্টি ভগবৎকৃত, সদ্‌গুণসম্পন্ন শূদ্রও এজন্মেই ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এমন ভাব ঐ মন্ত্রের বা বচনের নহে। অতএব তৎসম্বন্ধে পুনরুক্তি এস্থানে আর করিব না। তবে "গীতায় বেদের অনাদর আছে, বেদোক্ত ধর্ম্ম উপেক্ষিত হইয়াছে"—এই মতের আপাততঃ পোষক যে কতিপয় মন্ত্র আছে, যাহার বিকৃতব্যাখ্যাফলে পূর্ব্বকথিত ভাবের আবির্ভাব, সেই মন্ত্রগুলির আলোচনা করিতেছি।

গীতায় ২য় অধ্যায়স্থ দুইটী মন্ত্র, এবং নবমাধ্যায়ের একটী মন্ত্র বিকৃত ভাববর্ণনার বিশেষ অনুকূল;—প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে, যথা—

(১) ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য-সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

২ অঃ ৪৫

(২) যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।
২ অঃ ৪৬।

(৩) এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না —
গতাগতিং কামকামা লভন্তে। ৯ অঃ ২১।

(১) চিহ্নিত মন্ত্রের—প্রাচীন ব্যাখ্যা এই —

ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ, ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব ইত্যাদি। [স্বামী]

অর্থাৎ বেদসকল ত্রিগুণাত্মক সকাম অধিকারীর জন্য, তাহাদের কর্ম্মফলসম্বন্ধই বেদ-প্রতিপাদ্য, পরন্তু তুমি ত্রিগুণাতীত, নিষ্কাম হও। অথবা কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদক বেদভাগ ত্রিগুণাত্মক সকাম অধিকারীর জন্য, তুমি ত্রিগুণাতীত হও।.....

এই দুই অনুবাদের পার্থক্য এই যে, প্রথম অনুবাদে সকল বেদই "ত্রৈগুণ্যবিষয়" দ্বিতীয় অনুবাদে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ত্রৈগুণ্যবিষয়। যাহাই হউক, মূলে 'বেদাঃ' আছে—কর্ম্মকাণ্ডের কোন কথা নাই, অতএব সমস্ত বেদের পক্ষেই মূলে অনাদর সূচিত ইহাই নব্য মত।

ইহাই কি সত্য ? আমি বলি তাহা নহে ; কারণ, ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ—

ত্রৈগুণ্যং ত্রয়োগুণাঃ [স্বার্থেষণ্ (ষ্যঞ্] ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াদিতিবৎ) বিষয়াঃ গ্রাহ্যাঃ বিষয়িভিন্না যেষু সপ্তম্যর্থো বৃত্তিত্বং তচ্চ প্রতিপাদ্যত্বপর্যবসিতং দ্বয়ং কিল বেদস্থং বিষয়ো বিষয়ী চ, উক্তং হি অশ্বমেধপর্ব্বণঃ পঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে "বিষয়ী পুরুষো নিত্যং সত্ত্বঞ্চ বিষয়ঃ স্মৃতঃ" ইতি সত্ত্বস্য চেতনপ্রতিবিম্বগ্রাহিত্বেঽপি গুণান্তরবৎ তস্যাপি বিষয়ত্বমিতিচ তদর্থঃ। অতএব ত্রিগুণমবিবেকি-বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথাচ পুমানিতি সাংখ্যাচার্য্যাঃ॥

'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্ব্বিষয়বিষয়িণোরিতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যাঃ॥

ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ত্রৈগুণ্যান্নিষ্ক্রান্তো ভব॥ প্রকৃত্যাদি-স্থূলদেহান্তে ত্রৈগুণ্যে অহমিত্যভিমানী তদাত্মক-সুখদুঃখাভ্যাং বধ্যতে, তদভিমানহানং তন্নিষ্ক্রান্তিঃ॥ তদুপায়ো নিত্যসত্ত্বস্থ ইত্যাদিনা তৎফলঞ্চ নির্দ্বন্দ্ব ইতি দর্শিতম্।

অর্থাৎ জগতে দুই প্রকার বস্তু—বিষয় ও বিষয়ী।. (জড়পদার্থ বিষয়, চেতন বিষয়ী) বেদে দুই বস্তুরই উপদেশ আছে, তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্যই বিষয়, (এই বিষয়ে যে তাদাত্ম্যাভিমান, ইহাই বন্ধের কারণ) হে অর্জ্জুন! তুমি কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য হও, তাদাত্ম্যাভিমানহেতু যে ত্রৈগুণ্যরূপী হইয়া আছ তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, তুমি বিষয়ী, বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—(এই বিষয়ে প্রমাণ—মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ৫০ম অঃ ৮ শ্লোকে—সাংখ্যকারিকা ১২শ কারিকায় এবং শারীরকভাষ্য প্রথমভূমিকা হইতে মূলে উদ্ধৃত হইল) তুমি নিত্য সত্ত্বস্থ ইত্যাদি হইলেই নিস্ত্রৈগুণ্য ও নির্দ্বন্দ্ব হইবে।"

এইরূপ ব্যাখ্যা না হইলে,—মূলের উক্তি মিথ্যা ও বিরুদ্ধ হয়, কারণ,—বেদে যে কেবল ত্রৈগুণ্যই প্রতিপাদিত এমন নহে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডেও—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" "মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ" "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" ইত্যাদি বহু মন্ত্রে নিস্ত্রৈগুণ্য আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন, জ্ঞানকাণ্ডে ত নিস্ত্রৈগুণ্য বিশেষতঃ প্রতিপাদিত, এ অবস্থায়—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" কথাটা মূলের অলীক বেদনিন্দা হয় বলিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। আবার দেখ মূলেই বলিয়াছেন—

"যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি।" (৮ম অঃ ১১]

"বেদবেত্তৃগণ যে অক্ষর ব্রহ্ম কীর্ত্তন করেন" অর্থাৎ কিনা "ব্রহ্মতত্ত্ব বেদগম্য," এই অংশ এবং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" চলিত অর্থ ধরিলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয় কিনা সুধীগণ বিচার করুন। অতএব যে অর্থ মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্বের এবং অন্যান্য শাস্ত্রের অনুমোদিত, সেই অর্থই উপরে শেষাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কোন দোষই নাই।

[২] মন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যা এই—

উদপানং বাপীকূপতড়াগাদি তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নস্যার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকুশলব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব।

অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সকল স্নানপানাদি কার্য্য, নানা স্থানে গিয়া সম্পাদন করিতে হয়, মহাহ্রদে তৎ সমস্তই একত্র হইয়া থাকে, তদ্রূপ সকল বেদে যে বিবিধ কর্ম্মফল, এক ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীর তৎসমস্তই হইয়া থাকে।

বঙ্কিমবাবু এই ব্যাখ্যায় সবিনয়ে দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই,—এইরূপ ব্যাখ্যায় প্রথম শ্লোকার্দ্ধে একবার 'তাবান্' উহ্য করিতে হয়, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর একবার 'যাবান্' উহ্য করিতে হয়। অতএব ভাষার সরল নিয়মে ইহার অর্থান্তর হইয়া থাকে তাহা এই—

জলপ্লাবন হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ের যত প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সমগ্র বেদেরও ততই প্রয়োজন। অর্থাৎ জলপ্লাবন সময়ে ক্ষুদ্র জলাশয় নিরর্থক, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বেদও নিরর্থক।

মূলের স্বারসিক অর্থ এইরূপ হইলেও প্রাচীনগণ বেদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বক্র পথে অর্থ করিয়াছেন, ইহাও বঙ্কিমবাবুর মত। বেদ যে মূল গীতায় তত আদৃত নহে ইহাই সমুদিত তাৎপর্য্য।

বঙ্কিমবাবুর অর্থও গীতানির্দ্দিষ্ট ভাষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে হইলে ভাষাগত পদ-পদার্থে যেমন দৃষ্টি রাখিতে হয়, রচনাপদ্ধতির দিকেও সেইরূপ বা তদধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। গম্ভীর উপদেশপূর্ণ গীতায় 'বৈয়র্থ্য' বুঝাইবার জন্য বেদের প্রতি বালকোচিত উপহাস প্রদর্শনের ভাষায় 'অর্থঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইত না। তাহা হইলে—

"যথা ব্যর্থমুদপানং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
সর্ব্বে বেদাস্তথা ব্যর্থা ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

এইরূপ প্রয়োগ থাকিত।

'যাবান্' 'তাবান্' ইহাও থাকিত না, 'সঃ' 'সঃ' অথবা 'যথা' 'তথা' থাকিত, 'যাবান্' 'তাবান্' থাকিলে, গাম্ভীর্য্যরীতি বিরুদ্ধ উপহাসের মাত্রা কতখানি যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা বিচারকের অনুচিন্তনীয়। যে গীতায় বেদ,—নানাস্থানে আদৃত, বেদবিধি অবলম্বনের উপদেশ যে গীতার মূল মন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান বেদের উপদেশ সাপেক্ষ বলিয়া গীতায় যে উক্তিবিশেষে সম্যক্ সূচিত, সেই গীতায় বেদের প্রতি উপহাসের ভাষা প্রয়োগ কদাচ সম্ভাব্য নহে, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। তাহার পর আর এক কথা, এ ব্যাখ্যায় উপমান উপমেয় বিষয়ে বৈষম্য হইতেছে, কেন না, জলপ্লাবন উদপানসাপেক্ষ নহে, প্লাবনের হেতু নদীনদবৃদ্ধি, নদী নদ—উদপান নহে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বেদসাপেক্ষ, কার্য্যদ্বারা কারণের সার্থকতা হয়, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই বেদ সার্থক। পক্ষান্তরে উদপানের সার্থকতা জলপ্লাবনে হয় না। অতএব জলপ্লাবনে উদপানের নিরর্থকতা যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে বেদের নিরর্থকতা নিশ্চয়ই সেরূপ নহে। অতএব ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই—

উদপানে পানমাত্রপ্রয়োজনসাধনে শুষ্কপ্রায়জলাশয়ে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ সংপ্লুতমুদকং যস্মিন্ তস্মিন্ সতি অর্থঃ প্রয়োজনং যাবান্ যৎপরিমাণো ভবতি অধিকপ্রয়োজন-সিদ্ধির্ভবত্যবগাহনজলসেচনাদিকং সম্পদ্যতে, বিজানতস্তত্ত্বজ্ঞানবতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু অর্থঃ তাবান্ তৎপরিমাণো ভবতি অধিকফলসিদ্ধির্ভবতি। যথা উদকাসংপ্লবদশায়ামুদপানং পানমাত্রং সাধয়তি, তথা তত্ত্বজ্ঞানাভাবে সর্ব্বেবেদাঃ স্বর্গমাত্রানন্দং সম্পাদয়তি। যথা চ উদকসংপ্লবদশায়াং তদেবোদপানমবগাহনাদিসাধকং তথা তত্ত্বজ্ঞানবতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বে বেদাঃ স্বর্গাদিসর্ব্বানন্দস্থানং মোক্ষাখ্যমহানন্দং সাধয়ন্তীতি ভাবঃ।

অর্থাৎ যে জলাশয়ে কেবলমাত্র পান করিবার জল আছে তাহা জলপ্লাবনে পূর্ণ হইলে যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন অবগাহন জলসেচন ইত্যাদি সিদ্ধ করে। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত বেদই অধিক ফল—স্বর্গাপেক্ষা পরমানন্দ মোক্ষেরও সাধক হইয়া থাকে।

জলপ্লাবনের পূর্ব্বে উদপানে কেবল পানকার্য্য চলিত, ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে বেদদ্বারা কেবল স্বর্গফলই হইত, প্লাবনের পর সেই উদপানে অবগাহন জলসেচন চলিতে থাকে—তত্ত্বজ্ঞানের পর সেই বেদ স্বর্গাপেক্ষা বহুশতগুণ আনন্দ মোক্ষ প্রদানের হেতু হইয়া থাকেন।

এইরূপ অর্থ হইলে গীতার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

[৩] মন্ত্রে ত্রয়ীধর্ম্মসাধনে সংসারে যাতায়াত হয়। এইটুকু মাত্রই বুঝিয়া কেহ কেহ এস্থানেও বেদের প্রতি অনাদর দেখেন। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞগণ এস্থানে বেদের প্রতি আদরই দেখিয়া থাকেন।

ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনু প্রপন্নাঃ প্রপত্তৌ ক্রিয়ায়াং অনুশব্দার্থস্য হীনত্বস্যাম্বয়ঃ তত্র হেতুঃ কামকামাঃ অতএব গতাগতং লভন্তে।

অর্থাৎ যাহারা কামকামী তাহারা ত্রয়ীধর্ম্মকে নিন্দিতভাবে আশ্রয় করে, তাহার ফলে সংসারে গতায়াত করিয়া থাকে।

মর্ম্মার্থ এই যে, এমন যে উৎকৃষ্ট ত্রয়ীধর্ম্ম তাহার সকামভাবে অনুষ্ঠান নিন্দিত। সেই নিন্দিত অনুষ্ঠানের ফলে সংসারে গমনাগমন ক্লেশ। অতএব নিষ্কাম হওয়া একান্ত আবশ্যক অতএব গীতার এই প্রসিদ্ধ (৩) স্থানেই বেদের প্রতি স্বল্প অনাদরও প্রদর্শিত হয় নাই বরং বিশিষ্ট আদরই প্রদর্শিত হইয়াছে।

যামিমাং ইত্যাদি ২।৪২—৪৪ মন্ত্রের কথা ও অন্যান্য মন্ত্রের কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রবন্ধকারগণের প্রমাদ।

১। বিগত আষাঢ় মাসের "ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকার লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় "ব্রাহ্মণ-সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে ৪১৭ পৃষ্ঠায় ১—৪ পংক্তিতে বিদেশপ্রত্যাগত ম্লেচ্ছাচারিগণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে গ্রহণবিষয়ে যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। পাঠকগণ যেন মনে না করেন যে, ঐরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত মন্তব্যের সহিত ব্রাহ্মণ-সভার বা এই পত্রিকার অথবা ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের কোনওরূপ সহানুভূতি বা সাপক্ষ্য আছে। উহা লেখকের সম্পূর্ণ উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত মাত্র। ঐ প্রবন্ধটী ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত বলিয়া গৃহীত, সুতরাং উহা যে মহাসম্মিলনমণ্ডপে আমূল পঠিত হয় নাই,— ইহাই বুঝিতে হইবে। ঐ স্থানে পঠিত হইলে পঠিত বলিয়া গৃহীত এরূপ লিখিত হইত না। ব্রাহ্মণসভা ও মহাসম্মেলন বরাবর বিদেশপ্রত্যাগত কদাচারীগণের সমাজে ব্যবহার্য্যতা বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক এখন হইতে লেখকগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত উদ্ভটমত এই পত্রিকাকে দ্বার করিয়া প্রচার করিতে বিরত হইলে আমরা সুখী হইব।

(২) দ্বিতীয় লেখক প শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যক্ষদর্শীরূপে বিগত ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ২।১ স্থানে বিষম গলদ ধরা পড়িয়াছে। "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের জ্যোতিষের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল"—লিখিয়াছেন,—তিনি কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষাৎ শ্রোতা নহেন। সুতরাং তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়কে বক্তৃতাস্থানে লিখিত পত্র হস্তে উত্থিত ও লিপিপাঠ করিতে দেখিয়াছ

তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীযুক্ত তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় পঞ্জিকাসংস্কার-সমিতির সম্পাদকরূপে ঐ সমিতি হইতে বিগত বর্ষে কি কি কার্য্য হইয়াছে তাহার পরিচয় দিয়া উপস্থিত সভ্যগণের সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তিনি জ্যোতিষের কোন প্রবন্ধ পাঠ করেন নাই। আর দ্বিতীয় বক্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ মহাশয় পঞ্জিকাসংস্কার প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনের সাহায্যকল্পে স্বয়ং ১০৲ দশটী টাকা দান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে ঐরূপ একটী দেশহিতকর কার্য্যে নিজ হইতে অর্থ দান করিয়া শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় যে সাধু আদর্শ দেখাইলেন তাহার উল্লেখ প্রত্যক্ষদর্শী লেখক করিলেন না। আমরা এই সকল প্রমাদের জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ভবিষ্যতে লেখকগণকে সাবধান হইতে অনুরোধ করি।

(বিবিধ প্রসঙ্গ)

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ব্রাহ্মণভক্তি :—বিগত বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে পাবনার সার্ব্বজনীন—হিতকরীসভার একটী অধিবেশন হয়। সভাতে একজন ভট্টাচার্য্যবংশধর স্বকীয় বিকৃত শিক্ষাপ্রসূত "উদার মতের" উন্মাদনায় ব্রাহ্মণদিগকে আক্রমণকরিয়া বলেন—এই সব অবনত জাতি একদিন ব্রাহ্মণদের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল,—আমাদের তুলিয়ালও,কিন্তু যেদিন ব্রাহ্মণেরা সে কথা শোনে নাই, আজ এমন দিন আসিয়াছে যে, ব্রাহ্মণদিগকেই তাহাদের পায়ে ধরিতে হইবে।" বক্তার এই কথা শুনিয়া কাশিমবাজারের মনস্বী মহারাজবাহাদুর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া বলিলেন -"আমি এ সভায় থাকিতে পারিলাম না, আমি ব্রাহ্মণের নিন্দা শুনিতে পারি না।" সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মহারাজবাহাদুরকে সভাতে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তেজস্বী বিপ্রভক্ত মহারাজ বলিলেন— "আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারা ব্রাহ্মণের নিন্দা শুনিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আমার গুরু, আমি সে নিন্দা শুনিতে পারি না।"—এই বলিয়া তিনি সভাস্থান ত্যাগ করিলেন। সভার উদ্যোগকারিগণ মহারাজের বিমুখতা দেখিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফলোদয় হয় নাই। চুচুঁড়ায় যেবার সাহিত্যসম্মেলন হয়, ঐ সভায় মহারাজবাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐ সভায় রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতীয় সাহিত্যের পরিচয় দিতে উঠিয়া প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে ভট্টপল্লীর স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর হৃষীকেশ শাস্ত্রি মহাশয় তৎপুত্র

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্‌-এ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ও তৎপুত্র পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গমন করেন। তখন সভাপতি মহারাজ বাহাদুরই উক্ত শরচ্চন্দ্র দাসকে বক্তৃতা করিতে নিবৃত্ত করেন। সুতরাং মহারাজ বাহাদুরের ব্রাহ্মণ ভক্তি চিরদিনই প্রথিত। ধন্য মহারাজ, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত সমাজের আদর্শরূপে ব্রাহ্মণভক্তি শিক্ষা দিউন। এই জন্যই বহরমপুরের ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনে আপনার আমন্ত্রণে আপনার প্রাসাদে গমন করতঃ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে উঠিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ, মহাশয় বলিয়াছিলেন—

> "বিপ্রাণাং ত্বং ভবসি পরমঃ সেবকঃ সুপ্রসিদ্ধো
> দৈবী ভাষা তব শুভকৃপাসেকসঞ্জীবিতেব।
> যুষ্মৎকীর্ত্তিপ্রচয় পয়সাং স্রোতসি স্নাতচিত্তাঃ
> গীত্বা গীত্বা তবগুণগণং নৈব শেষং ব্রজামঃ॥"

অদ্য দেখিতেছি সেই বাক্য শ্রীমান্ মহারাজের পক্ষে বর্ণে বর্ণে সত্য।

অসবর্ণবিবাহ সম্বন্ধে ভারতসচিবের মন্তব্য।—লণ্ডন হইতে বিগত ৭ই আগষ্টের সংবাদে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অসবর্ণবিবাহ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুমহোদয় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে ভারত সরকার প্যাটেল বিলের জন্য কোনওরূপ সমর্থন করেন নাই এবং এপ্রস্তাবে কোনওরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু এই প্রস্তাবটী নাকি ভারত গবর্ণমেণ্টের বে-সরকারী সভ্যগণের বিশেষরূপ সহায়তা লাভ করিয়াছে, এই জন্য ভারত-সরকার এই প্রস্তাবটী বিধিরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের সব সম্প্রদায়ের অভিমত গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতগবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে একটা মত স্থির করিবেন। যদি কখনও এই প্রস্তাবটী বিধিবদ্ধ বা নিষিদ্ধ হইবার জন্য কাউন্সিলে উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে এই প্রস্তাবটীকে বে-সরকারী বিলরূপেই গণ্য করা হইবে।

আমরা ভারতসচিবের মুখে এই কথা শুনিয়া—এবং ভারতসরকার যে হিন্দুসমাজের উক্ত উদ্বেগকর প্রস্তাবটীর সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইলাম।

দ্বারবঙ্গাধিপতি কর্ত্তৃক নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা। সম্প্রতি ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীল শ্রীমিথিলাধিপতি দুইটী মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আয়োজন করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে বিগত ২২শে শ্রাবণ মহাসমারোহে উৎসবাদিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। কেন না এই প্রবল কলির প্রকোপে কি ধনী কি নির্ধন, কাহারও ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে মতিগতি নাই। উক্ত দুইটী মন্দিরের মধ্যে একটী 'গঙ্গাসাগর' সরোবরের পশ্চিমতীরে মধুবাণীতে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে। এই স্থানে শত শত লোক প্রত্যহ স্নানার্থ সমাগত হইয়া থাকে। অপর মন্দিরটী ভওয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই শেষোক্ত স্থানে দ্বারবঙ্গাধিপগণের কুলদেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং এইস্থানে যে বর্ত্তমান মিথিলাধিপের পূর্ব্বপুরুষ-

গণের আবাস স্থান ছিল। তাহা সাধারণের বিদিত না*, সেই প্রাচীনসৌধশ্রেণীর কোনই নিদর্শন এক্ষণে বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের আবাস স্থানটীর বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া মিথিলাধিপতি যে প্রশংসার কার্য্য করিলেন, তাহা প্রত্যেক হিন্দুরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই স্থানের দুইটী জীর্ণ পুষ্করিণী—যাহার সহিত কত প্রাচীন গৌরবময় কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে—ঐগুলিরও পুনঃ সংস্কারের ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি-রক্ষা প্রসঙ্গে দেবালয় ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা যথার্থই প্রশংসা যোগ্য।

ধর্ম্ম ও তীর্থরক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ সভার নূতন উদ্যম।—কালের প্রভাবে আজকাল সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকার উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব জানিবার এবং উপাসনা করিবার একটি প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি মাত্রেই আপন রুচি অনুসারে তত্ত্বপিপাসু ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইতেছেন। এদিকে সময় বুঝিয়া শাস্ত্র ও সাধনভজনজ্ঞানহীন কপটাচারিগণ আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কেহ জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সাজিয়া, কেহ বা তিলক মালা বহির্ব্বাস পরিধানে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া, কেহ বা গৈরিক বসন পরিয়া তিনখণ্ড বংশদণ্ড হাতে লইয়া পরমহংস সাজিয়া সংসার-বৈরাগ্যের ভাণ করিয়া, কেহ বা জেলে, মালো, সোণারবেণে, কায়স্থাদি ব্রাহ্মণেতর জাতিকে উপবীত এবং দীক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণ করিয়া, কেহ বা জাতিভেদ বিচার না করিয়া সর্ব্ববর্ণ একত্র ভোজন করার বিধি দিয়া, কেহ বা পরব্যোমস্থ কোন অবতার, কেহ বা ভক্ত-অবতার, কেহ জগদ্‌গুরু এবং কেহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর অবতার সাজিয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার ভণ্ডতায় দেশস্থ শ্রদ্ধাবান্ লোকদিগকে বিপথগামী করিতেছে। আবার অন্তদিকে সময় বুঝিয়া অধিকাংশ তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণ ও শ্রীবিগ্রহ-মন্দিরের সেবাইতগণ, নানাবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বনে তীর্থ এবং বিগ্রহসেবা এক একটি ব্যবসার অঙ্গ করিয়া উঠাইয়াছে, ইহাদের উৎপীড়নে অনেক নিরীহ শ্রদ্ধাবান্ লোকসকলকে অনেক প্রকার লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে চারিদিক হইতে কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্তত্ত্ব-প্রচারিণী সভায় অনেকদিন হইতে নানাপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত হইতে থাকে। সেজন্ত এই সভার অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়ের আহ্বানে এই সভার সভ্যগণের মধ্যে অনেকে ১৩২৫ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে একটি তুমুল আন্দোলন করেন। পরে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়, এই সভার সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, এই তিন মহোদয় দেশস্থ অধ্যাপক-পণ্ডিত দ্বারা একটি ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করাইয়া অনেক প্রখ্যাত অধ্যাপক-পণ্ডিত এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের স্বাক্ষরিত অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করেন। এবং সমস্ত শাস্ত্রাচার্য্যগণই বিচার-করিয়া একমতে এই ব্যবস্থাপত্র সমর্থন করিতেছেন।

এক্ষণে সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন যে, ব্রাহ্মণসভা এই নূতন উত্তমে যোগদান

করিয়া বিশেষ আন্তরিকতার সহিতই এই কার্য্যের সাফল্যের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী-সভার সভ্যগণের অনুরোধে বিগত ৩২শে শ্রাবণে আহূত ব্রাহ্মণসভার কার্য্যকরী-সমিতির অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হয় যে, বৈধ-উপায়ে বর্ণাশ্রম-সমাজে অসদাচার নিবারণ ও সদাচার সংস্থাপন বিষয়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের যে উদ্দেশ্য আছে তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ লইয়া এই শাখা সমিতি Sub-Committee) গঠিত হউক। তাঁহারা বর্ণাশ্রমসমাজভুক্ত ব্রাহ্মণাতিরিক্ত হিতৈষিযোগ্য অন্যবর্ণভুক্ত ব্যক্তিবিশেষকেও এই কমিটীর হিতৈষিরূপে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার নিয়মাবলীর ৪৫ বিধানমতে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে সমাজ হইতে ক্রমে গুরুতর অসদাচার সমূহের নিবারণ চেষ্টা করিবেন, এবং ক্রমে যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র শাস্ত্রসম্মত আচার প্রবর্ত্তিত হয়, এবং ধর্ম্মের নামে সমাজে অধর্ম্মাচরণের প্রশ্রয় না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং তীর্থসমূহে যে সকল অসদাচারের প্রচলন রহিয়াছে তাহারও নিবারণের ব্যবস্থা করিবেন। সবকমিটীর সভ্যগণ যথা—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (সভাপতি), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ, (সম্পাদক), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন বি-এ, শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ লাহিড়ী, হিতৈষী সভ্যগণ—মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্রনন্দী, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী, স্যার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ দাস। ইহাও স্থির হয় যে, সবকমিটি আবশ্যকানুরূপ সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপত্রের মর্ম্ম।

১। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি বেদানুকূল শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অধিকারি-ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের সর্ব্বপ্রকার সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

২। কার্য্য সৌকার্য্যার্থে দেশ কাল ও পাত্র বিচার করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত স্মৃতিনিবন্ধ এবং শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব-স্মৃতিনিবন্ধ সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, উক্ত দ্বিবিধ নিবন্ধ, সমস্ত বাঙ্গালা দেশে বিশিষ্ট প্রমাণরূপে গণ্য। এই দুই স্মৃতিনিবন্ধের ও বৈদিক গৃহ্যসূত্রের বা কল্পসূত্রের বিধি অনুসারে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণেতর জাতি সাধনভজনে যতই উৎকর্ষলাভ করুক না কেন, উৎক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে অধিকারী নহে, সুতরাং কামাচারক্রমে ঐরূপ সংস্কার—গ্রহণ ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না।

৩। অনন্য-ভক্ত অর্থাৎ সাধনভজন প্রভাবে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধিনিষেধের অতীত হইলেও যতদিন

পর্য্যন্ত সংসারিদিগের সংস্রব রক্ষা করিবেন, উপদেশ দিতে থাকিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত আচাররক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন। (কেননা -"যদি যোগী সমর্থশ্চেৎ সমুদ্রলঙ্ঘন-ক্ষমঃ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥")

৪। যাহাদের বিষয় বাসনা দূর হয় নাই অর্থাৎ যাহারা গৃহাশ্রমে আছেন, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র সঙ্গত বর্ণাশ্রমের বিধি ও নিষেধ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা প্রতিপালন করিতে হইবে। কেবল তাহা নয়, দেশাচার, কুলাচার এবং সমাজের শাসনও তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

৫। ব্রাহ্মণাদিবর্ণ নিজবর্ণ হইতে নীচ কোন বর্ণের সহিত আহার ব্যবহার এবং নিজবর্ণ হইতে নীচ কোনও বর্ণের পক্বান্নও ভোজন করিতে পারেন না, করিলে তাহাতে পাতিত্য জন্মে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোনও প্রকার অসবর্ণ-বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এই প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহাতে বিবাহিত ব্যক্তিগণের নরক ও বিবাহজাত সন্তানাদির সাঙ্কর্য্য জন্মে।

৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি। কিন্তু এই ত্রিবর্ণের কেহ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে দ্বিজ হইতে পারিবেন না ইহা শাস্ত্রের বিধি নহে, কারণ দীক্ষা দশবিধ সংস্কারের মধ্যে নহে।

৭। অধিকন্তু পতিত ক্ষত্রিয়ের পুত্র, পতিত বৈশ্যের পুত্র, শূদ্র, অন্ত্যজ কানীন, গোলক প্রভৃতি জারজ এবং অন্যান্য বর্ণসঙ্করগণ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও কোন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে উপনয়নধারী দ্বিজ হইতে পারেন না, অথবা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন না।

৮। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে ত্রিদণ্ডী পরমহংস আশ্রম গ্রহণ করিবার কোন বিধি ও মহাজন নাই।

প্রশ্নগুলি যথা :—

১। অর্থ উপার্জ্জন লালসায় একটি ব্যবসা পরিচালন জন্য যদি কেহ কোন দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা প্রবর্ত্তন করেন, তবে তত্রত্য "শ্রীবিগ্রহ" যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপাস্য হইতে পারেন কিনা ? আর উক্ত শ্রীবিগ্রহের নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত ব্যক্তিসকল, জাতি, ধর্ম্ম বিচার না করিয়া শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমের মহাপ্রসাদের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন কি না ?

২। আর যে সমস্ত পুরাকালের স্বয়ং প্রকাশ শ্রীবিগ্রহ অথবা পুরাকালের মহাজনগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ, যে সমস্ত অনুরাগী ভক্তগণ বহুকাল হইতে যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু কালক্রমে উত্তরাধিকারী স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া যদি কোন সেবাইত অর্থোপার্জ্জন লালসায়, শ্রীবিগ্রহ সেবা ব্যবসার অঙ্গভূত করিয়া নিতান্ত প্রাকৃতিক ভাবে

সেবা চালাইতে থাকেন, তবে এই প্রকার সেবা শ্রীঠাকুর গ্রহণ করিবেন কিনা? অথবা এই প্রকার নিতান্ত প্রাকৃতভাবে নিবেদিত প্রসাদ দেবপ্রসাদরূপে গণ্য হইবে কি না? এবং ইহা জাতি ধর্ম্ম বিচার না করিয়া বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ব্যক্তি সকল গ্রহণ করিতে পারেন কি না?

৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং পঞ্চ উপাসকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের উপাসক অন্য সম্প্রদায়ের শ্রীবিগ্রহমন্দিরের সেবাইত, পূজারি অথবা ভোগ রন্ধনকারিরূপে নিযুক্ত হইতে পারেন কি না? অর্থাৎ বৈষ্ণব-বিগ্রহের সেবাইতরূপে অথবা পূজারি ও ভোগরন্ধন কার্য্যে শাক্ত নিযুক্ত হইতে পারেন কিনা? অথবা শাক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবাইত বৈষ্ণব হইতে পারেন কিনা? অথবা পূজারি ও ভোগরন্ধন কার্য্যে বৈষ্ণব নিযুক্ত হইতে পারেন কিনা? ইত্যাদি ইত্যাদি :—

৪। কোন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অথবা শঙ্কর মতাবলম্বী মায়াবাদিসন্ন্যাসী যদি কোন মঠের মোহন্তের গদি গ্রহণ করিয়া পরদারাদি কোন প্রকার নিষিদ্ধ কদাচারে নিযুক্ত হন, তবে শাস্ত্রানুসারে এই প্রকার কদাচারী সন্ন্যাসী গদিচ্যুত হইবেন কিনা?

এতদুত্তরম্

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা-সহকারিসভাপতি-নানাদর্শনাচার্য্য-পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়-লিখিতম্।

১। অর্থার্জ্জনায় জনান্ বঞ্চয়িতুকামেন প্রতিষ্ঠিতোঽপি 'শ্রীবিগ্রহঃ' শ্রীবিষ্ণোরসান্নিধ্যেন নোপাস্যো ভবিতুমর্হতি। শুচেরেব প্রতিষ্ঠাদিকর্ম্মণ্যধিকারাৎ। "শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাদিতি" শ্রুতেঃ। "শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্। গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ। আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি।" ইতি স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য-শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতবচনেন "শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়া" ইতি তদ্ধৃতবচনান্তরেণ চাশুদ্ধভাবস্য কর্ত্তুঃ কর্ম্মানধিকারপ্রতিপাদনাৎ তৎকর্ম্মণো নিষ্ফলত্বাভিধানাচ্চ। অন্যমন্ত্রার্চ্চিত ইব নিষ্ফলপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণ্যপি দেবতায়া অসান্নিধ্যস্য —"খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে" ইত্যাদ্যাদিপুরাণবচনার্থাদেব প্রতীতেঃ। অন্যমন্ত্রার্চ্চিত ইত্যস্যোপলক্ষণত্বাৎ। উপলক্ষ্যন্তু কর্ম্মনৈষ্ফল্যমাত্রং কাকেভ্যো দধি রক্ষতামিত্যত্র কাকপদস্য দধ্যুপঘাতকোপলক্ষণত্ববৎ।

দারুব্রহ্মেতি প্রথিতশ্রীপুরুষোত্তমধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-নিবেদিতভোগেতি প্রসিদ্ধান্নব্যঞ্জনাদিব্যতিরিক্তান্নব্যঞ্জনাদিভোজনে বর্ণবিশেষস্পর্শাদিঘটিতনিষেধস্য স্মৃতিসদাচারসিদ্ধতয়া তদন্যস্ব প্রতিষ্ঠিতশ্রীবিগ্রহনিবেদিতান্নাদি-ভোজনেঽপি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণেন বর্ণবিশেষস্পর্শাদি-দোষো বিচারয়িতব্যঃ। সতি স্পর্শাদিদোষে তথাবিধান্নমভোজ্যম্। ভাবাশুদ্ধিমতা কৃতপ্রতিষ্ঠস্যাহ-

সন্নিহিত-দৈবতস্য নিবেদ্যেহন্নাদৌ তু সুতরাং বর্ণবিশেষ-স্পর্শাদি বিচারঃ। নিষিদ্ধ-স্পর্শাদি-দূষিতে চাভোজ্য-ত্বমিতি কৈমুতিকন্যায়-সিদ্ধম্।

২। ভাবাশুদ্ধিমতোহশুচিত্বেন তৎপ্রদত্ত-পূজাদিকং ন দেবগ্রাহ্যং ভবতি। তন্নিবেদিতান্ন-ভোজনাদিকঞ্চ বর্ণবিশেষ-স্পর্শাদি-বিচারং বিনা ন কর্ত্তব্যমেব। বর্ণবিশেষ-স্পর্শাদয়স্তু যে তাবৎ স্মৃতি-সদাচারপ্রতিষিদ্ধাঃ তেষাং দোষাণামভাব এব তদন্নং ভোজ্যং নত্বন্যথেতি ফলিতম্।

৩। স্বোপাস্যদেবতায়াঃ পূজাদৌ সেবায়ামন্নপাকাদৌ চ তথা-বিধোপাসকস্য তৎসম্প্রদায় সিদ্ধোপাসনারতস্য চাধিকারঃ সর্ব্বসম্মতঃ। অন্যদেবতা-ভক্তস্য তু প্রতিষ্ঠিত-শ্রীবিগ্রহাদি নিয়ত-পূজাদি-সেবা-তন্নির্ব্বাহকান্নাদিপাকেহধিকারশ্চ দেশ-কুলাদি-ব্যবহার-বিশেষ-নিয়ন্ত্রিতঃ। ইয়াংস্তু বিশেষ-স্তদ্দেবনিষ্ঠত্বমেবার্চ্চনাধিকারে সর্ব্বথৈব মৃগ্যম্। তস্যৈব ভাবশুদ্ধিজনকত্বাৎ।

৪। সন্ন্যাসিনাং স্ত্রীসংসর্গেণ পতনাৎ স্বপদতঃ প্রচ্যুতির্ভবত্যেবেতি বিদুষাং মতম্।

(সংস্কৃত-ব্যবস্থা-পত্রের বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যাভূষণ, এম,এ কৃত)

১। অর্থোপার্জ্জনার্থ জনগণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে যে কোন ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে ঐ বিগ্রহ উপাস্য হইতে পারে না। কেন না শুচি ব্যক্তিরই প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে অধিকার শাস্ত্রানুমোদিত। এ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ যথা :-"শুচি তৎ-কালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ।"

শৌচ বা শুদ্ধি দ্বিবিধ-বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি হইয়া থাকে এবং ভাব-শুদ্ধিই আন্তর শুদ্ধি। ভাবদুষ্ট বা আন্তরশুদ্ধি-হীন ব্যক্তি আজীবন কেবল গঙ্গাজল এবং পর্ব্বত-প্রমাণ মৃত্তিকা ভার দ্বারা স্নান করিলেও শুচি হয় না।" এই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত বচন দ্বারা এবং "শৌচাচার বিহীন সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল ব্যক্তির পণ্ড হয়" এইরূপ অপর একটী বচন দ্বারা ও ভাবাশুদ্ধ ব্যক্তির কর্ম্মে অনধিকার প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐরূপ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কৃত-কর্ম্ম-মাত্রই যে নিষ্ফল ইহা অভিহিত হইয়াছে। অতএব ঐরূপ ভাবাশুদ্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাদি-ক্রিয়াও নিষ্ফল হওয়ায় তাহাতে দেবতার সন্নিধানই হয় না। "বিগ্রহ খণ্ডিত (ভগ্ন হইলে), স্ফুটিত (ফাটিয়া গেলে) দগ্ধ, ভ্রষ্ট, স্থানবিবর্জ্জিত, কুক্কুরাদি পশু স্পৃষ্ট, দুষ্ট-ভূমিতে পতিত, অন্য মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চিত এবং পতিত ব্যক্তির স্পর্শ দ্বারা দূষিত এই দশবিধ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে দেবগণ উহাতে সন্নিধান বা অধিষ্ঠান করেন না"—এই আদিপুরাণের বচনার্থ হইতেই যেমন অন্য মন্ত্রার্চিত স্থলে সেইরূপ বিগ্রহের নিষ্ফল-প্রতিষ্ঠা-স্থলেও দেবতার সান্নিধ্য হয় না। উক্ত আদি-পুরাণের বচনে যে "অন্য মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইলে" এইরূপ কথিত হইয়াছে, তাহা উপলক্ষণ মাত্র, তাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠাদি ক্রিয়ার নিষ্ফলতা-স্থল-ও বুঝাইতেছে। যেমন কাক হইতে দধি রক্ষা কর'—এই বাক্যে কেবলমাত্র যে কাককে বুঝাইয়া থাকে তাহা নহে পরন্তু উক্ত দধির অনিষ্টকারি মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে।

দারুব্রহ্ম নামে প্রথিত শ্রীপুরুষোত্তমাধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগরূপে প্রসিদ্ধ অন্নব্যঞ্জনাদি ব্যতীত অন্য প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি-ভোজনে বর্ণবিশেষের স্পর্শজনিত নিষেধ স্মৃতি ও সদাচারসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-বিগ্রহ ভিন্ন অন্য যে কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্নাদি-ভোজনে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বর্ণবিশেষের স্পর্শাদিদোষ অবশ্য বিচার করিতে হইবে। স্পর্শাদিদোষ ঘটিলে তথাবিধ অন্ন অভোজ্য। অশুদ্ধভাবাপন্ন (বিগ্রহের প্রতি ব্যবসায় বুদ্ধি বা অর্থোপার্জ্জন-লালসা-প্রণোদিত) ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলে বিগ্রহে দেবতাই সন্নিহিত বা অধিষ্ঠিত হন না। তথাবিধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য এবং অন্নাদিতে বর্ণবিশেষের স্পর্শাদি-বিচার বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। নিষিদ্ধ-স্পর্শাদি-দূষিত দ্রব্য যে অভোজ্য তাহা বলাই বাহুল্য।

২। ভাবাশুদ্ধ ব্যক্তি স্বয়ং অশুচি হওয়ায় তৎপ্রদত্ত পূজাদি কিছুই দেবতার গ্রাহ্য হয় না। এবং ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নিবেদিত অন্নাদি ভোজনে বর্ণবিশেষের স্পর্শাদিদোষ বিচার না করা একেবারেই উচিত নহে। বর্ণবিশেষের স্পর্শাদি,—যাহা স্মৃতি ও সদাচারাদি প্রতিসিদ্ধ,—সেই সকল স্পর্শজনিত দোষের অভাব স্থলে ঐরূপ অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে, অন্যথা নহে,—ইহাই ফলিতার্থ বা ফলকথা।

৩। নিজের উপাস্য-দেবতার পূজা, সেবা এবং অন্নপাকাদিতে তথাবিধ উপাসক এবং শাস্ত্রসম্মত নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে উপাসনাকারি-ভক্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহাদির পূজা, সেবা এবং তাহার নির্ব্বাহার্থ অন্নাদি-পাকে অধিকার, দেশ ও কুলাদির ব্যবহার অনুসারে হইয়া থাকে। তবে বিশেষ বক্তব্য এই যে অর্চ্চনাধিকারে উপাস্যদেবতায় নিষ্ঠা রাখা সর্ব্বথা প্রয়োজন, কেননা তন্নিষ্ঠত্বই ভাবশুদ্ধির জনক।

৪। সন্ন্যাসিগণের স্ত্রীসংসর্গ দ্বারা পাতিত্য হওয়ায় তাহাদের স্বপদ হইতে প্রচ্যুতি হইয়া থাকে, ইহাই বিদ্বান্‌গণের মত।

নিম্নলিখিত মহাত্মগণ উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাঠ করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন।

ভট্টপল্লী নিবাসী দর্শনাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম। সংস্কৃত কলেজের দর্শনাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। সংস্কৃত কলেজের বেদান্তা-চার্য্য দ্রাবিড়দেশীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপল মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ। সংস্কৃত কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি। কলিকাতা পণ্ডিত সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ জোষীমঠাশ্রিত পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দ গিরী আগমবাগীশ। নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শিরোমণি। ভট্টপল্লী নিবাসী বিদ্যোদয় নামক সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ, এম, এ। ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, ভাটপাড়া ২৪ পরগণা। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর স্বনামখ্যাত কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তী,এম,এ, পি,আর, এস,সি, এস, (আর, টি, ডি। নায়ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য।

অনুমোদনকারী ব্রাহ্মণ-সভার পারিষদগণের নাম।

পঞ্চকোট রাজসভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশ স্মৃতিকণ্ঠ, পোঃ কাশীপুর, জেলা মানভূম। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ ত্রিপুরার মহারাজার সভাপণ্ডিত, পোঃ আগরতলা, জেলা ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বেদান্তশাস্ত্রী, গ্রাম চৌপল্লী বেদান্ত চতুষ্পাঠী, জেলা নোয়াখালী। স্মৃতিতীর্থ স্মৃতি সুধীকরোপাধিক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বেনারস সিটী। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শিরোমণি, বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, সভাপতি পূর্ব্ব সারস্বতসমাজ, গ্রাম ও পোঃ বজ্রযোগিনী, ঢাকা। কার্ত্তিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, ফরিদপুর। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

অনুমোদনকারী অন্যান্য মহাত্মগণের নাম।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ শিরোমণি, সিমলা—কাঁসারিপাড়া, কলিকাতা, ১০৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী) ৪১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন, ৪০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংস স্বনামখ্যাত বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ভাগবত ধর্ম্ম-মণ্ডলের সম্পাদক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংস শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, সিদ্ধান্তরত্ন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশাবতংস শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ গোস্বামী, বেদান্তভূষণ, পোঃ মাড়। শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ বংশাবতংস শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীযুক্ত মুরলী-মোহন গোস্বামী। শ্রীনবদ্বীপ চৈতন্য চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বিদ্যাবিনোদ, শিরোমণি ব্যাকরণ তীর্থ, নবদ্বীপ। শ্রীধাম শান্তিপুরে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর সেবাইত শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী ভাগবত-ভূষণ। শ্রীশ্রীবংশীবদন বংশাবতংস শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গোস্বামী। শ্রীশ্রীবংশীবদন বংশাব-তংস শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য, গ্রাম বৈঁচি, জেলা হুগলী। শ্রীশ্রীভগবানা-চার্য্য বংশাবতংস শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী গোস্বামী। শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবাইত শ্রীবৃন্দারণ্য বাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী, সার্ব্বভৌম। শ্রীশ্রীরাধারমণ জিউর সেবাইত শ্রীবৃন্দারণ্য বাসী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, বিদ্যাবাগীশ, শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের শাখা পরিবার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রের সম্পাদক স্বনামখ্যাত বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। পল্লীবাসী বৈষ্ণব সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা, বৰ্দ্ধমান। উক্ত পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরের ভাগবত চতুষ্পাঠীর আচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ এসিয়াটিক সোসাইটী। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র তর্করত্ন হাটবসন্তপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। পোঃ মায়াপুর, জেলা হুগলী। শ্রীযুক্ত আশুতোষ শিরোরত্ন, সিমলা কাঁশারীপাড়া, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ, ৩৯।২নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বিদ্যাসাগর চেতলা, আলিপুর। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, গারণহাটা, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন স্মৃতিতীর্থ, শাস্ত্রী ১৪নং বাজে শিবপুর রোড্ পোঃ শিবপুর হাবড়া। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ চাতর। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, পাথুরিয়াঘাটা। কলিকাতা,। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বিদ্যারত্ন, আহিরীটোলা, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কালীকমল স্মৃতিতীর্থ, গরাণহাটা, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বিদ্যারত্ন পটলডাঙ্গা কলিকাতা। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ তর্কনিধি, সাং রাজাপুর। পল্লীবাসী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বক্রেশ্বর স্মৃতিচূড়ামণি।

প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি।

নব্যশিক্ষিতগণের একটা ভ্রান্ত ধারণা এই যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন, জড়জগৎ সম্বন্ধে আর্য্যমনীষিগণ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিবার জন্য বিগত হাওড়ার সাহিত্যসম্মেলনে বিজ্ঞানশাখার অধিবেশনে "প্রাচীনভারতের বিজ্ঞান" সম্বন্ধে পরিচয় দিতে উঠিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় বলেন—যে আর্য্যঋষিগণের জ্ঞানধারা মন্দাকিনীর মত কেবল আধ্যাত্মিকতত্ত্বের উন্নতমার্গে পরিচালিত হয় নাই পরন্তু ভাগীরথীর মত জড়তত্ত্বের নিম্নস্তরেও প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, আত্মা ও মনের সংযোগদ্বারা ঋষিগণ যে কেবল আত্মা সাক্ষাৎকার করিতেন এমন নহে; পরন্তু ঐরূপ যোগবলে তাঁহারা জড় ও অতীন্দ্রিয় সকল প্রকার দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবিষয়ে বৈষেশিক দর্শনের দুইটী সূত্র যথা—

"আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্।" ৯ অধ্যায় ১ আহ্নিক। ১১ সূ।

এবং "তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম্॥ ১২ সূ। বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞানাচার্য্যগণের মত তাঁহারা অন্ধপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিয়া নানা দ্রব্য লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করিতেন না।" এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনেক কৌতূহলোদ্দীপক নূতন তত্ত্বের উল্লেখ করেন। আমরা বারান্তরে সে প্রবন্ধ মুদ্রিত করিব। এক্ষণে উক্ত বিজ্ঞানশাখারই সভাপতিরূপে ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে অগ্রণী বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসম্বন্ধে অনন্ত ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নব্যশিক্ষিতগণের চক্ষু ফুটিবে আশা করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভারতবাসী বহুকাল হইতে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সাহিত্য ও দর্শনে আজিও ভারত-বাসী পৃথিবীর আদর্শ ও অনুকরণীয়। বিজ্ঞানেও এরূপ গূঢ় তত্ত্বের বর্ণন দেখা যায়, যাহা নব্য বিজ্ঞানে স্থান পাইতে পারে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" দেখিতে পাই, খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা-দেশে রেশমের চাষ হইত এবং "পত্রোর্ণ" অর্থাৎ পাতার রেশমে কাপড় বোনা হইত। এই কলা বিজ্ঞান-প্রয়োগে ক্রমে এত উন্নত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালার রেশম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। কণাদের "বৈশেষিক" দর্শনপাঠে জানা যায় যে, তরল জল, সঙ্ঘাত জল অর্থাৎ বরফ ও শিল এবং বাষ্পাকার জল, উত্তাপের (latent heat) ইতর-বিশেষজনিত একই দ্রব্য ; মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রাঘাত ও চুম্বকাকর্ষণের যে বিবরণ দেখি, তাহা নব্য বিজ্ঞানের যেন এক পৃষ্ঠা বোধ হয়। বৈশেষিকের পরমাণুবাদ (atomology) কি এখনকার পরমাণুবাদের সঙ্গে সঙ্গে যায় না? বাৎস্যায়নের "কামসূত্রের" ধাতুবাদ চৌষট্টি কলার এক কলা বলিয়া পরিগণিত। "চরক" ও "সুশ্রুতসংহিতার" সূত্রস্থানের বিবিধসূত্রে উদ্ভিদের শ্রেণী ও গণবিভাগের সহিত, পুষ্পহীন ও পুষ্পবাহী উদ্ভিদ, পুষ্পের পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব, জলাভিসর্পণ circeulation of water) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের বিবৃতি পাঠ করিয় বিস্মিত হইয়াছি ও চক্ষু ফুটিয়াছে। সেই সুশ্রুতের শবব্যবচ্ছেদ-তন্ত্র, শল্যতন্ত্র ও ক্ষারপাকবিধি নব্য-বিজ্ঞানেও স্থান পাইতে পারে। পণ্ডিতেরা খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে তিন চারি শত বৎসর পর পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। যে জাতি অতীতকাল হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে এমন বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, সেই জাতি কালস্রোতে প্রবাহিত হইয়া অধুনা হীনজ্যোতিঃ হইলেও, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় কি আমাদের হয় নাই? রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষকে আপনার অতীত আদর্শ আবিষ্কার করিতে হইবে ও আপনার স্বতন্ত্ররক্ষার জন্য সেই আদর্শকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। আমরা যদি সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা হইলেই অনুকরণের হীনতা ও পরগাছা হইবার কলঙ্ক হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারিব।"

স্বদেশীর মুখে অতীত গৌরবের এই সাক্ষ্য ও সমর্থন, সূক্ষ্মদর্শী বা ছিদ্রদর্শীর সন্দেহভঞ্জন না-ও করিতে পারে ভাবিয়া, বিদেশীর কথায় তদানীন্তন ভারতবর্ষের অবস্থা সভার গোচরে আনিতেছি। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে আগমন করিয়া দেখেন, বুদ্ধ ও মার্জ্জিত ভারতবর্ষে দর্শন ও বিজ্ঞানের সমধিক সমাদর ও গৌরব এবং প্রকৃষ্ট পর্য্যালোচনা। ইহা হইল প্রায় দুই হাজার দুই শত বৎসরের কথা। যে ইউরোপ এখন আমরা দেখিতেছি, যে ইউরোপের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগে জগৎ এখন একদিকে বিমুগ্ধ ও অন্য দিকে বিক্লিষ্ট, তখন সেই ইউরোপ বর্ব্বরজাতির আবাসভূমি ছিল। এখনকার ইউরোপ তখন জন্মে নাই। ডাক্তার হিউয়েল তাঁহার "বিজ্ঞানের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে গ্রীক-বিজ্ঞানের

ইতিহাস উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন—"যে সকল ঘটনাবলী চোকের উপর দেখা যায়, তাহাদের কার্য্যকারণ-নির্দ্ধারণের এষণা, অথবা আষাঢ়ে গল্প ও বিচারমার্গের প্রভেদ-জ্ঞান, অথবা একজাতীয় ঘটনা সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাকৃত কারণে উপনীত হওয়া, মিশর বা এশিয়াদেশবাসীদের মধ্যে কখনও ছিল না, থাকিবার কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। তবে ভারতবাসিগণের পক্ষে একথা বোধ হয় প্রযুক্ত হয় না।" উল্লিখিত ডাক্তারের বিজ্ঞান-এষণার এই বর্ণনা, ভারতবর্ষের সুদূর অতীত যুগের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার সাক্ষাৎ প্রমাণ না হইলেও, ইহা যে বিশিষ্ট পরোক্ষ প্রমাণ তাহার আর সন্দেহ নাই। উল্লিখিত ডাক্তার পৌরাণিক জ্যোতিষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবাসীদের মধ্যেও সূর্য্যকেন্দ্রক (heliocentric) মতের প্রচারক ছিল। আর্য্যভট্ট (১৩২২ খৃঃ) ও অন্যান্য ভারতীয় জ্যোতিষী পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতি অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের চারিধারে ঘোরা, এই বৈজ্ঞানিক মতের পোষণ করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তী হিন্দুরা এ মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।" হিন্দু-বিজ্ঞানের অতীত গৌরবে ডাক্তার হিউয়েল আশ্চর্য্যান্বিত অথবা সন্দিগ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু হিন্দু-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অজ্ঞানজাত ভ্রম সকল অচিরে সংশোধন করিবেন, এরূপ আশা করা যায়। ডাক্তার ম্যাকডোনেল "সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পাইথাগোরসের (গ্রীকদেশীয় পণ্ডিত) দর্শন ও বিজ্ঞান যে ভারতবর্ষীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের আদর্শে লিখিত, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।" ডাক্তার ম্যাকডোনেল আরও লিখিয়াছেন, "বিজ্ঞানে ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকট সবিশেষ ঋণী" "বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভারতবাসীর সাধনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য," "কোন কোন বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব গ্রীকদের কৃতিত্ব অপেক্ষা বহু উন্নত," "ইউরোপীয় শল্যতন্ত্র ভারতবর্ষ হইতে কৃত্রিম নাসিকা-নির্ম্মাণ-কৌশল ধার করিয়া লইয়াছে, ইংরেজ গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষেই এই কৌশল শিক্ষা করেন।" জার্ম্মাণ-পণ্ডিত ওয়েবারও "ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের ইতিহাসে" শেষোক্ত কথার সমর্থন করিয়াছেন। শেষোক্ত পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—"ভারতবাসী শল্যতন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, এবং এই তন্ত্রে ইউরোপের এখনও ভারতবর্ষের নিকট হইতে অনেক শিখিবার আছে।"

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে পাণ্ডিত্য সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রচারে ও প্রভাবে পাণ্ডিত্য-সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া সাধারণের আলোচ্য হইয়াছিল ও সেই সঙ্গে ধর্ম্মের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের কি মোহিনীশক্তি! ধর্ম্মের আনুকূল্যে শিক্ষার পথ অবারিত হইয়াছিল। খৃষ্ট-পরবর্ত্তী সপ্তম শতাব্দী, নলন্দা মঠের যে বিচিত্র চিত্র আমাদের জন্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহা অবহমানকাল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিস্তারের আদর্শ-স্বরূপ পরিগণিত থাকিবে।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

শিরোমা।

মাথাধরার ঔষধ। সর্ব্বরূপ মাথাধারা ইহা দ্বারা আরাম হয়। খাইবামাত্র অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে আরোগ্য, অথচ শিরা অবসন্ন হয় না। জ্বর জন্য মাথাধরা হইতে স্নায়বিক শিরঃপীড়া পর্য্যন্ত ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। উদর এবং জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র বিকৃতিজন্ত মথাধরার মন ঔষধ জগতে দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১২ বড়ী ॥৶০ আনা।

ক্রিমির বটিকা।

ক্রিমি দ্বারা শরীরে না করিতে পারে এমন পীড়া নাই, বিশেষ বালক বালিকাগণ সর্ব্বদা ক্রিমি দ্বারা উৎপীড়িত—তাই দেশীয় চারিটী দ্রব্যযোগে এই বটিকা প্রস্তুত করিয়াছি—সেবনে কোন বিঘ্ন নাই, নিশ্চয় ক্রিমি ইহাতে মরিয়া বাহির হইবে এবং অন্য উৎপাত নিবারণ করিবে। প্রতি কৌটা ।৴০ আনা।

অগ্নিকুমার রস।

অজীর্ণ, উদরাময়, অম্ল, আমাশয়, অক্ষুধা, বমি, উদ্গার ইত্যাদি উপদ্রব নিবারণ করিতে এই অগ্নিকুমার রস শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বস্তুতঃ ইহা পাচক এবং ধারক গুণশালী, অথচ পিত্তপ্রণালীর শোধক এবং বলকারক। সাত্ত্বিক আহার বিহারকারী ব্যক্তিগণের এবং ব্রাহ্মণ, বিধবাগণের পক্ষে অমৃততুল্য গুণশালী। গর্ভিণী হইতে শিশু পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা নিরাময় হইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা ।৴০ পাঁচ আনা।

দাদের মলম।

ইহা পূর্ণ বিলাতি বস্তু, ইহাতে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই। ইহা দ্বারা দাদবিচার চুলকোনা, খোস, পাঁচড়া, এমন কি কোরচ দাদ হইতে ক্ষত পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

মূল্য প্রতি কৌটা ।৴০ পাঁচ আনা।

[illegible] ভট্টাচার্য্য।

[illegible]

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ-সভা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED NoC—375

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণসমাজ

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religions & Social Magazine

(প্রবন্ধলেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

সপ্তম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

ভাদ্র।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড।৹ আনা।

সন ১৩২৬ সাল।

ভাদ্র সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ ডাক্তার।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম,এ।

সূচীপত্র

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"

সপ্তম বর্ষ। { ১৮৪১ শক, ১৩২৬ সাল, শ্রাবণ। } দ্বাদশ সংখ্যা।

বর্ষশেষে।

দেখিতে দেখিতে কালচক্রের নেমি পুনরায় আবর্ত্তিত হইল, বিশ্বসংসার এবং তাহার অন্তর্গত স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি ভাব নিচয়েরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। কালচক্রের এই পরিবৃত্তির নামই বর্ষপরিবর্ত্তন। —এই বর্ষাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকা' সপ্তমবর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টমবর্ষে 'উপনীত' হইল। যিনি কালরূপী ও কালাধিপতি, যিনি 'কলা' ও 'কাষ্ঠাদিরূপে' * বিশ্বসংসারের পরিচালক, তাঁহার কৃপার উপরই এই পত্রিকার অভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে। নববর্ষ হইতে এই পত্রিকার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনায় অদ্য এই বর্ষদ্বয়ের সন্ধিক্ষণে তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণসরোজোদ্দেশে কোটী কোটী প্রণতি অর্পণ করিতেছি, এবং যে 'প্রজাপতিরূপী' সম্বৎসর শ্রীশ্রীভগবদ্বিধানানুসারে †

---

* "কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি!
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১ অধ্যায়)

† কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

বিশ্বাধিবাসী প্রজাবৃন্দের মঙ্গলার্থ নানাকার্য্যাবলী অঙ্গে ধারণ করতঃ প্রকট হইয়া বিদ্যমান, তাঁহার উদ্দেশেও ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি, এবং মহাভারতোক্ত গুরুভক্ত আদর্শশিষ্য উতঙ্কের ভাষায় বলি—

"ত্রীণ্যর্পিতান্যত্র শতানি মধ্যে
ষষ্টিশ্চ নিত্যং চরতি ধ্রুবেঽস্মিন্।
চক্রে চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযোগে
ষড়্ বৈ কুমারাঃ পরিবর্ত্তয়ন্তি

*　*　*　*

নমোঽস্তু তস্মৈ জগদীশ্বরায় লোকত্রয়েশায় পুরন্দরায়॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়)

এই চক্ররূপ সম্বৎসরে তিনশত ষাটদিন একে একে অতীত হইয়াছে,—দর্শপৌর্ণমাসরূপ চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব পর্য্যায়ক্রমে অতিক্রম করিয়াছে,—গ্রীষ্মাদি ঋতুরূপ ষট্‌কুমার যথাক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং উহাদের সহিত এই বিশ্বে কত হর্ষ ও শোকসঙ্কুল অগণিত বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, - কে তাহার পরিগণনা করিবে ?

প্রথমতঃ পাশ্চাত্যদেশবাসীর সুদীর্ঘকালব্যাপী ঘোর পাশবসম্মর্দ্দের ফলে কেবল যে মানবমাত্রেরই মুখে কালিমাচ্ছায়া সংপাতিত হইয়াছে—তাহা নহে, পরন্তু এই যুদ্ধের ফলে বিবিধ আধি, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষাদি উৎপাতসমূহ দ্বারা যেন বিশ্বধরণী আকুল হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে হাহাকাররব উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছে ;—ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহের অভূতপূর্ব্ব মহার্ঘতা ও দুর্লভতানিবন্ধন শত সহস্র ব্যক্তি মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইতেছে,—তাহাদিগের পরিজন, কুটুম্ব, বান্ধবগণ আর্ত্তধ্বনিতে অম্বরতল বিদীর্ণ করিতেছে,—কত গ্রাম, নগর, পল্লী, পত্তন জনশূন্য হইয়া জীর্ণারণ্যের মত হতশ্রী হইয়াছে ! বিগত বর্ষে কেবল ভারতভূমি হইতেই ষষ্টিলক্ষ পরিমিত অধিবাসী ভীষণ সমর-জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণ ত আছেই। এই সকল দুর্নিমিত্তের কথা ভাবিতে গেলেও সমস্ত শরীর ও হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। এক কথায় পাপদানব আপনার করালমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তথাপি আমরা "সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গমাতার সন্তান বলিয়া গৌরব করিলেও,বিকৃত শিক্ষায় অভিভূত হইয়া বিদেশ হইতে প্রেরিত অস্পৃশ্য খাদ্য—(পাঁউরুটী বিস্কুট প্রভৃতি) সমূহ দ্বারা উদরপূর্ত্তির জন্য লালায়িত,—এবং এই সকল বিষবৎ পরিত্যাজ্য "অখাদ্য" সমূহের সংগ্রহার্থ বর্ষে বর্ষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিদেশীয়গণের চরণে অর্পণ করিতেছি,—আরও কৃতঘ্ন—আমরা বঙ্গজননীর স্তন্যোপম, - অমৃতনিষ্যন্দিনীরমত স্রোতস্বিনীগণের স্বভাবস্নিগ্ধ স্বচ্ছবারিধারা ত্যাগ করিয়া যবনস্পৃষ্ট কৃত্রিম, অমেধ্য-সংকীর্ণ কাচপাত্রনিরদ্ধ কলুষিতজলে পিপাসানিবারণের প্রয়াসী হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? এইজন্য পৃথ্বীমাতার নিকট আমরা অভিশপ্ত।

পুরাকালে মাতা পৃথ্বী নৃশংস-নৃপতি বেণ-কর্ত্তৃক উপপ্লুত হইয়া সমুদয় সার আকর্ষণ করিয়া গোরূপ ধারণকরতঃ পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজও তিনি যেন পাপদানবের উৎপীড়নে ভীত ও বিবিগ্ন হইয়া আমাদের গ্রাস হইতে সকল ভোগ্যবস্তু,—বৃক্ষসমূহের সরসমধুরফল,- ধেনুগণ হইতে অমৃতসোদর দুগ্ধ, ক্ষেত্র হইতে শস্যসম্পৎ সংহরণ করিয়া লইতেছেন। বৃক্ষসমূহ আর ফলভারে অবনত হয় না, 'গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা গাভীগণ দুধের নদীতে তুফান তুলে না'। এক্ষণে পদে পদে আমরা—

"দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ॥"—

এই শাস্ত্রবাক্যের ফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। কিন্তু হায়! আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, অধর্ম্মের অনিষ্ফল অহরহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও প্রতীকারের বা আত্মরক্ষার চেষ্টা আমরা একবার অন্তরেও চিন্তা করি না। হায়! পাপাত্মক কলির কি বিপথীকরণ প্রবৃত্তি!

এইরূপ পাপের ভয়াবহ ফলস্বরূপ মহামারী দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা নিত্য প্রপীড়িত হইলেও আমাদের ভীতিব্যাকুল হৃদয়ের একটী আশ্বাসের কারণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিগত বর্ষ-চতুষ্টয়ব্যাপী ঘোর সমরের অবসান, এবং ন্যায়ধর্ম্মপক্ষপাতি বিশ্বহিতব্রত ভারতেশ্বরের বিজয়-লক্ষ্মীলাভ। আনন্দের বিষয় এই যে, যে দুষ্পূরলোভজনিত আত্মম্ভরিতা জর্ম্মণাধিপতির হৃদয় আপূরিত করিয়া তাঁহাকে এই নৃশংস আসুরসমরে প্রণোদিত করিয়াছিল, আজ এই যুদ্ধের অবসান দিনে তাহা স্বয়ং বিশীর্ণ ও বিধ্বস্ত হইয়া অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মেরই প্রভুত্ব প্রখ্যাপিত করিতেছে।

আজ এই প্রবল কলির প্রকোপের দিনে জলধি-মন্থনে দেবপক্ষে অমৃতের মত এবং দনুজ পক্ষে গরলের মত অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের জয় অবলোকন করিয়া কোন্ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির চিত্তে হর্ষ না উদিত হইয়া থাকে? "অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে"—এই নীতি-বাক্যের প্রত্যক্ষফল দর্শন করিয়া সততপাপনিরত ব্যক্তিগণের চিত্তপরিশুদ্ধি এবং অধর্ম্ম হইতে বিরতি হইবে—ইহাই আমাদিগের আশ্বাস। প্রজাপতিরূপে বিগত সম্বৎসর দারুণ কর্ম্মপরায়ণ জার্ম্মাণবাসিগণকে উপলক্ষ করিয়া এই নীতি জ্বলন্ত-অক্ষরে বিশ্ববাসি-প্রজাবর্গের নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে আজও ধর্ম্ম ক্ষীণ হইলেও বিদ্যমান আছেন— আজও অধর্ম্ম ও পাপ বিষময় অনিষ্টফল উৎপাদন করিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ-সমাজ-পত্রিকা" এই ধর্ম্মের সেবাই ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া সপ্তমবর্ষ অতিক্রম করিল। ধর্ম্মপ্রচারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-গৃহস্বামী যদি আপন আপন পরিবারভুক্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কালবশতঃ ম্রিয়মাণ ধর্ম্মভাবকে সজীব করিবার জন্য এক এক খণ্ড পত্রিকা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হই। এবং এই পত্রিকা খানিও সকলের সহানুভূতির স্নিগ্ধচ্ছায়ায় পুষ্টিলাভ করিয়া সমধিক উৎসাহে ধর্ম্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। এইহেতু আজ দেশবাসী সমগ্রব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহায়তার আশায় কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নূতন বর্ষ হইতে সমাজে ধর্ম্মভাবের প্রচারের জন্য——এই প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের জীবিত ও স্বর্গত যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণভূস্বামী ত্যাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা আদর্শ হইয়া আছেন, তাঁহাদের বিস্তৃতজীবনী আমরা এই পত্রিকায় রীতিমত ভাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছি। তাঁহাদের মহনীয় জীবনচরিত পাঠ করিয়া সমাজের আপামর সাধারণের ধর্ম্মভাব উজ্জীবিত হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণভূস্বামি-বংশের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তও আমরা সাগ্রহে প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। এক্ষণে সুযোগ্য লেখকগণ নিজ নিজ পরিচিত ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মগণের জীবনী যথোচিত গবেষণা দ্বারা সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিলে আমরা উৎসাহিত হইব।

এই প্রসঙ্গে আমরা এই বৎসরের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মাত্ম-মহাপুরুষগণ পরলোকে গমন করিয়াছেন, গভীর শোকসহকারে বাষ্পগদগদকণ্ঠে তাঁহাদিগের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। একদিকে যেমন তাঁহাদের অপূরণীয় বিয়োগের কথা ভাবিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তেমনি অপরদিকে—

"কালমূলমিদং সর্ব্বং ভাবাভাবৌ সুখাসুখে
কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ॥"—

ইত্যাদি পুরাণবাক্য দ্বারা মহাকালের অলঙ্ঘ্যশক্তি স্মরণ করিয়া কোনওরূপে শোকবেগ ধারণ করিতেছি। তাঁহারা কোন সাধু উদ্দেশ্যে ইহালোক ত্যাগ করিয়া অমর ধামে গমন করিয়াছেন। এই সকল আদর্শ মহাপুরুষের গুণাবলী আজ লোকমুখে গীত হইলেও এস্থলে কেবল তাঁহাদিগের স্মারকচ্ছলে নামগুলির উল্লেখ করিব মাত্র।

(১) প্রথমতঃ রায়বাহাদুর ৺রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা বলি। বিগত চৈত্র মাসের ষড়্‌বিংশদিবস বঙ্গজননীর পক্ষে কি কুক্ষণে প্রভাত হইয়াছিল জানি না, যে হেতু ঐ দিন তাঁহার এক স্বনামধন্য কৃতিপুত্র শাস্ত্রীমহাশয় ধর্ম্ম ও সাহিত্যঘটিত সমস্ত কার্য্যকলাপ পশ্চাতে রাখিয়া স্বর্গধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী জ্ঞানের ভাণ্ডার ডুবিয়াছে আর ফিরাইয়া পাইব না। শাস্ত্রী মহাশয় পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেও সনাতন ধর্ম্মের ও বর্ণাশ্রম পদ্ধতির একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং স্বয়ং সাত্বিকআচারনিষ্ঠ ও নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিকপূত ছিলেন। এই সকল গুণের জন্যই তিনি শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রধানসম্পাদকরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। আমাদের আশা ছিল যে তাঁহার তত্ত্বাবধানে ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল দেশে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বজনপ্রিয় নিখিলভারতের মণ্ডনস্বরূপ, বিদ্বজ্জ্যোতিষ্কমণ্ডলের উজ্জ্বলনক্ষত্র স্যার গুরুদাসবন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবাদের মত লোকমুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত। তিনি রাজকীয় প্রাড্‌বিবাকের সম্মানাস্পদ

ও সমুচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াও যে আচার নিষ্ঠতা দেখাইয়া গিয়াছেন যে তাহা নব্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের আদর্শ হওয়া উচিত। অতঃপর (৩) মেদিনীপুরজেলার অন্তর্গত বেল্লাবেড়া নগরের ভূস্বামী রায় বাহাদুর ৺কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয় আমাদিগকে দুস্তর শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রভূতধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও সংস্কৃত সাহিত্য ও সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। তিনি বৈষয়িককার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও বিষয়ের কীট ছিলেন না। স্বয়ং সাত্ত্বিক সদাচার অধ্যাপকভাবে নিজের চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রকে নানাশাস্ত্র অধ্যাপন করিতেন। তাঁহার বিয়োগে এদেশের ধর্ম্ম ও সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই অনুভব করিতেছি। এইরূপ আদর্শচরিত্র ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর মৃত্যুতে ব্রাহ্মণসমাজের একটী স্তম্ভ ভগ্ন হইয়াছে। (৪) পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুরজিলার অধিবাসী কাশী প্রবাসী স্মার্ত্তধুরন্ধর পণ্ডিত ৺উমাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ৭৮ বৎসরবয়সে বারাণসীক্ষেত্রে পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৫) সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক ও পঞ্জিকা নির্ম্মাতা পণ্ডিত হরগৌরীশঙ্কর জ্যোতির্বিনোদ মহোদয় গত বৎসর আশ্বিনমাসে স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রানুশীলনের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার মত সাত্ত্বিক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর অধ্যাপকের মৃত্যুতে ব্রাহ্মণসমাজও শোকে আচ্ছন্ন। তিনি কেবল যে চতুঃষষ্ট্যঙ্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু বহুভাষা জানিতেন। (৬) বারাণসীসংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থমহাশয়ও এ বৎসরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই স্বর্গত পণ্ডিতমহোদয়ের ব্যাকরণশাস্ত্রে অসামান্যজ্ঞান ভারতপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্নপ্রদেশের বিদ্যার্থিগণ তাঁহার গুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ছাত্রত্বস্বীকার করতঃ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

আর কত বলিব,—শোকে কণ্ঠরোধ হইতেছে। যাঁহাদের কথা বলিলাম, তাঁহাদের বিয়োগ পৃথক পৃথকরূপেই আমাদের পক্ষে দুঃসহ, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, তাঁহাদের সকলের বিয়োগে আমরা কি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। ধৃতরাষ্ট্রের কথায় বলিব—

"তমস্বতীববিস্তীর্ণং মোহ আবিশতীব মাম্।
সংজ্ঞাং নোপলভে সূত মনো বিহ্বলতীব মে॥"

আমরা দিন দিন সমাজের গৌরবস্তম্ভ-স্বরূপ সাত্ত্বিক, সদাচারী, সুপণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের তিরোধানে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি এবং ব্রাহ্মণ্যের চতুঃসীমা হইতে ক্রমশঃ দূরে বহুদূরে গিয়া পড়িতেছি। যদি নব্যতন্ত্রের যুবকবৃন্দ প্রাচীন আদর্শে নিজ নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

শ্রীভববিভূতি শর্ম্মা।

বলিতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭) বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মত।—সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—বৈধহিংসায়ও যে পাপ আছে তাহা শাস্ত্রদ্বারা সমর্থিত হয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মযুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করিয়াছিলেন—এই জ্ঞাতিহিংসা শাস্ত্রবিহিত;

মনু বলেন,—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥

[৩৫০।৮ম অঃ]

গুরু, বালক, বৃদ্ধ বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ যিনিই হউননা কেন, আততায়ী হইয়া আসিতে দেখিলে বিচার না করিয়াই তাহাকে বধ করিবে। সুতরাং আততায়ী জ্ঞাতির বধ বৈধ।

কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর স্বয়ং ব্যাসদেব জ্ঞাতিবধের পাপক্ষালনার্থ ধর্ম্মরাজকে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা উচিত বৈধহিংসায়ও পাপ হয়।

বাস্তবিক বিজ্ঞানভিক্ষুর এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, কেননা আততায়ী-বধের উপদেশক শাস্ত্র অর্থশাস্ত্র, আর "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই প্রাধান্য; সুতরাং যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ, লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক ব্যবহারিক—অর্থশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এই নিমিত্তই প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন। যজ্ঞীয় পশুহনন ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত, সুতরাং তাহাতে পাপের প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না।

যদি যজ্ঞও পাপজনক হইবে, তবে জ্ঞাতিবধের জন্য যজ্ঞ এবং যজ্ঞের পাপের জন্য অপর যজ্ঞের প্রসঙ্গ মহাভারতাদি গ্রন্থে থাকিত, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নাই।

(৮) সাংখ্যমতের তাৎপর্য্য।—সাংখ্য যজ্ঞে যে পাপের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল পশুহনন নিবারণার্থ নহে। কর্ম্মের দোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গে লোকের প্রবৃত্তি উন্মেষিত করিবার জন্যই সাংখ্য যাগযজ্ঞের দোষ অনুসন্ধান করিয়াছেন।

তিনি বলেন,—যেমন পশুহনন পাপজনক, তেমনি যজ্ঞে ব্রীহি যবাদির নাশও পাপের কারণ। বৃক্ষ, গুল্ম বা ওষধি যাহা যজ্ঞে লাগিবে, তাহার নাশেও পাপ হইবে। প্রত্যেক বীজই এক একটী জীব;সেই সকল জীবের হননে পাপ হইবে। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বা ওষধি প্রত্যেকটীই পশ্বাদির ন্যায় জীব, তাহাদের নাশেও পাপ আছে। যজ্ঞে পশুহননমাত্র অকর্ত্তব্য, এবং তিল, যব, ব্রীহি প্রভৃতির নাশপূর্ব্বক নিরামিষযজ্ঞ কর্ত্তব্য, সাংখ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই। তিনি বলিতেছেন, আনুশ্রবিক (বৈদিক) কর্ম্মকলাপ দুঃখ ত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তির সাধক নহে, অতএব জ্ঞানান্বেষণ করা উচিত।

(৯) বৃক্ষাদি নাশে জীবহত্যা। —পাঠক! হয়ত আপনি যজ্ঞে হন্যমান পশুর আর্ত্তনাদে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বৈধ পশুহননেরও বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইতেছেন; কিন্তু যজ্ঞে শ্রুক্ শ্রুব ও চমসাদি যজ্ঞীয় পাত্র নির্ম্মাণের জন্য যে জীবন্ত বৃক্ষের পাতন করিতেছেন সে যে "হড় হড়" করিয়া আর্ত্তরবে ভূতলে মহাশয়ন করিতেছে। তাহার শোণিতকল্প ক্ষীর ধারায় পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে। সেই হন্যমান বৃক্ষের আর্ত্তরব সেই যজ্ঞে হূয়মান তিল ব্রীহি প্রভৃতির অন্তরস্থ জীবের "চট্পটরবে কাতর ক্রন্দন, আপনার মোহান্ধ অন্তঃকরণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ বলিয়া সেপক্ষে আপনার আদৌ দৃষ্টি নাই।

আপনি একদেশদর্শী হইলেও শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ একদেশদর্শী নহেন। তাঁহারা সকলের ভাষা, সকলের কাতর উক্তি শুনিতে পারিতেন। তাহাতেই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষা স্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা
যজ্ঞার্থে নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতিং পুনঃ।

মনু ৫ম অঃ।৪০॥

ওষধি, বৃক্ষ, পশু, তির্য্যক্‌জাতিও পক্ষিগণ, যজ্ঞার্থে নিধন প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার –(জাতি ও দেশানুসারে) উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ ব্রীহি যবাদি ওষধিকেও পশ্বাদি প্রাণির সহিত অভিন্ন ভাবিতেন, তাহাতেই এক যোগে বলিতেছেন নিধন প্রাপ্ত হইলে ইত্যাদি।

আপনার দৃষ্টি প্রখর, না ঋষিগণের? যে দয়ালু ঋষিগণ, কোন স্থানে কাহার গমনকালে পদ ঘর্ষণে কোন্ ক্ষুদ্র জীব নিহত হইল, কোথায় জলের কলসীর চাপে কোন ক্ষুদ্র কীট নিষ্পেষিত হইল, কোথায় রন্ধনশালার অগ্নিমধ্যে কোন পতঙ্গ ভস্মীভূত হইল, এই সকলের সূক্ষ্ম সংবাদ লইয়া গৃহস্থদের দিন দিন প্রায়শ্চিত্তের (পঞ্চ যজ্ঞের) ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইন্ধনার্থ অশুষ্কবৃক্ষের নিপাতনে উপপাতকের উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গোৎসবের পত্রিকা প্রবেশ প্রকরণীয় বৈধ ফলযুগলযুক্ত বিল্বশাখা ছেদনেও,—

শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া বিভো!

বলিয়া বৃক্ষকে দুঃখ সহ্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এমন কি দেবার্চ্চনে আবশ্যকীয় বিল্বপত্র ও তুলসী পত্র চয়নেও যে সেই সেই বৃক্ষের দুঃখ হইবে তাহা ভাবিয়াও সেইসকল বৃক্ষের নিকট কতরূপ ক্ষমা প্রার্থনার উপদেশ দিয়াছেন।

সেই মহর্ষিগণই আর্ত্তস্বরে রোরুদ্যমান ছাগমহিষাদি পশুকে যজ্ঞে নিহত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

(১০) যজ্ঞীয়হননে পশ্বাদির সম্মতি।—আপনারা বলিতে পারেন, ঋষিগণ অতিশয় নির্দ্দয়, সকলের ভাষা বুঝিয়া আর্ত্তস্বর শুনিয়া, কাতর বিলাপ ও প্রবল অনিচ্ছা অবগত হইয়াও পশু বৃক্ষ ও ব্রীহি যবাদি বধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যজ্ঞে হূয়মান ব্রীহিযবাদির বা বৃক্ষ ও ওষধি প্রভৃতির যে প্রবল অনিচ্ছা, পশুর যে যজ্ঞীয় হননে অসম্মতি তাহা আপনারা কিরূপে জানিলেন?

শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট পদার্থসমূহের তত্ত্ববেত্তা ঋষিগণ জানিতেন যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে নিযুক্ত পশু ও বীজাদির প্রচুর আনন্দ হয় ও অসৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদের দুঃখ হয়।

ব্যাসস্মৃতি অথিতিসৎকার প্রকরণে বলিয়াছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গৃহমাগতে।
ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যামঃ পরমাং গতিং॥ ৫০।
নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
দীয়মানং রুদত্যন্নং ভয়াদ্বৈ দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ৫৭॥

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ গৃহে আসিলে তদীয় ভোজনযোগ্য ব্রীহিযবাদি ওষধিগণ উত্তম গতি লাভ করিব বলিয়া নৃত্য করিতে থাকে।

আর শৌচহীন ভ্রষ্টাচার বেদহীন ব্রাহ্মণকে যে অন্ন দেওয়া হয়, সেই অন্ন, "হায়! আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া ভয়ে কাঁদিতে থাকে।

ইহা দ্বারা কি বুঝা গেল, যজ্ঞে হূয়মান ব্রীহিযবাদি পরলোকে উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া আনন্দিত হয় না? মনুস্মৃতি, স্পষ্টভাষায়ই সেই উন্নতির কথাই বলিয়াছেন।

যজ্ঞে নিহন্যমান পশুরও যে অসম্মতি আছে তাহা নহে।

চরকের অতিসার উৎপত্তির প্রকরণে কথিত আছে, সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞে পশু আনিতেন কিন্তু তাহাদিগকে হনন করিতেন না। ফল কথা তাহাদ্বারা যাগকর্ত্তার যাগ কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহিত হইত, কিন্তু পশুর কোনও উপকার হইত না।

ততো দক্ষযজ্ঞপ্রত্যবরকালং মনোঃ পুত্রানাং নরিষ্যন্নাভাগেক্ষাকুবিশাশযযাত্যাদীনাঞ্চ ক্রতুষু পশূনামেবাভ্যনুজ্ঞানাৎ পশবঃ প্রোক্ষণমবাপুঃ।

তাহার পর দক্ষযজ্ঞের পরবর্ত্তিকালে মনুর পুত্রগণ, নরিষ্যন্, নাভাগ, ইক্ষাকু, বিশাশ ও যযাতি প্রভৃতির যজ্ঞে পশুগণেরই অভিপ্রায় অনুসারে পশুগণ বৈদিক প্রোক্ষণ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আলম্ভন প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে থাকে।

তাহা হইলে দেখা গেল ওষধির ন্যায় যজ্ঞে নিহত হইয়া সদ্গতি লাভের জন্য পশুগণেরও ইচ্ছা ও আনন্দ আছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অপর প্রাণিমধ্যেও বিরল নহে।

পারলৌকিক উন্নতির জন্য সতী রমণী, মৃতপতির জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ লোকে চলিয়া যান। জন্মান্তরের উন্নতির আশায় লোকের স্বেচ্ছায় বৈধ অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি বা কামনা-সাগরে ঝম্প প্রদানের সংবাদ শাস্ত্রে আছে।

ক্ষত্রবীর পরলোকে স্বর্গে যাইবার জন্য নির্ভয়ে সম্মুখ সমরে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া থাকে। যজ্ঞে বেদমন্ত্রে প্রোক্ষিত পশুরও যে দিব্য জ্ঞান উদিত হয় না; এবং পারলৌকিক উন্নতির নিমিত্ত তাহারা সানন্দে অ আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হয় না, এ কথা সপ্রমাণ করিয়া বলিতে পারেন?

আর্ত্তস্বর শুনিয়া যদি কেহ অসম্মতি ও অনিষ্টকারিতা ও তজ্জন্য পাপের অনুমান করেন, তাহাও নিতান্ত ভ্রম। যদি যজ্ঞে নিহত পশুর সদ্‌গতি হয়, তবে নিহন্তা পশুর আত্মীয় হিতৈষী না অনিষ্টকারী অনাত্মীয়? পশু দেহ মাত্র ভোগ দেহ, এই দেহে পশুর আর কোনও উন্নতিরই সম্ভাবনা নাই। যদি বেদমন্ত্রে শোধিত পশু দিব্যলোক গমনে সমর্থ হয়, তবে তাহার ঘাতজন্য ক্ষণিক দুঃখ সহনীয় নহে কি?

যে ব্রাহ্মণ দেহে পুষ্পের আঘাতেও প্রত্যবায় হয়, তাহাতে ব্রণ হইলে এবং ব্রণের ছেদ ব্যতীত আরোগ্যের উপায়ান্তর না থাকিলে, যদি ভিষক্ ব্রণিত ব্রাহ্মণের হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার পরায়ণ বিপ্রের দেহে অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক রক্ত মোক্ষণ করেন, এবং পুনঃ ২ সেই ব্রাহ্মণকে অসহনীয় যাতনা দিয়া তাঁহার আরোগ্য বিধান করেন, এইরূপ স্থলে সেই ভিষকের পাপ না পুণ্য হইবে।

যদি পুণ্যই হয় তবে বলিতে হইবে অনিচ্ছাতঃ তীব্র যাতনা দিয়াও উপকার করিলে পুণ্যই হয়, এবং ইহা হিংসামধ্যেও গণ্য হয় না। যজ্ঞীয় পশুহনন সম্বন্ধেও সেই কথা।

ঋষিগণ দয়ালুই ছিলেন, যাহাতে জীবের মহোপকার সাধিত হয় সেইরূপ করাই দয়ালুর কার্য্য। ঋষিগণ, যাগকর্ত্তা ও যজ্ঞোপকরণ পশুবীজাদির সাত্বিক সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্প বিচার মূঢ়ের দৃষ্টিতে নির্দ্দয়তা অনুভূত হইতে পারে।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তম্……… (গীতা)

যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃত তুল্য, তাহাই সাত্বিক সুখ। পশুহননে প্রথমতঃ সামান্য ক্লেশ হইলেও পরিণামে দিব্যলোক প্রাপ্তিরূপ সুখ সংঘটিত হয়, ইহাই দয়ালু ঋষিবৃন্দের অভিসন্ধি।

(১১) নিরামিষ ভোজনেও জীবহত্যা।—যজ্ঞে নিহত পশ্বাদি স্বর্গে যায়, যজ্ঞে বধ, অবধ মধ্যে গণ্য, একথা না হয় আপনি বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনি নিরামিষ শাক-সব্জী ভোজন করিতেছেন; এই যে প্রত্যহ রাশি রাশি অন্ন উদর গত করিতেছেন; আপনার এই ভোজনরূপ মহাযজ্ঞে কত সহস্র সহস্র হনন ক্রিয়া সাধিত হইতেছে; প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ ধান্যবীজের অবঘাত; প্রচুর বৃক্ষলতা ও ওষধির বিনাশ, সর্ষপাদি কত শত শত ক্ষুদ্র বীজের যে নিষ্পেষণ হইতেছে, তাহাতে কি জীবহত্যা ও ভ্রূণহত্যা দেখিতেছেন না?

বৃক্ষের, লতার, ওষধির ও বীজের প্রত্যেকের জীব আছে, তাহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ ও শাস্ত্র যুক্তি প্রমাণিত।

লোকান্তরে এই জীবহত্যার বিচার চলিলে আপনি কি বলিয়া পক্ষ সমর্থন করিবেন? তখন বাধ্য হইয়া আপনাকেও বলিতে হইবে,—

"তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ"

তাৎপর্য্য এই যে, নিজের ভোজনের জন্য পাকের ব্যবস্থা নাই। অতিথি-সৎকার বলি বৈশ্বদেব ও সংবিভাগ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর গৃহস্থ শেষভুক্ হইবেন।

সেই অন্নও নারায়ণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া নিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিবেন। যজ্ঞে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্রেরাও স্বকীয় উপাস্যদেবতার নামে অন্ন নিবেদন করিয়া তদীয় প্রসাদ ভোজন করিবেন। এই নিমিত্তই অদীক্ষিতের অন্ন বিষ্ঠাতুল্য বলিয়া শাস্ত্র নিন্দা করিয়াছেন।

অতিথি-সৎকারাদি যজ্ঞের অবশেষ ভোজীই যজ্ঞ শিষ্টামৃতভুক। তাহার অপর শাস্ত্রীয় নাম বিঘসাশী। সুতরাং এই যে জীবহনন, তাহাও ভোজনার্থে নহে, যজ্ঞার্থে। অতএব "যজ্ঞে বধ অবধ মধ্যে গণ্য" এই উত্তরেই যমরাজকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

যাহারা পশুযাগ না করিয়া ব্রীহি যবাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের পক্ষেও "তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" এই মহাবাক্যই যমভট নিরস্তীকরণে অমোঘ মহৌষধ।

হিংসাব্যতীত লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না, গমন ভোজন, উপবেশন শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পাদন সকল কার্য্যেই যখন হিংসার সংস্রব আছে, তখন অবৈধ হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈধ হিংসাযুক্ত যজ্ঞ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বৈধ হিংসাযুক্ত যজ্ঞ, অবৈধ হিংসাজনিত অশুভ সংস্কারের সংশোধক তাহাতেই শাস্ত্র বৈধহিংসাপ্রকরণে দৃষ্টান্তস্থলে বলেন,—

যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষগ্ নাশয়তে বিষম্॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী ধৃত রুদ্রযামল।

যে বিষখণ্ডে সমস্ত জন্তুর মৃত্যু ঘটে, সেই বিষ খণ্ডেই ভিষক্ বিষ নষ্ট করিয়া থাকেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিনীকার উপসংহার করেন।—

তস্মাদবিধিজনিতা হিংসা পাপজনিকা।
বিধিবোধিতা স্বর্গজনিকা ইতি নির্গলিতার্থঃ॥

(১২) যজ্ঞীয় পশুর স্বর্গ গমন।—ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

এম্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্ দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্॥

পঞ্চম অধ্যায়। ৪২।

বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ, এই সকল (যজ্ঞ দেবপূজা ও পিতৃকার্য্য) স্থলে পশুহিংসা করিয়া, নিজকে ও পশুকে উত্তম গতি লাভ করাইয়া থাকেন।

শ্রুতি বলেন,—

পশুর্বৈ নীয়মানঃ স মৃত্যুং প্রাপশ্যৎ স দেবান্নান্ব কাময়তৈতুং তং দেবা অব্রুবন্, এহি স্বর্গং বৈ ত্বা লোকং গময়িষ্যামঃ।

যজ্ঞার্থে নীয়মান পশু প্রথমতঃ মৃত্যুকে অবলোকন করিয়া থাকে (তারপর) সেই পশু

দেবগণকে পাইবার জন্য কামনা করে। তাহাকে দেবগণ বলেন, এস তোমাকে স্বর্গলোকে লইয়া যাইব।

যজ্ঞে পশু প্রোক্ষণের বৈদিক মন্ত্রসমূহ পাঠ করিলেই লোকান্তরে পশুর উন্নতির প্রমাণ পাইবেন।

অগ্নিঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত সএতল্লোকমজয়ৎ তস্মিন্ অগ্নিঃ:স তে লোকো ভবিষ্যতি ত্বং যাস্যসি পিবৈতাপঃ। (যজুর্ব্বেদ)

অগ্নি পশু ছিলেন, (দেবগণ) সেই পশুদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি এই লোক জয় করিয়াছেন। হে পশো! অগ্নি যেস্থানে গিয়াছেন তথায় তোমারও স্থান হইবে এই (মন্ত্রপূত) জলপান ক'র, তুমিও তথায় যাইবে। 'এই জন্যই কি ছাগপশুকে বহ্নিদৈবতক বলা হয়?

এইরূপ "বায়ুঃ পশুরাসীৎ সূর্য্যঃ পশুরাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ ও বায়ু পশু ছিলেন, সূর্য্য পশু ছিলেন ইত্যাদি। পুরুষসূক্তে আরণ্য গ্রাম্য পশুকে বায়ব্য বলা হইয়াছে। বেদও বলেন, "বায়ব্যং শ্বেত ছাগলমালভেত" অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত, ইত্যাদি।

মহিষ বলির এক প্রার্থনা মন্ত্রে আছে,—

যাহি স্বর্গং মহাবীর! দত্ত্বা বলিফলং ময়ি।
তদ্দেবলোকে তিষ্ঠত্বমষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া॥

হে বীর! (মহিষ!) আমাকে বলির ফল প্রদান করিয়া তুমি স্বর্গে যাও! তুমি দেবলোকে অষ্টাবিংশতি (শত সহস্র) বর্ষ অবস্থান কর। অন্য মন্ত্রে আছে গন্ধর্ব্বত্বমবাপ্নুহি, গন্ধর্ব্ব দেহ লাভ কর।

দেবীভাগবতে আছে,—

দেব্যাগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বর্গমব্যয়ং।
দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশূনাং স্বর্গতির্ধ্রুবা॥

তৃতীয় স্কঃ ২৬ অঃ ৩৩।৩৪।

ভগবতীর প্রীতির জন্য পৌরাণিক বা তান্ত্রিক পূজায় যেসকল পশু উৎসর্গীকৃত হয়, তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রে বিশুদ্ধ করিয়া তদীয় কর্ণে পশুপাশ বিমোচনী পশুগায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শিবরূপে চিন্তিত সেই পশুর যথারীতি পূজার পর প্রার্থনা করিতে হয়,—

ছাগত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।
প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিনং বলিরূপিনং॥

হে ছাগ! তুমি আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি সর্ব্বরূপী (শিবরূপী) এই নিমিত্ত তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

মহিষ বলির অপর এক প্রার্থনা মন্ত্র এইরূপ,—

মহিষ! ত্বং মহাবীর ধর্ম্মরাজস্য বাহনঃ।
উৎপাতান্ রোগশোকাংশ্চ সর্ব্বশত্রুঞ্চ নাশয়।
দেব্যাঃ প্রীতিং সমুদ্দিশ্য স্বর্গং গচ্ছ পশূত্তম!

হে মহিষ! তুমি মহাবীর ও ধর্ম্মরাজের বাহন, উৎপাত রোগ, শোক ও সমস্ত শত্রু বিনাশ কর। হে পশূত্তম! দেবীর প্রীতি উদ্দেশে স্বর্গে গমন কর।

এই সকল প্রার্থনার পর সকল বলিতেই বক্ষ্যমান প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবাঃ।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

স্বয়ং স্বয়ম্ভু যজ্ঞের নিমিত্ত পশুগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তোমাকে ঘাতিত করিতেছি, অতএব যজ্ঞে যে বধ তাহা অবধ মধ্যে গণনীয়।

(১৩ নরবলি।—"যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে যায়" এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে চার্ব্বাকের একটী কদুক্তি আছে,—সে কদুক্তি দ্বারা কোনও কোনও লেখক স্বকীয় লেখনী কলঙ্কিত করিতেছেন।

চার্ব্বাক বলেন,—

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গে জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন কিংনু তস্মান্ন হিংস্যতে?

এই শ্লোকটাই বিষ্ণুপুরাণে অসুর মোহনার্থ মায়া মোহ কর্ত্তৃক এইরূপ উচ্চারিত হইয়াছে।

নিহতস্য পশোর্যজ্ঞেস্বর্গপ্রাপ্তি র্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিংনু তস্মান্ন হন্যতে?

যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে যায়, তবে যজমান তাহার নিজ পিতাকে (স্বর্গে পাঠাইবার জন্য) হিংসা করেন না কেন?

অসুর মোহনার্থ দেবাচার্য্য বৃহস্পতি এই সকল শ্লোক রচনা পূর্ব্বক মায়া-মোহ মুখে অসুর সমাজে প্রচার করেন। অসুরগণ এই সকল শুনিয়া যাগ যজ্ঞ হইতে বিরত ও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইতে থাকে। এই ছিদ্রে দেবগণ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন।

যজ্ঞে যে সকল পশুহননের বিধান আছে, সেই পশুরা প্রোক্ষিত হইলে স্বর্গে যাইবে, এবং যাগের ও উপকার হইবে। অন্য জীবের হননে কোনও উপকার নাই প্রত্যুত জীব হত্যাই হয়।

যজ্ঞীয় হননে পশুর উপকার হয়; কেননা পশুগণ এদেহে আর কোনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না, স্বর্গ প্রাপ্তিই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সেই যুক্তি খাটে না, কেননা মনুষ্য পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা একদিনের সাধনের ফলেই স্বর্গের বহু উপরে উঠিতে পারে; এমন কি মুক্তির সীমায় গিয়াও উপস্থিত হইতে পারে। তজ্জন্য মনুষ্যকে যজ্ঞে নিহত করিয়া স্বর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে মনুষ্যের অবনতি ব্যতীত উন্নতি হয় না। আর অনিষ্ট হইলে পাপ হওয়া সুনিশ্চিত।

বিশেষতঃ যজ্ঞে বা দেবপূজায় নরবলি বিহিত কিনা, তৎ সম্বন্ধেও মহান্ বিতর্ক আছে। বিহিত হইলেও উক্ত নর শব্দ মনুষ্য বাচক কিনা তাহাও নিপুণভাবে ভাবিবার বিষয়; শাস্ত্রে কেবল নরবলির কথাই আছে, মনুষ্য বলির কথা কোথাও নাই।

পরন্তু মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—

মগধাধিপতি জরাসন্ধ বন্দি রাজগণকে বলিদিয়া রুদ্র যাগ করিতে উদ্যত হইলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের সহিত যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইয়া সদর্পে বলিয়াছিলেন, তুমি অন্যায় কারী, আমরা তোমাকে শাসন করিতে আসিয়াছি। সেই অন্যায় কার্য্যের প্রদর্শন ব্যপদেশে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন ;—

মনুষ্যানাং সমালম্ভো নচ দৃষ্টঃ কদাচন।
সকথং মানুষৈ র্দ্দেবং যষ্টু মিচ্ছসি শঙ্করম্।
সবর্ণোহি সবর্ণানাং পশু সংজ্ঞাং করিষ্যসি।
কোহন্য এবং যথাহিত্বং জরাসন্ধ! বৃথামতিঃ॥

যজ্ঞে যে মানুষকে কাটা যায় ইহা কখনও দেখি নাই, তুমি মনুষ্যদ্বারা শঙ্করের যজ্ঞ করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছ? স্বজাতি স্বজাতীয়ের পশুসংজ্ঞা বিধান করিতেছ! হে দুষ্টমতি জরাসন্ধ! তোমার ন্যায় অন্যায়কারী জগতে আর কে আছে?

শ্রীকৃষ্ণের এইসকল উক্তি শ্রবণ করিয়া তাৎকালিক ভারত সম্রাট্ জরাসন্ধের মহাসভায় কেহই মনুষ্যবলির শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে উত্থিত হন নাই।

জরাসন্ধ উত্তরে এইমাত্র বলিয়াছিলেন,—

দেবতার্থ মুপাহৃত্য রাজ্ঞঃ কৃষ্ণ! কথং ভয়াৎ।
অহমদ্য বিমুচ্যেয়ং ক্ষাত্রং ব্রতমনুস্মরন্।

হে কৃষ্ণ! দেবতার নাম করিয়া এই সকল রাজাকে আহরণ করিয়াছি, নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব স্মরণ করিয়াও কিরূপে আজ ভয়ে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিব?

সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মনুষ্য বলির কথা জানেন না, সেই মনুষ্য বলি কোনও শাস্ত্র মধ্যে স্থান পাইলেও তাহাকে কি বলিব?

কালিকা পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে নরবলির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই নর শব্দ মনুষ্য বাচক না সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় অন্য কোনও জন্তুর বাচক?

শাস্ত্রে প্রায়ই সিংহ ব্যাঘ্রাদির এক সূত্রে বলি প্রকরণে নর শব্দের ব্যবহার হইয়াছে

মহাভারতের এই বলবৎ প্রমাণ দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই নরবলি মনুষ্য হনন হইলেও মহাভারতের পরে আবিষ্কৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট।

ইতি বলিতত্ত্বে বৈধহিংসা বিচার নামক প্রথম অধ্যায়।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

প্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দারোগা বাবু বাসাবাড়ী হইতে চল্লিশ টাকা আনিয়া সেই নোট খানির সহিত সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন, সাহেব মহা খুসি হইয়া টাকা আর নোট রাধাচরণের কাপড়ের খুটে বান্ধিতে বান্ধিতে বলিলেন,—"ওয়েল মাইডিয়ার ডারোগা টোমার বেটন কট। উত্তর হইল পঞ্চাশ—সাহেব কহিলেন—অলরাইট্, এক আম ৪০ টাকায় কিনিয়া কন্যাকে ডিলে। টুমি টোমার ওয়াইপ কট টাকার খাবে ৫০ টাকায় কট টাকা টৈয়ার করে মাইডিয়ার ?

দারোগার মুখে ধুলা উড়িয়া গিয়াছে—নিরব। সাহেব রাধানাথকে বলিলেন—এই টাকা নিয়া টোমার পিসির হাটে ডিবে। কাল বেলা ১০টায় টুমি টোমার ঠাকুরগরের নিকট টাকিবে যাও—বালক প্রস্থান করিল।

সাহেব তখন থানার কাগজ পত্র দেখিতে লাগিলেন,—কিছু পরে পরিদর্শক বহিতে লিখিয়া গেলেন "এই দারোগা আর দোকানদার সাহা তিন দিন মধ্যে বরিশালে আমার নিকট হাজির হয়।

সাহেব প্রস্থান করিলেন। দারোগা আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বাসা ঘরে গৃহিনীর নিকট গিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। দোকানদার সাহাজি প্রকৃতই একখানা নোট হারাইয়া দারোগা বাবুর সাহায্যে পাইবার আশা করিয়াছিল, কিন্তু বিধির কলম ঘুরিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে দোকানে উপস্থিত হইল। কনেষ্টবল মুসলমান—কিন্তু তাহারা হিন্দুগণের ঠাকুর সেবার উপর বিশ্বাস ছিল, রাধাচরণের নিকট অগ্রেই ঘটনা শুনিয়াছিল। ঠাকুরগৃহ যে সাহেব মেরামত করিতে গোলোকমণ্ডলকে টাকা দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; তাহা মণ্ডল গল্পচ্ছলে তাহাকে বলিয়াছিল। এই সাহেব যে বরিশাল হইতে বাহির হইয়া এইরূপ একাকী ভ্রমণ করেন, বাছের খাঁ তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিত। ইহার হৃদয়ে যে দয়া মায়া আছে, মনুষ্যত্ব আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তাহা খাঁসাহেব পূর্ব্বেই দুই একটা ছোট বড় কার্য্যে জানিয়াছিল। রাধাচরণের নিকট খাঁ সাহেব শুনিয়াছে যে, গতরাত্রে জলঝড়ের সময় একটী সাহেব তাহাদের ভাঙ্গাঘরের আশ্রয়ে ছিল। আবার গোলোকমণ্ডল বলিয়াছে যে সাহেব তাহাকে চারিটী টাকা দিয়া রাধাচরণদের ঠাকুর ঘর মেরামত করিতে বলিয়া দিয়া থানার দিক্ আসিয়াছিল। এই সাহেবই ম্যাজিষ্ট্রেট্। থানার কার্য্য করিয়া যখন প্রস্থান করিলেন, তখন কনেষ্টবল ঘুরিতে ঘুরিতে রাধাচরণের বাড়ী উপস্থিত হইল। এইক্ষণ রাধাচরণ টাকা লইয়া হরিদাসীর হাতে দিয়া সমস্ত ঘটনা বলিল, তাহার মা আর পিসিমা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের কৃপা ভাবিয়া এদিক ওদিক যখন চাহিতেছেন,

তখন কনেষ্টবল গিয়া সমস্ত বলিল—হরিদাসী ইহাকে পূর্ব্ব হইতে জানিত। কেননা খাঁসাহেবের বাড়ী এই গ্রামে।

বাল্যে এবং কিশোর বয়সে অনেক সময় এইস্থানে আসিত—বেড়াইত। এইজন্য এই গোস্বামী পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। থানার কাহিনী শুনিয়া আর গোল মণ্ডলের ব্যবহার দেখিয়া রমণীদ্বয় স্থির বুঝিয়া লইল যে, ইহা সেই প্রেমের ঠাকুর ভক্তির ধন শ্রীহরি শ্যামসুন্দরের কার্য্য। নতুবা কৃষ্ণকাঠি গ্রামে এমন কে আছে যে, তাহাদের ন্যায় দরিদ্র গৃহস্থের সাহায্য করে। আর জেলার ম্যাজেষ্টার সাহেবই বা কেন এত দয়া করিবেন।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কামিনীদ্বয় সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া গৃহকার্য্যে গমন করিল। কনেষ্টবল বাছেরখাঁ রাধাচরণকে সাহেবের উক্তি স্মরণ করাইয়া বলিল—বরিশাল যাইতে হইলে আমি তোমাকে লইয়া যাইব। তোমার উপর সাহেব ভারি খুসি - তোমার শিক্ষার সুবিধা হইবে। আর দারিদ্রতার কষ্ট হইবে না, বলিয়া খাঁ সাহেব চলিয়া গেলেন। রাধাচরণ সাধ্যমত পবিত্র হইয়া ঠাকুরের আরতি জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল। আরতি হইল। তাহার পর পাড়া হইতে হরিদাসী চাউল সংগ্রহ করিল। সমস্ত দিনের পরে ঠাকুরের অনাথ তিনটী রাত্রে আহার করিল।

বালককে কোলে করিয়া নারীদ্বয় অনেক উপদেশ দিল। রাধাচরণ সেই সময় একবার মাত্র পিতার গৃহাগমন চিন্তা ও শ্যামসুন্দরের নাম করিতে করিতে শয়ন করিল। কিন্তু আহ্লাদে আর নানা চিন্তায় নিদ্রা আসিল না দেখিয়া উঠিয়া অতি উচ্চকণ্ঠে গীত ধরিল—

শ্যামসুন্দর রূপমনোহর
যেন কোটী শশী ভাতিরে।
কিবা শ্রীঅঙ্গসুঠাম বঙ্কিমনয়ান
অধরে মুরলী কি শোভারে।
গলে গুঞ্জবেড়া পরা পীতধড়া
শিরে শিখিচূড়া চরণে নূপুর বাজেরে।
মরি মরি কি সুচারু ছান্দ
শ্রীমুখে রাজিছে গগন চাঁদ
ভক্ত হৃদি মুগ্ধ মোহন কান্দ
ওরূপের মধুর জ্যোতিরে॥

গীত শুনিতে শুনিতে নারীদ্বয় নিদ্রিতা হইলেন। শেষে রাধাচরণও নিদ্রিত হইল।

বরিশালের ম্যাজেষ্টারি আদালতে একটী মামলার বিচার হইতেছে। আদালতে লোক ধরিতেছে না, লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। মোকর্দ্দমার বিচার দেখিবার জন্য কত কৌতুকদর্শী, অনেক ন্যায়দর্শী, অনেক হুজুক প্রিয়, অনেক অর্থ লোলুপ, অনেক যোগাড়ে, অনেক মামলা-বাজ, কত শত সাধু, শত শত চোর, ডাকাইত, ব্যাংড়ে, বদমাইস আদালতের গৃহপূর্ণ করিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ গাছতলায় শুইয়া আছে।

কৃষ্ণকাঠি গ্রামের যাদবচন্দ্র মুন্সী ধনশালী কুসীদ জীবি ব্যক্তি। শারীরিক সৌন্দর্য্য আর চরিত্র দোষ দুই ইহার নিত্য সঙ্গী। গরীব দুঃখী লোকের উপর পীড়ন করা, আর অনাথা বিধবা যুবতীর সর্ব্বস্ব হরণ করা, ইহার নিত্যকার্য্য। গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের একটী বৈষ্ণবীর প্রতি অত্যাচার করিয়া আজ মুন্সী মহাশয় রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

বরিশালের সেই স্বনামখ্যাত হৃদয়বান ম্যাজিষ্ট্রেট মতিমান্ হ্যামিলটন বাহাদুর অদ্য বিচারক। বিচারে মুন্সী মহাশয়ের হাজার টাকা জরিমানা দিবার আদেশ হইয়াছে। মুন্সী ধনী হইলেও চরিত্র দোষে অনেক সময় অনেকরূপ মামলায় অর্থ নষ্ট করিয়াছে। প্রতিবাসিগণ তাহার উপর বড় বিরক্ত; অদ্য এই জরিমানা দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উকিল মোক্তারগণের ফি আদালতের ব্যয়, ব্যারিষ্টার সাহেবের খরচ, সর্ব্বোপরি আদালতের গুপ্ত ব্যয়াদির জন্য মুন্সীর প্রায় ৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়স্বজনে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে কিন্তু জুটিয়া উঠিতেছে না।

এদিকে বেলা অতীত প্রায় কাছারী ভাঙ্গিবার অল্পই বাকি আছে। শীঘ্রই টাকা দিতে হইবে—নতুবা জেলে যাইতে হইবে। এই কারণে যাদবমুন্সী কোটের ঘরে বসিয়া কান্দিয়া ঘর ভাসাইতেছে। আর ভাবিতেছে—বোধ হয় আমার হরিদাসীর অভিশাপে এই দশা ঘটিয়াছে।

কাছারী ভাঙ্গিবার আর বড় বিলম্ব নাই—লোকারণ্য কিন্তু পূর্ব্ববৎ। মুন্সী জেলে যায় কি জরিমানার টাকা দেয়—দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। সকলেই উৎসুক হইয়া আছে। যাদবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবমুন্সী, বাড়ীতে টাকা আনিতে যে নৌকা গিয়াছে; তাহারি প্রতিক্ষায় নদীর তীরে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছে। দেখিতে দেখিতে বাড়ীর লোক আসিয়া কহিল—না অত টাকা তো সংগ্রহ হইল না। তখন মাধবের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ব্যাকুল হৃদয়ে নদীর দিকে চাহিয়া একটা নূতন দৃশ্য দেখিল।

একটী ব্রাহ্মণ অতি বড় একখানি কাচ্ছা নৌকার ছাদে বসিয়া একটী চাঁদপানা মেয়েকে নদী হইতে বরিশালের সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন। নৌকা দেখিয়া দর্শক মাত্রেরই অতি ধনীর নৌকা বলিয়া বিশ্বাস হইল। মাধবের কিন্তু ব্রাহ্মণকে পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। ক্রমে নৌকা তীরে লাগিল—মুন্সী ব্রাহ্মণকে বহু দিন পরে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথা হ'তে এলেন? ব্রাহ্মণ মুন্সীকে পূর্ব্বের উপকারী বলিয়া অতি সম্ভ্রমের সহিত উত্তর দিলেন—বহু দূর হ'তে। মুন্সী পুনরপি আগ্রহের সহিত কন্যাটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"এটি কে?" উত্তর হইল—আমার ভাবী পুত্রবধু। মুন্সী মহাশয়—আমার শ্যামসুন্দর বিগ্রহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন তো? রাধাচরণ আর আমার ভগ্নী ও স্ত্রী ভাল আছে তো? মাধব থতমত খাইয়া উত্তর করিল হাঁ।

এই সময় মাধব নৌকার আকৃতি আর সাজসরঞ্জাম দেখিয়া কহিল—আপনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করে এনেছেন দেখছি!

শ্যামসুন্দরের সেবক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—হরির ইচ্ছা।

তখন যাদবমুন্সী তাঁহাকে যাদবমুন্সীর বিপদের কাহিনী আমূল শুনাইয়া দুইপা জড়িয়ে ধরিল। গৌরীচরণ দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ একতাড়া নোট লইয়া তীরে অবতরণ করিলেন।

কোর্টের নিকট গিয়া নোটগুলি যাদবমুন্সীর হাতে দিয়া কহিলেন—আমি ৪০৲ টাকা আপনার নিকট হইতে লইয়াছিলাম, তাহার চক্র বৃদ্ধির চক্রবৃদ্ধি হ'তেও অধিক; অন্য হাজার টাকা আপনাকে দিলাম। আমার পিতৃশ্রাদ্ধের ঋণ আমি অদ্য পরিশোধ করিলাম। তখন যাদবমুন্সী পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। গৌরীচরণের উন্নতি তাহারকৃত উপকার, তাহার দয়া, নিজের কুব্যবহার ইত্যাদি স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর জরিমানা জমা দিয়া মুক্তি পাইল। বাহিরে আসিয়া গৌরীচরণের পায়ের উপর পড়িয়া কহিল—আমি মহাপাপী তাই আপনার বাড়ীঘর নিলামে বিক্রী করিয়াছি। এমন কি শ্যামসুন্দরের গাত্রের পিতলের গহনা পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

তখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রকৃত ভক্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ্যের অবতার গৌরীচরণ একবার প্রদীপ্ত ব্রহ্মণ্যতেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নত হইয়া বলিলেন—"ক্ষমা ব্রাহ্মণের ভূষণ" "ঔদার্য্য' ব্রাহ্মণ্যের নিত্য আরাধ্য বেদমাতা গায়ত্রীর ন্যায় পবিত্র। দারিদ্র্যতা জনিত ভিক্ষাবৃত্তি ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য। আমি সুদগ্রাহী নই, অর্থকরী বিদ্যা অনুশীলনকারী নই, বিলাসী কামুক নই, আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্রাহ্মণের কার্য্য করিলাম।

কার্য্যের কর্ত্তা আপনি নহেন। সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" শিবশান্ত মদ্বৈত অনন্ত শ্যামসুন্দরই কর্ত্তা—ফলভোগ জীবের। আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহার ফল আপনি পাইলেন এবং পাইবেন। আমি যাহা করিতেছি তাহার ফল আমি পাইব, তাহার কেহ অংশী হইবে না। এখন আসুন আমার নৌকায় বাড়ী যাই। শ্যামসুন্দরের উৎসব্ করিব, চক্ষু ভরিয়া দেখিবেন—তাহার কৃপা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। কাছারীর সমস্ত লোকে তখন গৌরীচরণ গোস্বামীর মহত্ব আর যাদবমুন্সীর নীচত্ব আলোচনা করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। কেবল একটী ব্রাহ্মণ আর একটী অর্দ্ধবৃদ্ধ নমঃশূদ্র একটী নিম্নশ্রেণীর পুলিসকর্ম্মচারী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বলিল, মুন্সী তুমি বড় ভাগ্যবান্—তোমার কৃতকার্য্য আমরা সমস্তই জানি, কিন্তু বুঝিলাম না শ্রীহরির কি ইচ্ছা। তুমি শ্যামসুন্দর-বিগ্রহের প্রতি অত্যাচার করিতে ক্রটী কর নাই, কিন্তু সেই শ্যামসুন্দর তোমাকে, আজ তাহারি সেবক দিয়া উদ্ধার করিলেন। পাপের পরিণাম দেখিতে পাইলাম না এই যাহা দুঃখ। যাহার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গৃহদ্বার পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছ, এমন কি যাহার ক্ষুধিত পুত্রের মুখের গ্রাস-স্বরূপ জিনিষ চাউলগুলি পর্য্যন্ত লইয়া বিক্রী করিয়াছ, আজ সেই ব্যক্তি তোমাকে রাজদ্বার হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন,—ভগবানের এই বিচার বুঝিলাম না। কিন্তু যাও মুন্সী সেই সতীলক্ষ্মী ব্রাহ্মণীর পায়ে পড়িয়া "মা"

বলিয়া ক্ষমা চাও, আর তোমার পাপে অর্জ্জিত সম্পত্তি শ্যামসুন্দরের সেবায় দান করিয়া হিন্দুজন্ম সার্থক কর। তোমার পুত্র কন্যা নাই অদ্য হইতে প্রকৃত হিন্দু হও, মানুষ হও। পাপের স্রোত আর বৃদ্ধি করিও না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নিরব হইল। তখন পুলিষ-কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিল—থানার দারোগাবাবু এক খুনের মোকর্দ্দমায় পড়িয়া বিচারে চাকুরি হইতে অবসর পাইয়াছেন—জুয়াচোর সাহাজি সাহেবের নিকট লবন ওজনে কম দিয়া ২৫৲ টাকা অর্থ দণ্ড দিয়াছে। গোলকমণ্ডল সাহেবের চেষ্টায় রাস্তার ঠিকাদার হইয়াছে—আমি হেড কনেষ্টবলী পাইয়াছি।

এইগুলি সমস্তই ঠাকুরের দয়া ইহা আমার বিশ্বাস। গৌরীচরণ তখন এই ঘটনার পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিলেন এবং সকলকে লইয়া আপনার নৌকায় উঠিলেন। কাছারী জনশূন্য হইল।

সন্ধ্যা হয় হয় সময় নৌকা ছাড়া হইল। যাদবমুন্সী নৌকায় আসিয়া প্রথমে বাতাসে গিয়া বসিবার জন্য ছাদে উঠিলেন। মাধব প্রভৃতি গৌরীচরণের নিকট তাহার ধন উপার্জ্জনের গল্প শুনিতে লাগিল। যাদবমুন্সী বারে বারে নড়িতে লাগিল, যেন তাহার শরীরে কি একটা যন্ত্রণা উপস্থিত। ছাদ হইতে নীচে আসিল এবং নিম্ন হইতে ছাদে গেল। এক বার বসিয়া একবার দাড়াইয়া একবার শুইয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারিল না, শেষে বলিল গোঁসাইঠাকুর! আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে, যেন এখনি আমি মরিলাম, শরীরে বড় জ্বালা অসহ্য আবার তাহার উপর একটা ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আরও অস্থির হইয়াছি। দূরে অতি-দূরে দেখিতেছি যেন একটা পরিচিতা স্ত্রীলোক একখানা রক্তমাখা ছুরি লইয়া আমার বুকে বসাইতে আসিতেছে।

বল বল ঠাকুর একি দৃশ্য! তুমি ব্রাহ্মণ জ্ঞানী আমি হীন শূদ্র আমি কিছুতেই বুঝিতেছি না। একি—নিকটে যে—অতি নিকটে হু জ্বলে গেল। নৌকা তখন "নলছিটি বন্দর ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়াছে। মাধব আর গৌরিচরণ যাদবের সুশ্রূষা করিতে লাগিল। অপর লোকসমূহ অবাক হইয়া রহিল।

কিছু পরে যাদব আবার যেন প্রলাপ বলিতে লাগিল—একটা কালপুরুষ আমাকে জড়িয়ে ধরিল—আর স্ত্রীলোকটি বুকে ছুরি বসাইল গেছি—গেছি—উঃ জ্বলে গেল। বলিয়াই এইবার যাদব প্রকৃত অজ্ঞান হইল।

তখন নৌকা কৃষ্ণকাঠি আসিয়াছে, মাঝিরা নৌকা বান্ধিল। মাধবমুন্সী তাড়াতাড়ী গৌরীচরণের পুত্র, ভগ্নী, স্ত্রী ইত্যাদিকে সংবাদ দিল। তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিত দুই চারি কথার পর রাইকিশোরীকে লইয়া যাইতে কহিয়া রাধাচরণকে বলি-লেন রাধাচরণ তুমি শীঘ্র শ্যামসুন্দরের পাদোদক লইয়া আইস। মুহূর্ত্তমধ্যে পাদোদক আনিত হইল। যাদবমুন্সীকে তাহা পান করিতে দিলেন, কতকটা তাহার মাথায় দিলেন, ভক্তির এমনি মহিমা আর নিষ্ঠাবান্ গোস্বামীর এমনি অটল ভগবদ্বিশ্বাস যে অমনি মুন্সী সুস্থ হইল।

ব্রাহ্মণজাতীর আচরিত অনুষ্ঠিত বিগ্রহ সেবার ফল দেখিয়া মুর্খ কুচরিত্র কুসীদজীবি মুন্সী আশ্চর্য্য হইল। তখন লজ্জিত হইয়া সকলের সহিত তীরে নামিল। গোস্বামী দীর্ঘ দিনের নিজের পৈত্রিক বিগ্রহ হৃদয়ের আরাধ্য শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া প্রতিবাসীগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, আজ আর রাধাচরণের আনন্দের সীমা নাই। সে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া পিতার আজ্ঞা আর অভ্যাগত জনগণের আদেশ পালন করিতে লাগিল, গ্রামের মধ্যে গৌরিচরণের অবস্থা পরিবর্ত্তন সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। প্রতিবাসীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। মুন্সীর প্রতি গোস্বামীর ব্যবহার দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইল। সে রাত্রি লোকের আগমন আলাপ আর নৌকার দ্রব্যাদি উঠাইতে অতীত হইয়া গেল। সমগ্র গ্রামটী সেরাত্রে এই কথার আলোচনায় মুখরিত হইল। সুখের রাত্রি শীঘ্রই প্রভাত হইল।

পরদিন প্রাতে অতি সমারোহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের পূজা হইল; যাদব মাধব দুই ভাই আর বাড়ী গেলনা। নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ঠাকুরের নামে দান করিয়া গৌরী-চরণের নিকট দীক্ষা লইল। দুইভাই ঠাকুরের সেবক হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিল। যথাসময়ে রাইকিশোরীর সহিত রাধাচরণের বিবাহ দিয়া শ্যামসুন্দরের নূতন পরিচারক পরিচারিকা নিযুক্ত করিল।

ঠাকুরের অনুগ্রহে গৌরীচরণ অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া সেই দিন হইতে নিজের বাড়ীর নাম রাখিলেন "শ্যামকুটীর"। গ্রামের লোকে কিন্তু "গৌরী-কুটীর" বলিত।

এইরূপে আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া আহ্নিকপূত কর্ম্মী ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্যবহার দেখিয়া কৃষ্ণকাঠির গ্রামসুদ্ধ লোকে শিখিল যে, অচল ভক্তি বিশ্বাসের সহিত অনুষ্ঠিত জাতীয় আচরণ করিলে শ্রীভগবান নিশ্চয়ই জীবের মঙ্গল বিধান করেন। ভগবদ নির্দ্দিষ্টকার্য্যের প্রত্যবায় ঘটাইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুশাস্ত্র কথিত নিয়মগুলি ভগবদ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-উহার প্রকৃত ব্যবহারই হিন্দুয়ানি। প্রকৃত ব্যবহারই ধর্ম্মানুষ্ঠান।

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন।

শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণসভা ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যে সকল মহান উদ্দেশ্য লইয়া ইহা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—ধীরে ধীরে ঐগুলি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কলির প্রকোপহেতু লুপ্তপ্রায় চাতুর্ব্বর্ণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য এবং হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"—গীতোক্ত এই অমৃতোপম ভগবদ্বাণীর বহুল প্রচার দ্বারা—স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া সদ্ভাব স্থাপনপূর্ব্বক হিন্দুসমাজের পূর্ব্বগৌরবের উদ্ধার সাধনই ইহার লক্ষ্য। এই সভা একেবারেই সাম্প্রদায়িক নহে, অর্থাৎ জাতিবিশেষের স্বার্থ-প্রসারের বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী।

(১) দেশে দ্বিজাতিগণের মধ্যে বেদশিক্ষাবিস্তারের জন্য সাঙ্গবেদবিদ্যালয় স্থাপন, (২) শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মে হিন্দুসমাজান্তর্গত জনসাধারণের অনুরাগ সঞ্চার ও অবিহিত গর্হিত কর্ম্মের বর্জ্জনের জন্য, ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষাপ্রচার জন্য, কলিকাতা মহানগরীতে ধর্ম্মশাস্ত্র-চতুষ্পাঠী স্থাপন, (৩) দেশের সর্ব্বত্র প্রকৃত শাস্ত্রার্থ প্রচার জন্য প্রচার-বিভাগের প্রতিষ্ঠা (৪) প্রচারকার্য্যের সৌকার্য্যার্থে "ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকার" পরিচালন, (৫) সমগ্র ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠান, (৬) ইংরাজিকলেজে অধ্যয়ননিরত ছাত্রগণের মধ্যে সদাচার ও নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদির সুব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা, (৭) সামাজিক বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য কুলপরিচয় সংগ্রহ; (৮) ধর্ম্মের নামে যে সকল অধর্ম্ম ও ব্যভিচার চলিতেছে, ঐ গুলির নিবারণ এবং তীর্থসমূহের বিশুদ্ধি রক্ষা ও অত্যাচার নিবারণ জন্য 'ধর্ম্ম ও তীর্থরক্ষা' প্রস্তাব বিষয়ক শাখা-সমিতির প্রতিষ্ঠা—ইত্যাদি নানা সদনুষ্ঠান এই সভা আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এইগুলির পূর্ণাঙ্গতা সাধনের জন্য উপযুক্ত সুদক্ষ বিদ্বান ব্যক্তিগণের উপর বিভিন্ন বিভাগের ভার বিন্যস্ত করিয়া যতদূর সম্ভব চেষ্টা ও প্রযত্ন করিতেছেন। এই সকল সৎ কার্য্যের সুফল নানারূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার পরিচয় বিস্তৃতভাবেই এই স্থানে বিবৃত করা যাইতেছে।

মহাসম্মিলন—

শ্রীল শ্রীসুসঙ্গাধিপের আমন্ত্রণে বিগত বর্ষে ময়মনসিংহে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের উদ্যোগ হয়। স্থানীয় নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সম্মিলনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হয়, এমন সময়ে ইউরোপের মহাসমর ঘোর মূর্ত্তি ধারণ করায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য মহামান্য ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয় এক মন্ত্রণা সভা আহ্বান করেন। আমাদের সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতিমহাশয় শ্রীল শ্রীদ্বারবঙ্গাধিপতি এই সভায় আমন্ত্রিত হইয়া দিল্লী নগরে গমন করিতে বাধ্য হন। এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে বিগত বর্ষে সম্মিলনের অধিবেশন হইতে পারে নাই। কিন্তু এ বৎসর বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীল শ্রীদ্বারবঙ্গাধিপতির সভাপতিত্বে—মহাসমারোহে ময়মনসিংহ নগরীতেই উক্ত মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার বিবরণ সকল সংবাদপত্রে এবং ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, নিম্নে ঐ মহাসভায় ঘোষিত নির্দ্ধারণগুলি বিবৃত হইল ;—

১। ব্রাহ্মণ-পরিবারস্থ প্রত্যেক উপনীত ব্যক্তির ত্রিসন্ধ্যোপাসনায় এবং ব্রাহ্মণোচিত সদাচার রক্ষায় ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য জাতীয়গণের ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষায় অধিকতর আগ্রহ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হউক।

২। বর্ণাশ্রমী বিদ্যার্থীদিগের অধ্যয়নের জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং সংস্থাপিত বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসে ধর্ম্ম ও সদাচার শিক্ষা এবং রক্ষার ব্যবস্থার চেষ্টা করা হউক।

৩। হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার্থ এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সুবিধার জন্য হিন্দু-গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীর দেবালয় রক্ষা ও সংস্থাপন করা এবং অতিথি-সৎকার, জলাশয়, গাভী ও গোচারণ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

৪। জাতিগত পবিত্রতা এবং ব্রাহ্মণের বংশ-পরিচয় রক্ষা ও জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হউক।

৫। আচারবান বিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত ও কুলাচার্য্য মহোদয়গণকে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ হইতে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে বৃত্তিদানে সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

৬। সমাজে পণ-প্রথা নিবারণের ব্যবস্থা করা হউক।

৭। বিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানিকর পুস্তক অধ্যয়ন নিবারণ এবং স্কুল কলেজের ছাত্র-দিগের পাঠোপযোগী শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রণয়নের বিহিত উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হউক।

৮। অবিলম্বে পঞ্জিকার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হউক।

৯। বিবিধ উপায়ে হিন্দুসমাজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা করা হউক।

১০। শাস্ত্র ও সমাজ বিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন অসবর্ণ বিবাহ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

১১। ময়মনসিংহে একটী ব্রাহ্মণসভা গঠিত করিয়া একজন সুযোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ পূর্ব্বক জেলায় চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

১২। মহামান্য ভারতসম্রাট ও সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবন লাভ করতঃ জয়শ্রী ও সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ মঙ্গলদ্বারা বিভূষিত হউন; এতদর্থে ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাঙ্গ বেদবিদ্যালয়।

এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১০০ জন ছাত্র বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুস্থানী ছাত্র, মাত্র ১২ জন বাঙ্গালী। দেশে বেদের আদরের সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যালয়ে ক্রমশঃই বাঙ্গালী বিদ্যার্থী আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা বিশেষ আশার বিষয়। এতদ্ব্যতীত এস্থানে ব্যাকরণ, কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রাদিরও অধ্যাপনা হয়। অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাদত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, স্বরবৈদিক প্রকরণ অধ্যাপনার জন্য দুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, শ্রীযুক্ত রণবীর দত্ত শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বালমুকুন্দ শাস্ত্রী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রিমহাশয় এই বিদ্যালয়ের আচার্য্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই উদ্যোগে ইহার প্রতিষ্ঠা। তিনি অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা ইহার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহারই অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রযত্নে স্বর্গীয় মহাত্মা শিবকুমার শাস্ত্রীর নাম চিরস্মরণীয় করণার্থে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সহায়তায় 'শিবকুমার সংস্কৃত বিদ্যার্থীভবন' নামক বিরাট ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে, এবং তথায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বাস করিতেছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র চতুষ্পাঠী।

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র চতুষ্পাঠীর পরিচালনা করিতেছেন। এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনার কিছু বিশিষ্টতা আছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাই ছাত্রগণের অভিলষিত শাস্ত্রাধ্যয়নের সীমা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে অল্প ছাত্রই শাস্ত্রে প্রকৃত প্রবেশ লাভ করেন। যাঁহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদ্বারা বঙ্গের হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইবে, তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা না থাকিলে অনেক সময়ে কুফল হইবারই সম্ভাবনা। এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা দর্শন অথবা স্মৃতিশাস্ত্রে কৃতবিদ্য গবর্ণমেণ্টপরিগৃহীত উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁহারাই গভীরভাবে শাস্ত্রের তত্ত্বাবধান জন্য এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। বর্ত্তমানে ৮জন উপরোক্ত শ্রেণীর ছাত্র এইখানে অধ্যয়ন করিতেছেন। তন্মধ্যে চারিজন বিশিষ্ট ছাত্রকে মাসিক ৩০৲ বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। এই চতুষ্পাঠীর দ্বারা আর একটি দুরূহ কার্য্য সাধিত হইতেছে। অধুনা বড়ই ব্যবস্থাসঙ্কট উপস্থিত, সেইজন্য কোন প্রকার দক্ষিণাদি

না লইয়া, নানাস্থান হইতে প্রার্থিত বিষয়ে প্রকৃত শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা সকল যত্নসহকারে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে অন্ততঃ ২৫০ আড়াইশত এইরূপ দুরূহ ব্যবস্থা বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে জিজ্ঞাসু হিন্দুসমাজে প্রদত্ত হইয়াছে।

দর্শন-চতুষ্পাঠী।

ব্রাহ্মণসভা প্রতিষ্ঠাপিত সাঙ্গবেদবিদ্যালয়ে যদি চ সাংখ্য, বেদান্তাদি দর্শন অধ্যাপিত হয় বটে, তথাপি যে ন্যায়দর্শনজন্য সমগ্র ভারত মধ্যে বাঙ্গালার প্রাধান্য স্বীকৃত, সেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আমাদের বেদবিদ্যালয়ে হইত না। এই অভাব ব্রাহ্মণসভা অনুভব করিয়া আসিতেছেন। বিগতবর্ষ হইতে এই চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই বৎসরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় বেদান্ত ও সাংখ্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা ১৫জন ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন। এই দুই নবীন অধ্যাপক সাত্ত্বিক, আচারবান্, সাধুপ্রকৃতি এবং কৃতবিদ্য।

ব্রাহ্মণ-ছাত্রাবাস।

কলেজসংশ্লিষ্ট হোষ্টেলে যদিও হিন্দুর অভক্ষ্য ভক্ষণের প্রচলন কম, তথাপি হিন্দু আচার সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া সেই সব হোষ্টেলে অবস্থান ব্রাহ্মণছাত্রপক্ষে সহজ হয় না। অনেক সময় হোষ্টেলে ব্রাহ্মণছাত্র সন্ধ্যাপূজাদি করিলে উপহাসাস্পদও হইয়া থাকেন। এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণসভার সহায়তায় ব্রাহ্মণছাত্রাবাস স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করেন; এবং ব্রাহ্মণ-সভার কার্য্যকরী-সমিতির অনুমোদনানুসারে বিগতবর্ষে বিভিন্ন কলেজের ২০।২৫ জন ব্রাহ্মণ-ছাত্র লইয়া একটী ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়, ছাত্রগণ রীতিমত সদাচার ও সন্ধ্যাপূজাদি যাহাতে করেন, তাহার যথোচিত ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বৎসর কলিকাতায় বাটী ভাড়া অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায় উপযুক্ত বাটীর অভাবে আমাদের সংকল্পিত ব্রাহ্মণ-ছাত্রাবাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তবে দৈবদুর্ব্বিপাকে এ বৎসর আমাদের উদ্যম ব্যর্থ হইলেও আমরা একেবারে হতাশ হই নাই। সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া মনোমতভাবে উক্ত ব্রাহ্মণ-ছাত্রাবাস পরিচালন করিতে পারিব এই আশা রাখি।

পরীক্ষা বিভাগ।

এই বিভাগের কার্য্য পূর্ব্বাপর একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গঙ্গাটিকুরীর জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যই প্রায় সম্পূর্ণ। বাঙ্গালার যে সকল জেলায় সংস্কৃতানুশীলন কতকপরিমাণেও আছে, প্রায় সেই সকল স্থানেই ইহার পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত আছে। উপস্থিত পূর্ব্ব ও উপাধি এই দ্বিবিধ পরীক্ষা গৃহীত হয়।

এই বৎসরে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ১ ১ জন পরীক্ষা দেয়, তন্মধ্যে ৪২ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১০ জন ছাত্র, ১১ জন অধ্যাপক ও ৩৩ জন প্রশ্নকর্ত্তাও বৃত্তি পাইয়াছেন। অর্থের অস্বাচ্ছল্য হেতু বৃত্তির পরিমাণ উপযুক্তরূপ না হইলেও বৃত্তির সম্মান প্রদর্শন ব্রাহ্মণসভা উচিত বিবেচনা করেন। সামান্য হইলেও তাই এই বৃত্তির ব্যবস্থা।

প্রচার বিভাগ।

এই বিভাগের কার্য্য এক্ষণে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিতেছেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাধ্যুসিত বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিয়া তথায় সভার উদ্দেশ্য প্রচার এবং সেই ভাবে ব্রাহ্মণদিগকে উদ্বুদ্ধ করা এবং শাখাসভা স্থাপন দ্বারা সেই ভাবকে স্থায়ী করা, সদস্য সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বোপরি এই মূল ব্রাহ্মণসভার সহিত মফঃস্বলের সহানুভূতি উদ্রিক্ত করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। উভয়েই সুপণ্ডিত ও সুবক্তা এবং সাত্বিক ও সদাচারী। আমরা আশা করি ইঁহাদের চেষ্টায় ব্রাহ্মণসভার উদ্দেশ্য প্রচার সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে। ব্রাহ্মণসভার কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত বহু শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে। সংখ্যায় মোট ৮৭টী শাখাসভা আছে। নিম্নে বহু শাখাসভার নামোল্লেখ করা হইলঃ—ফরিদপুর জেলাস্থ বাজিতপুর, সামন্তসার, প্রাণপুর, কাওলীবেড়া, ফুলারডাঙ্গা, প্যারপুর, পাঁচ্চর, উমেদপুর, আঁধারমানিক, কালামৃধা, ননীক্ষীর, আমগ্রাম, মহেন্দ্রদী, কবিরাজপুর, সাধুহাটী, দত্তপাড়া, গোঁসাইরহাট প্রভৃতি গ্রামসমূহে এবং খুলনা জিলাস্থ খুলনা সদর, লখপুর, মাগুরা প্রভৃতি গ্রামসমূহে এবং মেদিনীপুরস্থ তমলুক, জুনাটীয়া, টাবাখালী, কাখুরিয়াবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে এবং বগুড়াজিলাস্থ রায়কালী গ্রামে এবং ঢাকা জিলাস্থ পাটগ্রাম, চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি গ্রামসমূহে, বর্দ্ধমান জিলাস্থ মীরহাট গ্রামে এবং মুর্শিদাবাদ জিলাস্থ কান্দিসহরে, দুমকাজেলার তাড়রা গ্রামে, ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া সদরে, শ্রীহট্টের মহাসহস্রগ্রামে শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে। এ ছাড়া মুর্শিদাবাদ জিলার কল্যাণপুর, বাউগ্রাম, পাঁচথুপী, রাজহাট, পীলসীমা, ইন্দ্রাণী, মাড়গ্রাম, এড়োয়ালী, অজান, কাগ্রাম, মাখলতোর, শালু, মালিহাটী, আলুগ্রাম, আমলাই, দত্তক্রটিয়া, সাহোড়া রামনগর, মাজীয়াড়া; বীরভূম জিলার—ঝলকা, নওপাড়া, তুরীগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এবং বর্দ্ধমান মৌগ্রামে শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে। যশোহর "লক্ষ্মীপাশা কালীবাড়ী" শাখাসভা, বীরভূমজিলার বড়শাল শাখাসভা, খরুণশাখাসভা, দেখুড় উদয়পুর শাখাসভা সন্ধ্যাজোল শাখাসভা মুর্শিদাবাদের সাটুই কুমারপুর শাখাসভা, শক্তিপুর, রামপাড়া নলহাটী শাখাসভা, বেলডাঙ্গা, টেঁয়াবৈদ্যপুর, মহলা, নূতনগঞ্জ, গণ্ডই, শাখাসভা, ফরিদপুর জেলায় ধুলজোড়া উজিরপুর, সাতৈর মহিষালয়, সেহলাপটী পাজাশিয়া, রায়েরচর, কুষীরদীয়া, বাটকেমারি, ফুলালী, কামারগ্রাম সোতাশী, ভাটদী, বজেশ্বরদী, হরিদাসপুর, পিঞ্জলিয়া, যশোহর জেলায় চাঁদরা, হরিহরনগর, আউনাড়া, মহম্মদপুর, টগরবন্দ, চিতুরকান্দী

ত্রিপুরাজেলার বিদ্যাকূট প্রভৃতি স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। সেই সেই শাখাসভার পরিচালকগণ ব্রাহ্মণসভার উদ্দেশ্যসমূহ প্রচার করিবার জন্য নিজেদের আয়ত্তাধীন যোগ্যতানুসারে কোথায় বা একটী, কোথাও বা একাধিক গ্রাম লইয়া সামাজিক সংস্রব রাখিয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম উপদেশ দান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে বহু ব্রাহ্মণপরিবারেই যাহাতে শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান চলে এবং প্রত্যেক উপনীত ব্রাহ্মণ-সন্তান যাহাতে সন্ধ্যোপাসনা করেন, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, বহুস্থলেই বিশুদ্ধভাবে যাহাতে ক্রিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এবং বিশুদ্ধভাবে যাহাতে সন্ধ্যোপাসনা করিবার সুবিধা হয়, এজন্য বিশুদ্ধ পুঁথি, পুস্তক এবং পুরোহিত প্রভৃতির সংগ্রহকল্পে বহু ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণসমাজ-পত্রিকা।

এই বিভাগের কার্য্যভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি ও কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের উপর ছিল। এ বৎসর পত্রিকাখানিকে আরও উন্নত প্রণালীতে পরিচালন জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত ব্যক্তির উপর পত্রিকার সম্পাদন-ভার অর্পিত হইয়াছে। ইঁহারা দুইজন বিনা পারিশ্রমিকে এই গুরুভার অঙ্গীকার করিয়াছেন। একজন বঙ্গবাসীকলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক সুলেখক সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোদয় সংস্কৃতপত্রিকার সম্পাদক প্রথিতনামা পণ্ডিত শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ, মহাশয়। ইনি যে কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় পারদর্শী তাহা নহে, পরন্তু পত্রিকাসম্পাদন বিষয়েও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি সুসঙ্গ রাজকুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা এম,এ বাহাদুর। ইনি ভারতীয় ও প্রতীচ্য অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রাজপরিবারভুক্ত হইলেও ইনি যে সাহিত্যের আকর্ষণে এই পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। তাঁহার আদর্শে ব্রাহ্মণভূস্বামিপরিবারভুক্ত নবযুবকগণ ব্রাহ্মণসভার কার্য্যে যোগদান করিলে ব্রাহ্মণসভার অভ্যুদয়বিষয়ে আমরা আশান্বিত হইতে পারি। আমরা এই সুদক্ষ সম্পাদক-মণ্ডলীর অধ্যক্ষতায় পত্রিকার যথেষ্ট অভ্যুদয় দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

পঞ্জিকা সংস্কার-সমিতি।

বর্ত্তমান বৎসরে এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কার্য্য হয় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব-বিবেচনায় হিন্দু সাধারণ ব্রাহ্মণসভার এ বিষয়ে কালক্ষেপ মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা জানাইতেছি যে, এই অবলম্বিত সংস্কারকার্য্যে অপরিহার্য্য কালক্ষেপে হতাশ হইবার কিছুই নাই; ব্রাহ্মণসভার সংকল্প দৃঢ় আছে।

এই পঞ্জিকা-সমিতির কার্য্য পরিচালন জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণতর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পঞ্জিকা-সমিতির মনোনীত সদস্যগণ—

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, ২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ৩। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যারত্ন, ৪। শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় ঝা, ৫। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ জ্যোতীরত্ন, ৬। শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি, ৭। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, ৮। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৯। শ্রীযুক্ত আশুতোষ শিরোরত্ন, ১০। শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ, ১১। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ন, ১২। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্র-বাচস্পতি, ১৩। শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন, ১৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, ১৫। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, ১৬। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন রক্ষিত, ১৭। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার।

কুলপরিচয় বিভাগ।

এই বিভাগের কার্য্য ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে এবং প্রবীণ ঘটককর্ত্তৃক সঙ্কলিত কুলগ্রন্থ সংগ্রহ চেষ্টা চলিতেছে। ৬৫৲ টাকা মূল্যে "কুলগ্রন্থদীপিকা" দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে এবং তাহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যাইতেছে। 'কুলার্ণবতত্ত্ব' নামক আর একখানি গ্রন্থ ও ক্রয় করা হইয়াছে। এই বিভাগের প্রধান উদ্যোক্তা—হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বারেন্দ্র কুলপরিচয় সম্বন্ধীয় কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথী সংগৃহীত হইয়াছে এবং কুলীনগণের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। পুঁথিসংগ্রহকল্পে শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী মহাশয়ের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই বিভাগের প্রাণস্বরূপ, তাঁহারই প্রযত্নে এই বিভাগের কার্য্য আশাতিরিক্তরূপে সাফল্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণসভা কার্য্যালয়ে সংগৃহীত কুলপরিচয় এবং এই সকল দুর্লভ গ্রন্থ-সাহায্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-জাতির বংশধারা সঙ্কলন করা সহজ হইবে।

অসবর্ণ বিবাহ-বিলের বিপক্ষে ব্রাহ্মণসভার উদ্যম ঃ—

সকলে অবগত আছেন যে বিগত বর্ষে বোম্বাই প্রদেশবাসী শ্রীযুক্ত প্যাটেল ভারতীয় রাজমন্ত্রিপরিষদের সভ্যরূপে অসবর্ণবিবাহপ্রস্তাব রাজকীয় বিধিরূপে নিবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত মন্ত্রিপরিষদে উত্থাপিত করেন। ইহাতে সনাতনধর্ম্মিগণের হৃদয়ে যে ব্যথা উৎপন্ন হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি মহোদয়ের নিকট আবেদন করিবার জন্য বিগত বার্ষিক অধিবেশনে এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। তৎপরে ব্রাহ্মণসভার সভ্যগণের একটী অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে, সাধারণ হিন্দুমাত্রেই যখন এই বিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান, তখন কেবল ব্রাহ্মণসভা হইতে এ বিষয়ে আন্দোলন না করিয়া নিখিল হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা উচিত। তদনুসারে মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজন্যদিগের সভাপতিত্বে ও ব্রাহ্মণসভার

অন্যতম সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর মহাশয়ের সম্পাদকত্বে অসবর্ণ-বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতিকূলে যে মহান আন্দোলন হয়, এবং কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণপ্রান্ত স্থিত বিশাল প্রান্তরে বিরাট সভার অধিবেশন হয়—যাহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল —তাহার পুনরুল্লেখ এখানে বাহুল্য মাত্র। এই বাপদেশে লক্ষাধিক ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ যে আবেদনপত্র হিন্দুসাধারণের পক্ষ হইতে প্রেরিত হয়, তাহার অনুবাদ "ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকায় বিগত মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ব্রাহ্মণশাখাসভাসকল সর্ব্বতোভাবে যে সহায়তা করিয়াছেন,তাহা প্রশংসার্হ। তাঁহাদেরই চেষ্টায় উক্ত উদ্বেগকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিশাল হিন্দুসমাজের অভিমত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এক্ষণে আপনারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, বিগত ৭ই আগষ্ট লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে ভারতসচীব মিঃ মণ্টেগু মহোদয় পার্লামেণ্টের কমন্সসভায় ভারতীয় কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অসবর্ণবিবাহ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে ভারত গভর্ণমেণ্ট কোনওরূপ সহায়তা করেন নাই ও করিবেন না এবং ইহার জন্য ভারত রাজসরকার দায়ী নহেন। ভারতসচিব হিন্দুসাধারণের মর্ম্মন্তুদ আন্দোলন ও তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই ঐ রূপ কথা বলিয়াছেন, এবং ভারত সরকারের নিরপেক্ষতাই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

কার্য্যকরী-সমিতি।

ব্রাহ্মণ-সভার কার্য্যাবলী পরিচালন জন্য একটী কার্য্যকরী-সমিতি গঠিত আছে। সম্পাদক-গণ প্রয়োজন মত এই সমিতি আহ্বান করেন এবং ইহার পরামর্শ মতে সভার কার্য্যাদির ব্যবস্থা করেন। আলোচ্য বর্ষে এই কার্য্যকরী-সমিতির ১৭টী অধিবেশন হইয়াছে।

পারিষদগণ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র স্মৃতিকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ন।

সহকারী সভাপতিগণ—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, রাজা শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

কার্য্যাধ্যক্ষগণ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, মাণ্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাণ্যবর কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর।

সহকারী সম্পাদকগণ—

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যান্য সভ্যগণ –

শ্রীযুক্ত হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, রামদয়াল মজুমদার, পশুপতিনাথ শাস্ত্রী, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অশ্বিনীকুমার আচার্য্য, রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়, কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায়, কুমার বিমলেন্দু রায়, অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন, মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, প্রিয়কুমার আচার্য্য চৌধুরী, রামচরণ বিদ্যাবিনোদ, আশুতোষ শিরোরত্ন, বসন্তকুমার তর্কনিধি, আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীরাম শাস্ত্রী, শশিকুমার শিরোমণি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, হরিনারায়ণ সরস্বতী, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস রায়, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী, উমানাথ ভট্টাচার্য্য, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সাহায্যদাতৃগণের নাম—

মাণ্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পশ্চিমদেশীয় শ্রীযুক্ত বলদেব রামবিহারী লাল, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীযুক্ত কুন্দনলাল চতুর্ব্বেদী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীঝাঁ ব্যাকরণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবীর বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন রায়, শ্রীযুক্ত শুকদেব মানাকা, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ হরিতোয়াল, শ্রীযুক্ত রামলাল রামস্বরূপ, শ্রীযুক্ত ভুমাল রায়জী প্রভৃতি।

ব্রাহ্মণ সভাগৃহ।

আপনাদিগকে অদ্য একটী আনন্দের কথা শুনাইব। আশা হয় শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় ব্রাহ্মণ-সভার এবার 'পরগৃহ বাস' ঘুচিল। ব্রাহ্মণসভা কার্য্যালয় জন্য আমরা এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মূল্য নির্দ্ধারণে সুকিয়াষ্ট্রীট ও আপার সারকুলার রোডের সঙ্গমস্থিত ১০৪ নং

বিস্তৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন ভবনের (Lease) ইজারাস্বত্ব ৪০০০০্ মূল্যে ক্রয় করিয়াছি। এবং এই স্থানটীর উপর সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের যে মালিকানি স্বত্ব আছে, তাহা ৯৫ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করা স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনি আপাততঃ ৩০ হাজার টাকা মাত্র লইয়াই আমাদিগকে উহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়া ঐ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, বক্রী ৬৫ হাজার টাকা ৫ বৎসরে ক্রমে ক্রমে লইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া যে সৌজন্য দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহারই বংশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কায়স্থ কুলতিলক শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয়ের ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাই ইহার মূল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এইহেতু এস্থানে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীভগবান তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। এই ভূমি ক্রয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মণসমাজের প্রধান সহায় মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রতিশ্রুত ৩০,০০০্ ত্রিশহাজার টাকা দিয়াছেন। বক্রী টাকা ব্রাহ্মণসভার প্রাণস্বরূপ কুণ্ডলার জমিদার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়মহাশয় রাজা চৌগ্রামাধিপ শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায় মহোদয়, মাননীয় কুমার শ্রীশিবশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, বর্দ্ধমানের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় নিজ হইতে ঋণ করিয়া ও চাঁদা তুলিয়া দিবার ভার লইয়াছেন। এই সকল মহাপ্রাণ দানশৌণ্ড মহাত্মদিগকে আমরা সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ প্রত্যেকের উদ্দেশে বলিব—দাতা শতং জীবতু।

ধর্ম্ম ও তীর্থরক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ-সভার নূতন উদ্যম।

আজকাল কলির প্রভাবে ধর্ম্মের যে কিরূপ গ্লানি হইতেছে এবং তীর্থসমূহে তীর্থাধিকারিগণের অত্যাচার যেভাবে চলিতেছে, তাহার নূতন করিয়া পরিচয় দিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না, সংবাদ পত্রপাঠক প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এবিষয়ে বিশেষরূপ অবগত আছেন। এই অধর্ম্মের প্রকোপ হইতে ধর্ম্ম ও তীর্থ সমূহের উদ্ধার সাধন করিয়া পুণ্য চাতুর্ব্বর্ণ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য এই মহানগরীস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-প্রচারিণী-সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ মহাশয় ও সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী-মহাশয় উক্ত সভার পক্ষ হইতে উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মণ-সভার সহায়তা প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণসভা সানন্দে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং গত ৩২শে শ্রাবণের কার্য্যকরী-সমিতির অধিবেশন একটী শাখাসমিতি গঠন করিয়াছেন।

এই শাখা-সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ মহাশয় হইয়াছেন।

আমরা আশা করি সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গ সংগঠিত এই সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া উক্ত ধর্ম্ম ও তীর্থ রক্ষা প্রস্তাবটীকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইবে।

উপসংহার।

ব্রাহ্মণসভা উল্লিখিত বিবিধ সমাজ হিতকর কার্য্য হস্তে গ্রহণ করিয়া ঐ গুলির সাফল্যের জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজের মুষ্টিমেয় জনকয়েক স্বজাতিবৎসল ব্যক্তি মাত্রই এই সভার অভ্যুদয় সাধনার্থ যত্নপর। ব্যক্তি বিশেষের এইরূপ ত্যাগ ও একনিষ্ঠতা পরিদৃষ্ট হইলেও,—ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সাধারণভাবে সহানুভূতি কোথায়? দেশের সাধারণ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ কি চিরদিনই এই সকল শুভানুষ্ঠানে নীরব, নিরুদ্যোগ ও নিদ্রিত থাকিবেন? তাঁহারা কি আমাদের উদ্যমে যোগদান করিবেন না? একবার কি তাঁহারা নয়ন উন্মীলিত করিয়া এই সাধু কার্য্যসমূহের শুভ ফল নিরীক্ষণ করিবেন না?

দানবীর মান্যবর গৌরীপুরাধিপ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মণ-সভার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তিনি এই সভার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে যে ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা এদেশে অতীব বিরল। তাঁহার প্রদত্ত এক লক্ষ মুদ্রা হইতে বার্ষিক আয় ব্রাহ্মণ-সভাকে জীবিত রাখিয়াছে, কিন্তু তাঁহার একাকীর দান ত জাতির সজীবতার লক্ষণ নহে? ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগ সমগ্র জাতির মুখোজ্জ্বল করিলেও উহা জাতিগত শক্তির পরিচায়ক নহে। উহা জাতিগত পরমুখাপেক্ষিতারই প্রমাণ। ত্যাগশীলতা ত আর একজনের একচেটিয়া নহে? যতদিন ধনী, নির্ধন নির্ব্বিশেষে সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের বালক বৃদ্ধ ও বনিতা-এ একযোগে এই সমাজের উন্নতিকল্পে কাজ করিতে না শিখিবেন, যতদিন সকলে স্ব স্ব সামর্থ্যানুরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া এই ব্রাহ্মণসভা ও তাহার শুভ উদ্দেশ্যসমূহের পুষ্টি সাধনার্থ যত্নপর না হইবেন,—যতদিন না দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণসন্তান কর্ত্তব্যের প্রেরণায় উন্নিদ্র হইয়া নবাভ্যুত্থানের উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ হইবেন, ততদিন ব্যক্তিবিশেষের দান লক্ষাধিক বা কোটি পরিমিত হইলেও জাতীয়জীবনসংগঠনজনিত গৌরব করিবার মত আমাদের কিছুই নাই। স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা না হইলে সভা পরিচালন ও তাহার উদ্দেশ্যসমূহের যথাযথ সম্পাদন অসম্ভব। এইজন্যই দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের সঙ্ঘশক্তি সংগঠনের জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

নব মল্লিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কবি রাজার কথার সূত্রপাতেই চমকিয়া উঠিলেন, নবমল্লিকা! কথার ভাবে বুঝিলেম, তবে ত' রাজকুমারীর নামই নবমল্লিকা; শোকান্ধকারময় মনে যেন ক্ষণেকের মধ্যে বিদ্যুদাভাস দেখা দিয়া গেল। মনে পড়িল-সেই প্রথম কবিতাপাঠ—নবমল্লিকার স্তুতি। কল্পনায় জাগিল—বাতায়ন-জালান্তর্বর্ত্তিনী একটী তরুণী জীবন্ত প্রতিমা নবমল্লিকা। তাহার সেই কোমল আঁখি দুটীর সরসস্পর্শ আজ যেন কবি ক্ষণেকের জন্ত অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করিলেন। তাহার পর কত তুচ্ছ ঘটনা (যাহা ঘটিয়া তাঁহার মানসপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে) আজ অতি প্রবল হইয়া আসিয়া তাঁহার এই কল্পনাস্রোতে যোগদান করিল। কয়েক দিনের তুচ্ছ ঘটনা—যেমন রাজকুমারীর দাসী দু'তিনদিন তাঁহার স্বল্পভাষিণী দাসীর সহিত আলাপ করিতে আসিত। কিন্তু বিফল মনোরথে ফিরিয়া যায়। সে সব যেন নূতন আলোকে তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। একখানি ছোট চন্দনাগুরুধূপবাসিত ভূর্জ্জপত্রিকা ''লেখা আছে, অভিসারিকার আমন্ত্রণ, কিন্তু শেষে যোগ করা আছে, আমি শ্রীরাজেরই প্রথম অভিসারিণী আর কাহারও নহি। আপনার পরিচিত (পরিচিত লেখাটী একটু কল্পিত দেখায়, যেন প্রণয় ইত্যাকার কথা বদলাইয়া লেখা) ছদ্মনামে লিখিতেছি। কবির প্রতিভাদৃপ্ত হৃদয়ে সে আহ্বান তত বলবান্ হয় নাই। তারপর আরও অনেক সামান্য ঘটনা তাঁহার মনকে সে ছবির বিষয়ে সজীব করিয়া দিল, সে ছবি তাঁহার অনমুমিত পূর্ব্ব। তিনি বিস্ময় ও হর্ষে জড়ীভূত হইয়া উঠিলেন। এইসকল চিন্তায় কিছু সময় গেল।

একটু থামিয়া তিনি রাজার মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন সেখানে নীরব শোকের এক উদাস দৃষ্টি তাঁহার কথার প্রতীক্ষায় যেন লোলুপ হইয়া রহিয়াছে। বুকে অনেক আশা, অনেক হর্ষ, অনেক ভয়ের কম্পন দমন করিয়া কবি কহিলেন মহারাজ! আমি আজ আমার কবিরাজ নাম সার্থক করিব। রাজা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, পারিলেন না। পশ্চাৎ হইতে জলদগম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসী বংশদণ্ডী সভায় প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমার কবিরাজ নাম সার্থক হইবে।

সকলেই সেই হীন বস্ত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের পানে উন্মীলিত-নয়নে চাহিয়া রহিল। বংশদণ্ডী রাজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরাজ শির নত করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন বংশদণ্ডী রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন—মহারাজ! আজ আপনার সম্মুখে এক রহস্য ভাঙ্গিব। ইচ্ছা করেন ত' আপনার অন্তরঙ্গ ভিন্ন অন্য সকলকে বিদায় দিতে পারেন। সকলে উঠিয়া গেল। কেবল রাজা, শ্রীরাজ ও বংশদণ্ডী

সেখানে রহিলেন। কবিও উঠিতে যাইতেছিলেন, বংশদণ্ডী তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। আর একজন সেখানে স্তম্ভান্তরালে রহিল, কেহ তাহাকে দেখিল না—সে সেনানায়ক চক্রপতি।

বংশদণ্ডী কহিলেন—শুনুন—আপনারা যখন নীচে সভাগৃহে উপবেশন করেন, দুই দিন ঘটনাক্রমে ঠিক্ সেই সময়ে আমি রোগিণীর কক্ষে ছিলাম। সেখান হইতে নীচের কথাবার্ত্তা ক্ষীণভাবে শুনা যায়। আমি রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলাম, দেখিলাম—একজন কে কথা কহিলেই, তাহার নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠে। সেই কথা শুনিবার জন্য আগ্রহের ভাব প্রকাশ পায়। আমি দুইচারিবার উঠিয়া সেই স্বরশুনিলাম, সে বেশ একটী মিষ্টস্বর—পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। আজ দুইদিন তাহা লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানাইবার জন্য আসিতেছি, এমন সময়ে ঠিক্ সেইরূপ মধুর স্বরে ইনি (শ্রীরাজকে দেখাইয়া) আপনাকে বলিতেছেন—'আমার কবিরাজ নাম সার্থক করিব' পরে ঈষৎ থামিয়া হাসিয়া এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া শ্রীরাজের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—আমার বোধ হয় রাজকুমারী ইহার প্রতি অনুরাগিণী।

সমস্ত সভাগৃহ নিস্তব্ধ, সন্ন্যাসী শেষ কথাটী এত আস্তে অথচ গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন, যে, তাঁহার কথা শেষ হইলেও মনে হইতেছিল, যেন তখনও তিনি বলিতেছিলেন—রাজকুমারী ইঁহার প্রতি অনুরাগিণী। তাঁহার কথা শেষ হইয়া গেল। বিস্ময়, হর্ষ, ক্রোধ ও ভয়মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব ভাবের আন্দোলনে রাজার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাজকুমারী ইঁহার প্রতি অনুরাগিণী, একটা বিস্ময়ের কথা? মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার বন্ধু অকৃত্রিম সরল প্রাণ শ্রীরাজ, তাহার অনুরাগের পাত্র ভাবিয়া একটু ক্ষণিক মাত্র হর্ষের আভাস প্রাণে দেখা দিল। কে অনুরাগ সঞ্চার করাইল? ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। এবং সন্দেহভাজন চরগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ইহার কি পরিণাম ভাবিয়া ভীত হইলেন। রাজকন্যার সহিত পরিণীত হইবে অজ্ঞাতকুলশীল একজন যুবা। হউক সে হাজার সরল-প্রাণ কবিশ্রেষ্ঠ! রাজা ধীরে ধীরে হাঁটু গাড়িয়া সেই সাধুবরের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিলেন—কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—প্রভু! পরিণাম!

কিন্তু ইতিমধ্যে বংশদণ্ডী এক অদ্ভুত ভাব বিকারে পড়িয়া গিয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বকালের এক সুকুমার শিশুর মুখ হঠাৎ যেন তাঁহার স্বপ্নের মত মনে হইল। চমকিয়া ভাবিলেন—'এমুখ কোথা মনে হইতে আসে? কিন্তু চিন্তাসূত্রের মূল পাইতেছিলেন না। চারিধারের স্তম্ভগাত্রে খোদিত বিকটাকার দৈত্যগণের মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিয়া ভাবিলেন—'ইহাদের দেখিয়াও সে মুখের ছায়া মনে উদয় হয় না। কবে কোথায় রে! কোথায়!! তখন মনে হইল একদিন তরুণপ্রভাতের অমলকিরণে স্নান করিয়া কেবল রাজবংশের এক নবীন কুমার শিক্ষার্থীরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত লইয়া তাঁহার দ্বারে আসিয়া শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল। তিনি যত্নে সাদরে সে শিশুটীকে মনুষ্যের কর্ত্তব্যপথে তুলিয়া দিয়াছিলেন। মনে পড়িল—সে কতদিন ছায়ানিবিড়বনতলে [illegible] হইয়া তাঁহার পার্শ্বে [illegible]

বাহির হইত। কতদিন একাকী রাত্রে জাগিয়া অনন্ত তারকাপূর্ণ আকাশপটে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া থাকিত। মনে পড়িল—তাহার সাধারণ পাঠে অসীম অবহেলা। কিন্তু কবিগণের গ্রন্থে অতুল ভক্তি। আর চারিধারের বন্যপ্রকৃতির সহিত অহরহঃ গূঢ় আলাপ। সেই সব মনে বেশ ঠিক্ করিয়া লইয়া, তাহার বিদায় দিনের বিংশবর্ষীয় নবযুবার স্বর্গোপম বদনমাধুরী হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিলেন। সেই বিদায়-আলিঙ্গনাশ্রু যে কত হৃদয়মাধুর্য্যের পরিচায়ক। তাহার সহিত আজিকার এ মুখখানি কি মেলেনা? বেশ মেলে। তিনি কেরলরাজের বিপত্তির কথা সুদূর সুবর্ণরেখাতীরে আপন নিভৃত আশ্রমে বড় সঠিক্ ভাবে পান্ নাই। একটা অস্ফুট গুঞ্জনমাত্র সেখানে পৌঁছিয়াছিল। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী তাহাতে বড় বেশী কর্ণপাত করেন নাই। আজ কিন্তু সে সংবাদের সত্যতা দিবার উজ্জ্বল আভায় তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। অর্দ্ধচকিতস্বরে ডাকিলেন—'বেণুধর! একি?'

কেরলরাজকুমারের নাম ছিল 'বেণুধর-বিজয়শ্রী।' তখন সেই হঠাৎ সম্বোধনে ঈষৎ স্তম্ভিত, চকিত হইয়া অথচ আপনার স্থৈর্য্যকে সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া বেণুধর—তাঁহার প্রিয়শিষ্য কেরলরাজকুমার তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া ডাকিলেন—গুরুদেব!

ইতিমধ্যে প্রথম যখন বংশদণ্ডী শ্রীরাজকে বেণুধর বলিয়া ডাকিলেন, তখনই রাজা চকিত-ভাবে সিংহাসনের একপার্শ্বে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিমেষমধ্যে যখন তাঁহার প্রিয়বন্ধু শ্রীরাজ কবিরাজ "বেণুধর" আহ্বানে "গুরুদেব" বলিয়া সন্ন্যাসীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন, তখন আর তাঁহার কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি জানিতেন—কেরলরাজ-কুমারের নাম বেণুধর। কেরলসেনাগণ যখন মাহোটাক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হয়, তখন সেক্ষেত্রে বীরশ্রেষ্ঠরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল "বেণুধর বিজয়শ্রী"। বৃদ্ধ-রাজার অসতর্কতায় এবং কালবিলম্বহেতু কেরলসেনাগণ পরাজিত হইয়াছিল। কেরলের বৃদ্ধরাজা আপন সেনাপতিত্ব-গৌরব ছাড়িতেন না। যৌবনে তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীররূপে খ্যাতিলাভ করিয়া বেণুধরের মাতাকে স্বয়ম্বর হইতে লইয়া আসেন। আসন্ন বিপৎকালে তাঁহার সে গৌরব কাল হইল। রণক্ষেত্রে আপন প্রাণ দিয়া তিনি সে ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু কেরলরাজ্য বিজেতৃগণ অধিকার করিল। তারপরকার সকল ঘটনা যখন একে একে মনে উদয় হইতে লাগিল; তখন বিস্ময়ে ও হর্ষে রাজার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্তে রাজার মনে এইরূপ একটা ভাবস্রোত খেলিয়া গেল। তখন বংশদণ্ডী কহিলেন—উঠ বৎস! আমি তোমার সকল অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার কবিরাজ নাম সার্থক হইবে। চিকিৎসক-কুলের আরাধ্যদেবতা মহেশ্বরের মত তুমি নিরুপমা উমালাভ করিয়া সংসারে অনন্ত সুখ ভোগ করিবে। আর কেরলবিজয়ী মহারাজ চতুর্ভুজ! তোমার পরিণাম কি হইবে শুন! তোমার বন্ধুশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য তোমার কবি-রাজকে একবার সত্যসত্যই কবিরাজ হইয়া সেই সুকুমারীবালার অনুরাগ-রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে। কারণ এখন হঠাৎ তাঁহার

নিকট ইঁহার প্রকৃত নাম প্রকাশ করিলে আনন্দাতিশয্য দুর্ব্বল দেহ সহ্য করিতে পারিবে না। কেমন সম্মতি আছে ?

রাজা তখনও কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই সিংহাসনের পার্শ্বে ভর দিয়া আকুলনেত্রে উভয়ের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্নিগ্ধ-শরৎ-সমীরে বহুমূল্য ঝালরগুলি সেই নব-মল্লিকা কবিত্বপাঠের দিন যেমন দুলিয়াছিল আজও তেমনি দুলিতেছে। বাহিরের আলোকোচ্ছ্বাসময় নগরীতে শতকর্ম্ম-সঙ্ঘের জনরব শ্রুত হইতেছে। ভৈরবের মন্দির হইতে উচ্চ স্তোত্র পাঠ হইতেছে। ঈষৎ ধূপগন্ধে সমীরণ অতি পবিত্র স্পর্শ। চারিধারে উৎসব-কোলাহল। শ্রমণগণের ভিক্ষার গান তাঁহারই রাজবাটীর সিংহদ্বারে তখনও শুনা যাইতেছিল। তিনি ভাবিলেন—এই বীর বেণুধর মাহোটাক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার তাহার কবিত্বসুধা প্রাণে সঞ্চারিত হইল। তাহার সরল সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহাকে বুকে লইয়া কহিলেন—"প্রভু সম্মত আছি", শ্রীরাজের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—আর তুমি শ্রীরাজ নহ। আজ তুমি বেণুধর বিজয়শ্রী। কিন্তু যদি তোমার মুখে ওই সরল সুন্দর সত্যজ্যোতিঃ তবে এ ছলনা কোথা হইতে শিখিলে ?

পুলকাকুল বেণুধরের চক্ষে দুই ফোঁটা অশ্রুজল দেখা দিল। বসনাগ্রে তাহা মুছিয়া করুণহাস্যে রাজার পানে চাহিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি জানিতাম, পৃথিবীতে কেরল-রাজ্যের সহিত কাহারও বিবাদ নাই। ভাবিয়াছিলাম—সেই বৃদ্ধরাজা লইয়া কেরলরাজ্য সকল ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া বসিয়া আছে। সে কাহারও রাজ্যে লোভ করে না। কাহারও কথায় থাকে না। তারপর আর একটু হাঁসির মাত্রা চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—কিন্তু তারপর যখন এই প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিমময় গঙ্গেশ্বর চতুর্ভুজ তাঁহার চতুরঙ্গ সেনা লইয়া কেরলরাজ্যের দ্বারে আসিয়া যুদ্ধপ্রার্থনা করিলেন, তখন বুঝিলাম—আশা বৃথা স্বপ্নময়ী। কঠিন বাস্তবজগতে তাহার স্থান নাই। তাই তখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলাম! কিন্তু, আমাদের সৈন্য, শান্তিপ্রিয় ও অশিক্ষিত—যাহা হইবার হইল। মাহোটা অন্তে বনে আশ্রয় লইলাম। কেরলরাজধানীর, রাজপুরীর এবং রাজপরিবারের অবস্থা ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি কাঁদিলাম। প্রতিক্ষণ আশা করিতেছিলাম—কখন রাজপুরী দাহের অগ্নিশিখা লক্ষ্য হইবে। রাত কাটিল, ভাবিলাম—কই রাজপুরী ভস্মীভূত করিয়া, রাজধানী ভূমিসাৎ করিয়া, উৎপীড়িত রাজপরিবারগণের আর্ত্তনিনাদে বিজেতা ত' তাঁহার বিজয় চিহ্ন রাখিয়া গেল না! মনে হইল এ লোকটাকে চিনিতে হইবে। তারপর এই ছদ্মবেশ। এই ছদ্মবেশে সমস্ত আপনার কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। কেরলরাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন, প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজ্য-পরিচালনের ভার প্রদান, নিরুদ্দিষ্ট রাজকুমারের অন্বেষণ, সব দেখিলাম। দেখিয়া ভাবিলাম—এ লোকটাকে চিনিতে হইবে। যে এমন করিয়া মানুষকে আদর করিতে পারে, সে কেন নিরীহ এক রাজ্যজয়ের বৃথা প্রশংসা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না!

রাজ্যজয় প্রবৃত্তি জিনিতে কত নিরীহ সুখশান্তিময় প্রাণের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়—ভাবিয়া দেখে

না। তাই এই ছদ্মবেশে তোমার কাছে আসিয়া স্বভাবসুলভ কবিত্বমুগ্ধ হৃদয়ে বনপ্রকৃতির পূজা উপহার দিয়াছিলাম। তারপর ত' সবই তুমি জান। সেখান হইতে যে তোমার সঙ্গে আসি নাই, তাহার কারণ, আর একবার কেরলে ফিরিয়া যাইয়া গোপনে প্রধান মন্ত্রীকে আমার উদ্দেশ্য জানাইয়া আসি। আজ আমি আপনার স্নেহে মুগ্ধ, বিক্রীত।

তারপর যাহা ঘটিল সে সহজে অনুমেয়। বংশদণ্ডী উভয়ের শিরে হস্তস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদবন্ধনে তাঁহাদের বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করিয়া দিলেন! এবং অনতি বিলম্বে সুবর্ণ-রেখা তীরে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ ঘটনা রাজা ও শ্রীরাজ ভিন্ন কেহই জানিল না। আর একজন জানিয়াছিল—কিন্তু সে গোপনে, অন্যায়পূর্ব্বক। তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সে অন্তরে জ্বলিতেছিল, কিন্তু কিছু প্রকাশ করিল না।

(৪)

শ্রীরাজ, রাজকুমারীর চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন। নগর মধ্যে সকলে জানিল শ্রীরাজ উত্তম চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ। একদিন শরতের অতি শীতল প্রত্যুষে দাসী এবং সহচরী সম-ভিব্যাহারে শ্রীরাজ রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারীর কাণে কাণে তাহার পূর্ব্বদিন সহচরী এসুখ সংবাদ জানাইয়াছিল। তবে ইহার কারণ কিছুই বলিতে পারে নাই। সে কারণ, রাজা চতুর্ভুজ ও শ্রীরাজভিন্ন অন্য কেহ জানিত না। আর জানিত সেনানায়ক চক্রপতি। তবে,রাজকুমারীর মনেহইল বুঝি এতদ্দিনে আমার চিত্তদাহের কারণ ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু কে সে কারণ ধরিয়াছে, এবং কেমন করিয়া ধরিয়াছে; মনে মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ এই প্রশ্নই বারবার তাঁহার আশা ও হর্ষবিহ্বল হৃদটীকে আন্দোলিত করিতেছিল। কিন্তু আজ চিরদিনের সঞ্চিত গচ্ছিত ধনের মত তিনি তাঁহার শুভদিনের সঞ্চিত প্রণয়রত্নরাশি, তাহার উপযুক্ত অধিকারীর হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন ভাবিয়া তাঁহার মন সরস ক্ষীণ আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল।

নবমল্লিকা আজ ক্ষণে ক্ষণে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আবার ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু মুদিয়া স্নিগ্ধ প্রশান্ত নিদ্রারমত ভাব দেখাইতেছিল। শরতের স্বর্ণাভ আলোকে বিস্তৃত কক্ষতল উদ্ভাসিত। আর তাহার ঔজ্জ্বল্য প্রাচুর্য্য এই বিরহক্ষীণা তরুণী মূর্ত্তিটীকে যেন আরও ক্ষীণ স্বর্গচ্যুত শুষ্ককুসুমটীর মত দেখাইতেছিল। হঠাৎ পদশব্দে নবমল্লিকা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তখন দাসী ঘরে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু এবার নয়নপদ্ম আর মুদিল না। উৎসুক আশায় যেন তাহা দ্বিগুণ বিকশিত হইল। তার পরে সহচরী ঘরে প্রবেশ করিল। পীড়িতার গণ্ডে ক্ষণেকের জন্য একটা লজ্জার ক্ষীণ রক্তাভা দেখা দিল। সকলের পক্ষে শ্রীরাজ অবনত অথচ মধুর ভঙ্গীতে নয়নপক্ষ ঈষৎ ফুটাইয়া রাজকুমারীর চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলাইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সে নয়ন মুদিত হইল। ক্ষীণা তরুণীর গাত্রে যেন নব জীবনের একমুহূর্ত্ত মাধুরীরাগ খেলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা।

জমার বিবরণ।

ইং ১লা বৈশাখ লাঃ ৩০শে চৈত্র ১৩২৫ সন।

জমা—

সাধারণ-বিভাগ—

অনারেবল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত ৭০,০০০৲ টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ৫৲ হিসাবে—	৩,৫০০৲	
গত বৎসরের বাকী—	৪৭॥৶০	
একুন	৩৫৪৭॥৶০	
মধ্যে আদায়—		২,৭৫৬৲
অন্যান্য বার্ষিক বা মাসিক বৃত্তি আদায়—		৭৪৯৲
১৩২৫ সালের বাড়ী ভাড়া আদায়—		১,০৩০৻৩
বিবিধ আদায়—		১২০৷/৩
বার্ষিক সভাখাতে—		৭০৲
ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকা-বিভাগ—		৫২০৸/০
পরীক্ষা বিভাগ—		৩০০৲
ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী খাতে—		৬০৲
কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক—		৪৯১॥৶৯
দেনা খাতে— (কর্ম্মচারী প্রভৃতির বৃত্তি, বাড়ীভাড়া, প্রেসের বাকী ইত্যাদি)		৭৫৭৸৯
মোট		৬,৮৫৫॥৶০

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা।

খরচের বিবরণ।

ইং ১লা বৈশাখ লাঃ ৩০শে চৈত্র ১৩২৫ সন।

খরচ—

গতবৎসরের নাজাই তহবিল—		৩৩২৸৵৹
সাধারণ বিভাগ—		৪,৬৯৯৸৶৯
দেবার্চ্চনা খাতে—	২৯।৶৬	
বার্ষিক সভা খাতে—	১২০৶৹	
কর্ম্মচারী প্রভৃতির বৃত্তি—	১,৪৬৩ ৻৯	
অধ্যাপক ও ছাত্রবৃত্তি—	৬৭৩।৶৯	
পাথেয় খরচ—	৩২৷৷৶৹	
বাড়ীভাড়া খাতে—	২,'৪৭৲	
বেদবিদ্যালয়ের সাহায্য—	১১৬৶৹	
সুদখাতে—	৪৩৶৬	
ব্রাহ্মণ-ছাত্রাবাস—	৪৸৹	
পঞ্জিকা-সংস্কার খাতে—	৭।৶৯	
বিবিধ খরচ—	১৬৯৸৬	
		১,৪০১৷৷৶৯
ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকা বিভাগ—		
পত্রিকা অন্যান্য—	৭১৪৷৷৶৯	
ডাকমাশুল খরচ—	১৪২৸৹	
প্রেস খাতে—	৫৪৪।৹	
পরীক্ষা বিভাগ—		৩১৬৶৬
ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী খাতে—		৭৫৶৬
তহবিল—		২৯৸৶৬
নগদ—	৫।৬	
হাওলাত—	২৪৷৷৶৹	
	মোট	৬,৮৫৫৷৷৶৹

শ্রীনরেশচন্দ্র মৈত্র।

হিসাব রক্ষক।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার

আয়ের বিবরণ।

ইং ১লা বৈশাখ লাঃ ৩০শে চৈত্র ১৩২৫ সন।

আয়—

বিবরণ		
অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী দং ৭০,০০০৲ টাকার সুদ—		২,৭৫৬৲
অন্যান্য বার্ষিক বা মাসিকবৃত্তি—		৭৪৯৲
অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—	৫০০৲	
শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	৬৲	
রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর—	৬০৲	
রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়—	৮০৲	
শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—	১০০৲	
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	৩৲	
১৩২৫সালের বাড়ী ভাড়া আদায়—		১,০৩০ ৫৩
বিবিধ আদায়—		১২০।/৩
বার্ষিক সভা খাতে—		৭০৲
অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—	৫০৲	
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—	২০৲	
পরীক্ষা বিভাগ—		৩০০৲
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	৩০০৲	
ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকা বিভাগ—		৫২০৸/০
নাজাই তহবিল উদ্‌বৃত্ত তহবিলের হিসাবে পার করা গেল—		৮৭১৷/৬
	মোট	৬৪১৭৸০

উদ্‌বৃত্ত তহবিলের হিসাব—

বিবরণ	
মোট নাজাই তহবিল—	১,২০৪।৶৬
মোট	১,২০৪।৶৬

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার

ব্যয়ের বিবরণ।

ইং ১লা বৈশাখ লাঃ ৩০শে চৈত্র ১৩২৫ সন।

ব্যয়—

সাধারণ বিভাগ—		৪,৬৯৯৸৶৯
দেবার্চ্চনা খাতে—	২৯।৶৬	
বার্ষিক সভা খাতে—	১২০৶০	
কর্ম্মচারী প্রভৃতির বৃত্তি—	১,৪৬৩৶৯	
অধ্যাপক ও ছাত্র বৃত্তি—	৮৭৩।৶৯	
পাথেয় খরচ—	৩২॥৶০	
বাড়ী ভাড়া—	২,০৪০	
বেদবিদ্যালয়ের সাহায্য—	১১৬৶০	
সুদখাতে—	৪৩৶৬	
ব্রাহ্মণ-ছাত্রাবাস খাতে—	৪৸০	
পঞ্জিকা-সংস্কার খাতে—	৭।৶৯	
বিবিধ খাতে—	১৬৯৸৶৬	
ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকা বিভাগ—		১,৪০১॥৶৯
পরীক্ষা বিভাগ—		৩১৬৶৬
	মোট	৬,৪১৭৸০

হিসাব—

গত বৎসরের নাজাই তহবিল—	৩৩২৸/০
বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয় হিসাবের জের—	৮৭১৶৬
মোট	১,২০৩।৶৯

শ্রীচিরসুহৃদ লাহিড়ী।

শ্রীনরেশচন্দ্র মৈত্র।

হিসাব রক্ষক—

সাঙ্গবেদ বিদ্যালয়।

সন ১৩২৫ সালের হিসাব।

জমা—

গত বৎসরের তহবিল—	৪৯৮৬
বৃত্তিখাতে জমা—	১,৭৫২,

অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী— ১২০০,

রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর— ৬০,

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬০,

শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ লাহিড়ী ১২,

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা দত্ত শাস্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক সংগৃহীত ৪১০,

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা— ১০,

১৭৫২,

আনামত জমা—	১০০,

রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়—

১৯০১৮৬

খরচ—

অধ্যাপক বৃত্তি—	১৩৪০,
ছাত্রবৃত্তি—	৬৯।/০
বাড়ী ভাড়া—	৪২০,
বাজে খরচ—	১৭৮৵০
তহবিল—	৫৪।/৬
	১৯০১৮৬

শ্রীচিরসুহৃদ লাহিড়ী।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

সহকারী সম্পাদক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা।

শ্রীচন্দ্রিকা দত্ত শাস্ত্রী।

অধ্যাপক।

১৩২৬ সনের শ্রী৺দুর্গাপূজার কাল নির্ণয়।

৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ঘ ৯।৫২।১০ সেঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ।

১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার ঘ ৯।৫১।৫৫ সেঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

১৪ই আশ্বিন বুধবার ঘ ৯।৫১।৫৪ সেঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণ ও কালবেলানুরোধে ঘ ৮।৭২।২৯ সেঃ মধ্যে দ্ব্যাত্মক চরলগ্নে শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীর পত্রিকা স্থাপন এবং সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ। পূর্ব্বাহ্ণমধ্যে সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। পূর্ব্বাহ্ণমধ্যে সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ।

১৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ঘ ৯।৫১।৫৩ সেঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে মহাষ্টমী পূজা প্রশস্তা। পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে মহাষ্টম্যাদি কল্পারম্ভ। রাত্রি ঘ ১০।৩৯।৩৯ সেঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। রাত্রি ঘ ১১।৩।৩৯ সেঃগতে ঘ ১১।২৭।৩৯ সেঃ মধ্যে বলিদান ও সন্ধিপূজা সমাপনীয়া।

১৬ই আশ্বিন শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ও বারবেলানুরোধে ঘ ৮।৫২।৩০ সেঃ মধ্যে মহানবমী পূজা প্রশস্তা।

১৭ই আশ্বিন শনিবার ঘ ৯।৫১।৫১ সেঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ কিন্তু কালবেলা ও পূর্ব্বাহ্ণাদির অনুরোধে ঘ ৭।২৪।৮ সেঃ গতে ঘ ৯।২৪।৫ সেঃ মধ্যে চরলগ্নে ও চর-নবাংশে দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে দেবীর বিসর্জ্জন করিবে।

বিসর্জ্জনান্তে অপরাজিতা পূজা।

শ্রীদুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন।
ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক।
(ব্রাহ্মণসভা)

সপ্তম বর্ষের বর্ণানুক্রমে বিষয় সূচী।

(১৩১৫ সালের আশ্বিন হইতে ১৩২৬ সালের ভাদ্র পর্য্যন্ত)

পদ্য।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৫ সালের আশ্বিন হইতে ইহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ-সভা কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।